পণ্ডিতবর

শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি

প্রণীত

ধর্ম্মব্যাখ্যা।

১ম পর্ব্ব।

১ম হইতে ৫ম খণ্ড পর্য্যন্ত।

—·০:০:০ –

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক।

কলিকাতা

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্টীম মেশিন প্রেসে শ্রীবিহারীলাল
সরকার দ্বারা মুদ্রিত এবং ৬৬ নং কলেজ ষ্ট্রীটে শ্রীভূধর
চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

শক ১৮০৬।
সন ১২৯১।

আমার অনুমতি ব্যতিত কেহই এই ধর্ম্মব্যাখ্যা (যাহা অং
এইরূপ ১২ পর্ব্বে অর্থাৎ ৬০ খণ্ডে শেষ হইবে) পুনর্মুদ্রন অথবা ভাষান্ত
অনুবাদ কি কোন কিছুই করিতে পারিবেন না।

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক।

বিজ্ঞাপন।

বহুদিন পরে বুঝি আবার ভারতের দুঃখ পূর্ণ ভাগ্য প্রসন্ন হইল। আবার বুঝি ভারতগগনে পবিত্র সুধাকরের নির্ম্মল জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। বহুযুগ ধরিয়া নিদ্রাভিভূত ভারত-সন্তান, আর্য্য-সন্তান পুনরায় দেখি চক্ষুরুন্মীলন করিতেছেন। আপনাদের প্রণষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত হৃদয় বাঁধিয়া বদ্ধ পরিকর হইয়া প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা আবার ভারতবাসীর পরম সৌভাগ্যের বিষয় কি হইতে পারে। পুনরায় আর্য্যসন্তানের হৃদয়ে প্রবল ধর্ম্মানুরাগ, উদ্যম, ও উৎসাহ অল্পে অল্পে সঞ্চারিত হইতেছে দেখিয়া কার প্রাণ আনন্দে না মাতিয়া উঠে। আজ চারি মাস ধরিয়া যে তুমুল ধর্ম্মান্দোলনে ভারতবর্ষ আলোড়িত হইল, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আপনাদের সমূহ ক্ষতি স্বীকারে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া, ঝড় বৃষ্টি ভ্রূক্ষেপ করিয়া নিশ্চল ভাবে জনতা মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া, উৎসুকচিত্তে যে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণির অমৃতময়ী, জ্ঞানপূর্ণ, সারগর্ভ ধর্ম্মব্যাখ্যা শ্রবণ করিল, ইহা দেখিয়া কোন ধর্ম্মানুরাগীর হৃদয়ে আশার সঞ্চার না হয়? বর্ত্তমান সময়ে ভারতসন্ততিগণ এই পবিত্র অনুষ্ঠানের গুরুত্ব অনুভব করিতে কতদূর সমর্থ হইবেন তাহা জানি না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় বিশ্বাস যে ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা ইহার আশানুরূপ শুভ ফল সম্ভোগ করিয়া আপনাদের কৃতার্থ জ্ঞান করিবেন ইহাতে কোন মাত্র সংশয় নাই। কিন্তু এই আন্দোলন স্থায়ীরূপে রক্ষিত করিতে হইলে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বিবৃত ব্যাখ্যা সমূহ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। কারণ তাহা হইলে ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই স্থিরচিত্তে শান্তভাবে ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ধর্ম্মানুশীলন করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে বিশেষ সুবিধা হইবে। নচেৎ যদি এই ঘোর আন্দোলন কেবলমাত্র বক্তৃতাদিতেই পর্য্যবসিত হয়, তাহা হইলে অচিরেই ইহা অতীতের কাল গর্ভে চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া আমি পণ্ডিতবরের সমস্ত ব্যাখ্যা তাঁহার অনুমত্যনুসারে ক্রমে ক্রমে খণ্ডাকারে প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। তিনি স্বয়ং অনুগ্রহ

করিয়া তাঁহার সমস্ত বক্তৃতা বিশদরূপে পরিবর্দ্ধিত ও পরিশোধিত করিয়া লিখিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। তদনুযায়ী এবারে কেবলমাত্র "ধর্ম্মের প্রয়োজন" এই বিষয়টী তাঁহার দ্বারা পরিস্কাররূপে লিখিত হইলে প্রকাশিত করা হইল। বিষয়টী অত্যন্ত গুরুতর। কিন্তু সাধারণের নিতান্ত আগ্রহের নিমিত্ত অতি সত্বর লিখিত হইল বলিয়া অনেকগুলি অংশ সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে তন্নিমিত্ত সে বিষয়গুলি কিছু কঠিন হইবার সম্ভাবনা। ভরসা করি পাঠকগণ একটু নিবিষ্ট চিত্তে লেখকের উদ্দেশ্য সংগ্রহ করিতে যত্নবান হইবেন। ভবিষ্যতে পুনঃমুদ্রণের সময় সে গুলি আরও বিশদরূপে সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায়, বুঝাইয়া দেওয়া হইবে।

এই পুস্তক আমার বিনা অনুমতিতে কেহ ভাষান্তরে অনুবাদ বা পুনর্মুদ্রণ করিতে পারিবেন না।

বশম্বদ
শ্রী ভূধর চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক।

সূচীপত্র।

প্রথম খণ্ড—ধর্ম্মের প্রয়োজন।

বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	দুঃখের কথা বা প্রস্তাবনা	১
২।	ধর্ম্ম কাল্পনিক পদার্থ নহে	২
৩।	ধর্ম্মের লক্ষণ	৪
৪।	অধর্ম্মের লক্ষণ	৬
৫।	ধর্ম্মের বর্ণনা	৭
৬।	ধর্ম্মের অবস্থা	১০
৭।	অদৃষ্ট	১৫
৮।	পাপ ও পুণ্য	১৬
৯।	ধর্ম্মাধর্ম্মের গতি প্রণালী	১৬
১০।	ধর্ম্মের উন্নতি ও অবনতি	২১
১১।	প্রাণীর উৎপত্তি	২২
১২।	প্রাণীর ক্রমোন্নতি	২৪
১৩।	ক্রমোন্নতির প্রণালী	২৬
১৪।	আন্তরিক শক্তির দ্বারা শরীরের গঠন ...	২৮
১৫।	মনুষ্য শরীরের উৎপত্তি	৩০
১৬।	ধর্ম্মের উন্নতি ও অবনতির লক্ষণ ...	৩২
১৭।	ধর্ম্মক্ষয়ে মনুষ্যের অসম্পূর্ণতা ও ধর্ম্ম সঞ্চয়ে পূর্ণতা	৩২
১৮।	সম্পূর্ণ মনুষ্য ভারতেই সম্ভবে	৩৪
১৯।	ধর্ম্মক্ষয়ে মনুষ্য, মনুষ্য-চর্ম্মাচ্ছাদিত পশু ...	৪১
২০।	ধর্ম্মক্ষয়ে বংশ পরম্পরা ক্রমে মনুষ্যের বন মানুষ হইবার সম্ভাবনা	৪২
২১।	ধর্ম্মের অভাবে আর্য্যবংশের উৎসেদের সম্ভাবনা এবং ধর্ম্ম থাকিলে থাকিবার কথা	৪৬

বিষয়		পৃষ্ঠা
২২।	ধর্ম্মের অভাবে আয়ুঃক্ষয় ও উন্নতিতে আয়ুঃবৃদ্ধি ...	৫১
২৩।	ধর্ম্মক্ষয়ে ভারতবাসীর আরও অধিক আয়ু ক্ষয়ের সম্ভাবনা	৫৫
২৪।	ধর্ম্মানুষ্ঠান থাকিলে শরীর নির্ব্যাধি ও সচ্ছন্দ ভাবে থাকে	৫৬
২৫।	ধর্ম্ম ব্যতীত প্রকৃত সুখ হয় না	৫৮
২৬।	ধর্ম্মের দ্বারাই জাতীয়তা ও সমাজ রক্ষা ...	৫৯
২৭।	ধর্ম্মক্ষয়ে পরকালে ক্লেশ	৬০
২৯।	ধর্ম্মোন্নতির গুরুতর ফল	৬০

দ্বিতীয় খণ্ড—ধর্ম্মসাধন (ধর্ম্মের উপাদান নির্ণয়।)

১।	ধর্ম্মের উপাদান নির্ণয়	৬১
২।	নিরোধ শক্তি হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি ও অধর্ম্মের ক্ষয়	৬৩
৩।	নিরোধের বিবরণ	৬৫
৪।	বৃত্তি নিরোধের বিভাগ	৬৬
৫।	স্বরূপ নিরোধের বিভাগ	৬৮
৬।	শক্তির আধার ভৌতিক পদার্থ নহে ভৌতিক পদার্থের আধারই শক্তি	৭২
৭।	দেহের মধ্যে দুই প্রকার শক্তি ক্রিয়া করে ...	৭৩
৮।	অস্বাভাবিক শক্তি দেহের ধর্ম্ম নহে কিন্তু স্বতন্ত্র ও স্বাধীন	৭৫
৯।	জীবাত্মার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা	৭৮
১০।	ইন্দ্রিয় নিরোধাদির লক্ষণ	৭৯
১১।	ইন্দ্রিয় ও প্রাণ নিরোধের বিভাগ	৭৯
১২।	মানসাদি নিরোধের বি৴রণ	৮১
১৩।	ধর্ম্মের বিবরণ	৮৩
১৪।	আত্মজ্ঞানের বিভাগ	৮৩

পৃষ্ঠা		বিষয়
১৫।	দেহাত্মজ্ঞানাদির বিভাগ	৮৮
১৬।	সবৃত্তিক দেহাত্মজ্ঞানাদির বর্ণনা	৮৯
১৭।	আত্মজ্ঞানের বিকাশ	৯৪
১৮।	ইন্দ্রিয় ও প্রাণবৃত্তির নিরোধ দ্বারা দেহাত্মজ্ঞান নিবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞানের উৎপত্তি	৯৫
১৯।	ইন্দ্রিয় ও প্রাণের স্বরূপ নিরোধের দ্বারা ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞানের নিবৃত্তি এবং মানসাত্মজ্ঞানের উৎপত্তি ...	১০১
২০।	মানস নিরোধের দ্বারা মানসাত্মজ্ঞানের নিবৃত্তি ও অভিমানাত্মজ্ঞানের উৎপত্তি	১০৩
২১।	অভিমান নিরোধের দ্বারা অভিমানাত্মজ্ঞানের নিবৃত্তি ও বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞানের উৎপত্তি	১০৪
২২।	বুদ্ধি নিরোধ দ্বারা বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞানের নিবৃত্তি ও প্রকৃত্যাত্মজ্ঞানের উৎপত্তি	১০৪
২৩।	প্রকৃতি নিরোধে পরমাত্মার প্রকৃত স্বরূপে বিকাশ ...	১০৫
২৪।	ঔদাসীন্যবিবরণ	১০৫
২৫।	ঔদাসীন্যের বিভাগ	১১৫
২৫ক।	ভক্তি	১২০ক
২৬।	ধৃতির বিকাশ	১২০খ
২৭।	ক্ষমার বিকাশ	১২২
২৮।	দমের বিকাশ	১২২
২৯।	অস্তেয়ের বিকাশ	১২৩
৩০।	শৌচের বিকাশ	১২৩
৩১।	ইন্দ্রিয় নিগ্রহের বিকাশ	১২৪
৩২।	ধী শক্তির বিকাশ	ঐ
৩৩।	সত্যের বিকাশ	১২৮

তৃতীয় খণ্ড—ধর্ম্মসাধন (ধর্ম্মনিমিত্তাদি নির্ণয়।)

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। ধর্ম্মের দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারণ	১৩০
২। বিবেক দর্শনের বিবরণ	১৩১
৩। কিরূপে বিবেক দর্শন দ্বারা বৈরাগ্য নিরোধ শক্তির বিকাশ হয়	১৩৫
৪। ধারনার লক্ষণ	১৪৩
৫। ধারণা দ্বারা ধর্ম্মের উন্নতি	১৪৩
৬। শারীর প্রদেশে ধারণার প্রণালী ও তৎফল ...	১৪৫
৭। বাহ্য বিষয়ে ধারণার প্রণালী ও তৎফল ...	১৫২
৮। ধ্যানের বিবরণ	১৫৬
৯। বুদ্ধি, অভিমান, মন ও ইন্দ্রিয়াদির বিশেষ বিবরণ ...	১৫৭
১০। জ্ঞানশক্তি, পরিচালনশক্তি এবং পোষণ শক্তির উৎপত্তি	১৭১
১১। উক্ত শক্তি গুলির বিকাশ ও হ্রাসের নিয়ম ...	১৭৪
১২। জ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয়	১৭৮
১৩। কোন্ সময়ে আমাদের আত্মার অনুভূতিটা গ্রাহ্য হয়	১৮৫
১৪। জ্ঞান স্বরূপ নির্ণয়ের অন্তর্গত ভক্তির অবস্থা নির্ণয় ...	১৮৮
১৫। জ্ঞানস্বরূপ নির্ণয়ের অন্তর্গত ক্রোধাদির অবস্থা নির্ণয়	১৮৮
১৬। জ্ঞানস্বরূপ নির্ণয়ের অন্তর্গত ভক্তি প্রভৃতির প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়	১৯০
১৭। জ্ঞান স্বরূপ নির্ণয়ের অন্তর্গত ভক্তির প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়	১৯১
১৮। জ্ঞান স্বরূপ নির্ণয়ের অন্তর্গত ক্রোধের স্বরূপ নির্ণয়	১৯৩
১৯। জ্ঞান স্বরূপ নির্ণয়ের অন্তর্গত ঈর্ষ্যাদির স্বরূপ নির্ণয়	১৯৬
২০। জ্ঞান স্বরূপ নির্ণয়ের অন্তর্গত আশার স্বরূপ নির্ণয়	১৯৭
২১। জ্ঞান স্বরূপ নির্ণয়ের অন্তর্গত শোকের অবস্থা নির্ণয়	২০০
২২। জ্ঞান স্বরূপের অন্তর্গত দুঃখের স্বরূপ নির্ণয় ...	২০২
২২। ঐ সুখের স্বরূপ নির্ণয়	২০৪
২৩। আহারাদি জনিত সুখও কি আত্মারই অবস্থা বিশেষ?	২০৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
২৪। শিষ্য কর্ত্তৃক শরীরের নির্ণয়	২১১
২৫। জ্ঞান স্বরূপ নির্ণয়ের অন্তর্গত আহারাদিজনিত সুখ দুঃখের স্বরূপ নির্ণয়	২১২
২৬। ব্যক্তিভেদে আহারাদি জনিত সুখ দুঃখ প্রভেদের কারণ নির্দ্দেশ	২১৮
২৭। দ্রব্যবিশেষে বাতিক প্রকৃতির সুখ দুঃখ হয় কেন ? ...	২২১
২৮। পিত্তাধিক প্রকৃতির দ্রব্যবিশেষে সুখ দুঃখ হয় কেন ?	২২৩
২৯। শ্লেষ্মাধিক প্রকৃতির দ্রব্যবিশেষের দ্বারা সুখ দুঃখ হয় কেন ?	২২৬
৩০। প্রকৃতিভেদে আহার্য্যদ্রব্যের রসজনিত সুখ দুঃখের	
৩১। তারতম্য কারণনির্ণয়	২২৯
৩২। শ্লেষ্মাধিক প্রকৃতির রসবিশেষে সুখ দুঃখের কারণ নির্ণয়	২৩০
৩৩। পিত্তাধিক প্রকৃতির রসবিশেষে সুখ দুঃখের কারণ নির্ণয়	২৩১
৩৪। বাতাধিক প্রকৃতির রস বিশেষে সুখ দুঃখের কারণনির্ণয়	২৩২
৩৫। ব্যক্তিবিভেদে গন্ধাদিজনিত সুখ দুঃখের ভিন্নতার কারণ নির্দ্দেশ	২৩৩
৩৬। সুখ দুঃখ সর্ব্বদা থাকে না কেন ?	২৩৭
৩৭। ধর্ম্মব্যাখ্যায় প্রত্যেক কথার শাস্ত্রীয় বচন দেওয়া হয় না কেন ?	২৩৮
৩৮। মানসিক প্রত্যক্ষই অধ্যাত্ম বস্তুর মুখ্য প্রমাণ ...	২৪২
৩৯। ভক্তি বিবেক সুখ দুঃখাদি থাকে কোথা ? ...	২৪৩
৪০। ভক্তি প্রভৃতির আধারাধেয় যোজনা ...	২৪৯
৪১। সুখ দুঃখ থাকে কোথা ?	২৫১
৪২। প্রত্যেক শক্তির সুখ দুঃখ স্বরূপতা নির্ণয় ...	২৫৩
৪৩। পরিচালন শক্তির সুখ দুঃখ অবস্থা	২৫৪
৪৪। পোষণ শক্তির সুখ দুঃখ অবস্থা	২৫৪
৪৫। জ্ঞান শক্তির সুখ দুঃখ অবস্থা	২৫৫
৪৬। ভক্তির সুখ দুঃখ অবস্থা	২৫৫
৪৭। ক্রোধের সুখ দুঃখ অবস্থা	২৫৬
৪৮। সাত্ত্বিক সুখের অর্থ কি ?	২৫৮
৪৯। অলৌকিক সুখের বিবরণ	২৫৯

পৃষ্ঠা

৫০। অলৌকিক দুঃখের বিবরণ ২৬০
৫১। তমোগুণকে মোহস্বরূপ বলেন কেন ? ... ২৬১
৫২। এতাবৎ বিচারের ফল ২৬২

চতুর্থ খণ্ড—ধর্ম্মসাধন (ধর্ম্ম নিমিত্ত কারণ সমাধি বর্ণন)।

১। বাহ্যজ্ঞান স্বরূপ নির্ণয়ের প্রশ্ন ২৬৫
২। শিষ্য কর্ত্তৃক বাহ্যজ্ঞানের প্রণালী কথন ... ২৬৬
৩ দর্শনাদি বাহ্যজ্ঞানের প্রণালী ২৬৮
৪। বাহ্যজ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয় ২৭২
৫। সুখ দুঃখাদি বিকাশ কালে এবং ঘটাদি জ্ঞান কালে
আত্মার অবস্থার তারতম্য ২৭৫
৬। বুদ্ধি মন প্রভৃতির বিশেষ রূপের বর্ণনা ... ২৭৮
৭। সত্ত্বগুণ প্রকাশক পদার্থ এই কথার অর্থ ... ২৮০
৮। অনুভূতি কি পদার্থ ? ২৮৩
৯। অন্যরূপ মানসিক প্রত্যক্ষ ২৯৫
১০। চৈতন্যের অনুভূতি কি পদার্থ ২৯৬
১১। ইন্দ্রিয় শক্তি একই পদার্থ ৩০১
১২। এক সময়ে দুইটি জ্ঞান না হওয়ার কারণ .. ৩০২
১৩। পঞ্চেন্দ্রিয়ের অবস্থা ভেদ ৩০৪

পঞ্চম খণ্ড—সমাধি প্রকরণ (আত্ম সমাধি)।

১। সমাধির লক্ষণ ৩০৬
২। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির বিবরণ ৩০৯
৩। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির বিবরণ ৩১১

	বিষয়	পৃ
৪।	সমাধির পূর্ব্বাঙ্গ	৩১২
৫।	যম	৩১৪
৬।	নিয়ম	৩১৫
৭।	আসন	৩১৬
৮।	সিদ্ধাসন	৩১৬
৯।	পদ্মাসন	৩১৭
১০।	বীরাসন	৩১৭
১১।	ভদ্রাসন	৩১৭
১২।	স্বস্তিকাসন	৩১৮
১৩।	আসন সিদ্ধির উপায়	৩.৮
১৪।	আসন করার আধার	৩২০
১৫।	প্রাণায়াম	৩২০
১৬।	প্রাণায়াম বিভাগ	৩২১
১৭।	প্রত্যাহার	৩২৪
১৮।	সমাধির ক্রম	৩২৪
১৯।	সমাধির প্রণালী	৩২৫
২০।	অঙ্গানুষ্ঠানের ফল কি ?	৩২৭
২১।	সমাধির প্রক্রিয়া	৩২৮
২২।	সবিতর্ক সমাধিতে কিরূপ অনুভূতি হয়	৩৩০
২৩।	সবিতর্ক সমাধিতে অন্তঃকরণের কি অবস্থা হয়	৩৩৩
২৪।	সবিতর্ক সমাধির ফল	৩৩৪
২৫।	মুক্তির সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম	৩৩৫
২৬।	সবিতর্ক সমাধির দ্বিতীয়াবস্থার বিবরণ	৩৩৭
২৭।	সবিচার সমাধির বিবরণ	৩৩৯
২৮।	সানন্দ সমাধির বিবরণ	৩৪১
২৯।	অস্মিতামাত্র সমাধির বিবরণ	৩৪২
৩০।	নির্ব্বীজ সমাধির বিবরণ	৩৪২

বিষয়			পৃষ্ঠা
৩১। ইতর সমাধির বিবরণ	...	...	৩৪৫
৩২। জ্ঞানমার্গ কাহাকে বলে ?	...	...	৩৪৬
৩৩। জ্ঞানমার্গে বিপদাশঙ্কা	...	...	৩৪৭

প্রথম পর্ব্বের সূচীপত্র সমাপ্ত।

ওঁ

শ্রীসদাশিবঃ

শরণম্।

ধর্ম্মব্যাখ্যা।

ধর্ম্মের প্রয়োজন।

ওঁ বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনোমে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্, আবিরাবীর্ম্ম এধি, বেদস্য ম আণীস্থঃ শ্রুতম্মে মাপ্রহাসী রনেনাধীতে নাহোরাত্রান্ সন্দধামি, ঋতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি তন্মামবতু তদ্বক্তারমবত্ববতু মামবতু বক্তারম্। ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ, হরিঃ, ওঁ॥

দুঃখের কথা।

কালিদাস, বরাহ, মিহির প্রভৃতি জলন্ত তারাগুলির অস্তকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত, ভারতবর্ষের উন্নতির আভ্যন্তরিক অবস্থার পর্য্যালোচনা করিলে, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হয় যে, আজকাল ভারতবর্ষ স্থূল-জড়তত্ত্ব-জ্ঞানবিষয়িণী-উন্নতির দিকে তীব্রবেগে ধাবিত হইতেছে। সহস্রাধিক বৎসবের পর ভারতবর্ষে এরূপ জ্ঞানচর্চ্চার পুনরভ্যুদয়, অনাবৃষ্টি পরিশুষ্কদেশে নববর্ষণের ন্যায়, নিতান্ত আহ্লাদজনক, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অতিশয় পরিতাপের বিষয় এই যে, যে পরিমাণে আমাদের

ধর্ম্মব্যাখ্যা।

স্থূলজড়পদার্থের জ্ঞান উন্নত হইতেছে, সূক্ষ্মতত্ত্বের জ্ঞান সেই পরিমাণেই ক্ষীণ ও মলিন হইয়া আসিতেছে; স্থূল জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সূক্ষ্মদর্শন শক্তির হ্রাস হইয়া যাইতেছে; জ্ঞান স্থূলভাব ধারণ করিতেছে। এখন চিন্তাশক্তির গতি স্থূলাভিমুখী; স্থূলভাবকে অবলম্বন করিয়াই চিন্তা পর্য্যবসিত হইতেছে; স্থূলই মনের বিশ্রাম-গৃহ, মন এখন স্থূল বিষয় ব্যতীত আর কিছুই জানিতে চায় না, কোন সূক্ষ্ম বিষয় চিন্তা করিতে গেলেই যেন মস্তিষ্ক ও মন নিতান্ত কাতর ও ম্লান হইয়া পড়ে, সুতরাং সূক্ষ্মচিন্তা বিরক্তিজনক ও পরিহার্য্য বলিয়া বোধ হয়। অতএব এ উন্নতি আমাদের প্রকৃত উন্নতি বা কল্যাণসাধক বলিয়া স্বীকার করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। ইহা পক্ষাঘাত রোগের ন্যায় মনের একাঙ্গ ক্ষীণ ও ক্রিয়াশক্তি-বিহীন করিয়া অপরার্দ্ধের পুষ্টি সাধন করিতেছে। বাস্তবিক দেখিতে গেলে স্থূল এবং সূক্ষ্ম এতদুভয়বিধ চিন্তাই মনের অঙ্গদ্বয়। এই উভয় চিন্তার বিষয়ও বিভিন্ন প্রকার। স্থূল চিন্তার বিষয় ভৌতিক জগৎ, সূক্ষ্ম চিন্তার বিষয় অধ্যাত্ম জগৎ, আবার উভয় চিন্তার ফলও পৃথকবিধ। ভৌতিক চিন্তার ফল ভৌতিক জগতে, অধ্যাত্ম চিন্তার ফল অধ্যাত্ম জগতে। অর্থাৎ শরীর, মন, বুদ্ধি ও আত্মার প্রকৃত কল্যাণসাধনই অধ্যাত্মচিন্তার মুখ্য ফল। কিন্তু দুর্ভাগ্য সমাজ সেই অধ্যাত্ম চিন্তায়ই সম্পূর্ণ উদাসীন। যাহার তৃপ্তি সাধনের নিমিত্ত, যে আত্মার সন্তোষ উপহারের নিমিত্ত, জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত এত আয়াস, এত পরিশ্রম, এত অপমান, এত গ্লানি স্বীকার, সেই আত্মার বিষয় চিন্তা,—সেই অধ্যাত্ম জগতের চিন্তাই সমাজের উপেক্ষিত বিষয় হইয়াছে! এই নিমিত্তই সমাজের ঈদৃশ দুরবস্থা, নানাপ্রকার আধি ব্যাধি দ্বারা সমাজ প্রপীড়িত; সুখ, শান্তি, স্বচ্ছন্দতা সমাজ হইতে বিলুপ্তপ্রায়;—ভারতসমাজ হাহাকারে পরিপূর্ণ :

যত দিন উভয়বিধ চিন্তাশক্তির গতি সমসূত্রে উন্নতির দিকে প্রবাহিত না হইবে, ততদিন আমাদের প্রকৃত কল্যাণ কদাচ সম্ভাবিত নহে। অধ্যাত্ম জগতে চিন্তনীয় বিষয়ের মধ্যে 'ধর্ম্ম' একটী মুখ্যতম বিষয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এই মুখ্য বিষয়টীতেই সমাজের যাদৃশ অবহেলা পরিলক্ষিত হয়, এমন আর কোনটীতেই নয়।

দেশীয় শিক্ষার অভাব হইয়া কেবল বিদেশীয় শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মন ও মস্তিষ্ক বিদেশীয় ভাব, বিদেশীয়-সংস্কার, বিদেশীয় দৃষ্টি ও বিদেশীয় প্রকৃতি দ্বারা সংগঠিত হইয়া উঠিয়াছে;—এমন কি ভারতীয় মনুষ্যের পৃথক্ অস্তিত্বই বিলুপ্তপ্রায়! আজ ভারতবর্ষ মৃত, আজ আর্য্যভূমি ভারতবর্ষকে, উপইংলণ্ড বা ফিরিঙ্গিল্যাণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি বোধ হয় না। আজ নব্যসমাজ, ভারতবর্ষে যাহা কিছু দেখেন, তাহাই বিদেশীয় দৃষ্টিদ্বারা; যাহা কিছু ভাবেন তাহা বিদেশীয় ভাবনাদ্বারা; এবং যাহা কিছু ধারণা করেন, তাহাও বিদেশীয় ধারণা দ্বারা। তাই বলি, আর্য্যভূমি ভারতবর্ষ, উপ-ইংলণ্ড হইয়া উঠিল! তাই বলিয়াই, আজ অন্য দেশের পুঁতুলপূজা 'আইডোলেটরি,' আমাদের বহুমূল্য সগুণ ব্রহ্মোপাসনাও 'পৌত্তলিকতা,' অন্যদেশে ব্যবসায়াদি ভেদে 'কাষ্টসিষ্টেম্,' আমাদেরও প্রাকৃত জাতিভেদ 'কাষ্টসিষ্টেম্'। আজ অন্য দেশের ধর্ম্ম কেবল সমাজের অঙ্গমাত্র, কারণ তাহার মূল ভিত্তিস্বরূপ যে ৮।১০টি আজ্ঞা আছে, তাহা কেবল সমাজের নিমিত্তই আবশ্যক; সেইহেতু ভারতের অমূল্য ধর্ম্ম-ধনও সামাজিক অঙ্গমাত্র। ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক প্রাচীন নিয়মেই এইরূপ বিপরীত ভাব প্রবেশ করিয়াছে।

নব্যসমাজের অবস্থা বলিলাম। আবার আজ কালের প্রাচীন-সমাজের অবস্থা আরও শোচনীয়। প্রাচীনসমাজ স্থূল, সূক্ষ্ম কোনও চিন্তার আবশ্যকতা মনে করেন না। তাঁহারা যাহা করিয়া আসিতেছেন, তাহাই করিবেন। আর্য্যশাস্ত্রের নির্ম্মল সুযুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গুলি যে তাঁহাদের ঘোর স্বেচ্ছাচার ও স্বার্থপরতায় বিমিশ্রিত হইয়া, এখন নিতান্ত মলিনবেশে পরিণত ও ঘোর কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, ইহা প্রাচীনসমাজ ঈষৎ কটাক্ষ করিয়াও দেখেন না। প্রাচীন-সমাজ স্তম্ভের ন্যায় নিশ্চিন্ত ও অচল অটল। এইরূপে, কি নব্যসমাজ কি প্রাচীনসমাজ, উভয়ত্রই ধর্ম্মের শোচনীয় অবস্থা।

ধর্ম্ম কাল্পনিক পদার্থ নহে।

আজকাল কেহ কেহ এমনও মনে করেন, ধর্ম্ম এক প্রকার কাল্পনিক জিনিস, ইহা কবির মনের এক প্রকার ভাব মাত্র—ইহার উপর দেশের

প্রকৃত শুভাশুভ নির্ভর করে না—সুতরাং ইহার নিমিত্ত এত প্রয়াস, এত ত্যাগ-স্বীকার অপ্রয়োজন। বাস্তবিক তাহা নিতান্ত ভ্রম। ধর্ম্ম আমাদের প্রকৃতির সহিত,—অস্তিত্বের সহিত গাঁথা। ভারতীয় ধর্ম্মের কোন অংশে কল্পনার অণুমাত্র চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। উহার প্রত্যেক সিদ্ধান্তই ভারতীয় প্রকৃতির অনুমোদিত। ভারতের আচার-ধর্ম্ম, ভারতের ব্যবহার-ধর্ম্ম. ভারতের আহার-ধর্ম্ম, ভারতের উপাসনা-ধর্ম্ম, ভারতের ব্রত-ধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তই ভারতের স্বভাবের সঙ্গে গাঁথা; এই নিমিত্তই নানা প্রকার গুরুতর বিঘ্ন বাধা পাইয়াও সহস্র সহস্র বৎসরে ইহার অস্তিত্ব বিনষ্ট হয় নাই। আর্য্যধর্ম্ম যদি কাল্পনিক হইত, তবে কদাচ এত যুগ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারিত না। আমরা ইতিহাস দ্বারা অবগত আছি, অনেক অনেক কাল্পনিক ধর্ম্মের চিহ্নও লক্ষিত হয় না; কিন্তু ভারতীয় ধর্ম্ম নিজ বীর্য্য প্রভাব দ্বারা অদ্যাপি সজীব রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও যে একবারে বিনষ্ট হইবে, ইহা কদাচ মনে করা যায় না। তবে যদি ভারতীয় প্রকৃতি একবারে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, দেশীয় প্রকৃতির সহিত মানবীয় প্রকৃতির সম্বন্ধ যদি একেবারে বিশ্লিষ্ট হয়, তবে দেশোচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের উচ্ছেদ হইলেও হইতে পারে। কিন্তু তাহা কি কখন সম্ভব?

ধর্ম্মের লক্ষণ।

ভারতীয় ধর্ম্ম এইরূপ প্রাকৃতিক পদার্থ বলিয়াই, খৃষ্টান, মুসলমান, ব্রাহ্ম বা অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় ইহার কোন বিশেষ সংজ্ঞা নাই। আমাদের ধর্ম্ম,—শাস্ত্রে কেবল ধর্ম্ম নামেই অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং ধর্ম্ম শব্দের সাধারণত যে বৈয়াকরণ অর্থ বুঝি, আর্য্য-ধর্ম্মস্থলে তাহাই বুঝিতে হইবে।

"ধৃঙ"—অবস্থানে, এই ধাতুর উত্তর "মন্" প্রত্যয় দ্বারা ধর্ম্মপদ সাধিত। যাহার জন্য বস্তুর অবস্থিতি এবং যাহা না থাকিলে বস্তুর অবস্থিতি থাকে না,—যাহা বস্তুর প্রকৃতি স্বরূপ, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। আমাদের ধর্ম্মও সেইরূপ। যে গুণ-বিশেষ সূক্ষ্ম বীজভাবে থাকাতে আমরা মনুষ্য, যে সূক্ষ্ম-গুণ-বিশেষের বিনাশে মনুষ্যত্বের হানি, যে সূক্ষ্ম-গুণ-বিশেষ

না থাকিলে আমাদের মনুষ্যত্ব থাকিতে পারে না, সেই সূক্ষ্ম গুণ-বিশেষই আমাদের ধর্ম্ম।

সেই সত্বগুণ-সম্ভূত গুণ-বিশেষ একই পদার্থ; কার্য্যকারণ ভেদে নানা প্রকারে পরিণত হয়। বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা সেই এক শক্তি হইতেই * বিবিধ প্রকার ধর্ম্ম বিকাশিত হইয়া আত্মাতে সঞ্চিত হয়। যজ্ঞ দ্বারা একরূপ ধর্ম্ম সঞ্চিত হয়, শ্রাদ্ধ দ্বারা একরূপ, ব্রতদ্বারা একরূপ, অতিথি সেবা দ্বারা একরূপ এবং উপাসনা দ্বারা একরূপ ধর্ম্ম বিকাশিত হইয়া সঞ্চিত হয়। বাস্তবিক সমস্ত ধর্ম্মেরই মূলবীজ—মূল প্রকৃতি একটী মাত্র শক্তিবিশেষ। অতএব উপাসনাদিসাধ্য সমস্ত ধর্ম্মের মূল বীজ বলিয়া তাহাকেই ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে।

প্রথম দেখা যাউক, সেই বীজভূত ধর্ম্মটি কি?—আত্মার যে শক্তি বিশেষের দ্বারা চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়, মন, ও বুদ্ধি প্রভৃতির চঞ্চলতা এবং বাহ্য বিষয়াভিমুখে গতি বা বাহ্য বিষয়ে পরিচালনা নিরুদ্ধ হইয়া নির্ব্বাত প্রদীপের ন্যায় উহাদের স্থিরতা সম্পাদিত হয়, সেই শক্তিই সমস্ত ধর্ম্মের বীজভূত ধর্ম্ম। এই শক্তিটীর নাম 'নিরোধশক্তি।' জল সেচনাদিকারণ দ্বারা যেরূপ বৃক্ষ হইতে ফল উৎপন্ন হয়, সেইরূপ যজ্ঞব্রতাদির অনুষ্ঠান দ্বারা এই নিরোধশক্তি হইতেই বহুবিধ ধর্ম্ম বিকাশিত হয়। † তাহাদের নাম কার্য্য ধর্ম্ম—'

* ননু কথমত্র একমেব বস্তু ক্বচিদ্গুণঃ ক্বচিচ্ছক্তি রিত্যাখ্যায়তে? নৈয়ায়িক নয়ে গুণ শক্ত্যোর্ভেদাৎ। উচ্যতে অত্র প্রাচীন দর্শন মত মবলম্ব্য এবমুক্তম্, তেহি শক্তি গুণয়োরভেদং পশ্যন্তি।

অলমতি বিস্তরেণ।

† কি প্রকারে নিরোধ শক্তি হইতেই সমস্ত ধর্ম্ম বিকাশিত হয়, তাহা অতি বিস্তার ভয়ে এখানে বলিলাম না। আমার অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান নামক গ্রন্থে ইহা বিস্তার মতে ব্যাখ্যাত হইবে। ভরসা করি, কেবল এ স্থানটিতে কোন সন্দেহ হইলে সুবুদ্ধি পাঠকমাত্রেই আমার অধ্যাত্ম বিজ্ঞান প্রকাশের প্রতীক্ষা করিবেন।

অধর্ম্মের লক্ষণ।

আত্মার আর একটী শক্তি বা গুণবিশেষ আছে, সেই শক্তিবিশেষের দ্বারা চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়, * মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি, বাহ্য বিষয়ে পরিচালিত হয়—দর্শন ও শ্রবণাদির নিমিত্ত প্রেরিত হয়, এই শক্তি বিশেষের নাম 'ব্যুত্থান শক্তি।' ধর্ম্ম শব্দের যোগার্থ দ্বারা ইহাকেও আত্মার ধর্ম্ম বলা যায়। কিন্তু নানা প্রকার নিষিদ্ধ অনুষ্ঠান দ্বারা এই ব্যুত্থান শক্তি হইতেই কতকগুলি অনির্ব্বচনীয় পাপ, এবং ঈর্ষ্যা, অসূয়া, হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, অভিমান প্রভৃতি পাপ বা কুৎসিত গুণ সমুৎপন্ন হয়, আর এই গুণগুলি কেবল মনুষ্যেই থাকে না, পশ্বাদির আত্মাতেও থাকে, সুতরাং ব্যুত্থান শক্তি সমুৎপন্ন গুণগুলি সাধারণ প্রাণীরই ধর্ম্ম। এ নিমিত্ত ব্যুত্থান শক্তিকে বীজভূত অধর্ম্ম, আর তাহা হইতে উৎপন্ন গুণগুলিকে অধর্ম্ম (অপধর্ম্ম) বলা যায়। †

এই নিরোধশক্তি, আর ব্যুত্থানশক্তি যে চিত্তের ধর্ম্ম এবং ইহাদের যে লক্ষণ বলা হইল তাহা পাতঞ্জলদর্শনে লিখিত আছে। ‡

* ইন্দ্রিয় বলিলে চক্ষু কর্ণাদির আকৃতি মাত্র বুঝায় না, কিন্তু চক্ষু কর্ণাদির অন্তর্গত যে শক্তি বিশেষ আছে, যদ্দ্বারা দেখা যায় এবং শুনা যায় সেই শক্তি বিশেষের নাম ইন্দ্রিয়।

† যে প্রকারে ব্যুত্থান শক্তি হইতে অধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, তাহাও আমার *'অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে'* ব্যাখ্যাত হইবে।

‡ এই কথাটি এখানে তত গুরুতর প্রয়োজনীয় নয় বলিয়া সূত্র কয়েকটি মূল মধ্যে নিবেশিত হইল না।

'ব্যুত্থান নিরোধ সংস্কারয়োর—ভিভব প্রাদুর্ভাবৌ নিরোধ ক্ষণ চিত্তান্বয়ো নিরোধ পরিণামঃ" এই নবম সূত্র অবধি "এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্ম্ম লক্ষণাবস্থা পরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ" এই ১৩শ সূত্র পর্য্যন্ত এবং 'ব্যুত্থান সংস্কারাশ্চিত্ত ধর্ম্মা :—নিরোধ সংস্কারা অপি চিত্তধর্ম্মাঃ" ইত্যাদি ভাষ্য দ্বারা ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ধর্ম্মের বর্ণনা।

নিরোধশক্তি হইতে সমুৎপন্ন ধর্ম্ম সমূহের মধ্যে, এমত অসংখ্য প্রকার ধর্ম্ম আছে, যাহার বিশেষ বিশেষ নাম নাই, শাস্ত্রে কেবল সেই গুলিকে "অপূর্ব্ব" মাত্রই বলিয়াছেন; সুতরাং তাহার এক একটী লইয়া কার্য্য প্রণালী দেখান নিতান্ত সুকঠিন। এ নিমিত্ত যে ধর্ম্ম গুলির বিশেষ বিশেষ নাম আছে, তাহাই লইয়া আমরা বিশেষ আলোচনা করিব। ফলতঃ ইহার সঙ্গে সঙ্গে অন্যগুলিও দর্শিত হইবে। সেই ধর্ম্মগুলি এই;—

১ম ধৃতি, (ধারণা করা স্মরণ রাখিবার শক্তি) *; (২) ক্ষমা, (কেহ অপকার করিলে যে তাহার প্রত্যপকারে প্রবৃত্তি হয়, সেই প্রবৃত্তিকে যে শক্তি দ্বারা নিরোধ করা যায়); (৩) দম, (শোক, তাপাদি দ্বারা কোন প্রকার চিত্তবিকৃতি উপস্থিত হইলে, যে শক্তি দ্বারা ঐ প্রবৃত্তির নিরোধ করা যায়); (৪) অস্তেয়, (অবিধি পূর্ব্বক পরস্ব গ্রহণের প্রবৃত্তিকে যে শক্তিদ্বারা নিরুদ্ধ করা যায়); (৫) শৌচ, (শরীর ও চিত্তের নির্ম্মলভাব) (৬) ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, (যে শক্তি দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে নিরুদ্ধ করা যায়); (৭) ধী, (শাস্ত্রাদি দ্বারা বস্তুর তত্ত্ব নিশ্চয় শক্তি—ধীশক্তি); (৮) বিদ্যা, (যে শক্তি দ্বারা অন্তরস্থ চৈতন্য স্বরূপ পরমাত্মার আন্তরিক প্রত্যক্ষ করা যায়, শরীরাদি হইতে আপনাকে পৃথক্‌রূপে জানা যায়,

* কোন একটী মাত্র বিষয় দেখিয়া বা শুনিয়া সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নিবৃত্ত হয় না, দর্শন জন্য পুনঃ পুনঃ ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়; কিন্তু ইন্দ্রিয়ের তাদৃশী গতি কিঞ্চিৎ কালের জন্য নিরোধ করিলে, ঐ দর্শন বা শ্রবণ ক্রিয়া জনিত একটী সংস্কার—বা মনোমধ্যে যে একটী রেখা অঙ্কিত হয়, অর্থাৎ যদ্দ্বারা ঐ দর্শন বা শ্রবণ ক্রিয়াটি পুনর্ব্বার স্মৃতিরূপে মনে উপস্থিত হইতে পারে, সেই শক্তিটির নাম ধৃতি।

কেহ কেহ ধৈর্য্যকেই ধৃতি বলিতে চাহেন, কিন্তু তাহা নিতান্ত ভ্রম। যে ধৈর্য্যকে তাঁহারা ধৃতি বলিতে চাহেন, সেই ধৈর্য্য পরোক্ত দম শক্তি ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহাদি শক্তির মধ্যে অন্তর্নিহিত সুতরাং এখানে আবার ধৈর্য্য অর্থ করিলে মনুর পুনরুক্তি দোষ ঘটে।

যে শক্তি দ্বারা ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি অভিমান প্রভৃতি অন্তরস্থ পদার্থ সকল আম্র ও কাঁটালের রসাস্বাদের ন্যায় পৃথক্ পৃথক্‌রূপে জাজ্জ্বল্যমান মানসিক প্রত্যক্ষ করিতে পারে); (৯) সত্য, (কায় মন ও বাক্য দ্বারা সম্পূর্ণ যথার্থ আচরণ করা); (১০) অক্রোধ, (যে শক্তি দ্বারা ক্রোধকে নিরুদ্ধ করা যায়)—এই দশটী এবং বৈরাগ্য, ঔদাসীন্য, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম, সন্তোষ প্রভৃতি কতকগুলি সৎগুণ।'

এতৎ সমস্তের মধ্যে আত্মবোধের ক্ষমতাটিই সর্ব্বোচ্চ পরম ধর্ম্ম *। কারণ এই ধর্ম্মটীর স্ফুরণ হইলেই মনুষ্যের উন্নতি চরমাবস্থা হয়, মনুষ্য কৃত-কার্য্য হয়। এজন্য এইটীই মনুষ্যের সর্ব্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। উক্ত দশটী ধর্ম্ম হইতে ক্রমে বৈরাগ্য প্রভৃতি ধর্ম্মের উৎপত্তি, তন্নিমিত্ত অনেক স্থানে এই দশটীরই গণনা দেখা যায়। ভগবান মনু বলিয়াছেন ৬ষ্ঠ অং ৯১ ৯২-৯৩-৯৪ শ্লোকঃ—

চতুর্ভিরপি চৈবৈতৈর্নিত্যমাশ্রমিভির্দ্বিজৈঃ।
দশলক্ষণকো ধর্ম্মঃ সেবিতব্যঃ প্রযত্নতঃ॥
ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ধীর্ব্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্।
দশলক্ষণানি ধর্ম্মস্য যে বিপ্রাঃ সমধীয়তে।
অধীত্যচানুবর্ত্তন্তে তে যান্তি পরমাঙ্গতিম্॥
দশলক্ষণকং ধর্ম্ম মনুতিষ্ঠন্ সমাহিতঃ।
বেদান্তং বিধিবচ্ছ্রুত্বা সংন্যসেদনৃণোদ্বিজঃ॥ †

* ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—"অয়ন্তু পরমোধর্ম্মো যদ্যোগেনাত্ম-দর্শনম্" যোগ দ্বারা আত্মার দর্শন করাই পরম ধর্ম্ম॥

† কুল্লূকভট্ট ব্যাখ্যা।—চতুর্ভিরিত্যাদি। এতৈর্ব্রহ্মচার্য্যাদিভি র্বাগ্রশ্র-মিভিশ্চতুর্ভিরপি দ্বিজাতিভিঃ বক্ষ্যমাণো দশবিধ স্বরূপোধর্ম্মঃ প্রযত্নতঃ সততং মনুষ্ঠেয়ঃ॥ তমেব স্বরূপতঃ সঙ্খ্যাদিভিশ্চ দর্শয়তি ধৃতিরিতি, সন্তোষোধৃতিঃ,

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বনবাসী, ভিক্ষুক এই চার আশ্রমী দ্বিজাতিরাই একান্ত যত্নসহকারে দশবিধ ধর্ম্মের সতত সেবা করিবেন। যথা ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধীশক্তি, আত্মজ্ঞান, যথার্থ ভাব, অক্রোধ, এ দশটীই ধর্ম্মের স্বরূপ। যে ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মের এ দশটী স্বরূপ অবগত হইয়া ইহার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা পরমাগতি প্রাপ্ত হন—আত্মাকে লাভ করেন। এই দশ স্বরূপ ধর্ম্মকে অতি সমাহিত হইয়া অনুষ্ঠান করিতে করিতে দ্বিজগণ সংন্যাসী হইবেন। এখন বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বে যে নিরোধ শক্তিকে ধর্ম্ম বলা হইয়াছে, সেটি কেবল কারণ ধর্ম্ম মাত্র। আর এই যে দশবিধ ধর্ম্ম, ভক্তি বিরাগ সন্তোষাদি ধর্ম্ম এবং কেবল "অপূর্ব্ব" নামক ধর্ম্ম এই তিন প্রকার ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করা হইল, ইহারা কার্য্য-ধর্ম্ম। এই কারণধর্ম্ম ও কার্য্যধর্ম্মের বীজ কেবল মনুষ্যেতেই

পরেণাপকারে কৃতে তস্য প্রত্যপকারানাচরণং ক্ষমা, বিকার হেতু বিষয় সন্নিধানেপি অবিক্রিয়ত্বং মনসোদমঃ, মনসোদমনং দমইতি সনন্দ-বচনাৎ শীতাতপাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা দমইতি গোবিন্দরাজঃ। অন্যায়েন পর-ধনাদি গ্রহণং স্তেয়ং তদ্ভিন্ন মস্তেয়ং, যথা শাস্ত্রং—মৃজ্জলাভ্যাং দেহশোধনং শৌচম্, বিষয়েভ্য শ্চক্ষুরাদি বারণমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ, শাস্ত্রাদি তত্ত্বজ্ঞানং ধীঃ। আত্মজ্ঞানং বিদ্যা। যথার্থাভিধানং সত্যং ক্রোধ হেতৌ সত্যপি ক্রোধানুৎ-পত্তির ক্রোধঃ। এতদ্দশবিধং ধর্ম্মস্বরূপং ॥

দশলক্ষণেতি। যে বিপ্রা এতানি দশবিধ ধর্ম্মস্বরূপাণি পঠন্তি পঠিত্বা চাত্মজ্ঞান সাচিব্যেনানুতিষ্ঠন্তে তে ব্রহ্মজ্ঞান সমুৎকর্ষাৎ পরমাঙ্গতিং মোক্ষলক্ষণাংপ্রাপ্নুবন্তি ॥ দশলক্ষণেতি। উক্ত দশ লক্ষণকন্ধর্ম্মং সংযত-মনাঃ সন্ননুতিষ্ঠন উপনিষদাদ্যর্থং গৃহস্থাবস্থায়াং যথোক্তাধ্যয়ন ধর্ম্মান গুরু মুখাদবগম্য পরিশোধিত দেবাদি ঋণত্রয়ঃ সংন্যাস মনুতিষ্ঠেৎ ॥

অত্র ধৃত্যাদি ব্যাখ্যায়াং নভট্টেন বয়মেকবচসো ভবিতুমর্হামঃ। মহ্য-বস্থানার্থকস্য ধৃতেঃ সন্তোষার্থকত্বমুপপদ্যতে, অপিতু সবিশেষণাবস্থিতিরেব। তথাহি মনসশ্চাঞ্চল্য নিরোধেন জ্ঞানস্য স্মৃতিসংস্কাররূপেণাবস্থিতে রনুকূল ব্যাপারবিশেষ রূপা ধারণৈব ধৃতিরুচ্যতে, নবা প্রত্যপকারানা-

থাকে অন্য কোন প্রাণীতে ইহার কিছুই নাই—এই গুণগুলি আছে বলিয়াই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব; এই গুণরাশি দ্বারাই মনুষ্য অন্য প্রাণী অপেক্ষায় পৃথক্, এই গুণসমষ্টি দ্বারাই মনুষ্য শরীর মনুষ্যাকারে পরিণত; এই গুণরাশি দ্বারাই মনুষ্য অন্য প্রাণী অপেক্ষায় পৃথক্, এই গুণগুলি না থাকিলে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব থাকে না, এই গুণগুলির হ্রাস হইলেই মনুষ্যত্বের হ্রাস এবং ইহারই উন্নতি হইলে মনুষ্যত্বের উন্নতি। এ নিমিত্ত এই গুণগুলির নাম মনুষ্যের 'ধৰ্ম্ম'।

ধৰ্ম্মের অবস্থা।

উক্ত ধৰ্ম্ম আর অধৰ্ম্মের দ্বিবিধ অবস্থা আছে। এক, বিকাশিত অবস্থা; আর এক লীন অবস্থা। যখন ইহাদের বিকাশিত অবস্থা হয়,

চরণাদি রূপাভাবানাম্ ক্ষমাদিত্বম্ অভাবস্যা নুষ্টেয় ত্বা সম্ভবাৎ, নবা দেহ-শুদ্ধি মাত্রং শৌচং মনঃশুদ্ধেরেব লক্ষ্যত্বস্য যুক্তত্বাৎ ॥

"ধৃতিক্ষমাদির ব্যাখ্যায় আমরা কুল্লুকভট্টের মতে একবাক্য হইতে পারিলাম না। ভট্ট বলেন,—"ধৃতি (সন্তোষ) ক্ষমা, (অপকারক ব্যক্তির প্রত্যপকার না করা।' দম, (বিষয়সংসর্গসত্ত্বেও মনের বিকার না হওয়া) অস্তেয়, (অন্যায় পূর্ব্বক পরধন অপহরণ না করা) শৌচ, (মৃত্তিকাও জল দ্বারা দেহশোধন) অক্রোধ, (ক্রোধকারণসত্ত্বেও ক্রোধ না করা)।" আমরা এই অর্থ সুযুক্তিসঙ্গত মনে করি না। কারণ অবস্থান অর্থের 'ধৃ' ধাতু হইতে উৎপন্ন ধৃতি শব্দের 'সন্তোষ' অর্থ নিতান্ত অসংলগ্ন, আবার অপকারক ব্যক্তির প্রত্যপকার না করা অর্থাৎ অপকারক ব্যক্তির প্রত্যপকার করণের অভাবকে 'ক্ষমা' বলিলেন ইহাও নিতান্ত অসম্ভব বোধ হয়। কারণ 'ক্ষমা' মনের একটী বৃত্তি হওয়া আবশ্যক উহা মনের একটী বৃত্তিবিশেষ না হইয়া 'অভাব" পদার্থ হইলে কদাচ অনুষ্ঠেয় হইতে পারে না। 'দম' প্রভৃতিতেও এই একই দোষ। আবার মনঃশুদ্ধিই যখন সকল শাস্ত্রের একতম মুখ্য উদ্দেশ্য তখন তাহা পরিত্যাগ করিয়া কেবল দেহ ধৌত করাকে 'শৌচ বলাও যুক্তিবিরুদ্ধই বোধ হইল।

তখন ইহাদের নাম 'প্রবৃত্তি' বা 'বৃত্তি', আর যখন লীন অবস্থা হয়, তখন তাহার নাম 'সংস্কার'।

এতদুভয়ের বিশেষ এই;—ধর্ম্মাধর্ম্মের বিকাশ অবস্থার কার্য্য সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু সংস্কার অবস্থার কার্য্য অতি সূক্ষ্ম, এনিমিত্ত তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায় না; হয়ত, সময়ে সময়ে কিছু মাত্রই অনুভবে আসে না।

মনে করুন, ভক্তি একটী ধর্ম্ম। ইহা যখন মনোমধ্যে বিকাশিত হয়, তখন শরীর মধ্যেই ইহার কার্য্য বিলক্ষণরূপে অনুভূত হয়। আবার যখন ঐ ভক্তির ভাবটী মনোমধ্যে বিলীন হয়, তখন আর কিছুমাত্র অনুভব হয় না। আরও দেখুন, ক্রোধ একটী অধর্ম্ম, ইহা যখন মনোমধ্যে বিকাশিত হয়, তখন চক্ষুদ্বয়ের রক্তিমাকার ও ফুস্‌ফুসাদির বেগবত্তা বিলক্ষণরূপ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু যখন ঐ ক্রোধ বৃত্তিটী বিলীন হয়, তখন তাহার কিছুমাত্র অনুভব হয় না।

ইহার তাৎপর্য্য এই;—যখন দেখি বালককালের মুখস্থ করা 'ক' 'খ' বা কত শত গদ্য পদ্য এখনও মনে আসে, যাহা একবার দেখিয়াছি, যাহা একবার শুনিয়াছি, যাহা একবার ভাবিয়াছি, সমস্তই মনে আসে, উদ্দীপনার কারণ মাত্র পাইলেই ঠিক স্মরণ হয়, তখন ইহা নিশ্চয়রূপে বলা যায় যে, আমাদের মনে যত প্রকার প্রবৃত্তির বিকাশ হয়, তাহার কোনটীই একেবারে বিনষ্ট হয় না। কিন্তু কেবল সাম্যভাবেই মনোমধ্যে অবস্থিতি করে। যদি মনের ক্রিয়া বিকাশিত হইয়া একেবারেই বিনষ্ট হইত, তবে আমরা সহস্র সহস্র চেষ্টা দ্বারাও পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঘটনা সকল মনে করিতে পারিতাম না। কিন্তু, মনের ক্রিয়ার নিয়ম এই যে, ঠিক একই সময়ে ভিন্ন প্রকারের দুইটী ভাব মনোমধ্যে বিকাশিত হয় না। কোন দর্শন বা স্পর্শনাদি ক্রিয়া হইতে হইতে যদি অন্য আর একটি দর্শন বা স্পর্শনাদি ক্রিয়া আসিয়া মনে উপস্থিত হয়, তখন এই শেষের ক্রিয়া দ্বারা পূর্ব্বেকার দর্শন বা স্পর্শনাদি ক্রিয়াটী অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হইয়া পড়ে। তখন শেষে দর্শন বা স্পর্শনাদি ক্রিয়াটীই মনের উপর আধিপত্য করিয়া বিকাশিত হয়। এইপ্রকারেই

আমাদের মনে দর্শন বা স্পর্শনাদি সমস্ত ক্রিয়ার উদ্দীপনা হইয়া থাকে। কিন্তু এখানে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, যদিচ, শেষে দর্শন বা স্পর্শনাদি ক্রিয়া দ্বারা পূর্ব্বকার বিকাশিত দর্শন বা স্পর্শনাদি ক্রিয়াগুলি অত্যন্ত ক্ষীণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হয় সত্য, তথাপি ঐ পূর্ব্বকার দর্শন বা স্পর্শনাদি ক্রিয়াগুলির পুনর্ব্বার বিকাশিত হওয়ার চেষ্টা বিলক্ষণ-রূপ থাকে, পরে সময়মত একটুকু সুযোগ ও সাহায্য পাইলেই পুনর্ব্বার এক একটী করিয়া মনোমধ্যে পূর্ণবেগে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। ইহারই নাম স্মরণ হওয়া।

মনে করুন আপনি যেন রামদাসকে দেখিতেছেন। তখন ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে আপনার মনোমধ্যে এক প্রকার ক্রিয়ার বিকাশ হইয়াছে এবং ঐ ক্রিয়ার বিকাশ থাকিতে থাকিতেই যেন তখন শ্যামদাস আসিয়া সম্মুখস্থ হইল, তখন শ্যামদাসের শরীর হইতে তাহার গৌর-বর্ণাকার-শক্তি বিশেষ প্রসারিত হইয়া আপনার চক্ষুঃ প্রণালী দ্বারা মস্তিষ্কে উন্নীত হইয়া মনের উদ্বোধন করিতে লাগিল। কিন্তু ঠিক এককালে দুই রকমের দুইটী ক্রিয়া মনোমধ্যে বিকাশিত হইতে পারে না বলিয়া অগত্যাই তখন রামদাসের দর্শন ক্রিয়া ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া অবশেষে অত্যন্ত ক্ষীণ ও লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িল। তখন শ্যামদাসের দর্শন ক্রিয়ার উত্তমরূপ বিকাশ হইল—তখন আপনি শ্যামদাসকে দেখিতে লাগিলেন। আবার শ্যামদাসকে দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণদাস আসিয়া উপস্থিত। তখন আবার পূর্ব্বের ন্যায় শ্যামদাসের দর্শন-ক্রিয়াকে ক্ষীণ ও বিলুপ্ত প্রায় করিয়া কৃষ্ণদাসেরই দর্শন ক্রিয়া মনোমধ্যে বিকাশিত হইবে। কিন্তু ঐ পূর্ব্ব পূর্ব্ব দর্শনের ক্রিয়া সকল বিনষ্টপ্রায় ও ক্ষীণাবস্থ হইয়াও পুনর্ব্বার আপনার আপনার উদ্দীপনের চেষ্টা হইতে বিরত হয় না। যেরূপ দুইজন মল্লপুরুষ মল্লযুদ্ধ করিতে করিতে একজন অপরজনের নীচস্থ হইয়াও পুনর্ব্বার আপনার উত্থানের চেষ্টা হইতে বিরত না হইয়া সময় মতে একটু ছল পাইলেই উপরিস্থ মল্লকে নীচে ফেলিয়া আপনি উপরে উঠে, মনের ক্রিয়াও সেইরূপ; মনের ক্রিয়াও ক্রিয়ান্তর দ্বারা একবার বিলুপ্তপ্রায় হইয়া পুনর্ব্বার

সময় মতে বিকাশিত হইয়া উঠে। এই প্রকার দর্শন বা স্পর্শনাদি ক্রিয়ার বিলুপ্ত প্রায়-ক্ষীণাবস্থাকে 'সংস্কার' * অবস্থা বলে।

যেরূপ আমাদের দর্শনাদির জ্ঞান বৃত্তির সংস্কার অবস্থা দেখাইলাম, সেইরূপ আমাদের সকল প্রকার প্রবৃত্তিরই সংস্কার অবস্থা মনে থাকে। কি ধর্ম্ম, কি অধর্ম্ম সকলেরই সংস্কার অবস্থা আছে। উহারা কেহই বিকাশিত হইয়া একেবারে মূলসহ বিনষ্ট হয় না; মনোমধ্যে সকলেই বিলুপ্তপ্রায় ক্ষীণাবস্থায় থাকে। ইহা কার্য্য দ্বারা সপ্রমাণ হয়। যখন যজ্ঞ দ্বারা, পূজা দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, উপাসনা দ্বারা এক একটী কেবল 'অপূর্ব্ব' নামে সদ্‌গুণ বা ধর্ম্ম আমাদের মনোমধ্যে বিকাশিত হয়; অথবা যখন আমাদের মনে ধৃতি, ক্ষমা, দম, বিবেক, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম বিরাগ ইত্যাদি ধর্ম্ম প্রবৃত্তির বিকাশ হয়; কিম্বা যখন ক্রোধ, ঈর্ষা, অসূয়া, হিংসা, কামের তৃষ্ণা ইত্যাদি অধর্ম্ম বৃত্তির উদয় হয়, তখন উহারাও পরে পরে উৎপন্ন এক একটী বৃত্তি দ্বারা অভিভূত হইয়া বিলুপ্ত-প্রায় ক্ষীণাবস্থায় (সংস্কারাবস্থায়) মনে থাকে। কিন্তু যখন পুনর্ব্বার উপযুক্ত উদ্দীপনার কারণের সহায়তা পায় তখনই ঐ সকল বিলুপ্তপ্রায় প্রবৃত্তি গুলি বায়ু সাহায্যে তৃণাচ্ছন্ন বহ্নির ন্যায় প্রবল বেগে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। ইহার প্রণালী এই;—মনে করুন, যেন আপনার মনোমধ্যে ক্রোধ প্রবৃত্তি বিজৃম্ভিত হইয়া স্নায়ু মণ্ডলকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। কিন্তু ক্ষণৈক পরে যাহার উপর আপনার ক্রোধ, সেই ভৃত্য আসিয়া কর-যোড়ে নতশিরে ভয়ভরে দাঁড়াইল। তখন অবশ্যই আপনার মনে দয়াবৃত্তির বিকাশ হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঠিক একই সময়ে ভিন্ন রকম দুইটী ক্রিয়া মনে হইবে না, সুতরাং তখন অগত্যাই দয়া দ্বারা ক্রোধবৃত্তি সংযত হইয়া বিনষ্টপ্রায় ক্ষীণাবস্থায় আত্মাতেই থাকিল। কিন্তু উহার পুনর্ব্বার উদ্দীপনের চেষ্টাও থাকিবে, পরে যখন সময় মতে উপযুক্ত উদ্দীপক কারণ পাইবে, তখন আবার ক্রোধবৃত্তি জাগ্রত হইয়া উঠিবে। আবার মনে করুন আপনার যেন ভগবানের উপাসনা

* এই জাতীয় সংস্কারকে বাসনা বলে।

করিতে করিতে মনোমধ্যে ভক্তি প্রবৃত্তির বিকাশ হইল, তখন আহ্লাদের আর সীমা নাই, আনন্দের পার নাই, কিন্তু ঐ সময় যেন আপনার শিশু সন্তান আসিয়া ক্রোড়ে বসিল, তখন অবশ্যই সন্তান স্পর্শের জ্ঞান-বৃত্তি আপনার মনে বিকাশিত হইবে, সুতরাং ঐ বৃত্তির উত্তেজনা হইয়া ভক্তিবৃত্তি বিলুপ্তপ্রায় ক্ষীণাবস্থায় মনোমধ্যে থাকিবে। পরে আবার যখন কোন উদ্দীপক কারণের সাহায্য পাইবে, তখন ঐ ভক্তিবৃত্তি পুনঃ পুনঃ উদ্দীপিত হইবে।' অথবা যেন বিবেক ধর্ম্মের বিকাশ হইল, তখন আপনি দেখিতে পাইলেন যে, যে মহাশক্তি হইতে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হইতেছে—সেই মহানের মহান্ অনন্ত বল হইতেই আপনার এই ক্ষুদ্র শরীর পরিচালিত। এই অনন্ত জগতে এক ব্যতীত কর্ত্তা নাই, এক ব্যতীত স্বাধীন নাই, এক ব্যতীত দুইও নাই—আপনি আমি কেহই নাই। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যেন কোন্ খান্ হইতে আর একটী বৃত্তি আসিয়া উপস্থিত। তখন ঐ বৃত্তি দ্বারা বিবেক ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইল, বিবেক বৃত্তি বিলুপ্ত প্রায় ক্ষীণাবস্থায় (সংস্কারাবস্থায়) থাকিল। কিন্তু যখন ভবিষ্যতে উদ্দীপক কারণের সাহায্য পাইবে তখনই আবার মনোমধ্যে বিবেক ধর্ম্ম বিকাশিত হইবে।

সকল প্রকার ধর্ম্ম বা অধর্ম্মেরই এইরূপ ঘটনা হইয়া থাকে। মনোবৃত্তি—আত্মার বৃত্তিমাত্রেরই ঐ একই রূপ প্রণালী। ইহা দর্শনের স্থির-তর সিদ্ধান্ত যে, "নাসদুৎপাদোনৃশৃঙ্গবৎ" "নাশঃ কারণ লয়ঃ"—"যাহা নাই, তাহা কদাচ উৎপন্ন হইতে পারে না, এবং যাহা আছে তাহাও একবারে শূন্যভাবে বিনষ্ট হয় না। সমস্ত-বস্তু, সমস্ত-শক্তি, সমস্ত-ক্রিয়াই এক একটী মূল বস্তু হইতে, এক একটী মূল শক্তি হইতে বিকাশিত হয় মাত্র—তাহাকেই উৎপত্তি বলে। আর নাশের সময়ও কেবল মাত্র সূক্ষ্মাবস্থায় বিলীন হয়" (সাঙ্খ্যদর্শন)। সুতরাং আমাদের ধর্ম্মাধর্ম্মও এক একটি মূল ধর্ম্ম হইতে বিকাশিত হইয়া আবার শূন্য-ভাবে বিনষ্ট না হইয়া সূক্ষ্মভাবে (সংস্কারভাবে) অবস্থিতি করে। যদি আত্মার বৃত্তিগুলি সংস্কার রূপে না থাকিত তবে আমার আমিত্বই থাকিত না, মন থাকিত না, অন্তঃকরণ থাকিত না। কারণ, কেবল-

মাত্র অসঙ্খ্য সংস্কাররাশির উপরেই আমার আমিত্ব, মনের অস্তিত্ব, অন্তঃকরণের সত্ত্বা অবস্থিত। ইহা পরে ব্যাখ্যাত হইবে।

ধর্ম্মাধর্ম্মের এই রূপ সংস্কার দার্শনিকগণ স্বীকার করেন। যথা—

পাতঞ্জল দর্শনের বিভূতিপাদের ১৮ সঙ্খ্যক "সংস্কার সাক্ষাৎ করণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্।" এই সূত্রে ভগবান্ বেদব্যাসকৃত ভাষ্য—"দ্বয়ে খল্বমী সংস্কারাঃ স্মৃতি ক্লেশহেতবো বাসনারূপাঃ, বিপাকহেতবো ধর্ম্মাধর্ম্মরূপাস্তে পূর্ব্বভবাভি সংস্কৃতাঃ পরিণামচেষ্টা নিরোধশক্তি জীবন-শক্তিবদপরিদৃষ্টাঃ চিত্তধর্ম্মাঃ।" ইহার অর্থ এই :—আমাদের মনে যে কোন শক্তি বা ক্রিয়ার বিকাশ হয় তাহা হইতে দ্বিবিধ সংস্কার সঞ্চিত হয়। তন্মধ্যে যে জাতীয় সংস্কারগুলি স্মরণ বা অবিদ্যাদির কারণ তাহাদের নাম বাসনা। আর যে জাতীয় সংস্কারগুলি আমাদের জন্ম, আয়ু ও ভোগের কারণ তাহাদের নাম ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। এই সকল সংস্কারগুলি পূর্ব্বেকার ক্রিয়ার দ্বারা গঠিত হয়। যেমন পরিণামশক্তি, চেষ্টাশক্তি ও জীবনশক্তি প্রভৃতি শক্তিগুলি সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয় না তেমনই এই সকল সংস্কারগুলিও সুস্পষ্ট অনুভূত হয় না।

অদৃষ্ট।

মনের এই ভাল মন্দ ক্রিয়াগুলি যখন আমাদের আত্মার মধ্যে সংস্কারাবস্থায় থাকে তখন উহা মনে মনেও অনুভব করা বা দর্শন করা যায় না। কেবলমাত্র যখন কোন উদ্দীপক কারণের সাহায্য পায় তখনই উহা পুনঃ পুনঃ স্ফুরিত হয়, এই দেখিয়া উহাদের সূক্ষ্মরূপে অস্তিত্ব অনুমিত হয়। এ নিমিত্ত, ঐ সংস্কারাবস্থাপন্ন ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রবৃত্তির নাম 'অদৃষ্ট' বা 'অপূর্ব্ব'। ইহাই ভগবান্ কার্ষ্ণাজিনি বলিয়াছেন, "কর্ম্মণ এবোত্তরাবস্থা ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যা পূর্ব্বম্" (বেদান্তদর্শন)। যাগ যজ্ঞাদি দ্বারা হউক বা গোবধাদি দ্বারা হউক—যে কোন বিহিত বা অবিহিত ক্রিয়া দ্বারা মনোমধ্যে কোন একটী ক্রিয়া উৎপন্ন হইলে, পরে তাহার, যে অবস্থাটী (সংস্কার) মনে থাকে তাহারই নাম ধর্ম্মাধর্ম্ম

স্বরূপ 'অপূর্ব্ব' বা 'অদৃষ্ট।' তন্মধ্যে যেগুলি কুৎসিত বা কষ্টদায়ক গুণের (অধর্ম্মের) সংস্কার তাহার নাম 'দুরদৃষ্ট', আর যেগুলি উন্নতি বা সুখসাধক গুণের (ধর্ম্মের) সংস্কার তাহাদের নাম 'শুভাদৃষ্ট'। *

পাপ ও পুণ্য।

আমরা ধর্ম্মাধর্ম্মের সংস্কারাবস্থা বর্ণনা করিয়া আসিলাম। যে অবস্থাকে 'অদৃষ্ট' বা 'অপূর্ব্ব' বলা হইয়াছে সেই অবস্থারই নাম 'পাপ' ও 'পুণ্য'। যাহা অধর্ম্মের সংস্কার অবস্থা তাহার নাম 'পাপ' আর যাহা ধর্ম্মের সংস্কার অবস্থা তাহার নাম 'পুণ্য' অর্থাৎ কুৎসিত বা ঐহিক পারত্রিক ক্লেশদায়ক গুণের সংস্কার অবস্থার নাম 'পাপ' আর প্রকৃত সুখ বা ঐহিক পারত্রিক উন্নতিদায়ক সংস্কারগুলির নাম 'পুণ্য'।

ধর্ম্মাধর্ম্মের গতি প্রণালী।

অধর্ম্ম আর ধর্ম্ম বৃত্তি এতদুভয়ের বিচিত্র ও ভিন্ন প্রকার গতি আছে, ইহাদের উভয়ের ক্রিয়া প্রণালী ঠিক পরস্পরের বিপরীত। অধর্ম্ম প্রবৃত্তির গতি নিম্নাভিমুখে, আর ধর্ম্ম প্রবৃত্তির গতি উর্দ্ধাভিমুখে। অধর্ম্ম প্রবৃত্তি যতই নিম্নাভিমুখ হয় ততই বলবতী। আর ধর্ম্ম প্রবৃত্তি যতই উর্দ্ধাভিমুখ হয় ততই বলবতী। অধর্ম্ম প্রবৃত্তির উদ্দীপন কালে স্নায়ু মণ্ডলের অণুরাশির মধ্যে যে কম্পন বিশেষ উৎপন্ন হয় তাহা বহির্ম্মুখীন, আর ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উত্তেজনা কালে স্নায়ু মণ্ডলের অণুরাশির মধ্যে যে বিকম্পন বিশেষ উৎপন্ন হয় তাহা অন্তর্ম্মুখীন। এ নিমিত্ত অধর্ম্ম প্রবৃত্তিকে "অধঃস্রোতস্বিনী প্রবৃত্তি," আর ধর্ম্ম প্রবৃত্তিকে "উর্দ্ধ-

* আজ কাল নানাবিধ অমূলক কল্পনা দ্বারা আমাদের 'অদৃষ্টের' নিতান্ত দুরবস্থা। যাঁহার যাহা ইচ্ছা হয় 'অদৃষ্ট' কে তিনি তাহাই বলেন। এ নিমিত্ত, নিবেদন এই যে, এই, শাস্ত্র ও যুক্তিমূলক অদৃষ্টের ব্যাখ্যাটি যেন স্মরণ রাখেন। বোধ হয় সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই এইরূপ অদৃষ্ট অবশ্য স্বীকার করিবেন। অদৃষ্টের কার্য্যপ্রণালী 'পুনর্জ্জন্ম' প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করিব ইচ্ছা থাকিল।

স্রোতস্বিনী প্রবৃত্তি” বলা যায়। অতএব শিবসংহিতাতে লিখিত আছে, “তেচোর্দ্ধস্রোতসো নিত্যং” ইত্যাদি। যাঁহারা সাধনের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের সর্ব্বদা উর্দ্ধ-স্রোতস্বিনী প্রবৃত্তি হয়। অতএব সাঙ্খ্যতত্ত্ব কৌমুদীতে বলিয়াছেন,—

“ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধং গমনমধস্তাদ্ভবত্যধর্ম্মেণ”

ধর্ম্ম প্রবৃত্তির পরিচালনা দ্বারা আত্মার উর্দ্ধগতি, আর অধর্ম্ম প্রবৃত্তির পরিচালনা দ্বারা আত্মার অধোগতি হইয়া থাকে।

এই কথাটী পরিষ্কাররূপে বুঝিতে হইলে, আর একটী কথা মনে করা আবশ্যক। সেই কথাটী এই ;—“ত্রীণি খলু স্থানানি নিযুজ্যমান শক্তি মাত্রস্যৈব, সূত্র স্থানম্, প্রবাহস্থানম্, নিয়োগ স্থানমিতি”। কার্য্যে প্রবর্ত্তমানশক্তি (ক) মাত্রেরই তিনটী স্থান থাকে—সূত্রস্থান (১), প্রবাহস্থান (২), নিয়োগস্থান (৩)। যেস্থান হইতে কোন শক্তির সমুত্থান হয়,সেখানে তাহার “সূত্রস্থান” (খ),যেথান দিয়া ঐ শক্তিটী প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যায়, সেখানে তাহার “প্রবাহস্থান” (গ)। আর যেখানে গিয়া ঐ শক্তিটী অন্য বস্তুর সহিত মিলিত হয়, সেখানে তাহার “নিয়োগ-স্থান” (ঘ)। মনে করুন, একটী কাঠের ঘোড়ায় রশী লাগাইয়া একটী বালক টানিতেছে। এখানে, যে আকর্ষণশক্তিটী দ্বারা দারুময় অশ্বটী বালকের দিকে যাইতেছে, সেই শক্তিটী বালকের হস্ত হইতে সমুত্থিত ; এনিমিত্ত বালকের হস্তে ঐ শক্তির “সূত্রস্থান।” পরে ঐ শক্তিটী রশী দ্বারা প্রবাহিত হইতেছে, এ নিমিত্ত ঐ রশীতেই শক্তির “প্রবাহস্থান।” পরে কাষ্ঠময় অশ্বে গিয়া ঐ শক্তির যোগ হইয়াছে, এ নিমিত্ত কাষ্ঠময় অশ্বেই ঐ “শক্তির নিয়োগস্থান।”

এখন জিজ্ঞাস্য, বালকের হস্তের ঐ আকর্ষণ শক্তিটি আবার কোথা হইতে আসিল ?—আত্মা বা মনের বাসস্থান মস্তিষ্ক * হইতেই ঐ শক্তি

(ক) (force); (খ) (Intensity); (গ) Direction); (ঘ) Point of application)

* “তা এতাঃ শীর্ষঞ্ছ্রিয়ঃ শ্রিতাশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনোবাক্প্রাণঃ” (ঐতরেয়ারণ্যকের ২আং। ১ অং। ৪ খ। ইহার অর্থ—

প্রথমতঃ আসিয়াছে। অতএব ঐ শক্তির প্রথম সূত্রস্থান মনযুক্ত মস্তিষ্ক। তৎপর ঐ শক্তি হস্তের স্নায়ু সমূহ দ্বারা প্রবাহিত হইয়াছে, এ নিমিত্ত উহার প্রথম প্রবাহস্থান স্নায়ুতে। তৎপর ঐ শক্তি হস্তের পেষীর উপর সম্বদ্ধ হইয়া রশীতে সংলগ্ন হইয়াছে, অতএব বালকের হস্তেই ঐ শক্তির প্রথম নিয়োগস্থান। এখন বুঝিতে পারিলেন যে, বালকের ঐ কাষ্ঠ ঘোটক টানিবার শক্তি প্রথম মস্তিষ্কস্থ মনে স্ফুরিত হইয়া করতলাভিমুখে (অধোভিমুখে) প্রবাহিত হইতেছে। আবার আর এক কথা, ঐ আকর্ষণ বৃত্তিটী করতলাভিমুখে যতই অগ্রসর হয় ততই স্নায়ুমণ্ডলের উত্তেজনাদি বশতঃ অধিকতর বলবতী হয়। এবং ইহাও সহজে জানা যায় যে, ঐ আকর্ষণ প্রবৃত্তিটী যখন হস্তাগ্রাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন তাহার পরিচালনা দ্বারা স্নায়বীয় অণুসকল অবশ্যই সম্মুখের দিকে ঈষৎ বিকম্পিত হইবে। এই আকর্ষণ বৃত্তিটি অধঃস্রোতস্বিনী। কারণ এই বৃত্তিটি, মস্তক হইতে প্রবাহিত হইয়া হস্তাগ্রের অভিমুখে আসিতেছে।

যেরূপ এই আকর্ষণ বৃত্তিটির অধঃস্রোতস্বিনী গতি ও অন্যান্য অবস্থা বুঝিলেন, তেমন আমাদের দর্শন ও স্পর্শনাদির নিমিত্ত যে সকল মানসিক প্রবৃত্তির স্ফুরণ হয়, তাহাদের প্রত্যেকেরই এইএক নিয়ম। কামাদি প্রবৃত্তিরও এই নিয়ম। ক্রোধ, ঈর্ষা, অসূয়া প্রভৃতি পাপ বৃত্তিরও এই একই নিয়ম। যে কোনরূপ অধর্ম্মের বিকাশ হয় তাহারই এই নিয়মে গতি। মনে করুন, আপনার অপকারক ভৃত্য বুধোকে আঘাত করিবার

• চক্ষু প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শক্তি, মন, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের শক্তি এবং প্রাণ ইহারা মস্তিষ্ক আশ্রয় করিয়া থাকে। (অন্যান্য স্থানেও যে মন প্রাণাদি থাকিবার কথা আছে, তাহার উদ্দেশ্য পৃথক।)

এইখানে আর একটী কথা বলিয়া রাখা উচিত। পাঠকবর্গ যেন আর্য্যগণের উচ্চারিত মন বা আত্মাকে ইংরাজি মাইণ্ড (mind) বা সোল (soul) শব্দের দ্বারা অনুবাদ করিয়া বুঝিবেন না। কারণ আর্য্যদের মন আর আত্মা এবং ইংরাজি মাইণ্ড আর সোল—ইহা আমার বিশ্বাসে অত্যন্ত ভিন্ন পদার্থ।

জন্য আপনি উদ্যত। এক্ষণে অবশ্যই আপনার মনে ক্রোধ প্রবৃত্তির উত্তেজনা হইয়াছে। তখন আপনার হৃদয় ও মুখ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল বিকম্পিত হইতে লাগিল, রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, চক্ষু আরক্ত হইল, হৃৎপিণ্ডাদি যন্ত্র সকল অতিশয় বেগে নর্ত্তন করিতে লাগিল। এইক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে ক্রোধ একটী বল বিশেষ, একটী শক্তি বিশেষ (ক)। নচেৎ আপনার শরীরে এইরূপ বিকৃতি হইবে কেন? শক্তি ব্যতীত আর কেহই ত জড়বস্তুকে বিকৃত বা পরিচালিত করিতে সমর্থ নহে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। সুতরাং ক্রোধ একটী বল বিশেষ; এইরূপ সকল প্রকার ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সকল প্রকার মনোবৃত্তি এক একটী শক্তি বিশেষ তাহার সন্দেহ নাই। এখন দেখা যাউক, ক্রোধ বৃত্তির উত্তেজনা কালে আপনার শরীরে কিরূপ ঘটনা হইয়াছে?—এক্ষণে, ঐ ক্রোধ নামক বল বিশেষ আপনার মনোমধ্যে বিজৃম্ভিত হইয়া সর্ব্ব শরীরের স্নায়ুর দ্বারা প্রবাহিত হইয়া হস্তাগ্রাদির অভিমুখে আসিতেছে * সুতরাং এই ক্রোধশক্তির গতি, মস্তিষ্ক হইতে নিম্নাভিমুখী হইতেছে। এবং এই ক্রোধ নামক শক্তিটি স্নায়ুমণ্ডল দ্বারা প্রবাহিত হইয়া যতই দেহের বহিঃস্তরে হস্ত পদাদির অগ্রভাগে প্রবাহিত হইতেছে, ততই স্নায়ুমণ্ডলের উত্তেজনাদি বশতঃ অধিক বলবতী হইবে। এবং যখন ঐ শক্তিটি বহির্দ্দিকে অগ্রসর হইতেছে, তখন, অবশ্যই স্নায়ুমণ্ডলের অণুরাশির মধ্যে একটী পরিচালনাও হইতেছে; সেই পরিচালনা অবশ্যই বহির্ম্মুখী, সুতরাং উহাতে যে স্নায়ুর অণুরাশির মধ্যে এক প্রকার কম্পন বিশেষ জন্মিয়াছে, তাহাও বহির্ম্মুখ। অতএব এই ক্রোধ বৃত্তিটী অধঃস্রোতস্বিনী। এবং এই ক্রোধ প্রবৃত্তিটির 'সূত্রস্থান' মনযুক্ত মস্তিষ্কে আর 'প্রবাহস্থান' সর্ব্ব শরীরের স্নায়ু মণ্ডলে, এবং 'নিয়োগস্থান'

(ক) force

* ক্রোধ হস্তাগ্রাভিমুখে আসিতেছে, ইহা শুনিলে সাধারণের আপাততঃ হাসি আসিতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক উহা হাসির কথা নহে, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানবিদেরা উহা আহ্লাদের সহিত স্বীকার করিতে পারেন। আমাদের উপাসনা প্রবন্ধে উহা বিশেষরূপে প্রকাশিত হইবে।

হাতের মুষ্টিতে, যদ্দ্বারা আপনি বুধোকে আঘাত করিবেন। অপকার্য্য দ্বারা,—নিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা আমাদের যে কোনরূপ অধর্ম্ম গুণ বিকাশিত হয়, তাহারই এইরূপ অধঃস্রোতস্বিনী গতি। ঈর্ষা, অসূয়া, প্রভৃতি সকলেরই এই প্রণালীর গতি। এ নিমিত্ত অধর্ম্মশক্তি মাত্রই অধঃস্রোতস্বিনী।

এখন দেখা যাউক, ধর্ম্মবৃত্তি কিপ্রকারে ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনী? মনে করুন, উদ্দীপ্ত ক্রোধাবস্থা থাকিতে থাকিতে আপনার দম প্রবৃত্তির (ধর্ম্ম বর্ণনা দেখ) পরিস্ফুরণ হইল। তখন দমপ্রবৃত্তিঃ ইতস্তত বিসর্পিত ক্রোধ বৃত্তিকে সংযত করিতে লাগিল, প্রবহমান ক্রোধকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে লাগিল, যেখান হইতে ঐ ক্রোধ প্রবৃত্তি স্ফুরিত হইয়া সমস্ত শরীরে আসিতেছিল, যেন সেই মনোমধ্যে আবার প্রত্যাকৃষ্ট হইতে লাগিল। এখানে অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, যদ্দ্বারা প্রবহমান ক্রোধ নামক বলবিশেষ—শক্তিবিশেষ সংহৃত হইল, অবশ্যই তাহা একটী শক্তিবিশেষ —বলবিশেষ হইবেই হইবে। কারণ কোন একটী শক্তি ব্যতীত আর কেহই কোন একটী শক্তির হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে সমর্থ নহে। এক শক্তিই অপর শক্তির হ্রাস বৃদ্ধিতে সমর্থ। এবং ইহাও স্বীকার্য্য যে, যে শক্তি (দম) দ্বারা ঐ বহির্দ্দিকে প্রবহমান ক্রোধ নামক বলবিশেষ সংযত হইল, অবশ্যই তাহা ক্রোধবলের বিপরীত মত বলবিশেষও বিপরীত মত কার্য্যকারক হইবে। অর্থাৎ ক্রোধ যেরূপ মনোমধ্যে উত্থিত হইয়া মস্তিষ্কের সাহায্যে স্নায়ুমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হওয়া কালীন যতই বিস্ফুরিত হয়, ততই অধিকতর বলবান হইয়া থাকে এবং যতই বহির্ম্মুখে অগ্রসর হয়, ততই স্নায়ুমণ্ডলের সম্মুখ চাঞ্চল্যবর্দ্ধন করিতে থাকে। 'দম' তাহার বিপরীত কার্য্য করিতেছে। দম শক্তির শরীরাভ্যন্তরে বলাধিক্য, দম শক্তি স্নায়বীয় অণু সকলকে অন্তরভিমুখে বিকম্পিত করে, দমবল অন্তরভিমুখে গতিমান্। এতৎ সম্বন্ধে ঈদৃশ বাগাড়ম্বর অপেক্ষা আন্তরিক অনুভব—মানসিক প্রত্যক্ষই মুখ্যপ্রমাণ। ক্রোধ ও দমাদির স্ফুরণ হইলে মনে মনেই এইরূপ অনুভব হইয়া থাকে। তবে যাহাদের অনুভবের ক্ষমতা নাই, তাহাদের নিমিত্ত কেবল এইরূপ বাহ্যিরের বাগা-

ত্বয়ের প্রয়োজন। যেরূপ দমের ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনী গতি পরিদর্শিত হইল, সেইরূপ আমাদের সকল প্রকার ধর্ম্মেরই ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনী গতি। যজ্ঞকরণকালীন, উপাসনাকালীন, ব্রতাদিকরণকালীন যে সকল ধর্ম্ম বিকাশিত হয়, তাহাদের সকলেরই এইরূপ গতি। ভক্তির গতি এইরূপ, বিবেকের গতি এইরূপ, বৈরাগ্যের গতি এইরূপ, ধর্ম্মমাত্রেরই এইরূপ ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনী গতি। ধর্ম্মের কার্য্য-প্রণালী দেখাইবার সময় ইহা বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইবে। ধর্ম্মাধর্ম্মের লক্ষণ, বর্ণনা, অবস্থা, এবং গতিপ্রণালী সবিস্তারে ব্যাখ্যাত হইল এবং এই ধর্ম্ম যে আমাদের প্রকৃতির সহিত গাঁথা, ধর্ম্মই আমাদের অস্তিত্বের ভিত্তি স্বরূপ ইহাও পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে ;—

ধর্ম্মের উন্নতি অবনতি।

ধর্ম্ম যদি আমাদের মনুষ্যত্বের সহিত গাঁথা, সহজাত শক্তিবিশেষ হইল, তবে তাহার আবার উন্নতি অবনতি কি? এবং উন্নতির চেষ্টাই বা কেন? রক্ষার চেষ্টাই বা কেন? তাহাতো অবশ্যই আমাদের আছে এবং চিরদিন থাকিবে?

অতি সহজজ্ঞানেই এই সন্দেহ মীমাংসিত হইতে পারে। মনে করুন, তড়িদগ্নির ধর্ম্ম তাপ, পাথর-কয়লার অগ্নির ধর্ম্ম তাপ, ঘুঁটের (শুষ্ক গোময়ের) অগ্নির ধর্ম্মতাপ কি এক প্রকার? না ঐ সকল তাপের অপসারকতা-ধর্ম্মই এক প্রকার? কদাচ নহে, উহা অত্যন্ত বিসদৃশ। আবার জলের ধর্ম্ম তরলতা লইলেও, পৌষ মাসের জল আর জ্যৈষ্ঠ মাসের জলও একরূপ তরল নহে, উহার অনেক ন্যূনাতিরেক আছে। যতই শৈত্য ততই তরলতার হ্রাস, যতই শৈত্যের হ্রাস ততই তরলতার বৃদ্ধি। আবার কারণ বিশেষে জলের তরলতা একেবারে বিনষ্ট হইয়া জলও বরফ হইয়া যায়, এবং অগ্নির তাপ ধর্ম্ম, আর তাপের অপসারকতা বিনাশ হইয়াও শুধু অঙ্গার মাত্র অবশিষ্ট থাকে। সেই অবস্থায় জলও বলা যায় না অগ্নিও বলা যায় না। আমাদের ধর্ম্মেরও ঐ প্রকার বৃদ্ধি হইতে পারে, হ্রাস হইতে পারে, আবার একেবারে

বিনাশও হইতে পারে—যাহা হইলে আমাদের আর মনুষ্যত্বই থাকে না। সুতরাং ধর্ম্মের উন্নতি ও অবনতি আছে। তাই শাস্ত্র ধর্ম্মোন্নতির নিমিত্ত বারম্বার উপদেশ প্রদান করেন। বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্মের পরম উন্নতি, আবার নিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্মের একেবারে বিনাশও হইতে পারে।

প্রাণীর উৎপত্তি।

এক্ষণে দেখা যাউক, কি প্রকারে ধর্ম্ম মনুষ্যের জীবন, কি প্রকারে ধর্ম্ম মনুষ্যের অস্তিত্ব ভিত্তি, কি প্রকারে ধর্ম্ম আছে বলিয়াই মনুষ্য শরীর মনুষ্যাকারে গঠিত, কি প্রকারে ধর্ম্মের অভাবে মনুষ্যত্বের অভাব এবং কি প্রকারেই বা ধর্ম্মের অভাবে মনুষ্যের শরীরাকার পরিবর্ত্তিত হয়।

যখন দেখা যায়, কি কীট, কি পতঙ্গ, কি পক্ষী, কি পশু, কি মনুষ্য, সকলেরই শরীর সাক্ষাৎ বা পরম্পরারূপে উদ্ভিজ্জের আশ্রিত, সকলেরই শরীর উদ্ভিজ্জীয় পদার্থ দ্বারা সংগঠিত; মূল ধাতু, উপধাতু প্রভৃতি ভূত পদার্থ হইতে উদ্ভিজ্জেরা যে একরূপ পদার্থ সংগ্রহ ও প্রস্তুত করে, সেই পদার্থই মনুষ্যাদি শরীরের মূল ও মুখ্য উপাদান, তাহারই সংগ্রহ করিয়া মনুষ্যাদির শরীর। কেহ বা সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই উদ্ভিজ্জীয় পদার্থ গ্রহণ করে, কেহ বা পরম্পরা সম্বন্ধে উদ্ভিজ্জীয় পদার্থের সংগ্রহ করে। মনে করুন, উদ্ভিজ্জভোজী শূকর ছাগলাদিরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উদ্ভিজ্জ দ্বারা শরীরের পুষ্টি সাধন করে, আবার ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুরা সেই মাংস দ্বারা পরিপুষ্ট হয়, সুতরাং ইহারা পরম্পরা সম্বন্ধে উদ্ভিজ্জীয় পদার্থের গ্রহণ করে। মনুষ্যেরাও উদ্ভিজ্জ ও উদ্ভিজ্জভোজী গোদুগ্ধ ও উদ্ভিজ্জভোজীর মাংসাদি দ্বারা দেহের সংরক্ষণ ও পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে; সুতরাং মনুষ্যেরা সাক্ষাৎ পরম্পরা উভয় রূপেই উদ্ভিজ্জের পদার্থ গ্রহণ করে। বাস্তবিক মনুষ্যাদি কেহই উদ্ভিজ্জ পদার্থ ভিন্ন কেবলমাত্র জল মৃত্তিকাদির পান ভোজন করিয়া জীবিত থাকিতে পারে না।

আবার যখন দেখি শ্রুতিও বলিয়াছেন "অথাতো রেতসঃ সৃষ্টিঃ, প্রজাপতে রেতো দেবা, দেবানাং রেতো বর্ষং, বর্ষস্য রেত ওষধয়ঃ,

ওষধীনাং রেতোঽন্নং, অন্নস্য রেতো রেতো, রেতসোহতঃ প্রজাঃ, প্রজানাং রেতো হৃদয়ং, হৃদয়স্য রেতো মনঃ, মনসো রেতো বাক্”—ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় আরণ্যক (৩ আ—১ অ—৩থ ১ খ।) * * * * বৃষ্টি জলের সারভূত কার্য্য উদ্ভিজ্জ, উদ্ভিজ্জের সারভূত সৃষ্টি অন্ন—খাদ্য—(উহাদের যে অংশটা অদন (গ্রহন) করিয়া অন্য প্রাণীর পুষ্টি হয়) অন্নের সারভূত সৃষ্টি রেতঃ—বীজ,—(ঠিক যে জিনিষটা দ্বারা শরীর গঠিত হয়) রেতের সারভূত সৃষ্টি প্রাণীর শরীর, শরীরের সারভূত সৃষ্টি হৃদয় (মস্তিষ্ক *), মস্তিষ্কের সারভূত সৃষ্টি বাগিন্দ্রিয়)।

অতএব তখন আমাদের এই বিশ্বাস সুদৃঢ় হইয়া আসে যে, এই মনুষ্য, পশু, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণী সকল আকাশ হইতে অথবা একেবারে মৃত্তিকাদি পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয় নাই, কিন্তু উদ্ভিজ্জ হইতেই হইয়াছে। উদ্ভিজ্জই মনুষ্যাদি প্রাণীর সাক্ষাৎ ও পরম্পরা সম্বন্ধে পূর্ব্ব মাতা। সকলেই উদ্ভিজ্জ হইতে সমুৎপন্ন। কেহবা একেবারে উদ্ভিজ্জ হইতেই উৎপন্ন, কেহবা আবার উদ্ভিজ্জজাত প্রাণী হইতে, কেহবা তজ্জাত প্রাণী হইতে উৎপন্ন ইত্যাদি। প্রাণীগণ যদি প্রথম উদ্ভিজ্জ হইতে উৎপন্ন না হইত, তবে উদ্ভিজ্জের পদার্থ ব্যতীতও জীবিত থাকিতে পারিত। কিন্তু তাহা নহে। মৃত্তিকার সহিত ঘটের যেরূপ সম্বন্ধ, উদ্ভিজ্জীয় পদার্থের সহিত ও মনুষ্যাদি প্রাণীর সেই প্রকার সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। কারণ উদ্ভিজ্জীয় পদার্থটা বাদ দিলে মনুষ্যাদি শরীরের

* যদ্যপি হৃদয় শব্দস্য উরোঽন্তর বর্ত্তিস্থান বিশেষ এব লৌকিক ব্যবহারঃ তথাপি মস্তিষ্কস্যৈব হৃদোমনসো মুখ্যাঽয়ত্বাৎ অত্র মস্তিষ্কমেব হৃদয় শব্দ শাবাচ্যম্ তথাচ শ্রুতিঃ “তা এতাঃ শীর্ষঞ্ছিয়ঃ শ্রিত্যাশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনোবাক্ প্রাণঃ। (২ আঃ। ১ অং। ৪ খঃ)

লৌকিক ব্যবহারে হৃদয় শব্দে হৃৎপিণ্ডই বুঝায়। কিন্তু শাস্ত্রযুক্তি দেখিতে গেলে হৃদয় শব্দে মস্তিষ্ক বুঝাই উচিত। কারণ ‘হৃৎ’ শব্দে মন বুঝায় ‘অয়’ শব্দে স্থান বুঝায়। আবার মস্তিষ্কই মনের স্থান তাহাও শাস্ত্র বলেন। অতএব মস্তিষ্কই এখানে হৃদয় বলিয়া বুঝিতে হইবে।

কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। অতএব উদ্ভিজ্জ হইতেই সাক্ষাৎ পরম্পরা সম্বন্ধে প্রাণীর উৎপত্তি।

প্রাণীর ক্রমোন্নতি।

যখন, আন্তরিক শক্তির পরিবর্ত্তনে গুটিপোকা, উঁই প্রভৃতির শরীরের অবস্থান্তরে পরিবর্ত্তন দেখি, এমন কি মনুষ্যেরও আন্তরিক ক্রিয়ার পরিবর্ত্তনে পূর্ব্বাকৃতি কতকটা পরিবর্ত্তিত লক্ষিত হয়।

যখন দেখি ভগবান্ পতঞ্জলি বলিতেছেন ;—

"জাত্যন্তর পরিণামঃ প্রকৃত্যা পূরাৎ"

(৪র্থ পাং। ২ সূঃ)

এবং ভগবান্ বেদব্যাস ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন "তত্র কায়েন্দ্রিয়াণামন্য জাতীয় পরিণতানাম্ পূর্ব্ব পরিণামাপায়ে উত্তর পরিণামোপজন স্তেষাং পূর্ব্বাবয়বানু প্রবেশাদ্ভবতি কায়েন্দ্রিয় প্রকৃতয়শ্চ স্বং বিকার মনু গৃহ্নন্তি আপূরেণ ধর্ম্মাদি নিমিত্ত মপেক্ষমাণা ইতি'" অন্য রূপে পরিণত—কোন এক রূপে অবস্থিত শরীর এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের পূর্ব্ব জাতীয় অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া আর এক জাতীয় অবস্থা হয়। যখন এরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তখন তাহার পূর্ব্ব শরীরীয় ভৌতিক পদার্থও ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি পরাবস্থায় অনু প্রবিষ্ট হইয়া সাহায্য করে। এই পরিবর্ত্তনের মূল নিমিত্ত আন্তরিক ধর্ম্মাদি। অর্থাৎ মনুষ্যাদি কোন শরীরে অন্য যে কোন জাতীয় ধর্ম্মের স্ফুরণ হয়, শরীরের ভৌতিক পদার্থ রাশিও তখন সেই জাতীয় শরীরই গঠন করিয়া তোলে।

এই সূত্র দ্বারা যে ঠিক ক্রমোন্নতিই বলা হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু ইহাই বলা হইয়াছে যে, যে কোন প্রাণী হউক না কেন তাহারই আন্তরিক ধর্ম্মের উৎকৃষ্ট রূপ পরিবর্ত্তন হইলেও শরীরাকৃতি অন্য প্রকার উৎকৃষ্টরূপে পরিণত হয়। আবার আন্তরিক ধর্ম্মের অপকৃষ্ট রূপে পরিবর্ত্তন হইলেও শরীরাকৃতি অন্য প্রকার অপকৃষ্ট রূপে পরিণত হয়। সুতরাং এই মত অনুসারে উচ্চ প্রাণী হইতেও অপকৃষ্ট

প্রাণী হইতে পারে, আবার অপকৃষ্ট প্রাণী হইতেও উৎকৃষ্ট প্রাণী হইতে পারে। ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে। *

* ননু কথমত্র যস্য কস্যচিৎ প্রাণিন এব জাত্যন্তরপরিণামত্বেন সূত্র ভাষ্যার্থোনূদ্যতে? অত্রহি মনুষ্যস্যৈব জাত্যন্তরপরিণামোঽবগম্যতে, "মনুষ্যজাতি-পরিণতানাম্ কায়েন্দ্রিয়াণাং যো দেব তির্য্যগ্ জাতি পরিণামঃ স খলু প্রকৃত্যাপূরাত্তবতীতি মিশ্রব্যাখ্যানাত্ 'নিমিত্ত মপ্রযোজক' মিত্যত্র চ নন্দীশ্বরাদীনাং দেবাদি জাতি পরিণামস্যোদাহ্রিয়মাণত্বাৎ, তত্র ধ্যানজমনাশয়' মিত্যত্র চ মনুষ্যাণামেব জন্মাদি নির্ম্মাণচিত্তস্য পরিদর্শনাৎ, অন্য নির্ম্মাণচিত্তাপেক্ষয়া মনুষ্যাণামেব সমাধি নির্ম্মাণচিত্তস্য কৈবল্যোপযোগিত্ব পরিদর্শনপ্রকরণাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ময়োর্নিমিত্তত্বস্য ভাষ্যমাণত্বাচ্চ। অত্র প্রত্যুচ্যতে, নাত্র মনুষ্যস্যৈব জাত্যন্তরপরিণতি ব্যাখ্যা যুজ্যতে ভাষ্যকৃদ্ভিরন্যথা ব্যাখ্যানাৎ, এবং হি ভাষ্যং "কায়েন্দ্রিয়াণামন্যজাতীয়পরিণতানামিতি" নহ্যন্যশব্দস্য মনুষ্যে শক্তিঃ নবা মনুষ্যমাত্র প্রতিপাদনায় অন্যশব্দপ্রয়োগ উন্মত্তবক্তারমৃতে সম্ভবতি তস্মাৎ সামান্যত এব জাত্যন্তর পরিণামোঽবগন্তব্য ইতি। যচ্চোক্তং নন্দীশ্বরাদীনামুদাহরণবলাৎ তথাঽবগন্তব্যমিতি তদপ্যযুক্তং নহ্যুদাহরণেন নিয়মঃ সঙ্কুচ্যতে নহি "ব্যাধিভোম্রিয়তে যথা দেবদত্ত" ইত্যুক্তে মনুষ্যস্যৈব মৃত্যু কারণং ব্যাধির্নান্যস্যেত্যেবমবগম্যতে, প্রকরণাত্তু নন্দীশ্বরাদয় উদাহৃতাঃ। যচ্চোক্তং মনুষ্যাণামেব পঞ্চবিধনির্ম্মাণচিত্তপরিদর্শনাদিতি, তত্রোচ্যতে সমাধি নির্ম্মাণচিত্তস্যৈব কৈবল্যোপযোগিত্ব প্রতিপাদনায় জন্মাদি নির্ম্মাণচিত্তমুপদর্শিতং নৈতেনান্যস্য জাত্যন্তরপরিণামো নিরাকৃতঃ। নবা প্রকরণসঙ্গতি ক্ষতিঃ গুণপরিবর্ত্তনাজ্জাত্যন্তরপরিণামে মনুষ্যাণামপ্যুদাহরণগর্ভপ্রবেশসম্ভবাৎ, ননু মনুষ্যস্যৈব দেহান্তরিতাদি সিদ্ধি প্রতিপাদনে মনুষ্য দেহস্যৈব জাত্যন্তর পরিণাম প্রক্রিয়ায়া উপোদ্ঘাত সঙ্গতি মত্বাৎ কথমন্যেষামপি জাত্যন্তর পরিণাম প্রতিপাদন প্রসঙ্গঃ? উচ্যতে নান্যেষাং জাত্যন্তর পরিণাম প্রতিপাদনায় এতদারব্ধং অপিতু মনুষ্যস্যৈব, নিয়মস্তু সর্ব্বেষামেব জাত্যন্তর পরিণামং পরিমৃশতীতি। যচ্চোক্তং ধর্ম্মাধর্ম্ম-

অতএব ইহা স্বীকার করা যায় যে, আন্তরিক গুণের পরিবর্ত্তনে শরীরের আকৃতির পরিবর্ত্তন হইতে পারে, এবং গুটিপোকাদির ন্যায় কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইতে হইতেই প্রাণিজগৎ ক্রমোন্নতি দ্বারা মনুষ্য-জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

ক্রমোন্নতির প্রণালী।

জীবের শক্তি বিষয়ে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে মনুষ্য শরীরে আত্মার শক্তি যত অধিক বিকাশিত এরূপ আর কোন প্রাণীতেই নাই। অন্যান্য প্রাণী শরীরে জীবের শক্তি ক্রমেই অল্প। মনুষ্যাপেক্ষা পশুতে অল্প, পশু অপেক্ষা পক্ষীআদিতে অল্প ইত্যাদি। বাস্তবিক মনুষ্য শরীরই আত্মার সম্পূর্ণ শক্তি বিকাশের উপযুক্ত স্থান। শ্রুতি বলেন 'তাভ্যোগামানয়ৎ

য়োনি'মিত্তত্ব কথনাৎ মনুষ্যস্যৈব জাত্যন্তরপরিণতি প্রতিপাদক মিদং সূত্রং নহি মনুষ্যমন্তরেণ ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্ভব ইতি তদপ্যযুক্তং নাত্র ধর্ম্মাদিশব্দেন পুণ্যপাপাত্মকাঃ সদসৎপ্রবৃত্তিতৎসংস্কারা উচ্যন্তে অযুক্ত—ত্বাৎ, কিন্তর্হি, জন্মন উৎকর্ষাপকর্ষাপেক্ষয়া শুদ্ধাশুদ্ধস্বরূপ তত্তজ্জাতীয় ধর্ম্মাদিরেব। নহ্যাত্মারামা-দুর্ব্বাসো রামদেবাদয়ো দেবত্বং নাপন্না ইতি দেবানামিন্দ্রাদীনা মপেক্ষয়া হ্ধার্ম্মিকাঃ—কিন্তু দেবধর্ম্মস্যাস্ফুরণাদেব ন দেবদেহ-মাপন্না ইতি।

"জাত্যন্তর পরিণাম" এই সূত্রে মিশ্রব্যাখ্যানুসারে মনুষ্যজাতি হইতেই অন্য জাতির পরিণাম বুঝা যায় এবং আরও পাঁচটী যুক্তি মনে হয় যদ্দ্বারা মনুষ্যেরই জাত্যন্তর পরিণাম বুঝায়। কিন্তু ঐ সমস্ত যুক্তি এবং মিশ্রের ব্যাখ্যা যে নিতান্ত অসঙ্গত ও ভ্রান্তিমূলক তাহা পণ্ডিতগণের বুঝিবার নিমিত্ত সংস্কৃতেই লিখিত হইল, অনেক বিস্তার হয় বলিয়া আর বাঙ্গালায় উহার অনুবাদ করিলাম না, তবে একটী কথা মাত্র অনুবাদ করিতেছি। 'জাত্যন্তর' এই সূত্রে স্বয়ং বেদব্যাস "অন্য জাতীয় পরিণতানাং" যে কোনরূপে পরিণত দেহাদির অন্যাকারে পরিণতি হয় ইহা বলিয়াছেন, তবে বাচস্পতি মিশ্র 'মনুষ্য' শব্দ কোথায় পাইলেন? অন্য জাতীয় বলিলে কি মনুষ্যজাতি বুঝায়? ~

তা অক্রবন্ নবৈ নোয়মলমিতি তাভ্যোহশ্বমানয়ৎ তা অক্রবন্ নবৈনোয়মলমিতি তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ তা অক্রবন্ সুকৃতম্বাবতেতি।'— ঐতরেয় উপনিষৎ)। "বিধাতা তাপ. বায়ু, আলোক প্রভৃতির সৃষ্টি করিলে, তাহারা চক্ষুরিন্দ্রিয়াদি শক্তিরূপে পরিণত হইয়া আপন আপন কার্য্য নিষ্পন্ন করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত আধার প্রার্থনা করিলে, বিধাতা তাহাদিগকে গবাকার শরীর দিলেন। তাহারা যেন বিধাতাকে বলিল "ইহা আমাদের পর্য্যাপ্তি মতে ক্রিয়ার উপযুক্ত হয় নাই।" পরে বিধাতা অশ্বাকার শরীর উপস্থিত করিলেন তাহাতেও তাহারা ঐরূপ বলিল, পরে পুরুষাকার শরীর উপস্থিত করিলেন তাহাতে তাহারা বলিল 'ইহা আমাদের পর্য্যাপ্ত ক্রিয়ার উপযোগী হইয়াছে।'—ইহা আলঙ্কারিক কথা মাত্র, বাস্তবিক ক্রমোন্নতিই ইহার তাৎপর্য্য বোধ হয়। আবার ইহাও স্বীকার্য্য যে, একবারে কোন শক্তির পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না। অসম্পূর্ণ ভাব হইতেই ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ ভাব হইয়া থাকে!

অতএব ইহাই সত্য বলিয়া বোধ হয় যে, প্রাণী জগৎ উদ্ভিজ্জ হইতেই ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া এই মনুষ্যরূপে পরিণত হইয়াছে। * অর্থাৎ সম্ভবতঃ উদ্ভিজ্জ হইতে একরূপ পোকা বিশেষ, সেই পোকা হইতে তদপেক্ষা উচ্চ প্রাণী ক্রমে তাহা হইতে তদপেক্ষায় উচ্চ প্রাণী, এই ভাবে ক্রমে ক্রমে উন্নত হইতে হইতে পশু, পশুর পরে উল্লুক, বনমানুষ

* পাঠকগণ মনে রাখিবেন যে আমরা এতদ্দ্বারা অদ্ভুত তপোবলসম্পন্ন পূর্ব্বসৃষ্টির দেবর্ষিগণ বা অন্যান্য মহর্ষিগণের যে এই সৃষ্টিতে অদ্ভুত প্রকার উৎপত্তি হইয়া তাঁহাদের হইতেও মনুষ্যাদি সৃষ্টির কথা পুরাণাদি শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহার আমরা নিরাকরণ করিতেছি না। আমরা এখানে কেবল মাত্র, ভগবানের প্রাকৃত নিয়মাধীন যেরূপ সৃষ্টি হইবার নিতান্ত সম্ভব তাহাই ব্যাখ্যা করিলাম।

বাস্তবিক তপোবল দ্বারা যে অদ্ভুত প্রকার সৃষ্টি হইতে পারে তাহা আমাদের শিরোধার্য্য কথা। এবং সেই তপোধন মরীচ্যাদি হইতে সৃষ্টির প্রক্রিয়া আমরা পরে বুঝাইব।

প্রভৃতি, অবশেষে অসভ্য মানুষ, ক্রমে মানুষ। এইরূপেই বোধ হয় জগদ্বিধাতা মানুষকে অবতীর্ণ করিয়াছেন। কীটাদি নীচ প্রাণীর আন্তরিক গুণের পরিবর্ত্তন হইয়া হইয়া গুটিপোকার ন্যায় সশরীরে কিছু কিছু পরিবর্ত্তনের দ্বারা প্রাণি জগৎ মনুষ্যত্বে পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ একপ্রাণী একটুক উন্নত ও আন্থান্তরিত হইয়া মরিয়া গেল, কিন্তু তাহার সন্তান ততটুক উন্নত হইয়াই জন্মিল। পরে তাহার আবার কিছু উন্নতি ও পরিবর্ত্তন হইয়া মৃত্যু হইল কিন্তু তাহার সন্তান ততটুক উন্নত হইয়াই জন্মিল ইত্যাদি ক্রমে উন্নতি হইয়াছে।

আন্তরিক শক্তি দ্বারায় শরীরের গঠন।

যাহাকে আমরা শরীর বা দেহ বলি তাহা কেবল কতকগুলি যন্ত্রের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। কি মস্তিষ্ক, কি চক্ষু, কি কর্ণ, কি রসনা, কি নাসিকা, কি ফুস্‌ফুস্, কি পাকস্থলী কি মাংসপেশী উহারা সকলেই এক একটি যন্ত্রমাত্র। আত্মাতে যে সকল শক্তি আছে সেই সমস্ত শক্তি বাহ্য বা আন্তরিক বস্তুর সহিত যোগ করিতে হইলেই যন্ত্রের আবশ্যক। যন্ত্র ব্যতীত বিচিত্র রূপে শক্তির নিয়োগ করা সম্ভবে না। তাহাই আমাদের মস্তিষ্ক প্রভৃতি। অর্থাৎ মস্তিষ্ক, নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু প্রভৃতি শরীরাবয়ব সকল আর কিছুই করে না কেবল মাত্র আত্মার শক্তি গুলিকে বাহ্য বা আন্তরিক বিষয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেয়, এই জন্য উহাদিগকে যন্ত্র বলা যায়। তন্নিমিত্তই বানর ও মনুষ্যাদি বিভিন্ন প্রাণীর শরীর এক প্রকারে গঠিত হয় না। কারণ বানরের আত্মার শক্তি ও মনুষ্যের আত্মার শক্তি নিতান্ত বিভিন্ন ও অনেক কমি বেশী সুতরাং বানর ও মনুষ্যাদির শারীরিক যন্ত্রও অনেক বিভিন্ন ও কমবেশী সেই জন্য উহাদের শরীর বিভিন্নাকারে গঠিত।

ভগবানের সৃষ্টির প্রক্রিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তিনি বস্তুরাশি সৃষ্টি করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে শক্তির সৃষ্টি করিয়াছেন সেই শক্তি হইতেই স্থাবর জঙ্গমাদি সকল বস্তুর নানা প্রকার বিচিত্র আকৃতি গঠিত হয়। এখন দেখা যাক্ কোন্ কোন্ শক্তি দ্বারায়

কি ভাবে আমাদের শরীর গঠিত হইয়াছে। পাতঞ্জল দর্শনের দ্বিতী পাদের ত্তের সূত্র এই যে"সতিমূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগা" : ইহা অর্থ এই যে, অবিদ্যা ও অস্মিতাদি মূল কারণ থাকিলে ধর্ম্মাধর্ম্মাদি দ্বারায়ই আয়ুর সম্পাদন ও দৈহিক ভোগ সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহা তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা যখন শুক্র শোণিতের সহিত সংযুক্ত হয় তখ তাহার সংস্কার ভাবাপন্ন ধর্ম্মাধর্ম্মাদি শক্তিগুলি স্ফুরিত ও তৎসঙ্গে সঙ্গে শরীর গঠিত হইতে থাকে। অর্থাৎ বীর্য্যান্তর্গত আত্মাতে প্রথমত (বাসনা নামক) পরিচালক শক্তি, পোষণ শক্তি ও জ্ঞানশক্তির স্ফুরণ হয় * এবং ঐ সকল শক্তি স্ফুরণ হইলে শুক্র মধ্যে তখন তাপ জন্মে তাপ হইলেই উহার অংশ সকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হয়। সুতরাং তখন শুক্রাবয়বের ক্ষয় হয়, এবং ক্ষয়ের পর আবার পুষ্টি হয়। ক্ষয় ও পুষ্টি এতদুভয়ের সামঞ্জস্যে ক্রমে শরীরের বৃদ্ধি হইতে থাকে। মনে করুন জরায়ু নিহিত শুক্র মধ্যে আত্মার জ্ঞান শক্তির অধীন দর্শন শক্তির ঈষৎ স্ফুরণ হইল। স্ফুরণ দ্বারা অবশ্যই তাপের উদ্ভূতি হইল সুতরাং ক্ষয়ও হইতে লাগিল। এদিকে ঐ শুক্র মধ্যে ধারণ শক্তির অধীন পোষণ শক্তিও স্ফুরিত, সুতরাং তাহা দ্বারা পুষ্টি হইতে লাগিল। ক্রমে দর্শন শক্তি যতই স্ফুরিত ও পোষণ শক্তির দ্বারা যতই পুষ্টি হইতে লাগিল ততই এই ক্ষয় ও পুষ্টির সামঞ্জস্য দর্শক স্নায়ুর (ক) অঙ্কুর হয়,—ক্রমেই

---

* ব্যবহারিক জীবাত্মার যে এই ত্রিবিধ শক্তি আছে তাহা সাঙ্খ্যতত্ত্বের ৩২ কারিকায় বলিয়াছেন,—

" করণং ত্রয়োদশ বিধং তদাহরণ ধারণ প্রকাশ করম্।
কার্য্যঞ্চ তস্য দশধা হার্য্যং ধার্য্যং প্রকাশ্যঞ্চ ।

ইহার অর্থ এই,—মন অবধি একাদশেন্দ্রিয়, বুদ্ধি আর অভিমান এই ত্রয়োদশ প্রকার করণ। ইহাদের ক্রিয়া তিন প্রকার,—আহরণ, ধারণ ও প্রকাশন (পরিচালন ক্রিয়া, পোষণ ক্রিয়া, ও জ্ঞান ক্রিয়া)। এই শক্তিত্রয়ের মর্ম্ম ভাষান্তরে কতকটা (সম্পূর্ণ নহে) ব্যক্ত করা যায়। যথা Motive power, Vitality and Sensative power."

(ক) Optic nerve

বিকাশ, বিস্তার ও আকৃতি। এইরূপ এক একটী বৃত্তির স্ফুরণে সেই সেই বৃত্তির পরিচালক স্বরূপ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী প্রভৃতি শারীরিক যন্ত্রের সংগঠন হইয়া ক্রমে একটী পূর্ণ শরীরে পরিণত হইল। এই সময়ে ঈর্ষা, অসূয়া, হিংসা, দ্বেষ, কাম প্রভৃতির সংস্কার গুলি প্রকাশিত। ঐ সকল বৃত্তির উদ্দীপনের স্থান মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ ও অতি সন্নিহিত ঊর্দ্ধদেশ। সুতরাং ঐ সকল বৃত্তির স্ফুরণে মস্তিষ্কের বেষ্টন গঠন হইতে লাগিল। এই পর্য্যন্ত হইলেই পশুর শরীর সংগঠিত হইতে পারে। পশুর শরীর গঠনের এই শেষ সীমা উহাতে আর কোন শক্তির স্ফুরণের প্রয়োজন হয় না।

মনুষ্য শরীরের উৎপত্তি।

কিন্তু এই পর্য্যন্ত হইলেই মনুষ্যাকার হইল না। মনুষ্য শরীর হইতে আর কতকগুলি নূতন শক্তি যাহা পশ্বাদি প্রাণীতে নাই তাহার আবশ্যক। সেই শক্তিগুলি অর্থাৎ ধৃতি, ক্ষমা, দম ভক্তি প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত বহুবিধ ধর্ম্ম শক্তির অঙ্কুর বিকাশ হইল। এই সকল শক্তির উদ্দীপনের স্থান মস্তকের ঊর্দ্ধ ভাগ, সুতরাং ঐ সকল বৃত্তির স্ফুরণ দ্বারা মস্তকের উপরভাগ গঠিত হইল। এই ধর্ম্ম শক্তিগুলি থাকাতে অন্য অন্য শক্তির কিছু কিছু হ্রাসবৃদ্ধি নিবন্ধন শরীরের আকার ঈদৃশ বর্ত্তমান অবস্থায় (মনুষ্যাবস্থায়) পরিণত হয়। পশু কীট পতঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত শরীরেই এইরূপ আন্তরিক শক্তি স্ফুরণের দ্বারা সংগঠিত হইয়া থাকে। পশুর আন্তরিক শক্তি দ্বারা পাশব শরীর, বানরের আন্তরিক শক্তি দ্বারা বানর শরীর; বনমানুষের আন্তরিক শক্তি দ্বারা বনমানুষীয় শরীর সংগঠিত হয়। আন্তরিক ক্রিয়ার পরিবর্ত্তনে কিছু কিছু করিয়া শরীর যন্ত্রেরও পরিবর্ত্তন হয়। অর্থাৎ বানরের আন্তরিক ক্রিয়ার যখন কিছু অন্য প্রকার হইল তখন তাহার শরীর যন্ত্রগুলিরও কিছু পরিবর্ত্তন হইল। পরে তাহার সন্তান ঐ আকারের জন্মিল। অনন্তর তাহার আবার আন্তরিক ক্রিয়ার কিছু পরিবর্ত্তন হইল, শরীর কিছু অন্যাকার হইল এবং তাহার সন্তান ঐ নূতন আকারেরই হইল। এই ভাবে হয় ত সহস্র সহস্র বৎসরে শত শত পরিবর্ত্তন দ্বারা বানর

হইতে উল্লুক হইল, পরে ঐ রূপে ক্রমে সহস্র সহস্র বৎসরে শত শত পরিবর্ত্তনে উল্লুক হইতে বনমানুষ হইল। পরে যখন বনমানুষের আত্মায় ধৃতি, ক্ষমা, ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তির অতি সূক্ষ্ম বীজ অতি সূক্ষ্মভাবে অঙ্কুরিত হইল তখন উহার শরীরের কিছু পরিবর্ত্তন হইল। ক্রমে হয় ত সহস্র সহস্র বৎসরে অল্পে অল্পে ঐ সকল বৃত্তির অঙ্কুর বৃদ্ধি পাইয়া শত শত পরিবর্ত্তনের দ্বারা যখন ঐ বৃত্তিগুলি পরিপুষ্ট অবস্থায় আসিল তখন মনুষ্য দেহের আকার হইল।

ধৃতি, ক্ষমা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিবেক, আত্মবোধের ক্ষমতা প্রভৃতি শক্তিগুলি মনুষ্য ব্যতীত আর কোন প্রাণীরই দৃষ্ট হয় না, তবে যে, কোন কোন জাতীয় প্রাণীতে ঐ সকল শক্তির দুই একটী মাত্র অতি সামান্য পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহাও না থাকারই সমান। কিন্তু মনুষ্যেতে উহা সম্পূর্ণ ই দৃষ্ট হয় অতএব বুঝিলাম পূর্ব্বোল্লিখিত শক্তিগুলি দ্বারাই মনুষ্যশরীর গঠিত, সুতরাং উহারাই আমাদের ধর্ম্ম, উহারাই আমাদের মনুষ্যাকার দেহের সংরক্ষক ও একমাত্র অবলম্বন। এক্ষণে বুঝিলাম ধর্ম্ম আমাদের প্রকৃতির সহিত গাঁথা, উহা অগ্নির তাপের ন্যায় জলের তরলতার ন্যায় আমাদের সহায়রূপে অবস্থিত।*

---

* এস্থলে বালকগণের সন্দেহ হইতে পারে যে, যখন আত্মার শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরের পরিবর্ত্তন দর্শিত হইল তখন আত্মা আর শরীরকে একই বলা হইল, বা শরীরেরই শক্তিকে আত্মা বলা হইল। কিন্তু বাস্তবিক তাহা কদাচ বলা হয় নাই; আত্মা এবং আত্মার শক্তি শরীর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ, শরীরের শক্তিও আত্মা নহে। যেমন বিদ্যালয়ের মধ্যে বসিয়া পাঠ কর বলিয়াই তুমি আর বিদ্যালয় এতদুভয় এক নহে সেইরূপ আত্মার শক্তি আর শরীর এক পদার্থ নহে; আত্মার শক্তি সকল শরীর মধ্যে কেবল কার্য্য করে মাত্র। মনুষ্যের শরীর বিনষ্ট হইলে আত্মা বিনষ্ট হয় না, ইহা পুনর্জন্ম প্রকরণে বিস্তাররূপে ব্যাখ্যাত হইবে। এক্ষণে কেবল এই মাত্র স্মরণ রাখিবেন যে আত্মা ও শরীর এতদুভয়কে আমরা নিতান্ত বিভিন্ন বলিয়া জানি।

ধর্ম্মের উন্নতি অবনতির স্বরূপ।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি ধর্ম্মের স্ফুরণ হইয়াই শরীরের গঠন হইয়া থাকে তবে আর তাহার উন্নতি কি, আর কি প্রকারেই বা অবনতি হইবে?

শরীর গঠনকালে সকল ধর্ম্মের স্ফুরণ হয় না আবার যাহাদিগের স্ফুরণ হয় সেও কেবল অঙ্কুর মাত্র। উহা সম্পূর্ণ বিকাশের অবস্থা নহে। জন্মের পর লব্ধবয়স্ক হইয়া বিহিত অনুষ্ঠান করিলেই ধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ অবস্থা হয় সেই পূর্ব্বকার অঙ্কুর সকল শাখাপল্লবাদি দ্বারা পরিশোভিত হয়। আর যদি বিহিত অনুষ্ঠান না করা যায় তবে ঐ অঙ্কুরগুলি ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হইয়া যায়। বাস্তবিক ধর্ম্মের অঙ্কুর মাত্র থাকিলেও কোন কার্য্য হয় না। ধর্ম্মশক্তিগুলির যতই বারম্বার অনুশীলন, বারম্বার উদ্দীপন করা হয়, ততই উহারা দৃঢ়তর সংস্কার হইয়া আত্মাতে অবস্থিতি করে। এমন কি, ঐ সংস্কার বলে ভবিষ্যতে কেবল ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিই সর্ব্বদা উত্তেজিত হইতে থাকে। ইহার নাম ধর্ম্মের উন্নতি। আর ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুশীলনে যতই শৈথিল্য ততই উহার উদ্দীপন কম হইবে, ততই উহা ক্রমে ক্রমে বিরল হইবে, এমন কি, ভবিষ্যতে আর সহস্র চেষ্টা দ্বারাও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উদয় হইতে পারে না। কেবল অধর্ম্ম-প্রবৃত্তিরই আধিপত্য। ইহার নাম ধর্ম্মের অবনতি বা ক্ষয়। যে যে উপায়ে ধর্ম্মের উন্নতি ও ক্ষয় হয় তাহা পরে দেখাইব। এক্ষণে দেখা যাউক ধর্ম্মের ক্ষয় ও বৃদ্ধিতে আমাদের কি কি অনিষ্ট ও ইষ্টলাভ হইতে পারে। যে যে অনিষ্ট ও ইষ্টলাভ নিতান্ত স্থূলদর্শী লোকেও বুঝিতে পারেন এবং ভয়ানক নাস্তিকগণও অবশ্য স্বীকার করিবেন সেই সেই দোষগুণগুলি আলোচনা করাই প্রথম আবশ্যক। পরকালের অনিষ্ট ও ইষ্টলাভ পরে বুঝাইব।

ধর্ম্মক্ষয়ে মনুষ্যের অসম্পূর্ণতা ও ধর্ম্মসঞ্চয়ে পূর্ণতা।

ধর্ম্মের ক্ষয় হইলে আমরা অসম্পূর্ণ হই অর্থাৎ আমাদের মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণতা থাকে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে একমাত্র ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলি

অঙ্কুরিত হওয়াতেই আত্মার মনুষ্যত্ব সম্পাদিত হইয়াছে। বনমানুষাদির আত্মা অপেক্ষা মনুষ্যাত্মার পার্থক্য হইয়াছে। সুতরাং যে পরিমাণে ঐ সকল ধর্ম্মগুলির হ্রাস হইবে, সেই পরিমাণেই মনুষ্যাত্মার মনুষ্যত্ব কমিবে।* মনুষ্যত্ব হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার বলের ক্ষয় হইয়া ক্রমে অকর্ম্মণ্যদশা প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ শোক দুঃখ বা ইন্দ্রিয়বৃত্তির দ্বারা কোন প্রবল বাধা আত্মার উপর উপস্থিত হইলে আত্মা তাহা দমন করিতে পারিবে না। বরং ঐ সকল বৃত্তির দ্বারা অতিশয় অভিভূত হইয়া পড়িবে। দেহটী নানা প্রকার ব্যাধির আকর হইবে। কারণ ব্যাধি বিমোচন করিতে হইলে আত্মার বলের (ক) প্রয়োজন। কিন্তু অসম্পূর্ণতা নিবন্ধন অবশ্যই আত্মার বলের হ্রাস হইবে, এইজন্য ব্যাধি বিমোচনে অসমর্থ হইবে, সুতরাং আয়ুরও ক্ষয় হইবে। আর যদি সেই ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলি সমস্তই আত্মাতে বিকাশিত হয়, তবে আত্মার পূর্ণতানিবন্ধন উপযুক্ত কার্য্য ক্ষমতা ও বলিষ্ঠতা হইবে। আত্মার বলবত্তা থাকিলে শোক দুঃখ বা ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি দ্বারা কিছুমাত্র অভিভূত হয় না। কোন ব্যাধি হইলেও তাহা অনায়াসেই বিমুক্ত হইতে পারে। ব্যাধি বাধা না থাকিলেই সুতরাং আয়ুর বৃদ্ধি।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, পশুদিগের আত্মা নিতান্ত অসম্পূর্ণ কারণ তাহাদের কোনরূপ ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি আদৌ নাই, তবে তাহারা কেন শোক তাপাদি দ্বারা সর্ব্বদা পরিক্লিষ্ট হয় না? এ আপত্তি নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। কারণ পশুদিগের আত্মা মনুষ্যাত্মার তুলনায় নিতান্ত অসম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু তাহাদের পক্ষে তাহাই সম্পূর্ণ। এ নিমিত্ত তাহাদের ওরূপ অসম্পূর্ণতা নিবন্ধন কোন আধি ব্যাধির পরিপীড়ন হয় না। বল থাকিয়া তাহার ক্ষয়, আর স্বভাবতঃ অল্প বল থাকা এতদুভয়ের ফল একরূপ নহে। একজন যুবক

* এখানে আধুনিক নৈয়ায়িক মতের অর্থে মনুষ্যত্বে প্রয়োগ করা হয় নাই, কিন্তু প্রাচীন দার্শনিকেরা জাতিকে "নিত্যানেক সমবেত" বলেন না।

(ক) Curative power

পীড়িত হইয়া এরূপ ক্ষীণবল হইয়াছে যে, দুই সের ভারীর অধিক তুলিতে পারে না আর একটী শিশুও দুসেরের অধিক উত্তোলনে অক্ষম। কিন্তু প্রত্যুভয়ের তারতম্য এই যে, যিনি যুবক, তাঁহার শীঘ্র মৃত্যুর আশঙ্কা আর শিশুটী নিরাপদেই থাকিবে। সেইরূপ, মনুষ্যের ধর্ম্মের বীজ আছে সুতরাং তাহা বিকার প্রাপ্ত না হইলে মনুষ্যের আত্মার ক্ষীণতা হইবে, পশুদের তাহা আদৌ নাই সুতরাং তাহাদের আধিব্যাধিও নাই।

সম্পূর্ণ মানুষ ভারতেই সম্ভবে।

আরও একটী আপত্তি।—অন্যান্য দেশে জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি, শ্রদ্ধা, ঔদাসিন্য প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মগুলির বড় উৎকর্ষ লক্ষিত হয় না। বরং নিতান্ত অল্পতাই দেখা যায়; তথাচ সেখানকার লোকেরা এত সবল, সতেজ দীর্ঘায়ু ও দীর্ঘাকায় এবং সম্পূর্ণ মানবের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। তবে ধর্ম্মের হ্রাস হইলে মনুষ্যের অসম্পূর্ণতা ও তৎফল অল্পায়ু প্রভৃতি হয়, ইহা কিরূপে সম্ভবে? এ কথার উত্তরে যাহা বলিব, তাহা সকলেরই নিকট বোধ হয় একটু নূতন একটু সংস্কার বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু যাহা যুক্তিসিদ্ধ সত্য তাহা না বলিলে কি প্রকারে চলে?

বাস্তবিক দেখিতে গেলে সম্পূর্ণ মনুষ্য ভারত ব্যতীত কুত্রাপি সম্ভবে না। অন্যান্য দেশমাত্রেরই মানুষ অসম্পূর্ণ থাকিবে। ইতিহাস এবং প্রত্যক্ষই ইহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রকৃত আত্মোন্নতির পরাকাষ্ঠা ভারতবর্ষেই হইয়াছিল। বিবেক, বৈরাগ্য আত্মবোধ ও অণিমা, লঘিমাদির শক্তি প্রভৃতি মনুষ্যাত্মার যে সকল নিগূঢ় ধর্ম্ম আছে তাহার পূর্ণবিকাশ ভারতেই হইয়াছে। এই ভারতেই একদিন এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম মনুষ্য প্রাণী সেই মহান্ হইতে মহান্ অনন্ত পুরুষকে 'সোহং' ভাবে দেখিয়াছিল। যখন দুর্ব্বাসা শুকদেব, ভৃগু ভার্গব বামদেব, পতঞ্জলি, পঞ্চশিখ, কাক্ষীজিনি কপিলাদি ঋষিগণের জ্ঞানময়, তপোময়, ধর্ম্মময় মূর্ত্তি সকল মনোমধ্যে উদিত হয়, যখন তাঁহাদের জ্ঞান বীর্য্য, তপোবীর্য্য ধর্ম্মবীর্য্যের স্মরণ হয়, তখন অন্যান্য দেশ কেন, সুরলোকও তাহার তুলনা-স্থান মনে হয় না। আর্য্যদিগের শক্তি

প্রভাবে স্বরলোকও পরাজিত। কত শত শত দেব শত শত বার ভারতবাসী ঋষিদের নিকট পদনত। কত শত সহস্র আত্মদর্শী পরম ঋষি এই ভারতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা গণনার অতীত। যদি ইতিহাস বিশ্বাস না কর, তবে চল, চন্দ্রনাথ, বারাণসী, হরিদ্বার হিমালয়াদির কন্দরে যাই, আজও শত শত তপোময় দেবোপম মহাপ্রভাব মহাত্মা-আত্মদর্শী সম্পূর্ণ মনুষ্য সকল দেখাইব। কিন্তু অন্য দেশে শুকদেবাদির সদৃশ কত জন লোকের নাম শুন বা দেখিতে পাও?—একজনও না।

ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতি দেখাইলাম, আবার আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং বিষয়োন্নতি এতদুভয়ের পরাকাষ্ঠা এক আধারেই দেখিতে চান তাহা হইলেও ভারতেই তাহার শত সহস্র জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পাইবেন। চলুন তবে, রাজর্ষি জনকের নিকট যাই; রাজর্ষি ভীষ্মদেবের নিকট উপস্থিত হই, রাজর্ষি অর্জ্জুন, রাজর্ষি যুধিষ্ঠির, রাজর্ষি দম প্রভৃতি ভারতের জ্বলন্ত তারাগুলির সমীপে চলুন, যাঁহাদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে প্রজ্জ্বলিত রাজসিংহাসনই অধ্যাত্ম যোগাসন, যাঁহারা আসমুদ্র পৃথিবীর ভয়ানক শাসন কার্য্যে নিরত থাকিয়াও সর্ব্বদাই যোগী, সর্ব্বদাই ভোগী ক্ষণকালও আত্মজ্ঞান বিস্মৃত হয়েন নাই, দেখিবেন তাঁহারাই একাধারে উভয়োন্নতির চরম দশা দেখাইয়াছেন সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। তাই বলি ভূমণ্ডলে একমাত্র ভারতবর্ষই একাধারে উভয়োন্নতির উপযুক্ত স্থান। ঐ নিমিত্তই চিরদিন ভারতবর্ষ উভয়োন্নতির নিমিত্তই উন্মত্ত। হউক, না হউক, পারুক, না পারুক, আজও দেশীয় প্রকৃতির প্রেরণা দ্বারা ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক উন্নতির বিরুদ্ধে বিষয়োন্নতি চাহে না।

কিন্তু অন্য দেশের প্রকৃতি অসম্পূর্ণ বলিয়াই উভয়োন্নতির সম্ভাবনা নাই। তাই বলিয়াই অন্য দেশে এ পর্য্যন্ত ঐরূপ কোন দৃষ্টান্ত দেখি না। চিরদিন এবং আজও অন্যান্য দেশ কেবল মাত্র বিষয়োন্নতি লইয়াই উন্মত্ত, কেবল মাত্র বিষয়েই মগ্ন, একমাত্র বিষয়াভিমুখেই অন্য দেশীয় মনঃ প্রকৃতির গতি। ধর্ম্মানুষ্ঠান যাহা কিছু আছে, বিবেচনা করিলে তাহা একরূপ সমাজের বন্ধন রক্ষার নিমিত্ত মাত্র বোধ হয়। মানব প্রকৃতির অসম্পূর্ণতাই ইহার মুখ্যতম কারণ।

যদি অনুসন্ধান করা যায় যে কি কারণে অন্য দেশের মানব প্রকৃতি অত্যন্ত অসম্পূর্ণ হইল, তবে দেখা যায় যে, দেশীয় প্রকৃতিই তাহার মুখ্যতম কারণ। চতুর্দ্দশটী কারণ দ্বারা মানব প্রকৃতির বিকাশ বা অবনতি হইয়া থাকে, তন্মধ্যে স্থানীয় প্রকৃতি একটি প্রধান কারণ।

যদি সেই চতুর্দ্দশটী কারণই অনুকূলরূপে সাহায্য করে তাহা হইলেই মানব প্রকৃতির বিকাশ হইতে পারে। আর যদি কতগুলি কারণ প্রতিকূল থাকে তবে পূর্ণ উন্নতি হইতে পারে না, আবার প্রতিকূল কারণ অধিক হইলে অবনতি হইবারই কথা। ভারতবর্ষে, দেশীয় প্রকৃতি উন্নতির অনুকূল বটে কিন্তু কুসংসর্গ, আলস্য, ও অনালোচনা প্রভৃতি কতকগুলি আগন্তুক দোষ আসিয়া আমাদিগকে সম্পূর্ণ আক্রমণ করিয়াছে। এই নিমিত্ত এই বর্ত্তমান দুর্দ্দশা, এই নিমিত্তই সাওতাল প্রভৃতি জাতি ভারতবাসী হইয়াও পশুপ্রায়ে পরিণত। অন্য দেশে অলসতাদি আগন্তুক দোষ নাই বটে, কিন্তু অপরিহার্য্য স্থানীয় প্রকৃতিই তাহাদের সম্পূর্ণতার মুখ্যতম অন্তরায়। এখন দেখা যাউক কি প্রকারে অন্য দেশীয় প্রকৃতি তাঁহাদের পূর্ণতার অন্তরায়।

যাহাদের শারীরিক প্রকৃতি অধিক প্রকার ভৌতিক প্রকৃতির অনুকূল, অর্থাৎ অধিক প্রকার ভৌতিক পরিবর্ত্তনের সহিত যাহাদের শারীরিক প্রকৃতির সামঞ্জস্য থাকে, তাহাদের শারীরিক প্রকৃতিই অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ হইতে পারে। শারীরিক প্রকৃতির সহিত মানসিক প্রকৃতির নিতান্ত ঘনিষ্টতা, সুতরাং বিধিমত উপায়ের অবলম্বন করিলে তাহাদেরই মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণ হইতে পারে, সেই দেশের মনুষ্যেই সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বের অঙ্কুর নিহিত আছে।

আর যে সমস্ত দেশে ভৌতিক প্রকৃতির অনেক প্রকার পরিবর্ত্তন নাই, সেই সকল দেশের লোকের শারীরিক প্রকৃতিই অপেক্ষাকৃত অসম্পূর্ণ, থাকিবার সম্ভব সুতরাং মানসিক শক্তি অসম্পূর্ণ, অতএব সে দেশের লোকও অসম্পূর্ণ। দেখুন, আমাদের দেশে পর পর ছয় ঋতুর পরিবর্ত্তন; শীতের পর বসন্ত, বসন্তের পর গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর শরত, শরতের পর হেমন্ত, হেমন্তের পর আবার শীত। পর পর এই ছয় ঋতুর পরিবর্ত্তনে,—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, সকল বিষয়েরই নানা প্রকার পরিবর্ত্তন হয়, এবং সেই সকল পরিবর্ত্তনই আমাদিগের সম্যক্ অনুভূত

হয় সুতরাং আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় সকল প্রকার পরিবর্ত্তনে অভ্যস্ত হওয়ায় সম্যক্ বিকসিত ও সম্পূর্ণ হইবারই কথা। কিন্তু যে দেশে কেবল শীত গ্রীষ্ম বৈ আর ঋতু নাই, সে দেশের লোকের ইন্দ্রিয় সকল কোথা হইতে এরূপ সম্পূর্ণতা লাভ করিবে? বসন্তের মৃদু মধুর তাপ গ্রীষ্মের তীব্র তাপ, শীতের মিঠুনি তাপ, শাতের থরহরি কম্প—আমাদের শরীরের স্পর্শন শক্তি এই সকল প্রকার পরিবর্ত্তন সহ্য করিয়া সম্যক্ উন্নতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু যে দেশে ঋতুর মধ্যে শুধু শীত আর গ্রীষ্ম সে দেশের লোকের স্পর্শন শক্তি কোথা হইতে সম্যক্ উন্নতি লাভ করিবে? আবার দেখ ভারতবাসীর শ্রবণ শক্তি যত তীক্ষ্ণ হইবে ইংরেজ বল ফরাসী বল তাহাদের শ্রবণ শক্তি কখনও সেরূপ তীক্ষ্ণ হইতে পারে না। এই শ্রবণশক্তির সম্পূর্ণতাতেই ভারতে সঙ্গীতশাস্ত্রের এত উচ্চ উন্নতি। ছয় ঋতুর পরিবর্ত্তনে সূর্য্যের আলোক কখন অধিক, কখন অল্প। এইরূপ আলোকের ভিন্ন ভিন্ন রকম পরিবর্ত্তন যাহাদের চক্ষুর উপর প্রতিনিয়ত আধিপত্য করিতেছে, তাহাদের চক্ষুর সহিত শুধু শীত গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকের চক্ষুর তুলনাই হয় না। এ ছাড়া ভারত যেমন স্বভাবের সৌন্দর্য্যের একমাত্র ভাণ্ডার, প্রকৃতির এরূপ ভাণ্ডার পৃথিবীতে আর কোথায়? হিমগিরির মত রত্ন গিরি ধরাধামে আর কোথায়? হিমালয় দেখিলে নয়ন স্বার্থক, তাহার প্রকাণ্ডত্ব ভাবিলে হৃদয় প্রকাণ্ডত্বের দিকে ধাবমান হয়। আবার এদিকে কলনাদিনী নির্ঝরিণী, সুরম্য বন উপবন, বৈশাখে বিদ্যুদ্দাম চকিত মেঘমালা, বসন্তের সুকোমল কুসুমোদ্গম, এসকল সৌন্দর্য্যে চক্ষুর শিক্ষা, ও মনের শিক্ষা, হৃদয়ের শিক্ষা প্রভৃতি ভারতে যত সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, শীতপ্রধান য়ুরোপ, গ্রীষ্মপ্রধান আফ্রিকায় সে প্রকার সম্পূর্ণতা লাভের তত সম্ভাবনা নাই। আরও দেখুন, যে, ইন্দ্রিয় থাকাতে মনুষ্যের এ উন্নতি, এ সভ্যতা এ সমাজ, সেই বাগিন্দ্রিয়ই অন্য দেশে কত অসম্পূর্ণ। ভারতবাসীর জিহ্বা অনতিস্থূল-প্রভেদ সম্পন্ন, যতপ্রকার উচ্চারণ সম্ভবে, অন্য দেশবাসীর জিহ্বায় তাহা এক বারেই অসম্ভব। ভারতে ছাপ্পান্নটি বর্ণে ভাষা, ইউরোপে পঁচিশ, ছাব্বিশ- টীর অধিক নহে। *

---

* অনেকের বিশ্বাস আছে, চীন ভাষায় বর্ণসংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক

একজন ইউরোপীয় অনেক দিনের শিক্ষায় অতি যত্নেও ট এবং ত স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিতে সক্ষম হন না কিন্তু ভারতবাসীর রসনায় কোন্ ভাষা অনুচ্চারিত থাকে? তাই বলি মনুষ্যত্বের পূর্ণতা ভারতেই সম্ভবে।

এখন আর একটী গুরুতর আপত্তি উত্থিত হইল—ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, কি ভারতবর্ষ, কি য়ুরোপ, কি আমেরিকা বা আফ্রিকা সকল দেশেই ঋতুর সংখ্যার কমিবেশী থাকিলেও ভৌতিক অবস্থা * পরিবর্ত্তনের সংখ্যা প্রায় সর্ব্বত্রই সমান। ভারতবর্ষে যেমন, পৃথিবীর গতি ভঙ্গী দ্বারা সূর্য্য-কিরণের ইতরবিশেষে, ৩৬৫ দিনে ৩৬৫ প্রকার ভৌতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, দিন দিনই ভৌতিক প্রকৃতি এক একরূপ নূতন ভাব গ্রহণ করে; ঠিক বিষুব রেখার স্থান ভিন্ন, সকল দেশেই এই একই প্রকার পরিবর্ত্তন—সকল দেশেই ৩৬৫ দিনে ৩৬৫ প্রকার ভৌতিক অবস্থা হইয়া থাকে।

সুতরাং ভারতবাসী মানুষেরাও যত প্রকার ভৌতিক পরিবর্ত্তন বহন করে, অন্যান্য দেশবাসী মনুষ্যেরাও তত প্রকার। তবে আর "ভারত-বাসীর প্রকৃতি অধিক বিকসিত এবং অন্য দেশবাসীর প্রকৃতি অল্প বিকসিত হইবে, এ কথার অর্থ কি?

এ বিষয়টী বুঝিতে গেলে বিশেষ একটু মনোযোগ করা আবশ্যক। শুধু ভৌতিক প্রকৃতির পরিবর্ত্তন লইয়াই কথা নহে,-কিন্তু ভৌতিক প্রকৃতির পরিবর্ত্তন দ্বারা শরীরাভ্যন্তরেও বিভিন্নরূপ ক্রিয়া হয়, তদ্দ্বারা মানবপ্রকৃতির অধিক বিকাশ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু তাহা স্বর্গভূমি ভারতবর্ষ ব্যতীত সম্ভবে না। শরীরের আভ্যন্তরিক ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন বলিলে মোটামোটি যাহা মনে হয়, বাস্তবিক ঠিক তাহাই নহে। অর্থাৎ এক ঋতুতে শরীর নিতান্ত শীতল হইয়া পড়িল, আবার আর এক ঋতুতে অত্যন্ত উষ্ণ এ প্রকার নহে। কারণ

কিন্তু বাস্তবিক চীনে বর্ণজ্ঞান আদৌ নাই। তাহাদের এক একটী কথা বুঝাইতে এক একটী সতন্ত্র ২ চিহ্ন আছে। যেমন পিতা বুঝাইতে একটি, মাতা বুঝাইতে আর একটী চিহ্ন ইত্যাদি তাহাদের বর্ণমালা ও অভিধান প্রায় একই কথা।

* Weather.

ভৌতিক প্রকৃতি যতই কেন শীতল বা উত্তপ্ত না হউক, শরীরের তাপ সকল সময়েই এক পরিমাণে থাকে।

মনুষ্য-শরীরের তাপ যদি ৯৯ রেখার অতিরিক্ত কিম্বা ৯৭ রেখার কম হয় তাহা হইলে, সচরাচর শরীর রক্ষিত হয় না। এজন্য বাহিরের বায়ু যখন গ্রহণযোগ্য অপেক্ষা অতিরিক্ত শীতল হয়, এবং তাহার সংস্পর্শে শরীরের তাপের অধিক পরিমাণ ক্ষয় হইতে থাকে তখন আমরা শরীরের অভ্যন্তরে একরূপ যন্ত্রবিশেষ-ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা, উষ্ণবীর্য্য আহারাদি দ্বারা—শরীরের তাপ বৃদ্ধি করিয়া এবং বাহিরেও বস্ত্রাদি ব্যবহার দ্বারা তাপ ক্ষয়ের বাধা দিয়া—পরিমিত তাপই রক্ষা করিয়া থাকি।

আবার যখন বাহিরের বায়ু উষ্ণ হয়, যাহার সংস্পর্শে শরীরের তাপ ক্ষয়ের কিছুমাত্র সাহায্য হয় না, তখন শরীরে অভ্যন্তরে প্রযত্ন বিশেষের দ্বারা এবং ঘর্ম্মাদি দ্বারা আমরা তাপের বিমোক্ষণ করি, এবং বাহিরেও জল সেচনাদি উপায় দ্বারা কিছু সাহায্য করি। এইরূপে পূর্ব্বোক্ত নিয়মিত তাপই রক্ষা করিয়া থাকি। ভৌতিক প্রকৃতি যতই কেন উষ্ণ, শীতল না হউক, শরীরের আভ্যন্তরিক যত্ন দ্বারা আমরা তাহার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া লই। সুতরাং সহজজ্ঞানে ঋতুভেদে শরীর প্রকৃতির পরিবর্ত্তন বুঝা যায় না।

কিন্তু ইহার মধ্যে একটি কথা আছে। ভৌতিক প্রকৃতির উষ্ণতা যখন সম্ভবতঃ—৭৫ হইতে ৮০ রেখার মধ্যে থাকে, তখন তাহা আমাদের শরীর প্রকৃতির ঠিক অনুকূল হয়। অর্থাৎ তখন ঐ বায়ু আদির দ্বারা আমাদের শরীরীয় তাপের অধিক পরিমাণ ক্ষয় হয় না আবার অত্যল্প ক্ষয়ও হয় না তখন সম্ভবমত ক্ষয় হয়। সুতরাং তখন আমাদের তাপের বৃদ্ধি বা বাহির করিবার নিমিত্ত কোন আভ্যন্তরিক যত্নের প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু যখন ভৌতিক তাপ সম্ভবতঃ ৭৫ রেখা অপেক্ষায় কমে তখন তাহার সংস্পর্শে আমাদের তাপ অধিক পরিমাণ ক্ষয় হয় বলিয়া তাপ-সঞ্চয়ের নিমিত্ত শরীরের আভ্যন্তরিক যত্নের আবশ্যক হয়। আর যখন ভৌতিক তাপ সম্ভবতঃ ৮০ রেখা অপেক্ষা অধিক হয় তখন উহার উপযুক্ত মত ক্ষয় হয় না বলিয়া আভ্যন্তরিক যত্নে উহা শরীর হইতে বাহির করা প্রয়োজন

হয়। এই যে অবস্থাদ্বয়ে একবার শরীরকে আভ্যন্তরিক যন্ত্রদ্বারা তাপ বৃদ্ধির নিমিত্ত চেষ্টিত হইতে হয়, আবার তাপক্ষয়ের নিমিত্ত চেষ্টিত হইয়া অন্তরে অন্তরে ক্রিয়া করিতে হয় ইহার নাম "ভৌতিক প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে শারিরীক প্রকৃতির পরিবর্ত্তন।" এইরূপ পরিবর্ত্তন ভারতবর্ষ ব্যতীত কুত্রাপি সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। কারণ ভারতবর্ষে পৌষমাসে ভৌতিক তাপ কোন খানে ৬০ রেখারও কম, আবার জ্যৈষ্ঠমাসে কোন খানে ৯০ রেখারও অধিক হয়। সুতরাং ভারতবর্ষীয় শারিরীক প্রকৃতি, তাপের বৃদ্ধিও বিমোক্ষণ এই দুই প্রকার ক্রিয়াতেই অভ্যস্ত। এক্ষণে প্রায় আশ্বিন মাসের ১০ই হইতে চৈত্র মাসের ১০ই পর্য্যন্ত আমাদিগকে তাপ বৃদ্ধির নিমিত্ত আভ্যন্তরিক প্রক্রিয়াবিশেষ করিতে হয়, আবার চৈত্র হইতে আশ্বিনের ১০ই পর্য্যন্ত তাপ বিমোক্ষণের চেষ্টা করিতে হয়। এতদুভয়বিধ ক্রিয়া আমাদের দিন দিনই কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হয়। হয়ত কেহ মনে করিতে পারেন যে আমরা বাহিরের বস্ত্রাদির উপায় দ্বারা তাপ সামঞ্জস্য করি ইহাতে আভ্যন্তিরক ক্রিয়া কোথা হইতে আসিল? বাস্তবিক তাহা নিতান্ত ভুল। কারণ, দরিদ্র এবং যোগনিরত মনুষ্যগণ ও শৃগাল শূকরাদি প্রাণীরও—ঋতু পরিবর্ত্তনে তাপের সামঞ্জস্য রাখিতে হয়। তাহাদেরও বস্ত্রাদি নাই, তবে কি উপায়ে উহারা এ কার্য্য সম্পন্ন করে?—শরীরের আভ্যন্তরিক ক্রিয়া দ্বারা। সেইরূপ সকলেরই আভ্যন্তরিক ক্রিয়া বিশেষ করিতে হয় তবে বস্ত্রাদিও সম্বল বটে।

সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তির সামঞ্জস্যই তাপ ও তড়িদাদির উপর নির্ভর করে, সুতরাং তাপ লইয়া যে আমাদের ঐরূপ বিচিত্র ক্রিয়া করিতে হয় তাহার সহিত সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তিরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, অতএব ঐ ক্রিয়ার বিচিত্রতার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়শক্তি এবং সমস্ত দৈহিক ও মানসিক শক্তিরই বিচিত্রতা জন্মে; সেই বিচিত্রতাই পূর্ণতার কারণ।

আবার দেখুন, আফ্রিকার ভৌতিক তাপ সম্ভবতঃ ৭৫ রেখার নীচে কখনই হয় না সর্ব্বদা উহার অধিকই থাকে। সুতরাং আফ্রিকাবাসীদের শরীর কখনই তাপের সঞ্চয় নিমিত্ত আন্তরিক প্রক্রিয়া বিশেষ করে না, বার মাস তাপ পরিমোচনের চেষ্টাই করে। আবার ইংলণ্ড আইস্‌লণ্ড প্রভৃতি

স্থানেও ভৌতিক তাপ সম্ভবতঃ ৮০ রেখার উপর কখনই উঠে না; বার মাস উহার নীচেই থাকে। সুতরাং ঐ সকল দেশবাসীর শারিরীক প্রকৃতি কখনই তাপ বিমোক্ষণের নিমিত্ত আভ্যন্তরিক যত্নবিশেষ করে না; তাপ সঞ্চয়ের নিমিত্তই সর্ব্বদা ব্যগ্র। অতএব ঋতু পরিবর্ত্তনে আফ্রিকাদি অন্যান্য দেশের শরীরপ্রকৃতির প্রকৃতরূপ পরিবর্ত্তন হয় না। এই নিমিত্ত অন্য দেশীয় ইন্দ্রিয়শক্তি, মনের শক্তি, চিরদিন অসম্পূর্ণ থাকিবারই সম্ভাবনা। সুতরাং ধর্ম্মশক্তিও অতি অসম্পূর্ণই থাকিবার কথা। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা সেই দেশের মতে অসম্পূর্ণ নহে। কারণ সেই দেশে যতটুক সম্ভব ততটুক হইলেই সেই দেশের মতে তাহারা সম্পূর্ণ হইতে পারে। অতএব তাহাদের অসম্পূর্ণতা নিবন্ধন ব্যাধি ও শোক তাপাদি দ্বারা অভিভূত হওয়া সম্ভবে না। ইহার উদাহরণ পশ্বাদির অসম্পূর্ণতা প্রবন্ধে পরিদর্শিত হইয়াছে। অতএব ধর্ম্মবিষয়ে অন্য দেশের দৃষ্টান্তে চলিলে আমাদের কুশল নাই। ভারতীয় মনুষ্যের আত্মাতে পূর্ণ প্রকৃতির অঙ্কুর নিহিত আছে তাহা বিকাশ প্রাপ্ত না করিলে নিশ্চয়ই ভারতের বিনাশ। *

ধর্ম্মের ক্ষয়ে মনুষ্য মনুষ্য-চর্ম্মাচ্ছাদিত পশু।

আত্মার আভ্যন্তরিক প্রকৃতির পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে মনুষ্যাত্মা ও পশুর আত্মাকে পরস্পর বিভিন্ন করার নিমিত্ত ধর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই। কারণ ধর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হইয়াই আত্মার মনুষ্যভাব হইয়াছে ইহা বিস্তার রূপে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দর্শন স্পর্শনাদি ইন্দ্রিয়শক্তি, কাম ক্রোধাদি মানসিক শক্তি, ইহা মনুষ্যবৎ অনেক পশুরই আছে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মই কেবল একমাত্র মনুষ্যতে থাকে সুতরাং সেই ধর্ম্মগুণের ক্ষয় হইলে, অন্য জন্তু অপেক্ষা মনুষ্যের বিশেষ কি? কি লইয়া মানুষেরা আত্মাকে মনুষ্যাত্মা মনে করিবে? কোন্ আভ্যন্তরিক গুণের দ্বারা আমাদের আত্মা, পশুর আত্মা হইতে বিভিন্ন থাকিবে?

---

* কেহ মনে করিবেন না যে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাকে পূর্ণাবস্থা বলা হইতেছে। আমরা এখন সম্পূর্ণতা দূরের কথা কুসংসর্গাদি দ্বারা অরণ্যের উদ্দাম পশু হইতেও অধম অবস্থায় আসিয়াছি। তাই বলিয়াই এত ক্রন্দন।

কেহ মনে করিতে পারেন মানুষের অনেক প্রকার কৌশল বুদ্ধি আছে, অধ্যয়নাদি দ্বারাও অনেক পদার্থের বিচিত্র ও অদ্ভুত তত্ত্ব জানিতে পায়। ইহাই মানুষের মনুষ্য গরিমা রক্ষা করিতে পারে। কিন্তু ইহা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। কারণ ঐ সকল গুণ ন্যূনাধিকরূপে মনুষ্য ব্যতীত অনেক প্রাণীতেই আছে। ভাবিয়া দেখুন বানরাদি দ্বিপদ পশুগণের কি কৌশল বুদ্ধি কিছুই নাই? উহারা কি আপন আপন স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যকলাপ সম্পন্ন করে না? দেখিয়া বা শুনিয়া কি কতকগুলি বস্তুকে আপনার পরিচিত করে না? অবশ্যই করে। তবে এই মাত্র বলা যায় যে মনুষ্যে ঐ সকল গুণ অধিক প্রকাশিত। তাই বলিয়া ঐ সমস্ত সাধারণ গুণের সহিত মনুষ্যত্বের কোন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নাই। সুতরাং ঐ সকল গুণের উন্নতি দ্বারা মনুষ্যত্বের উন্নতি হয় না। অতএব ধর্ম্মোন্নতি না থাকিলেই মানুষগণ স্থূল জ্ঞানের উন্নতি সত্ত্বেও মনুষ্য চর্ম্মে আবৃত পশু ভিন্ন আর কিছুই নহে। নিতান্ত জড় বুদ্ধিদের বিচিত্র পরিচ্ছদ, বিচিত্র ভবন, বিবিধ রসযুক্ত আহার, এবং দাস দাসীর সেবাদি দ্বারাও মনুষ্যত্বের অভিমান হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা যে নিতান্ত বৃথাভিমান তাহা ব্যাখ্যা করা অনাবশ্যক। কারণ বুদ্ধিমান্ মাত্রেরই উহা অবিদিত নাই।

ধর্ম্মের ক্ষয়ে বংশ পরম্পরা মানুষের বনমানুষাদি হইবার সম্ভাবনা।

মহাভারতাদি ইতিহাস এবং বর্ত্তমান নানাবিধ জাজ্বল্যমান চিহ্নের প্রতি মনোনিবেশ করিলে ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, যে ত্রিপুরপর্ব্বতবাসীরা আজ কুকী বলিয়া বিখ্যাত, যে মণিপুরবাসীরা আজ নাগা বা মণিপুরে ভূত নামে পরিচিত এবং যে অঙ্গদেশবাসীরা সাঁওতাল বলিয়া ঘৃণিত ভাবে উপেক্ষিত হইতেছে, একদিন ঐ সকল জাতীয়েরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি উৎকৃষ্ট আর্য্যজাতীয় থাকিয়া ভারতের যশঃসৌরভ দিগ্‌দিগন্তে বিকীর্ণ করিয়াছিল। তাহারাই আজ ঈদৃশ নরক অবস্থায় নিপতিত হইয়াছে। কারণ ইহাও ইতিহাসাদি দ্বারাই জানা যায় যে, ঐ সকল দেশে পূর্ব্বে প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয় রাজগণের রাজধানী ছিল।

ত্রিপুর পর্ব্বতে আর্য্যকুল ধুরন্ধর ত্রৈপুরেশ্বরের রাজনগরী, (১) অঙ্গদেশ মহাবীর কর্ণের নগরী (২) এবং মণিপুরের পূর্ব্বভাগে ও নিজ মণিপুরে ক্ষত্রিয়কুলতিলক বভ্রুবাহনের রাজধানী ছিল (৩)। কিন্তু সভ্য প্রজা না থাকিলে সভ্যতম রাজা থাকাও অসম্ভব। কারণ এই সকল সভ্যকুলের চূড়ামণি রাজগণ মন্বাদি শাসন শাস্ত্র অবলম্বী ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা বর্ত্তমান পশুবিশেষ ও রাক্ষসবিশেষ লইয়াই রাজত্ব করিতেন তাহা কদাচ সম্ভবপর নহে। প্রাচীনকালে শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্তই ভূপতির প্রয়োজন ছিল। সুতরাং যে রাক্ষসাদির ধর্ম্মজ্ঞানই আদৌ নাই, তাহাদের আর শাসন কি? তাহাদের আর রাজাই কি? কিছুই না। সুতরাং পূর্ব্বে ঐরূপ পশুময় ও রাক্ষসময় রাজ্য হইলে কর্ণ প্রভৃতি রাজগণ কোন্ প্রজার কুলধর্ম্ম, কোন্ প্রজার জাতিধর্ম্ম, কাহারই বা আশ্রমধর্ম্ম দণ্ডবলে সংরক্ষণ করিতেন।

যদি বল, সভ্য মানুষ ছিল বটে, কিন্তু কালক্রমে তাহারা বিনষ্ট হওয়ায় অন্য স্থান হইতে সমাগত অসভ্যগণ ঐ সকল স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহাও সত্য বলিয়া বোধ হয় না। কারণ আজও প্রকাশিত জনরব আছে যে সেই ত্রিপুরেশ্বরের বংশীয় আগরতলার মহারাজা সেই কুকীদিগের সহিত সজাতীয় ভাব দেখাইয়া কুকীদের নিকট সহানুভূতি

১। চেদিদেশকে ত্রৈপুর বা ত্রিপুরীদেশ বলে—(হেমচন্দ্র দেখ)। এখানকার রাজা দমঘোষ, শিশুপালাদি ছিলেন।

২। বৈদ্যনাথং সমারভ্যভুবনে শান্তগং শিবে। তাবদঙ্গাভিধো দেশ— ইত্যাদি শক্তিসঙ্গমতন্ত্র ৭ পটল। কর্ণের নাম অঙ্গরাট্, অঙ্গাধিপ—(হেমচন্দ্র দেখ)।

৩। শ্রুত্বা তু নৃপতিঃ পার্থং পিতরং বভ্রুবাহনঃ।
নির্যযৌ বিনয়েনাথ ব্রাহ্মণার্থ পুরঃসরঃ।
মণিপুরেশ্বরস্ত্বেবমুপান্তং ধনঞ্জয়ঃ—ইতি মহাভারতং
আশ্বমেধিক পর্ব্ব ৮০ অং।

(অতি সরল সংস্কৃত বলিয়া অর্থ করা গেল না।)

প্রাপ্ত হয়েন। এবং প্রায় আধ আধ কুকীগণের সহিত রাজবংশের বিবাহাদি সম্বন্ধও আছে। কিন্তু রাজা স্বয়ং ক্ষত্রিয়োচিত ব্যবহারই করেন। অতএব ইহা বিশ্বাস হয় যে ঐ কুকী ও নাগাদিরা একদিন সভ্য মানুষ ছিল। তবে ইহা অবশ্যই হইতে পারে যে ঐ সকল দেশে কুকী প্রভৃতি অসভ্য মানুষও ছিল, ক্রমে ক্রমে সভ্যমানুষ আর তাহারা একই হইয়া গিয়াছে। কুকীদের সম্বন্ধে যেরূপ, সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্যগণের সম্বন্ধেও সেইরূপ। সাঁওতালাদির স্থানে এমন অনেক তত্ত্ব বর্ত্তমান আছে যাহা দ্বারা বুঝা যায় সভ্যমানুষ ক্রমে ক্রমে অসভ্য হইয়া বর্ত্তমান দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এইরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ কি? মনুষ্যত্বের ক্রমাবনতিই ইহার একমাত্র কারণ। অলসতা, সদ্বৃত্তি সমূহের অনালোচনা, কুসংসর্গ প্রভৃতি কারণে ঐ সমস্ত সভ্যজাতির মনুষ্যত্বের যে ক্রমে হ্রাস হইয়া এক্ষণে বর্ত্তমান অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। এই বিষয় আমরা একটী পরীক্ষিত প্রমাণ দর্শাইতেছি।

অনেকেই জানেন কয়েক বৎসর অতীত হইল বৃকের (নেকড়ে বাঘের) গহ্বরে দুইটী ১৫। ১৬ বৎসর বয়স্ক মনুষ্য পাওয়া গিয়াছিল ও পরিদর্শনার্থ তাহারা প্রয়াগে আনীত হইয়াছিল। বৃকেরা যেসমস্ত মনুষ্যশিশু অপহরণ করিয়া লইয়া যায়, সকল সময় তাহাদের বিনাশ সাধন করে না, কোন কোনটীকে বা আহারাদি দ্বারা পালন করে। সেই দুইটী মনুষ্য এইরূপে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত বৃকদ্বারা পালিত হইয়া তাহাদের গহ্বরে ছিল। যখন তাহাদিগকে পাওয়া গিয়াছিল, তখন তাহারা দুই হস্তে ও দুই পদে পশুর ন্যায় গমনাগমন করিত, তাহাদের গাত্রের লোম মনুষ্য-লোমাপেক্ষা ঈষৎ দীর্ঘ হইয়াছিল এবং তাহাদের দন্ত সকল ঈষৎ সূক্ষ্মাগ্র (সূচল) হইয়াছিল। প্রায় ষোড়শ বৎসর ক্রমাগত পশুর সহবাসে পশু কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিল এবং জন্মাবধি মনুষ্যবৃত্তির পরিচালনা করে নাই, তাহাতেই তাহাদের বাহিরের আকার পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছিল। অতএব ইহা স্বীকার্য্য যে মনুষ্যোচিত বৃত্তির অবনতিতে মনুষ্যোচিত আকারেরও অবনতি হয়। সুতরাং মনুষ্যোচিত বৃত্তির পরিবর্ত্তন ও তৎসঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যশরীরেরও পরিবর্ত্তন হইতে হইতে মনুষ্য যে প্রকৃত

পশুত্বে পরিণত হইবে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? এক্ষণে দেখা যাউক কিরূপে তাহা সম্ভবপর হয়।

পূর্ব্বে ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ভগবানের নিয়মানুসারে আত্মার শক্তির দ্বারা সমস্ত প্রাণি-শরীর সংগঠিত হয়। আত্মার শক্তিগুলি, বাহ্য বা আন্তরিক পদার্থের সহিত সম্মিলিত করার নিমিত্ত যে মস্তিষ্ক ও চক্ষু কর্ণাদি কতকগুলি যন্ত্রসমষ্টি তাহাই শরীর নামে খ্যাত। যে প্রাণীর আত্মার শক্তি যত প্রকার তাহার শারীরিক যন্ত্রও তত প্রকার। সকল প্রাণীর আত্মার শক্তি এক প্রকার নহে সুতরাং সকল প্রাণীর শরীরও এক প্রকার নহে। এবং ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, আত্মার শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি দ্বারাই শরীরের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া প্রাণিজগৎ স্থাবর হইতে ক্রমে ক্রমে এই মনুষ্য শরীরে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু আবার ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, যে গুণ গুলির অঙ্কুর হইয়া প্রাণিজগৎ পশুভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনুষ্যত্বে পরিণত হইয়াছে (আমাদের ধর্ম্ম) তাহা যদি ক্রমেই উপেক্ষিত হইয়া অস্ফুরিত ও অপরিচালিত হইতে থাকে, কেবলমাত্র পশু সদৃশ গুণ গুলি অনুশীলিত হয়, তবে শরীরযন্ত্রগুলিও অতি সূক্ষ্ম মাত্রায় কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইতে থাকিবে।

ইহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন যে, শারীরিক যন্ত্রগুলি যতই অল্প পরিমাণে পরিচালিত হয়, ততই তাহাদের পুষ্টির হ্রাস ও ক্ষীণতা হইবে। এবং যতই অধিক পরিমাণে পরিচালনা করিব তত-ই তাহার পুষ্টি সংসাধিত হইবে। (কিন্তু পরিমাণের অধিক পরিচালনা করিলেও আবার ক্ষীণতাই হয়।)

কি মস্তিষ্ক, কি হৃৎপিণ্ড, ফুস্ ফুস্, সমস্ত শারীরিক যন্ত্রেরই এই নিয়ম।

এখন দেখুন। যে ধর্ম্ম নামক শক্তিগুলির অঙ্কুর ভাব হইয়া আমরা মনুষ্য (মনুষ্যের উৎপত্তি দেখ) উহাদের পরিস্ফুরণেরযন্ত্র আমাদের মস্তিষ্কের উপরের অংশ। যখন আমরা ঐ সকল ধর্ম্মাঙ্কুর বিকাশের চেষ্টা না করিয়া উপেক্ষা করিতে থাকিব এবং কেবল মাত্র সাধারণ ধর্ম্ম (অধর্ম্মের লক্ষণ ও বর্ণনা দেখ) গুলির অনুশীলন করিব, তখন শারীরিক অন্যান্য যন্ত্রগুলি বিলক্ষণ পরিপুষ্ট ও সুদৃঢ় হইবে সত্য, কিন্তু মস্তিষ্কের উপরিভাগটি

ক্রমেই হতশ্রী ও যতদূর সম্ভব ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়া কিছু একটু বৈলক্ষণ্য হইবে। ধর্ম্মের শক্তি গুলি স্ফুরিত না হওয়া হেতুক ক্রমে উহাদের স্ফুরণ ক্ষমতার হ্রাস হইতে থাকিবে। পরে এই অবস্থায় যে সন্তান প্রসূত হইবে তাহার ধর্ম্ম শক্তি বিকাশের ক্ষমতা কম হইয়াই সে ভূমিষ্ঠ হইবে। অতএব তাহার মস্তিষ্কের গঠন একটু অন্যরূপ হইবে এবং ঐ সন্তান বিশেষরূপ যত্ন করিলেও তাহার পিতা যতদূর ধর্ম্ম শক্তির বিকাশ করিতে পারিত ততদূর পারিবে না। কারণ তাহার মস্তিষ্কের আর ততদূর ক্ষমতা নাই। পরে সে যদি আবার ধর্ম্ম শক্তির বিকাশে সাধ্যমত যত্নবান্ না হয়, কেবল সাধারণ ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করে তবে তাহারও মস্তিষ্কের উপরিভাগ আরও একটু হতশ্রী, আরও একটু ক্ষীণ ও কিছু একটু বিসদৃশমত হইবে। এই প্রকারে তাহার সন্তান আবার আরও একটু অন্য রকম হইবে। এইরূপে বহুকাল পরে যদি মনুষ্য-জগৎ অন্যান্য কারণে একেবারে বিনষ্ট বা উচ্ছিন্ন হইয়া না যায়, তাহা হইলে মনুষ্যের আকৃতি কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া হইয়া সহস্র সহস্র বৎসরের পর যে আমাদের বৃদ্ধ প্রপৌত্রগণ পুনর্ব্বার ক্রমে সাঁওতাল, কুঁকী, রাক্ষস, বনমানুষ হইবে, ইহা অব্যর্থ সিদ্ধান্ত বলিয়াই বোধ হয়। ভগবান্ পতঞ্জলির বিজ্ঞানোপবৃংহিত "জাত্যন্তর পরিণাম" ইত্যাদি সূত্র দ্বারাও আভ্যন্তরিক প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে উন্নতি ও অবনতি এতদুভয়ই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অতএব বলি, এখন সকলেই আপন আপন মনুষ্যত্বরক্ষার নিমিত্ত, ভারতের গৌরব পালনের নিমিত্ত, আর্য্যকুলের মহত্ত্বধ্বনি উদ্‌ঘোষণের নিমিত্ত যত্নবান হউন, যাহাতে ভারতবর্ষ বংশপরম্পরা ক্রমে নীচ হইতে নীচতম জন্তুবিশেষ না হয় তাহা করুন।

ধর্ম্মের অভাবে আর্য্যবংশের উৎসেদের সম্ভাবনা এবং ধর্ম্ম থাকিলে থাকিবার কথা।

যেরূপ শরীর আত্মার সম্বল তেমন মন ও আত্মার সম্বল; যেরূপ শরীরের পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা দ্বারা আত্মার পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা তেমন মনেরও পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা দ্বারা আত্মার বলিষ্ঠতা। শরীর এবং মন এতদুভয়ের বল একত্রিত

হইয়া আত্মাকে পূর্ণশক্তিমান্ করে। শরীর এবং মন এতদুভয় যাহার অসম্পন্ন তাহার আত্মাও অসম্পন্ন হয়। বরং শরীর ক্ষীণ বীর্য্য হইলেও মন যদি অধিক বীর্য্যবান হয়, তাহা হইলে মন শরীরের দুর্ব্বলতার ত্রুটি সংশোধন করিতে পারে, কিন্তু মন দুর্ব্বল থাকিলে শরীর তাহার ত্রুটি পূরণে সমর্থ হয় না। এ বিষয়ের প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত আমরা পরে দেখাইব। এক্ষণে দেখা যাউক কি প্রকারে শরীর ও মনের পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা হয়।

যথোচিত পরিচালনা দ্বারা শরীরের পুষ্টি এবং বলিষ্ঠতা জন্মে। উত্তমরূপে পরিচালনে অস্থি মাংসাদির অণু সকল সুদৃঢ়রূপে সন্নিবেশিত ও সংহত হয়। কিন্তু শরীরের কোন একটী অঙ্গের পরিচালন দ্বারা সমস্ত অঙ্গের সুদৃঢ়তা বা বলিষ্ঠতা হয় না, সমস্ত অঙ্গের পরিচালনা করিলেই সমস্ত অঙ্গের বলিষ্ঠতা হয়।

মনেরও পরিচালনা দ্বারাই পুষ্টি এবং বলিষ্ঠতা। মনেরও কতকগুলি অঙ্গ আছে, পরিচালনা দ্বারাই সেই অঙ্গগুলি সুদৃঢ়রূপে সন্নিবেশিত হয়। মনেরও একাঙ্গের পরিচালনা দ্বারা সর্ব্বাঙ্গের পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা হয় না, উহারও সর্ব্বাঙ্গেরই পরিচালনা দ্বারা সর্ব্বাঙ্গের বলিষ্ঠতা জন্মে।

মনের অঙ্গ সকল ভাবময়—শক্তিময়, উহা ভৌতিক পদার্থময় নহে। মনে যত প্রকার শক্তি আছে তাহারা প্রত্যেকেই মনের এক একটী অঙ্গস্বরূপ। ঐ সকল ভাব বা শক্তির পরিচালনা দ্বারা মনের পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা হয়। তাহার নিয়ম এই,—ধৃতি, ক্ষমা, দম, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, বিবেক, বৈরাগ্য, আত্মানুভবের ক্ষমতা, শান্তি, সন্তোষ, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম, ধীশক্তি প্রভৃতি যে সকল শক্তির অঙ্কুর মনে আছে, তাহাদের বারম্বার বিকাশ ও পরিচালনা দ্বারা সেই সকল শক্তিগুলি পূর্ব্বোক্ত মতে (ধর্ম্মের অবস্থা দেখ) সংস্কার অবস্থায় মনোমধ্যে সঞ্চিত হইতে থাকে। সেই সঞ্চিত সংস্কারগুলির এইরূপ ভাবে থাকা চাই যে, যেন নদীর তরঙ্গের ন্যায় থেকে থেকে সর্ব্বদাই এক একটী ধর্ম্মশক্তির উন্মেষ হইয়া উঠে, যেন সর্ব্বদাই একবার বিবেক, একবার বৈরাগ্য, একবার আত্মানুভব, একবার দম, একবার ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ইত্যাদি শক্তি সকল মনোমধ্যে আপনাপনিই উদ্বেলিত হইয়া উঠে, তাহারই নাম সংস্কারের সন্নিবেশ বা মনের অবয়বের সন্নিবেশ হওয়া। মনের

যত অধিক সঙ্খ্যক ধর্ম্মশক্তিগুলি যত অধিক বেগে, অধিক সঙ্খ্যায় বারম্বার পরিচালনা করা যায় ততই সেই সেই বিকশিত শক্তিগুলি দৃঢ় মূল হইয়া আত্মাতে সন্নিবেশিত হয়। সুতরাং তদ্দ্বারা মনের পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা-বৃদ্ধি হয়। আর মনের শক্তির সংখ্যা যতই অল্প, বিকাশের পরিমাণ যতই অল্প, পরিচালনার বারের সংখ্যা যতই অল্প ততই সংস্কার দুর্ব্বল, ক্ষীণ এবং কম হয় সুতরাং মনের দুর্ব্বলতা আত্মার দুর্ব্বলতা। এমন কি মনের যদি সংস্কার আদৌ না থাকে, তবে মনের অস্তিত্বই থাকে না—সংস্কারই মনের অস্তিত্ব ভিত্তি, সংস্কার রাশি দ্বারাই মনকে ধরা যায়। ভগবান্ পতঞ্জলির পাতঞ্জল-দর্শনের দ্বিতীয় পাদের ত্রয়োদশ সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ বেদব্যাস ইহাই বলিয়াছেন "ক্লেশ—কর্ম্মবিপাকানুভবনির্ম্মিতাভিস্তু বাসনাভিরনাদিকালসম্মূর্চ্ছিতমিদং চিত্তং চিত্রীকৃত মিব সর্ব্বতো মৎস্য জালং গ্রন্থিভিরিবাততম্"—রাগ দ্বেষাদি অনুভবের সংস্কার, এবং শরীর মধ্যে সর্ব্বদা যে সকল ক্রিয়া হয় (সুখ, দুঃখ, আহার, ব্যবহার ইত্যাদি) তাহার অনুভবের সংস্কার রাশির, পর পর সন্নিবেশের দ্বারায় আমাদের মন বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়াছে যেমন শণের সূত্র গ্রন্থি সমূহের সন্নিবেশ দ্বারা বিস্তৃত একগাছি মৎস-জালে পরিণত হয় তেমন ঐ সংস্কার রাশির দ্বারা (এবং পূর্ব্বে যে ধর্ম্মাধর্ম্মের সংস্কার কথা বলা হইয়াছে তদ্দ্বারা) আমাদের মন বিস্তৃতায়তন হইয়াছে, এক একটী সংস্কারই মনের অস্থি বা পঞ্জর স্বরূপ এক একটী গ্রন্থি বিশেষ যেরূপ জালের গ্রন্থিগুলি বাদ দিলে আর জাল না, শুধুই সূত্র তেমন সংস্কার বাদ দিলেও আর মন থাকে না —* মনে কর এ পর্য্যন্ত যেন তোমার মনে কোন প্রকার প্রবৃত্তিরই পরিস্ফুরণ হয় নাই, যেন দর্শন, স্পর্শন, বা শ্রবণ, বা কোন প্রকার চিন্তা বা কোনরূপ সাধু অসাধু ভাবেরই কখনও উদ্দীপনা হয় নাই, যেন

* কেহ যেন মনে করেন না যে এতদ্দ্বারা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ন্যায় মস্তিষ্কের সংস্কার রাশিকে মনের ভিত্তি বলা হইল। যে সকল শক্তি হইতে ঐ সকল সংস্কার গঠিত হয় তাহা আমাদের মতে স্বতন্ত্র ও মস্তিষ্ক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

কোন প্রকার ক্রিয়ারই সংস্কার তোমার আত্মাতে নাই। এখন দেখ দেখি তুমি কি থাক, কোথায় তোমার মনের অস্তিত্ব থাকে? কিছুই না কেবল অচেতন শরীরেরই অস্তিত্ব থাকিবে। পূর্ব্বেকার ঘটনাগুলি মনে পড়ে বলিয়াই—পূর্ব্বেকার ঘটনার সংস্কারগুলি মনে আছে বলিয়াই মনের অনুভব করিতে পার, তুমি আপনাকে অনুভব করিতে পার। পূর্ব্বেকার বিকশিত শক্তিগুলিই মনের পঞ্জর স্বরূপ।

এইরূপে মনের বলিষ্ঠতা ও আত্মার বলিষ্ঠতা হয়।* এইরূপ বলিষ্ঠতা দ্বারা আত্মার তেজের বৃদ্ধি হয়, যে তেজকে আর্য্যেরা "তনুপা" নামে অভিহিত করেন। যে আত্মার শক্তি বলবতী এবং তেজও অধিক, সে আত্মার জীবনী-শক্তিও অধিক বলবতী। অতএব আমরা যদি বিবেক, বৈরাগ্যাদি ধৰ্ম্মশক্তির উপযুক্ত পরিচালনা না করি, তবে মনের ক্ষীণতা ও দুর্ব্বলতা দ্বারা জীবনীশক্তির হ্রাস হয়।

এ দিকে, আমরা পরাধীন; পরাধীনতায় মনোবৃত্তি গুলি সহজেই প্রশস্ত ও বিস্তৃত হইয়া বিকাশিত হইতে পারে না। অনেকটা সঙ্কুচিত থাকে, অন্যের স্বামিত্বভাব আসিয়া যেন আমাদের মনকে আক্রমণ পূর্ব্বক অভিভূত করিয়া রাখে, সুতরাং এতদ্বারাও আত্মার শক্তির হ্রাস হয়। এ অবস্থায় যদি আমরা সমস্ত ধৰ্ম্ম শক্তিগুলির পরিচালনা দ্বারা আত্মার ওজস্বিতা সংরক্ষণ না করি, তবে দিন দিনই আমাদের জীবনীশক্তি হ্রাস হইয়া ক্রমে উৎসেদ হইবার সম্ভাবনা। আমার বোধ হয়, ধৰ্ম্মশক্তির উপেক্ষাতে এখন আমাদের আত্মার যেরূপ ক্ষীণতা হইয়াছে, ইহাতে যদি ভারতবর্ষ বিদেশীয় রাজবংশের উপনিবাস হইত, তবে এতদিন আমাদের আমেরিকার দশা প্রাপ্ত হওয়াও অসম্ভব ছিল না।

গবাশ্বাদি পশুগণের আমাদের মত অসংখ্য মনোবৃত্তি নাই, যাহা কিছু আছে তাহারও কোনটিরই উক্তরূপ সংস্কার থাকে না। উহারা দেখিতে দেখিতেই ভুলিয়া যায় শ্রবণ মাত্রেই বিস্মৃত হয়। পশুদের দর্শন, স্পর্শন,

* আত্মজ্ঞানের স্থল ভিন্ন কখনই যেন মন প্রভৃতি বাদ দিয়া কেহ আত্মা বুঝেন না। চৈতন্য যুক্ত মনই—অন্তঃকরণই ব্যবহারিক আত্মা।

আঘ্রাণ, শ্রবণ বা কামাদি প্রবৃত্তি যাহা কিছু মনোমধ্যে বিকশিত হয়, প্রায় তৎক্ষণাৎ তাহা একবারে মন হইতে দূরীভূত হয়। উহারা পূর্ব্বেকার ঘটনাবলী মনে করিয়া কোন কার্য্যই করে না, উহাদের সকল কার্য্যই উপস্থিত মত। এ নিমিত্ত পশুদিগের মনের অবয়ব সন্নিবেশ হয় না—মনের অঙ্গপুষ্টি হয় না, সুতরাং মনের দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতা হয় না, সুতরাং আত্মারও এক অঙ্গ ক্ষীণ হইল। অতএব পশুদের আত্মা নিস্তেজ এবং দুর্ব্বল ও নিতান্ত ক্ষীণ সুতরাং তাহার জীবনীশক্তিও নিতান্ত ক্ষীণ ও দুর্ব্বলা। এ নিমিত্ত পশুদের শরীর অতিশয় বলবান্ হইলেও অধিক দিন জীবিতে পারে না। হস্তী অতিশয় বলবান্ ও বৃহৎ শরীর হইয়াও ক্ষুদ্র শরীর মনুষ্যের তুলনায় অত্যল্পজীবী। পশুর মধ্যেও যে জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতি অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক; তাহাদের দৈহিক বল অল্প থাকিলেও তাহারা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবী। অতি বৃহৎ শরীর গবাদি পশু অপেক্ষায় আধ্যাত্মিক কিছু উন্নত ক্ষুদ্র শরীর বানরাদির জীবন দীর্ঘ। অতএব আধ্যাত্মিক উন্নতি হইলেই যে জীবনীশক্তির বৃদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক অবনতি দ্বারা ক্রমে ক্রমে জীবনীশক্তির ক্ষয় ইহা অব্যর্থ বলিয়াই বোধ হয়। জীবেরই শক্তিবিশেষ জীবনীশক্তি, অতএব সেই জীবের (আত্মার) অঙ্গহীন হইলে যে তাহার শক্তির হ্রাস হইবে না ইহা বোধ হয় উন্মত্ত ব্যতীত আর কেহই বলিবে না।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, যদি আত্মার পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা দ্বারা জীবনীশক্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত সকলগুলি আধ্যাত্মিক শক্তিরই বিকাশ ও পরিচালনার আবশ্যক, তবে ক্রোধ, ঈর্ষা প্রভৃতিও আত্মার শক্তি বটে, উহারাও মনের অঙ্গ বটে, অতএব উহাদেরও উত্তমরূপ পরিচালনা দ্বারা সংস্কার সঞ্চয় না করিলে অবশ্যই মন ক্ষীণাবস্থাপন্ন হইবে। তাহা হইলে ঐ সকল প্রবৃত্তিরও পরিচালনা করিতে হইবে কি? না, কারণ ঐ সকল প্রবৃত্তি বা শক্তি মনের অঙ্গ স্বরূপ হইলেও উহা শরীরের অঙ্গ গলগণ্ড, শীলীপদাদির (গোদ) ন্যায় অতিরিক্ত অঙ্গ—উহা মনের ব্যাধিবিশেষের মধ্যে গণ্য সুতরাং ঐ সকল শক্তির বিকাশ ও পরিচালনা দ্বারা আত্মার ব্যাধিযুক্ত অঙ্গই উন্নত হইবে। যে সকল গুণের বিকাশ ও পরিচালনা দ্বারা শরীরের অযথা ক্ষয় হয়, সেই সকল প্রবৃত্তির পরিচালনায় আত্মার বলিষ্ঠতা হইয়া

জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায় ইহা নিতান্ত অসম্ভবপর কথা। সকলেই অবগত আছেন যে শোক বৃত্তির পরিচালনা দ্বারা শরীর ক্ষীণ হয়, এমন কি ঐ বৃত্তি অতিশয় প্রবল হইলে মৃত্যুও হইয়া থাকে। এখন কি শোককে জীবনীশক্তির বৃদ্ধিকর বলিতে হইবে? ঈর্ষা, অসূয়া প্রভৃতিও শোকজাতীয় প্রবৃত্তি। উহারাও শরীরে শোকের ন্যায় ফলসাধন করিয়া থাকে। ক্রোধ যদিও শোকজাতীয় নহে, তথাপি উহা শরীরের ক্ষয়কারক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যখন ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, তখন স্নায়ুমণ্ডলকে অপ্রকৃতিস্থ এবং ফুস্ফুস্ হৃৎপিণ্ডাদির অতিশয় চাঞ্চল্য উপস্থিত করিয়া রক্তরাশিকে অতিশয় উত্তপ্ত ও তরল করিয়া ফেলে, যেন দেহমধ্যে এক প্রকার মহাপ্রলয়ের ঝঞ্ঝাবায়ু উপস্থিত করে। এবং ঐ সকল অধর্ম্ম গুণ বিকাশ দ্বারা মনের অকর্ম্মণ্যতাই সম্পাদিত হয়। অতএব ঐ সকল প্রবৃত্তির পরিচালনা দ্বারা জীবনীশক্তির বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, ক্ষয়ই হইয়া থাকে।

আরও; সূক্ষ্ম বিচার করিতে গেলে, শোক, ঈর্ষা, অসূয়া ও ক্রোধাদি প্রবৃত্তি সকল পৃথক্ কোন প্রবৃত্তি নহে, বাস্তবিক উহারা অভিমান বাসনা ও আশা প্রভৃতির অতি বৃদ্ধির ফল মাত্র। অভিমান অতি ভয়ঙ্কর প্রবৃত্তি। একমাত্র অভিমান বৃত্তি দেদীপ্যমান থাকিলে বিবেকাদি কোন প্রবৃত্তিই বিকাশের অবকাশ পায় না। এজন্য এক অভিমানকে খর্ব্ব করিয়া যদি আত্মার সমস্ত অঙ্গের সম্পূর্ণতা করা যায় তবে তাহাই কর্ত্তব্য ও হিতজনক। কিন্তু ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উত্তেজনাকালে শরীরের অতি সুপ্রসন্ন ভাব পরিলক্ষিত হয়। তখন শরীর যন্ত্রের কিছু মাত্র উত্তেজনা বা ক্ষয় হয় না, তখন অতি শান্ত ও গম্ভীর ভাব দৃষ্ট হয়।

ধর্ম্মের অভাবে আয়ুঃক্ষয় ও উন্নতিতে আয়ুর্বৃদ্ধি।

ইতিহাসাদি পাঠ করিলে জানা যায় যে, ঋষিগণ অত্যন্ত দীর্ঘায়ু ছিলেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারাও দেখিতে পাই যাঁহারা এক্ষণকার যোগী তাঁহারাও দীর্ঘায়ু, শুধু তাঁহারা নহেন জীবনে যাঁহারা অধিক পরিমাণে ধর্ম্মানুশীলন করিয়া থাকেন তাঁহারাও অধিক দিন জীবিত থাকেন। ইহা দ্বারা এই সিদ্ধান্ত সম্ভব যে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির উত্তেজনায় আয়ুর বৃদ্ধি ও তদভাবে

আয়ুর ক্ষয়। এক্ষণে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে সচরাচর দেখা যায় অনেক অনেক অধার্ম্মিক লোকওত অধিককাল জীবিত থাকে। তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যদি তাহারা ধর্ম্মানুশীলনে জীবন ব্যয়িত করিত তাহা হইলে আরও অধিককাল জীবিত থাকিত। নিম্নে এই বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে।

মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্, পাকস্থালী, যকৃৎ, পেষী প্রভৃতি শরীর যন্ত্র সমূহের কার্য্যকরী ক্ষমতার নাম আয়ু। আত্মার জৈবনিক বল অনুসারে প্রত্যেক শরীর যন্ত্রের কার্য্যকরী—শক্তি, সময়, ক্রিয়া সংখ্যা ও ক্রিয়ার পরিমাণ দ্বারা নিয়মিত। অর্থাৎ মনে করুন, যদি রামদাসের ফুস্‌ফুস্ যেরূপ বেগ দিলে নিশ্বাস বায়ু নাসিকারন্ধ্র পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে ১২ অঙ্গুলী পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয় সেইরূপ বেগে ১ মিনিটে ১৮ বার করিয়া ক্রিয়া করে তাহা হইলে রামদাসের আত্মার জৈবনিক বল অনুসারে ঐ ফুস্‌ফুসের ৭২ বৎসর পর্য্যন্ত কার্য্য-করীশক্তি থাকিবে। এই প্রকার সকল যন্ত্রেরই কার্য্যকরী শক্তি নিয়মিত। এখন ভাবুন, যদি রামদাস যাহাতে বিতস্তির অধিক দুই অঙ্গুলী দূর পর্য্যন্ত নিশ্বাস-বায়ু প্রসারিত হইতে পারে, এইরূপ বেগ দিয়া তাহার ফুস্‌ফুস্‌কে প্রতি মিনিটে ২১ বার করিয়া কার্য্য করাইতে পারে, তাহা হইলে রামদাসের ৬ ভাগের ১ ভাগ (১২ বৎসর) আয়ু কমিবে। অর্থাৎ ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত উহার ফুস্‌ফুসের কার্য্যকরী ক্ষমতা থাকিবে। আবার যদি, যাহাতে বিতস্তির ২ অঙ্গুলী কম দূর পর্য্যন্ত বায়ু প্রসারিত হইতে পারে সেইরূপ বেগ দিয়া মিনিটে ১৫ বার করিয়া ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া করিতে পারে, তাহা হইলে রামদাসের ১২ বৎসর আয়ু বৃদ্ধি হইবে। অর্থাৎ ৮৪ বৎসর পর্য্যন্ত উহার ফুস্‌ফুসের কার্য্যকরী শক্তি থাকিবে। এইরূপ সমস্ত যন্ত্রেরই সম্ভবে। পরিমাণ অপেক্ষা অধিক ক্রিয়া হইলে সমস্ত যন্ত্রের শক্তিই শীঘ্র শীঘ্র কমিয়া যায় আবার পরিমাণের অপেক্ষা অল্প ক্রিয়া করিলে সকল যন্ত্রের শক্তিই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে। তাহা হইলেই দীর্ঘায়ু হওয়া যায়।

পাতঞ্জল দর্শনের তৃতীয় পাদের "সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ কর্ম্ম" এই সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ বেদব্যাস এই মর্ম্ম ব্যক্ত করিয়াছেন;—"আয়ু-

র্বিপাকং কর্ম্ম দ্বিবিধং সোপক্রমং নিরুপক্রমং। তত্র যথাদ্রবস্ত্রং বিতানিতং লঘীয়সা কালেন শুষ্যেৎ তথা সোপক্রমং। যথাচ তদেব সমপিণ্ডিতং চিরেণ সংশুষ্যেৎ এবং কিরুপক্রমং। যথা বাগ্নিঃ শুষ্ককক্ষে মুক্তোবাতেন সমং ততো যুক্তঃ ক্ষেপীয়সা কালেন দহেত্তথা সোপক্রমং যথা বা সএবাগ্নিস্তৃণরাশৌ ক্রমশোবয়বেষু ন্যস্তশ্চিরেণ দহেৎ তথা নিরুপক্রমং ইত্যাদি” ইহার সার মর্ম্ম।—যে শক্তি হইতে আয়ু শক্তির বিকাশ হয় তাহা দ্বিবিধ ঃ—সোপক্রম আর নিরুপক্রম। যাহার কার্য্য, শরীরের উপর অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে তাহা সোপক্রম, তাহার সত্বরই ক্ষয় হইবে। আর যাহার কার্য্য অল্পে ২ শরীরের উপর প্রকাশিত হইতেছে তাহার নাম নিরুপক্রম, তাহার ক্ষয়ে অনেক বিলম্ব হয়।

এখন দেখা যাউক ধর্ম্মের বিকাশও পরিচালনা না হইলে কিরূপে আয়ুর ক্ষয় হয়। ধর্ম্মশক্তিগুলি যে ঊর্দ্ধ স্রোতস্বিনী আর অধর্ম্ম শক্তিগুলি অধঃস্রোতস্বিনী তাহা আমরা ‘ধর্ম্মের গতিপ্রণালী’ ব্যাখ্যাস্তম্ভে বুঝাইয়াছি। এখন কেবল এইমাত্র বলিলেই হইবে যে, ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনী আর অধঃস্রোতস্বিনী প্রবৃত্তির উত্তেজনা কালীন শরীরের কি অবস্থা হয়।

মন যখন ভগবানের প্রেমরসে নিমগ্ন হয়, কিম্বা ভক্তিবৃত্তির উদ্দীপনা দ্বারা সেই অমৃতময়ের অভিমুখে অগ্রসর হয়, অথবা পরম বিদ্যার বিকাশ দ্বারা মনস্তত্ব এবং আত্মতত্বাদির অনুভব করত শরীর হইতে আত্মার পার্থক্য উপলব্ধি করে, অধ্যাত্মজগতে অবতীর্ণ হইয়া বুদ্ধি, চিত্ত, অভিমান, প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান এবং ইন্দ্রিয়শক্তি প্রভৃতি তত্ত্ব সকল জাজ্বল্যমান উপলব্ধি করিতে থাকে, তখন স্থূল শরীরের ক্রিয়া নিরুদ্ধপ্রায় হয়; মস্তিষ্ক, ফুস্ফুস্, হৃৎপিণ্ড, পেশী প্রভৃতির ক্রিয়া তখন অতীব মৃদু হইয়া পড়ে। কারণ, ধর্ম্মশক্তি মাত্রেই নিরোধশক্তি হইতে উৎপন্ন এবং অধর্ম্মশক্তি বা ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া আর ফুস্ফুস্ হৃৎপিণ্ডাদির ক্রিয়া মাত্রেই ব্যুত্থানশক্তি হইতে সমুৎপন্ন। নিরোধশক্তি নিবর্ত্তক এবং ব্যুত্থানশক্তি প্রবর্ত্তক। সুতরাং এক সময়ে এই নিবর্ত্তক আর প্রবর্ত্তক উভয় শক্তির কার্য্য হইতে পারে না। যখন শরীরের

ক্রিয়া শক্তি কমিয়া আইসে তখন শরীরের তাপ ও তড়িৎ নিতান্ত অল্প হইয়া আইসে *। যতপ্রকার ধর্ম্ম প্রবৃত্তি আছে সকলেরই উদ্দীপনা কালে শারীরিক ক্রিয়ার মন্দতা হয় এবং তাপ তড়িতের হ্রাস হয়, শরীর শীতবীর্য্য হয়। অন্ততঃ প্রতিদিন দুই তিন ঘণ্টা কাল ধর্ম্মপ্রবৃত্তির পরিচালনা দ্বারা ক্রমে যখন ঐ সকল প্রবৃত্তির সংস্কার দৃঢ়তররূপে মনে নিবদ্ধ হয়, তখন পূর্ব্বোক্ত সংস্কার দ্বারা সকল অবস্থাতেই বিবেক, বৈরাগ্য ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রভৃতির কিছু কিছু স্ফুরণ মনে থাকে, সুতরাং প্রায় সর্ব্বদাই শারীরিক ক্রিয়ার প্রভাব কিছু কম থাকে। স্নায়ুমণ্ডল একটু ধৈর্য্যশালী হয়, তাপ, তড়িৎ কিছু কম হয়, শরীর বেশ শীতবীর্য্য থাকে, সুতরাং আয়ুর বৃদ্ধি হয়।

আবার যদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিপরীতে সর্ব্বদাই কেবল চক্ষু কর্ণাদি ঐন্দ্রিয়িক পরিচালনাতেই ব্যাপৃত থাকে তবে তদ্দ্বারা, ভাটিজলে নাবিক পরিচালিতনৌকার ন্যায়, ইন্দ্রিয় ও অন্যান্য যন্ত্র সকলের বেগ আরও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং শীঘ্র শীঘ্র যন্ত্র সমূহের কার্য্যকারী শক্তির হ্রাস হয়,—আয়ুর ক্ষয় হয়। মনে করুন, গবাশ্বাদি পশুগণের ইন্দ্রিয়শক্তি অত্যন্ত প্রবলা। উহারা সর্ব্বদাই অত্যন্ত প্রবল ভাবে কেবল অধঃস্রোতস্বিনী বৃত্তির পরিচালনা করে। এই নিমিত্ত উহাদের শরীর যন্ত্রের কার্য্যকারী শক্তি শীঘ্র শীঘ্র উন্নত, শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিষ্ট ও শীঘ্র শীঘ্র চরিতার্থ হইয়া শীঘ্র শীঘ্র নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এ নিমিত্ত পশুরা এত বলবান্ হইয়াও অল্পায়ু। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে যদি শরীরযন্ত্র সকল অল্প কায করাইলেই আয়ুর বৃদ্ধি হয়, তবে নিদ্রাদ্বারা অধিক সময় নষ্ট করিলে কিম্বা কোন কার্য্য না করিয়া কেবল বসিয়া থাকিলেও কি দীর্ঘজীবী হওয়া যায়? যদি তাহা হয় তবে নিদ্রালু অলস ও বৃথাভিমানী ধনী লোকেরই দীর্ঘায়ু হইত, এবং পূর্ব্বে যে, শারীরিক যন্ত্রের উপযুক্ত পরিচালনায় পুষ্টি ও সুদৃঢ়তা দ্বারা আত্মার পুষ্টি ও জীবনী শক্তিবৃদ্ধির কথা বলা হইয়াছে তাহাও মিথ্যা হয়।

---

* এই রূপে তাপ তড়িৎ কমিলে যে কোন অপকার হয় না তাহা উপাসনা প্রণালীতে বুঝাইব।

একটু চিন্তা করিলেই ইহার মীমাংসা করিতে পারেন। আমরা কেবল এই মাত্র বলিয়াছি যে, ধর্ম্মশক্তি অভ্যাস দ্বারা সমস্ত শরীর যন্ত্রের মূলবেগ কিছু কম হয়। মূলবেগ কম হইলে যে শারীর যন্ত্রের উপযুক্ত পরিচালনা হয় না তাহা নহে। মূলবেগের অনুসারে সকলগুলি শরীর যন্ত্রের সমভাবে পরিচালনা করার নামই উপযুক্ত পরিচালনা। তাহা দ্বারাই শরীরের অবয়ব সকল উত্তমরূপে সন্নিবেশ ও সুদৃঢ় হইতে পারে। যদি আন্তরিক বেগ বলবান্ সত্বে যন্ত্র সকল অল্প অল্প পরিচালিত হয় তাহা হইলেই শরীরের অকর্ম্মণ্যত্ব হয়।

অলসাদির আন্তরিক বেগ যেমন তেমনই থাকে, কিন্তু বাহিরে ক্রিয়া কম হয় এবং ক্রিয়ার সমতাও থাকে না। তাহাদের ফুস্‌ফুস্, হৃৎপিণ্ডাদির ক্রিয়া প্রায় যেমন হবার তেমনিই হয়, কেবল হস্ত পদাদির বহিঃ পেষীগুলি সামান্য পরিচালিত হয়। এইরূপ ব্যবহারে আয়ুর ক্ষয় ভিন্ন বৃদ্ধির আশা নাই। ইহাতে মেদ প্রভৃতি নানা প্রকার রোগ জন্মিয়া শরীর শীঘ্রই মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হয়। অনিয়মিত নিদ্রা দ্বারাও শরীরের ক্ষয় ও পুষ্টির সামঞ্জস্য থাকে না, সুতরাং তদ্দ্বারা আয়ুর ক্ষয়ই হইয়া থাকে। ধর্ম্ম বিকাশ কালে এইরূপ অবস্থা হয় না।

ধৰ্ম্মক্ষয়ে ভারতবাসীর আরও অধিক আয়ুক্ষয়ের সম্ভাবনা।

সাধারণতঃ ভারতবাসীর শারিরীক প্রকৃতি পর্য্যালোচনায় দেখা যায় যে, এ দেশে স্নায়ুমৎ প্রকৃতিরই প্রবলতা। স্নায়ুমৎ প্রকৃতির গুণ এই যে, মস্তিষ্ক এবং স্নায়ু মণ্ডল অতিরিক্ত ক্রিয়াশীল হয় সুতরাং সমস্ত শারীরিক যন্ত্রই অধিকতর চঞ্চল হয়। শরীরাভ্যন্তরে তাপ ও তড়িৎ কিছু অধিক পরিমাণ থাকে। অতএব অন্য দেশীয় লোক অপেক্ষায় এ দেশীয় লোকের শীঘ্র শীঘ্র শরীর যন্ত্রের ক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা। এ জন্যই অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারতের লোক, বিশেষতঃ বাঙ্গালার (বাঙ্গালার আরও অধিক স্নায়ুমৎ প্রকৃতির প্রবলতা) স্বভাবতই অল্প দিন জীবিত থাকে। এ অবস্থায় ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শরীরটী কিছু শীতবীর্য্য ও যন্ত্রগুলির কিছু ধৈর্য্য সাধন

না করিলে যে শীঘ্র শীঘ্র কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে, তাহা বোধ হয় অসন্দিগ্ধ।

ধর্ম্মানুষ্ঠান থাকিলে শরীর নির্ব্ব্যাধি ও সচ্ছন্দভাবে থাকে।

শরীর তত্ত্ববিৎ মাত্রেই, বোধ হয় ইহা স্বীকার করিবেন যে, যতক্ষণ আমাদের সকলগুলি শরীর যন্ত্রের ক্রিয়ার সামঞ্জস্য (ক) থাকে, যতক্ষণ সকলগুলি যন্ত্র সমভাবে ক্রিয়া করে; অর্থাৎ যে যন্ত্রের যেরূপ ক্রিয়ার নিয়ম আছে সেই নিয়ম হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া কোন যন্ত্র অধিক বেগে, কোনটী অল্পবেগে কার্য্য না করে; আর যতক্ষণ তাপ ও তড়িতের সামঞ্জস্যের বাধা না হয়;—অর্থাৎ যে যন্ত্রে যে পরিমাণে তাপ তড়িৎ থাকা আবশ্যক সেরূপ না থাকিয়া কোন স্থানে তদপেক্ষা অধিক আর কোন স্থানে অপেক্ষাকৃত কম এরূপ না হয়; ততক্ষণ কোন প্রকার ব্যাধি হইতে পারে না। কিন্তু যখন ইহার বিপরীত অবস্থা হয়, অর্থাৎ শরীর ক্রিয়ার সামঞ্জস্য ভঙ্গ হইয়া কোন যন্ত্রের ক্রিয়া অধিক ও কোনটীর ক্রিয়া অল্প পরিমাণে হয়, অথবা কোন যন্ত্রের তাপ তড়িতের বৃদ্ধি বা কোন যন্ত্রের তাপ তড়িতের হ্রাস হয়, তখন নিশ্চয়ই রোগ জন্মে। এবং যখন শরীরকে উল্লিখিত সামঞ্জস্যে আনয়ন করা যায় তখনই শান্তি (ঔষধ দ্বারা কেবল এই সামঞ্জস্য ব্যতীত আর কিছুই করা হয় না)। কিন্তু যদি সকল যন্ত্রেরই ক্রিয়া এক পরিমাণে কমে, এক পরিমাণে বাড়ে, এবং তাপ তড়িৎও সকল স্থানেই এক পরিমাণে হ্রাস ও বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে কোন ব্যাধির আশঙ্কা নাই।

এখন দেখা যাউক কিরূপে ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শরীর নির্ব্ব্যাধি থাকে। এখানে আর একটি কথা মনে করা আবশ্যক। শরীর যন্ত্রের নিয়মিত কার্য্য করিতে যেরূপ আত্মার যত্ন বা প্রেরণা বিশেষের আবশ্যক তেমন অনিয়মিত কার্য্যেও আত্ম-প্রেরণার প্রয়োজন; শরীরের কোন যন্ত্রের ক্রিয়ায় ন্যূনাতিরেক হওয়া বা কোনখানে তাপ, তড়িতের ইতরবিশেষ হওয়া অথবা কোন ব্যাধিকালে শরীরে যে ক্রিয়া হয় তাহার কোনটিই আত্মার প্রেরণও যত্ন বিশেষের সাহায্য ব্যতীত হইতে পারে না।

(ক) Harmony.

এখন ভাবুন, আত্মা যখন বাহ্যজ্ঞান ভুলিয়া ভগবানের ভক্তিরসে নিমগ্ন হয়, অথবা বিবেক-বৈরাগ্যাদি-ধর্ম্মের বিকাশে পরমাত্মায় বিলীনপ্রায় হয়, তখন শরীরের সহিত আত্মার আমিত্ব-সম্বন্ধ শিথিল হইয়া আসে, এমন কি ভক্তি বিবেকাদির চরমাবস্থায় আত্মা শরীরের মধ্যে থাকিয়াও শরীর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে থাকে। সুতরাং তখন আত্মার কোন প্রকার যত্ন বা প্রেরণা শরীরের উপর থাকে না, এজন্য তখন ফুস্‌ফুস্‌ হৃৎপিণ্ডাদির ক্রিয়া একবারে নিরুদ্ধ হয়। বিশেষতঃ নিরোধশক্তি আর ব্যুত্থানশক্তি পরস্পরের বিরোধিনী। সুতরাং যতক্ষণ নিরোধ শক্তির কার্য্য হয়, ততক্ষণ ব্যুত্থান শক্তির কার্য্য হইতে পারে না, এবং যে পরিমাণে নিরোধ শক্তির বিকাশ সেই পরিমাণেই ব্যুত্থান শক্তির হ্রাস হয়। (শারিরীক ক্রিয়া সকল যে ব্যুত্থান শক্তির কার্য্য আর বিবেকাদি যে নিরোধ শক্তির কার্য্য তাহা পূর্ব্বেই (ধর্ম্মাধর্ম্মের লক্ষণ ও বর্ণনা প্রকরণে) সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে)। সুতরাং বিবেকাদি স্ফুরণ হইলেই শারীরিক ক্রিয়া ক্রমে নিস্তেজ হইতে থাকে (ইহা প্রত্যক্ষেই দেখা যায়)। যখন ফুস্‌ফুস্‌, হৃৎপিণ্ডাদির ক্রিয়া নিস্তব্ধ প্রায় হয় তখন তাপ আর তড়িৎও নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে। সুতরাং তখন সমস্ত শরীর যন্ত্রেরই ক্রিয়ার ন্যূনাতিরেক না থাকিয়া সামঞ্জস্য হয়; এবং তাপ তড়িতেরও সামঞ্জস্য হয়। এই সময়ে ব্যাধি থাকিলেও শরীর নির্ব্ব্যাধি হয়। পরে যখন জাগ্রৎ অবস্থা হয়, তখনও ঐরূপ সমতা হইতেই শরীর যন্ত্রের ক্রিয়ার পুনরারম্ভ এবং তাপ তড়িতের নূতন স্ফুরণ হইতে থাকে। এ নিমিত্ত পরেও উহার সামঞ্জস্যই থাকে। অহোরাত্র মধ্যে অন্ততঃ তিনবার এইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিলে শারীরিক ক্রিয়া ও তাপ তড়িতের সামঞ্জস্য ভঙ্গ হইতে পারে না সুতরাং কোন ব্যাধি হইবারই অবকাশ থাকে না। আর যদিও কদাচিৎ কোন পীড়া হয়, তখনও ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা উহার প্রতিকার হইতে পারে। যত প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান আছে তাহাদিগের প্রত্যেকের দ্বারা এই উপকারটী ন্যূনাধিক ক্রমে কিছু কিছু সংসাধিত হইবে সন্দেহ নাই। প্রত্যক্ষেও দেখা যায় যে ধর্ম্মশীল ও ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মারা বড় পীড়িত হন না। এরূপ বহুতর জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে যে, একটী গ্রাম কিম্বা সহর

ম্যালেরিয়া, মহামারী, বসন্ত প্রভৃতি ভয়ঙ্কর পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়া একবারে উৎসন্ন গেল, কিন্তু সেই গ্রামে সেই স্থানে একজন ব্রহ্মচারী কি পরিব্রাজক অক্লেশে নির্ব্ব্যাধি ও সবল শরীরে সমস্ত রোগকে তুচ্ছ করিয়া দিন অতিবাহিত করিতেছেন। ইহাপেক্ষা আর প্রবলতম প্রমাণ কি হইতে পারে?

ধর্ম্ম ব্যতীত প্রকৃত সুখ হয় না।

আমরা মোহান্ধ হইয়া যে ইন্দ্রিয়গণের নিকট প্রকৃত সুখের প্রার্থনা করি, তাহারা কি আমাদিগকে সেই প্রকৃত সুখ আনীয়া দিতে পারে? সেই ইন্দ্রিয়গণ কি আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে? যেখান হইতে ইন্দ্রিয়গণ সুখ আহরণে চেষ্টিত তাহা কি—সেই রস-গন্ধ স্পর্শাদিবিষয় সকল কি প্রকৃত সুখের স্থান? কখনই না। যদি বিষয় দ্বারা প্রকৃত সুখ—প্রকৃত তৃপ্তি হইত তবে আত্মার হাহাকার থাকিবে কেন? নয়নাদি ইন্দ্রিয়গণ দেখিতে দেখিতে শুনিতে শুনিতে তাহা হইতে ফিরিয়া আসে কেন? সেই সুস্বাদু-রস, সেই সুস্নিগ্ধরূপ, সেই কোকিলকুলের কাকলী যেন ঘৃণা পূর্ব্বক উপেক্ষা করিয়া আবার বিষয়ান্তরের নিমিত্ত ব্যাকুল হয় কেন? যদি বিষয়ই প্রকৃত সুখের স্থান হইত তবে ইন্দ্রিয়গণ কদাচ তাহা উপেক্ষা করিতে পারিত না, কদাচ তবে নিত্য নূতন পাইবার জন্য লালায়িত, উৎকণ্ঠিত হইত না। তাই বলি ইন্দ্রিয়গণ প্রকৃত সুখ আহরণ করিতে সমর্থ নয়। যে সুখের আস্বাদ করিলে মনের আর অরুচি হয় না—যে সুখ পাইলে মন উপেক্ষা করিতে চায় না তাহারই নাম প্রকৃত সুখ। একমাত্র ধর্ম্মই সেই প্রকৃত সুখের আকর—সেই প্রকৃত সুখের ভাণ্ডার। যখন ভক্তি ও বিবেকাদির উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা উদ্বেলিত হইয়া আত্মাকে প্লাবিত করিয়া ফেলে, তখন আত্মা অমৃত সাগরে ভাসিয়া ভাসিয়া অমৃত পানে উন্মত্ত হয়, তখন আত্মার অন্তরে আনন্দ বাহিরে আনন্দ আনন্দের বাজার আনন্দের হাট। সেই বাজারে না গেলে, সেই আনন্দ সেই শান্তি বুঝা যায় না। তবে এইমাত্র বলা যায় যে, যে আনন্দের আস্বাদে পৃথিবীপতিও সাম্রাজ্যসুখ বিস্মৃত হইয়া গহনবাসী হয়েন তাহা যে সাম্রাজ্য সুখ অপেক্ষায় অধিক, সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মের দ্বারাই জাতীয়তা ও সমাজ রক্ষা।

যাহাতে মনুষ্য সমাজ মধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের সহানুভূতি অভিব্যক্ত হয় তাহারই নাম জাতীয়তা। সেই জাতীয়তা জন্মাইয়া দেয় এমন কতকগুলি কারণ আছে। যত পরিমাণে পরস্পরের কার্য্যকলাপ, আহার ব্যবহার, রীতিনীতি, প্রভৃতি একভাবাপন্ন হইবে তত পরিমাণে জাতীয়তার বৃদ্ধি পাইবে। ইহা স্বীকার্য্য যে ধর্ম্মহীন স্বেচ্ছাচার রাজ্যে উক্ত কার্য্যকলাপ ও আহার ব্যবহারাদির ঐকমত্য হওয়া কদাচ সম্ভবে না। কারণ জগতে দুই জন মনুষ্যের রুচি এক প্রকার দৃষ্ট হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন রুচি। কিন্তু ধর্ম্মানুষ্ঠান হইলে রুচির পার্থক্য সত্ত্বেও কার্য্যকলাপাদির একত্ব হইতে পারে এবং সেইরূপ কার্য্য করিতে করিতে পরিণামে রুচি এবং প্রকৃতিও কার্য্যানুযায়ী হইয়া উঠে। কারণ প্রকৃত ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে যে যে আচার ও আহারাদির আবশ্যক হয় তাহা নিয়মিত ও নির্দ্দিষ্ট। সন্ধ্যা, আহ্নিক, জপ, স্নান, দান, অতিথি সৎকার, উৎসব, তীর্থযাত্রা, শৌচকার্য্যের অনুষ্ঠান, গোসেবা, সাধু ব্রাহ্মণ সেবা, দেবতা ভক্তি, ভগবদুপাসনা প্রভৃতি অনুষ্ঠান দ্বারাই ধর্ম্মের রক্ষা ও উন্নতি হয়। কাল্পনিক ধর্ম্ম ভিন্ন প্রকৃত ধর্ম্মের উন্নতিকল্পে এই কার্য্যগুলির অনুষ্ঠান ব্যতীত আর কোনই উপায়ের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ধর্ম্মানুশীলন করিতে গেলেই অগত্যা সকলেরই একরূপ কার্য্যকলাপ করিতে হয়। এবং ধর্ম্মের উন্নতি দ্বারা ক্রমে মানসিক প্রকৃতিরও এক :া হইয়া পড়ে, তখন প্রকৃত জাতীয়তা সংস্থাপিত হয়, তখন পরস্পরের নিমিত্ত পরস্পরের সহানুভূতি, সকলেই সকলের সুখে সুখী সকলেই সকলের দুঃখে দুঃখী হইয়া থাকে। অতএব ধর্ম্মই একমাত্র জাতীয়তার ভিত্তি, ধর্ম্মই সকলকে এক সূত্রে বন্ধন করিবার আলান স্বরূপ। ধর্ম্মশীল মহাত্মার অন্যায় স্বার্থপরতাদি দোষ থাকিতে পারে না। সুতরাং ধর্ম্ম দ্বারা সমাজেরও রক্ষা। অন্যায় স্বার্থপরতা আর অবিশ্বাস এই দুইটীই সমাজের প্রবলতর শত্রু। এই দুটী না থাকিলেই দণ্ডময় পশুর ন্যায় সমাজকে রাজদণ্ডে পীড়িত হইতে হয় না, নিরর্থক অর্থ ব্যয়ে দারিদ্র হইতেও হয় না।

ধর্ম্মের ক্ষয়ে পরকালের ক্লেশ।

ধর্ম্মের ক্ষয় হইলে ইহকালে যে সকল গুরুতর অনিষ্ট হয়, তাহাই এ পুস্তকে দর্শিত হইল। বাস্তবিক আরও যে কত অনিষ্ট তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করা নিতান্ত অসম্ভব ও অসাধ্য। ইতঃপর এই দেহ ত্যাগ করিলে আতিবাহিক দেহ ধারণ করিয়া অতি গুরুতর ভয়ানক যাতনা ভোগ করিতে হয়। তৎপর আবার নানা প্রকার নীচ যোনিতে বারম্বার জন্মগ্রহণ করিয়া অসহ্য দুঃসহ ও দুর্নিবার্য্য দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। আপাততঃ সে বিষয়ে হস্তার্পণ করিলাম না; " পুনর্জন্ম " প্রকরণে এই সমস্ত বিষয় অতি বিস্তারিতরূপে যুক্তি দ্বারা পরিদর্শিত হইবে।

ধর্ম্মোন্নতির গুরুতর ফল।

এ পর্য্যন্ত কেবল নাস্তিকদের প্রবোধের নিমিত্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের শারীরিক ও সামাজিক ফল মাত্রই প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক উহা ধান্যার্থী কৃষকের ধান্যফলের সঙ্গে সঙ্গে পল খড় লাভের সদৃশ অকিঞ্চিৎকর ফল মাত্র। ধর্ম্মের গুরুতর ফল সমস্তই অব্যাখ্যাত রহিয়াছে। তাহা উপাসনাদি প্রবন্ধে ক্রমে বিস্তারিতরূপে পরিদর্শিত হইবে। এইক্ষণ কেবল প্রতিজ্ঞা স্বরূপ বলিতেছি যে ধর্ম্মের পরম উন্নতি হইলে অণিমা লঘিমা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যের স্ফুরণ হয়, ধর্ম্মেরই পরম উন্নতি হইলে মনুষ্যের ঈশ্বরত্ব লাভ, ব্রহ্মত্ব লাভ এবং অবশেষে সমস্ত দুঃখ শোক তাপাদি হইতে পরিত্রাণ হইয়া মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা ধর্ম্মের চরম উন্নতি না করিয়া অনেকটা উন্নতি করিতে পারেন তাঁহাদেরও নানা প্রকার মহাশক্তির বিকাশ হয় এবং মৃত্যুর পর পরম সুখের উপভোগ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মগণ আতিবাহিক দেহবান্ হইয়া কেহ বা চন্দ্রলোকে কেহ বা সূর্য্যলোকে কেহ বা অন্যান্য লোকে অবস্থিতি করত অপরিমিত আনন্দভোগ করিয়া থাকেন। বহুকাল ঐরূপ স্বর্গীয় সুখভোগ করিয়া পরে আবার অত্যুন্নত মহাত্মার গৃহে জন্মগ্রহণানন্তর অতিশয় উচ্চমনাঃ মহাত্মা ধর্ম্মাত্মা হইয়া পরমানন্দে জীবন অতিবাহিত করেন। এই সকল বিষয় ক্রমে সাধ্যমত বিবরণে প্রবৃত্ত হইতেছি। ওঁ শ্রীসদাশিবঃ শরণম্ ওঁ।

ইতি শ্রীশশধর কৃতায়াঞ্চ ধর্ম্মব্যাখ্যায়াং ধর্ম্মপ্রয়োজনং
নাম প্রথম খণ্ডং সম্পূর্ণম্।

ও

শ্রীসদাশিবঃ

শরণম্।

ধর্ম্মব্যাখ্যা।

দ্বিতীয় খণ্ড।

ধর্ম্মসাধন।

ধর্ম্মের উপাদান নির্ণয়।

শিষ্য। ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের লক্ষণ, অবস্থা, গতি, শক্তি ও প্রয়োজনাদি সবিশেষ অবগত হইলাম, এখন কোন্ কোন্ উপায়ে ধর্ম্মের বিকাশ, উন্নতি ও রক্ষা বিধান হয়, এবং ঐহিক পারত্রিক সর্ব্বনাশের মুল-কারণ অধর্ম্মই বা কি উপায়ে বিনষ্ট হইতে পারে, তাহা জানিতে কুতূহল হইয়াছে। অতএব প্রার্থনা, অধ্যাত্মবিজ্ঞানাদি বিজ্ঞানশাস্ত্র-সম্মত প্রমাণ, যুক্তি, পরীক্ষা এবং অন্যান্য বচন প্রমাণাদির সহিত উক্ত বিষয়টি সবিস্তারে ব্যাখ্যা করিয়া পরিতৃপ্ত করুন।

আচার্য্য।—সাধারণ কোন একটি দ্রব্য নির্ম্মাণে, যেরূপ তিন প্রকার কারণের আবশ্যক হইয়া থাকে, ধর্ম্ম সাধনেও সেই রূপ ত্রিবিধ কারণের আবশ্যক। ত্রিবিধ কারণের দ্বারাই প্রত্যেক দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ১ম, কারণ—যে যে উপাদানের দ্বারা দ্রব্যটি নির্ম্মাণ করা যায়, সেই উপাদানগুলি। ২য়—সেই উপাদান সামগ্রীগুলির পরস্পর সম্বন্ধ। ৩য়—যদ্দ্বারা সেই উপাদানগুলির একত্র সমাবেশ বা পরস্পরের মিলনসাধন করা যায়। এই পুস্তকের কাগজগুলি ভৌতিক পরমাণু-উপাদানে রচিত, অতএব সেই

ভৌতিক পরমাণুরাশি ইহার প্রথম-শ্রেণীর কারণ। ইহার নাম "উপাদান-কারণ" বা "সমবায়ী-কারণ"। ঐ ভৌতিক পরমাণুগুলির পরস্পর সম্মিলন হইয়া, উহারা একত্রিত না হইলে কাগজ হইতে পারে না, অতএব ঐ পরমাণু গুলির পরস্পর সম্মিলনই, এই কাগজের দ্বিতীয় শ্রেণীর কারণ। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কারণের নাম "অসমবায়ী কারণ"। নানাবিধ যন্ত্র, অগ্নির জ্বালা, সূর্য্যের তাপাদি দ্বারা ঐ পরমাণুগুলি উত্তমরূপে সম্মিলিত ও একত্রিত হইয়া, কাগজ প্রস্তুত হয়, অতএব ঐ সকল যন্ত্র, অগ্নিতাপ ও সূর্য্য-তাপাদি উহার তৃতীয় কারণ অথবা "নিমিত্ত কারণ"। এই কারণত্রয়ের সংগ্রহ ব্যতীত কাগজ নির্ম্মাণ অসম্ভব। কেবল কাগজ নহে, আসন, বসন, ভূষণ, প্রভৃতি প্রত্যেক বস্তু নির্ম্মাণেই এইরূপ ত্রিবিধ কারণের সংগ্রহ চাই।

ধৃতিক্ষমাদি ধর্ম্মগুলিও এক একটি বস্তু—এক একটি জিনিষ; সুতরাং উহাদেরও ঐরূপ ত্রিবিধ কারণের আবশ্যক; উহাদেরও সমবায়ী, অসমবায়ী এবং নিমিত্ত কারণ অবশ্যই থাকিবে। তন্মধ্যে নিরোধশক্তি ইহাদের সমবায়ী বা উপাদান কারণ (প্রথম কারণ); কারণ, ভৌতিক পরমাণুরাশির দ্বারা যেমন কাগজ নির্ম্মিত হয়, তেমন, নিরোধ-শক্তির দ্বারাই ধৃতি ক্ষমাদি ধর্ম্মের শরীরটী গঠিত হয়। কতকগুলি নিরোধ শক্তির সংস্কার একত্রিত হইয়া, আপনার বিকাশের দ্বারা এক একটি ধর্ম্মের দেহ সংগঠন করে। (নিরোধ শক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্ব্বে (৫ পৃ-১১ পং অবধি) বলিয়াছি।) পরমাণুর পরস্পর সংযোগে যেমন কাগজ উৎপন্ন হয়, তেমন নিরোধশক্তির সংস্কারগুলির (১০ পৃ-৯ পং) পরস্পর ঘনিষ্ঠতার দ্বারা এক একটি ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়; অতএব নিরোধশক্তির সংস্কারগুলির পরস্পর ঘনিষ্ঠতা বা সংযোগসম্বন্ধ-কেই ধর্ম্মের অসমবায়ী কারণ (দ্বিতীয় কারণ) বলা যায়। অগ্নিতাপাদির সাহায্যে যেমন পরমাণুরাশি একত্রিত হইয়া, কাগজ নির্ম্মাণ হয়, সেইরূপ বৈরাগ্য, বিবেক দর্শন, ধারণা, ধ্যান, ও সমাধি প্রভৃতি কতকগুলি কারণের দ্বারা সেই নিরোধশক্তির সংস্কারগুলির ঘনিষ্ঠতা-সম্বন্ধ সম্পাদিত হয়, তৎপর ধৃতি, ক্ষমা, ও ভক্তিপ্রভৃতি এক একটী ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়; অতএব বিবেকদর্শন বৈরাগ্যাদিই ধর্ম্মের (তৃতীয় কারণ) বা নিমিত্ত কারণ।

উক্ত কারণ ত্রয়ের সংগ্রহ করিলেই ধর্ম্মের বিকাশ, উন্নতি ও রক্ষা হইতে পারে। ধর্ম্মের বিকাশ ও উন্নতি হইলে, অধর্ম্মক্ষয়ের নিমিত্ত যত্নান্তর অপেক্ষা করে না, অধর্ম্ম আপনিই বিনষ্ট হয়। ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম অত্যন্ত বিরোধী পদার্থ, সুতরাং ধর্ম্মের পূর্ণাবস্থায় অধর্ম্মের লেশও থাকিতে পায় না। ধর্ম্মের দ্বারা আত্মার সর্ব্বাঙ্গ পরিপূর্ণ হইলে অধর্ম্ম আর থাকিবে কোথায়? একটী দ্রব্যের সর্ব্বাঙ্গে চরম শীতলতা অবস্থা হইলে আর তাপ কোথায় থাকে। কিন্তু শৈত্যের হ্রাসের মাত্রা অনুসারে উষ্ণতার কিছু মাত্রায় অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। ধর্ম্মেরও মাত্রার হ্রাস থাকিলে সেই কয়েকমাত্রায় অধর্ম্ম থাকিতে পারে। শৈত্য যত মাত্রায় কম থাকিবে, তাপ তত মাত্রায় থাকিবে; ধর্ম্মও যত মাত্রায় কম থাকিবে, অধর্ম্ম তত মাত্রায় থাকিবে। সুতরাং ধর্ম্মের উন্নতির সঙ্গে অধর্ম্ম ক্ষীণ হইতে থাকে। অতএব ধর্ম্মের বিকাশ ও উন্নতির উপায় আর অধর্ম্ম ক্ষয়ের উপায় এতদুভয়ই এক; যদ্দ্বারা ধর্ম্মের উন্নতি, তদ্দ্বারাই অধর্ম্মের অবনতি। সুতরাং তাহার একটীর নির্দ্ধারণ করিলেই অপরটিও নির্দ্ধারিত হয়।

নিরোধশক্তি হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি ও অধর্ম্মের ক্ষয়।

এখন কি প্রকারে নিরোধশক্তি হইতে ধর্ম্মের বিকাশ ও উন্নতি আর অধর্ম্মের ক্ষয় হয়, তাহা বলিতেছি। কিন্তু ধর্ম্মের বিকাশ প্রণালী অপেক্ষায় অধর্ম্ম ক্ষয়ের প্রণালীটি কিছু সহজ, অতএব প্রথম অধর্ম্মক্ষয়ের প্রণালী শুন।

চিত্তের স্বাধীনতাই ধর্ম্মের বিকাশ ও অধর্ম্ম ক্ষয়ের মূলকারণ, ইহা বোধ হয় সহজেই বুঝা যায়। যাঁহাদের চিত্ত স্বাধীন নহে, পরাধীন—বিষয়ের অধীন; বিষয়ের শক্তি দ্বারা যখন যেভাবে যেদিকে পরিচালিত হয়, তখন সেভাবে সেদিকে চলিয়া যায়, বলপূর্ব্বক স্বয়ং নিবৃত্ত বা প্রবৃত্ত হইতে পারে না, তাহাদের ধর্ম্ম হওয়া সম্ভবে না, এবং সময় সময় ভয়ানক অধর্ম্মের দ্বারা আক্রান্ত হইতে হয়। অধিক কি, সংসারে যত প্রকার ঘোরতর অনর্থ ও ভীষণ পাপরাশি হইয়া থাকে, চিত্তের স্বাধীনতা বা সংযম

না থাকাই উাঁহার মুখ্যতম কারণ। পৃথিবীতে কে'না জানে যে, হিংসা, দ্বেষ, চৌর্য্য, মাৎসর্য্যাদি বৃত্তি সকল অতি ঘৃণিত? কে'না জানে যে উহা কর্ত্তব্য নহে? ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিবেক, শান্তি প্রভৃতি যে অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য, তাহাই বা কাহার অবিদিত আছে? নির্জ্জনে বসিয়া প্রত্যেক হৃদয়ই, অধর্ম্ম বর্জ্জনীয়, ধর্ম্ম পালনীয় এরূপ সাধু সংকল্প করিয়া থাকে, কিন্তু কার্য্য-কালে কয় জনের সেই মহান্ উদ্দেশ্য সফল হয়? তখন প্রায় অধিকাংশ প্রাণীকেই সেই সুসংকল্পিত কার্য্য হইতে বঞ্চিত হইতে দেখা যায়। কেহ ভগবচ্চিন্তার কর্ত্তব্যতা বুঝিয়া, তাহাঁকে ধ্যানকরিতে বসিলেন, কিন্তু কিছুকাল পরে ভাবিয়া দেখেন, হাট বাজারের চিন্তা করিতেছেন এবং কখন যে, ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া মন, হাটবাজারে আসিয়াছে তাহা মনে নাই, মনকে যেন, কে অলক্ষিত ভাবে হরণপূর্ব্বক বাজারে লইয়া গিয়াছে; তখন নিজের মনকে নিজে নিজে তিরস্কার করিয়া, আবার ঈশ্বরের নিকট আসিলেন, আবারও সেইরূপ অপহৃত হইলেন। ইহা কেন হয়? চিত্তের স্বাধীনতা নাই বলিয়া; যাঁহার মন স্বাধীন, তাঁহার কদাচ এইরূপ হয় না, এইরূপ ঘটনা হওয়াই চিত্তের বিষয়-তন্ত্রতার প্রমাণ, চিত্ত স্বাধীন থাকিলে বিষয়াকর্ষণে ধৈর্য্যচ্যুতি হয়না, বিষয়ের আকর্ষণ কালে, চিত্তকে বলপূর্ব্বক সংযত করিয়া রাখাযায়। অধর্ম্ম কার্য্যেও এইরূপই হয়; ক্রোধের দোষ পর্য্যালোচনায় "ক্রোধ অকর্ত্তব্য" বলিয়া সকলেই জানেন, অন্য কেহ ক্রোধ করিলে নিন্দাও করিয়া থাকেন; কিন্তু ভৃত্য যখন আজ্ঞা পালন করিল না, প্রভু তখন হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন; এবং উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে নিগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন; "ক্রোধ করা অকর্ত্তব্য" একথা তখন মনে নাই, কিন্তু কিছুকাল পর যেন আবার নিদ্রা-হইতে জাগিলেন; তখন মনে পড়িল "ক্রোধ করা অকর্ত্তব্য"। আরও দেখ; মনে স্থির ধারণা আছে যে, ঈর্ষ্যা করিব না, "ঈর্ষ্যা-পাপের ফল সদ্যই সম্পন্ন হয়, ঈর্ষ্যী মানব চিরদুঃখী; পরোন্নতির অসহিষ্ণুতা ঈর্ষ্যা, পরোন্নতি কখনই নিবারণ করাযায় না, ঈর্ষ্যাও কখন যায় না, সুতরাং চিরদিন দুঃখেই জ্বলিতে হয়।" কিন্তু যখন ঈর্ষ্যার সামগ্রী সমুপস্থিত হয়, তখন কিছুই মনে থাকে না। তখন অলক্ষিতভাবে ঈর্ষ্যাবৃত্তি আসিয়া আত্মাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে এবং তদনুযায়ী কার্য্যও করায়। সকল প্রকার পাপবৃত্তির

অনুষ্ঠানেই এরূপ হইয়া থাকে। অতএব চিত্তের স্বাধীনতা না থাকাই সমস্ত পাপের মূল। যাঁহারা স্বাধীন-চেতা, তাঁহারা আপন সঙ্কল্পের অনুসারে চিত্তসংযত করিতে সমর্থ হয়েন, পাপবৃত্তি তাঁহাদিগকে কখনই সংস্পর্শ করিতে পারে না।

কুৎসিত বিষয়ের আকর্ষণ দ্বারা চিত্ত যখন সেই বিষয়ের অভিমুখে নীত হওয়ার উপক্রম করে, সেই সময়ই পাপবৃত্তি বিকাশের প্রথম সময়। লোভ-পরবশ-আত্মার চিত্ত পরধনের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই আকর্ষণ যখন অত্যন্ত দুঃসহ হয়,তখনই চৌর্য্য প্রবৃত্তি, দস্যুপ্রবৃত্তি বা বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি পাপবৃত্তির উদয় হয়; ইন্দ্রিয়-সুখলোলুপচুরাত্মার চিত্ত, প্রমদা বিষয়ে গুরুতর আকৃষ্ট হইলেই ভয়াবহ ব্যভিচার বৃত্তির বিকাশ; যশের আকর্ষণে ছল করা প্রভৃতি নানা প্রকার পাপবৃত্তির পরিস্ফুরণ হইয়া থাকে। অতএব যিনি, বিষয়ের আকর্ষণ কালে স্বাধীনতা বলে মনকে সংযত করিয়া, ফিরাইয়া রাখিতে পারেন, তাঁহার ঐ সকল পাপবৃত্তির উদয় হইতে পারে না। সুতরাং এক মাত্র চিত্তসংযম থাকিলেই সমস্ত পাপ হইতে বিনিবৃত্ত থাকা যায়। যে শক্তির দ্বারা মনকে সংযত করিতে পারা যায়, আপন ইচ্ছানুসারে নিয়োগ প্রতিনিয়োগ করা যায়, ইচ্ছা হইলে সমস্ত বিষয় হইতে প্রত্যাকর্ষণপূর্ব্বক পরমাত্মার নিকটবর্ত্তী করা যায়, আবার ইচ্ছা হইলে যে কোন একটী বিষয়েই নিবদ্ধ করিয়া রাখা যায়, সেই শক্তির নামই স্বাধীনতা বা সংযমশক্তি বা নিরোধশক্তি। সুতরাং নিরোধ শক্তি দ্বারাই অধর্ম্মের ক্ষয় হয়।

এখন কি প্রকারে নিরোধ শক্তি হইতে ধর্ম্মের বিকাশ ও উন্নতি; তাহাও সবিস্তারে বলিতেছি। পরন্তু নিরোধশক্তি হইতে কি প্রকারে ধর্ম্মের বিকাশ, তাহা জানিবার পূর্ব্বে নিরোধশক্তির সবিশেষ বিবরণ জানা আবশ্যক, নচেৎ ধর্ম্মবিকাশের বিষয়টী উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় না। অতএব নিরোধ শক্তির বিবরণেই প্রথমে অগ্রসর হইলাম।

নিরোধের বিবরণ।

কত প্রকার নিরোধ, কোন্ প্রকার নিরোধের কি লক্ষণ, কোন্ নিরোধের কিরূপ ক্রিয়া হয় ইত্যাদি বিষয় গুলি নিরোধশক্তির বিবরণ, তাহাই ব্যাখ্যাত

হইবে। নিরোধশক্তিকে প্রথমে দুই প্রকারে ভাগ করা যায়। প্রথম বৃত্তি-নিরোধ" দ্বিতীয় "স্বরূপ-নিরোধ।" বাহিরেরবস্তু বা দেহীয় কোন বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হইয়া যে, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন প্রভৃতির মধ্যে এক একরূপ ঘটনাবিশেষ উপস্থিত হয়, তাহার নাম "বৃত্তি।" এই বৃত্তি প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের মধ্যে শত-শত বার ঘটিতেছে; এক মুহূর্ত্ত মধ্যেই চক্ষু, সহস্র বিষয় দেখিতেছে। শ্রবণ, সহস্র কথা শুনিতেছে। চক্ষু একবার ভিত্তি, একবার কবাট, একবার গবাক্ষ, একবার স্তম্ভ, একবার রেল, এই-রূপে প্রতিক্ষণেই একটী ছাড়িয়া আর একটী, সেটী ছাড়িয়া অপর একটী উপলব্ধি করিতেছে। কর্ণেন্দ্রিয়ও একটি শব্দ ত্যাগ করিয়া আর একটি, আবার সেইটি ছাড়িয়া অপরটী, এইরূপে শত শত শব্দের দিকে বিধাবিত হইতেছে। স্পর্শেন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি সকলেই এইরূপ চঞ্চলতাশাল হইয়া সর্ব্বদা ক্রিয়া করিতেছে। ইন্দ্রিয়াদির এই প্রকার চঞ্চলতা দমন করিয়া, কেবল একটি মাত্র বিষয়ে স্থির রাখাই একপ্রকার বৃত্তিনিরোধ। এ অবস্থায় ইন্দ্রিয়াদির প্রতিক্ষণে এক একরূপ বৃত্তি না হইয়া, অনেক সময় পর্য্যন্ত কেবল এক প্রকার বৃত্তিই হইতে থাকে। এই জন্য এই রূপ বৃত্তি-নিরোধকে "ইতর বৃত্তি নিরোধ" বলা যাইতে পারে। আর ইন্দ্রিয়াদির বিষয়জনিত কোন প্রকার বৃত্তি হইতে না দিয়া কেবল তাহাদের নিজ নিজ অবস্থায়ই সংযত রাখার নাম প্রকৃত "বৃত্তি নিরোধ।" এ অবস্থায় ইন্দ্রিয়াদি কেবল নিজ নিজ স্বরূপেই প্রকাশিত হইতে থাকে, তাহাদের বিষয়জনিত কোন প্রকার বৃত্তিই থাকে না। ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন প্রভৃতির কেবল মাত্র নিজ নিজ অবস্থাটীর নাম "স্বরূপ"; সেই স্বরূপেরও স্ফুরণ হইতে না দিয়া একবারে সংযত রাখার নাম "স্বরূপ-নিরোধ"। ইহা পরে বিস্তার করিতেছি।

বৃত্তি নিরোধের বিভাগ।

উক্ত উভয়বিধ বৃত্তিনিরোধই প্রথমে পাঁচ পাঁচ ভাগে বিভক্ত। প্রথম,—ইন্দ্রিয়- প্রাণাদি-বৃত্তি-নিরোধ; দ্বিতীয়,—মানসবৃত্তিনিরোধ; তৃতীয়,—অভি-মান-বৃত্তিনিরোধ; চতুর্থ,—বুদ্ধিবৃত্তি-নিরোধ; পঞ্চম,—প্রকৃতিবৃত্তি-নিরোধ। ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদিকে প্রতিক্ষণে নানা প্রকার বৃত্তি হইতে নিবৃত্ত রাখিয়া

কেবল এক একটী মাত্র বিষয়ে নিবদ্ধ রাখা, ইন্দ্রিয় প্রাণাদির "ইতর বৃত্তিনিরোধ।" মনকে প্রতিক্ষণে নানা বৃত্তি হইতে নিবৃত্ত রাখিয়া কেবল মাত্র একটি বিষয়ে আবদ্ধ রাখা, মনের "ইতর বৃত্তিনিরোধ।" অভিমানকে প্রতিক্ষণে নানা প্রকার বৃত্তি হইতে নিবৃত্ত রাখিয়া, কেবল একটি বিষয়ে আবদ্ধ রাখা, অভিমানের "ইতর বৃত্তিনিরোধ"। এইরূপ বুদ্ধি ও প্রকৃতির ইতর বৃত্তিনিরোধও জানিবে। এখন প্রকৃত "বৃত্তি নিরোধ" কি শ্রবণ কর।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দাদি এক এক প্রকার বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইয়া, যে এক একটি ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে এক এক প্রকার ঘটনা হইয়া থাকে, সেই ঘটনা হইতে না দিয়া, ইন্দ্রিয়াদিকে কেবল নিজ নিজ অবস্থায় সংযত করার নাম "ইন্দ্রিয় প্রাণাদি বৃত্তি-নিরোধ"।

ঐ সকল বিষয় দর্শন স্পর্শনাদি কালে মনের মধ্যে একরূপ ঘটনা বিশেষ হইয়া, উহাদের বিশেষরূপে জ্ঞান হয়; সেই ঘটনা বিশেষ এবং কোন-বিষয় সন্নিহিত না থাকিলেও যে, মনের মধ্যে এক প্রকার ঘটনা বিশেষ উপস্থিত হইয়া, ঐ সকল বিষয়ের নানাবিধ চিন্তা বা ধ্যান হইয়া থাকে তাহা, এই দুই প্রকারের কোন প্রকার ঘটনা হইতে না দিয়া মনকে কেবল আপন অবস্থাতেই সংযত রাখার নাম "মানসবৃত্তিনিরোধ"।

বিষয়ের উপর "অহং" "মদীয়" (আমি আমার ইত্যাকার) জ্ঞান অভিমানের বৃত্তি। সেই বৃত্তির নিরোধ "অভিমান বৃত্তি নিরোধ"।

নিশ্চয়-জ্ঞান, বুদ্ধির বৃত্তি। তন্নিরোধের নাম "বুদ্ধি-বৃত্তি-নিরোধ"।

সমস্ত প্রকার বৃত্তির সংস্কারাবস্থায় কথঞ্চিৎ প্রকৃতির বৃত্তি বলা যায়। সেই বৃত্তিনিরোধ "প্রকৃতিবৃত্তিনিরোধ"। এই হইল পাঁচ প্রকার বৃত্তি নিরোধ; এখন ইহাদেরও অবান্তর বিভাগ বলা যাইতেছে শ্রবণ কর,—

চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়-শক্তি পাঁচটী, বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় শক্তি পাঁচটী, প্রাণাদি শক্তিও, প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান, ভেদে পাঁচটী, সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ ও প্রাণাদির সর্ব্ব সমেত পঞ্চদশ সংখ্যা হইল ইহাদের প্রত্যেকেরই পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তি ও নির্দ্দিষ্ট আছে; চক্ষুরিন্দ্রিয়ের

রূপ গ্রহণের বৃত্তি, শ্রবণেন্দ্রিয়ের শব্দগ্রহণের বৃত্তি, ইত্যাদি। অতএব ইন্দ্রিয়াদির বৃত্তি ও সর্ব্ব সমেত পঞ্চদশ প্রকার, সুতরাং ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদি বৃত্তি নিরোধ ও পঞ্চদশ প্রকার। "চক্ষুরিন্দ্রিয়-বৃত্তি-নিরোধ," "শ্রবণেন্দ্রিয়-বৃত্তি-নিরোধ" ইত্যাদি। বলা বাহুল্য উক্ত সমস্ত প্রকার বৃত্তিই "অধঃ-স্রোতস্বিনী"।

মন, অভিমান, বুদ্ধি প্রভৃতি সকলেই সকল প্রকার ঐন্দ্রিয়িক বিষয় লইয়া তাহাদের জ্ঞান, চিন্তা, এবং তাহাদের উপর অভিমানাদি করিয়া থাকে, অতএব মন অবধি সকল অন্তঃকরণেরই ঐ ১৫ প্রকার বৃত্তিই আছে। চাক্ষুষ বিষয় চিন্তাকরা, মনের এক প্রকার বৃত্তি, শ্রাবণিক বিষয় চিন্তা করা, আর এক প্রকার বৃত্তি, এবং স্পৃষ্ট বিষয়ের চিন্তা করা, আর এক প্রকার বৃত্তি ইত্যাদি। অভিমানাদি সম্বন্ধেও এইরূপই জানিবে। তদ্ব্যতীত ইহাদের আরও অনেক প্রকার অধঃস্রোতস্বিনী বৃত্তি আছে; অতএব তাহার প্রত্যেকটী লইয়া মানসাদি বৃত্তি নিরোধও অনেক প্রকার হইল। এতদ্ভিন্ন ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনী ধর্ম্ম বৃত্তিও অনেক আছে, তাহারা নিজে নিজেই নিরোধের এক একটী মূর্ত্তি স্বরূপ, তথাপি তাহাদেরও আবার আর এক প্রকার নিরোধ আছে।

উক্ত বৃত্তি-নিরোধের প্রত্যেকটী মৃদু, মধ্যম, তীব্র, এই তিন ভাগে বিভক্ত। তাহার বিস্তারের প্রয়োজন নাই। এখন "স্বরূপ-নিরোধের" বিভাগ বলিতেছি।

স্বরূপ নিরোধের বিভাগ।

স্বরূপ নিরোধও পাঁচ প্রকারে বিভক্ত। ১ম—"ইন্দ্রিয়-প্রাণনিরোধ" ২য়—"মানস-নিরোধ"; ৩য়—"অহঙ্কার-নিরোধ"; "৪র্থ—বুদ্ধি-নিরোধ" ৫ম—"প্রকৃতিনিরোধ"। এই পাঁচ প্রকার স্বরূপ-নিরোধের বিশেষ বিশেষ লক্ষণাদি বিবরণের পূর্ব্বে আর একটী বিষয় বুঝিতে হইবে, নতুবা তাহা বুঝিতে পারা যায় না, অতএব তাহা অগ্রে শুন;

আমাদের শরীরের মধ্যে, যত প্রকার ক্রিয়া হইতেছে, তৎসমস্তই জীবাত্মার শক্তি দ্বারা সম্পাদিত। সমস্ত শক্তিময় জীবাত্মা আমাদের মস্তিষ্কের

অভ্যন্তরে বাস করিয়া, আপন শক্তি বিস্তারের দ্বারা শরীরের উপর রাজত্ব করিতেছেন (১)।

আত্মার শক্তিপরিচালনার প্রধানযন্ত্র মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কের অভ্যন্তরেই আত্মার শক্তির সর্ব্বপ্রথমে ক্রিয়া হয়। তৎপর স্নায়ুমণ্ডলের দ্বারা (২) প্রবাহিত হইয়া শরীরের হস্তপদাদি সমস্ত শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত ও পরিব্যাপ্ত হয়। "অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ স এষোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ" (মুণ্ডকোপনিষৎ) তৎপর বাহিরের দিকে বিসর্পিত হয়।

(১) আত্মার মস্তিষ্ক মধ্যে বসতির বিষয় "অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানে" সবিস্তারে প্রদর্শিত হইবে। কোন কোন শাস্ত্রে আত্মার হৃদয়াদি স্থানে থাকার বিষয় যে লিখিত আছে, তাহাও বিশেষরূপে মীমাংসিত হইবে। প্রথমখণ্ডের ২৩ পৃষ্ঠে ইহার একটী মাত্র শ্রুতি প্রমাণ ও উদ্ধৃত হইয়াছে।

(২) মস্তকের মধ্যে শাদা-শাদা মত অনেকটা ঘিলু আছে, তাহার নাম মস্তিষ্ক। আমাদের গলপ্রণালীর দু'ধার দিয়া প্রায় কনিষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রভাগের ন্যায় মোটা হইয়া, সেই মস্তিষ্কীয় পদার্থের কিয়দংশ, শরীরের নিম্নাভিমুখে বাহির হইয়াছে। তাহাদের গাত্রের চারি দিকে অতিসূক্ষ্ম এক একটা পর্দা আছে, এ নিমিত্ত ঐ পদার্থটা গলিয়া ছড়াইয়া যায় না এবং লম্বাকার মোটা সূত্রের মত দৃষ্ট হয়। এই পদার্থের নাম স্নায়ু" (স্নায়ু কথাটী সময় ২ অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়।)

বট বৃক্ষের শিকড় যেমন একটা হইতে দুইটা, দুইটা হইতে ১০টা, ১০টা হইতে ১০০টা, তৎপর সহস্র, তদনন্তর অসংখ্য শাখা বাহির হইয়া, পরিব্যাপ্ত হইয়া পুরাতন ভিত্তির সর্ব্বাঙ্গে অনুস্যূত হইয়া পড়ে, সেইরূপ ঐ দুটি বড়২ স্নায়ু হইতে প্রথমে ১০টা, তৎপরে ক্রমে ২০টা ৫০টা, ১০০টা, ৫০০টা, ১০০০টা, এবং তৎপরে লক্ষ লক্ষ হইয়া, অবশেষে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্নায়ু সমূহ বাহির হইয়া, সমস্ত শরীরের মধ্যে, হস্তপদাদি প্রত্যেক শাখা প্রশাখায় অনুস্যূত (গাঁথা) হইয়া আছে। এমন কি ? শরীরের মধ্যে এরূপ কোন স্থান অসম্ভব, যেখানে স্নায়ু নাই; অতিসূক্ষ্ম একটী সূচ্যগ্রবিদ্ধ করিলে সেখানেও অসংখ্য স্নায়ুর অস্তিত্ব আছে। স্নায়ু এত "সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর" হইয়াছে যে, তাহা অণুবীক্ষণের দ্বারাও পরিলক্ষিত হয় না। কেবল গলপ্রণালীর দুই ধার দিয়া দুইটী স্নায়ু বাহির হইয়াই যে, এত অসংখ্য স্নায়ু হইয়াছে তাহাও নহে, আরও অনেক প্রকার স্নায়ু সকল, মস্তিষ্ক হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে।

আত্মার সকল প্রকার শক্তিই, প্রথম পরিস্ফুরণকালে এক প্রকার অবস্থা গ্রহণ করে, সেই অবস্থার নাম 'বুদ্ধি'; ইহার ক্রিয়ার স্থান মস্তিষ্কের অভ্যন্তর প্রদেশ। তৎপর ঐ অবস্থার বিস্তৃতি হইয়া শক্তিটি, যখন ক্রিয়ানিষ্পাদনে উন্মুখী হয়, তখন আর এক প্রকার অবস্থা গ্রহণ করে; সেই অবস্থার নাম 'অভিমান'; ইহার ক্রিয়ার স্থান মস্তিষ্কের অভ্যন্তর ছাড়াইয়া

এই যে গলদেশ ও পৃষ্ঠ দণ্ড দেখিতেছ, ইহা ২৪ খানি অস্থিদ্বারা নির্ম্মিত। ২৪ খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি, গুহ্যদেশ অবধি, ক্রমে একখানির উপর আর এক খানি, তাহার উপর আর এক খানি, এভাবে, গলদেশের শেষস্থান অর্থাৎ মস্তকের খুলি পর্য্যন্ত বিন্যস্ত ও সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। ঐ অস্থিগুলির মধ্য দিয়া বরাবর ছিদ্র আছে, সুতরাং ঐ সকল অস্থিগুলি একত্রিত হইয়া, একটী চোঙ্গের অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। ঐ চোঙ্গের মধ্য দিয়াও মস্তিষ্কীয় পদার্থের কতকাংশ, একটী সর্পাকারে বরাবর বিসর্পিত হইয়া, গুহ্যদেশ পর্য্যন্ত গিয়াছে; এবং স্থানে স্থানে ঐ সকল অস্থির সন্ধি-স্থান-ভেদ করিয়া ঐ অস্থির মধ্যবর্ত্তী—পদার্থের কিছু কিছু অংশ, মেরুদণ্ডের বাহিরে আসিয়া, অনেকগুলি স্নায়ুরূপে পরিণত হইয়াছে; তাহা হইতে আবার অসংখ্য স্নায়ুসমূহের বিস্তৃতি হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত দুই চক্ষুর দিকে দুটি এবং রসনার দিকে কতকগুলি, এইরূপ নানা দ্বার দিয়া অনেক গুলি বড় বড় স্নায়ু বাহির হইয়া, অবশেষে অসংখ্যেয় হইয়া পড়িয়াছে এবং সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া, শরীরটিকে সর্ব্বতোভাবে গাঁথিয়া রাখিয়াছে।

যেরূপ তাড়িত যন্ত্রের মধ্যে, তড়িৎশক্তি প্রকাশিত হইয়া, সেই যন্ত্রসংলগ্ন-ইতস্ততো বিসর্পিত-ধাতুময় তারসমূহের দ্বারা প্রবাহিত হইয়া দিগ্‌দিগন্তে চলিয়া যায়, সেইরূপ, আত্মার শক্তিও প্রথম আত্মাতে পরিস্ফুরিত হইয়া, মস্তিষ্কের অভ্যন্তর প্রদেশে সমালোড়ন পূর্ব্বক, ক্রমে মস্তিষ্ক ছাড়িয়া তৎসংলগ্ন তারসমূহ-স্বরূপ স্নায়ুসমূহ দ্বারা ইতস্ততো বিসর্পিত হইয়া, শরীরের সকল স্থানে গমনাগমন করিয়া থাকে।

শরীরের মধ্যবর্ত্তী ফুস্‌ফুস্‌, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী, ক্ষুদ্র পাকাশয়, যকৃৎ, প্লীহা, মূত্রাশয়, ও মলাশয়াদি যন্ত্রে এবং তৎসংলগ্ন যে সকল মাংসপেশী আছে, আর হস্ত পদাদি অবয়বে যে সকল মাংসপেশী আছে, তাহাদের মধ্যেও ঐ সকল স্নায়ু প্রবেশ করিয়াছে। আত্মার শক্তি ঐ সকল স্নায়ুর দ্বারা প্রবাহিত হইয়া ঐ সকল যন্ত্রও মাংসপেশীর উপরে নিযুক্ত হইয়া ফুস্‌ফুস্‌ হৃৎপিণ্ডাদিযন্ত্র এবং হস্ত পদাদির ক্রিয়া নির্ব্বাহিত করে।

উক্ত স্নায়ু সমূহের মধ্যে স্থানে স্থানে দুটী পাঁচটী বা ততোধিক স্নায়ুর একত্র সম্মিলন হইয়া পরে আবার তাহা হইতে, অনেক গুলি স্নায়ু ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিস্তৃত হইয়াছে।

একটু বাহিরের দিকে, অথচ মস্তিষ্কের মধ্যেই বটে। ঐ অবস্থার বিস্তৃতি হইয়া, যখন ঐ শক্তিটি ক্রিয়া করিতে যত্নবতী হয়, তখন আর এক প্রকার অবস্থা ধারণ করে, সেই অবস্থার নাম 'মন'; ইহার ক্রিয়ার স্থান মস্তিষ্কের শেষ সীমা এবং স্নায়ুর মূল প্রদেশ। তৎপরে ঐ শক্তি আরও বিস্তৃত হইয়া যখন স্নায়ু মণ্ডলে প্রবাহিত হইয়া চলে, তখন আর এক প্রকার অবস্থা

যেখানে স্নায়ুগণের এরূপ সম্মিলন, অগত্যাই সেস্থানটী কিছু মোটা হইয়াছে, স্নায়ুর এইরূপ সম্মিলন স্থানের নাম "স্নায়ুপর্ব্ব"।

প্রত্যেক স্নায়ুপর্ব্বই কিছু পরিমাণে মস্তিষ্কের তুল্য কার্য্য করিতে সমর্থ; কারণ, যে যে উপাদানে মস্তিষ্ক গঠিত, ইহারাও সেই একই পদার্থে গঠিত; অতএব প্রত্যেক স্নায়ুপর্ব্বই আত্মার শক্তিকে গ্রহণ করিয়া, তাহাকে মস্তিষ্কের ন্যায় কার্য্য করাইয়া দিতে পারে। তন্মধ্যে যে স্নায়ুপর্ব্বটী কিছু বড়, সে কিছু বেশি, আর যেটী ক্ষুদ্র, সে অনেক কম পরিমাণে ঐ কার্য্য করিতে পারে। এজন্য প্রত্যেক স্নায়ুপর্ব্বকে আত্মার এক একটী ক্ষুদ্রবাসস্থান বলিলেও বলা যায়। একারণ যে যে যন্ত্রে, আত্মার শক্তি বরাবর না আসিয়া, এক একটী স্নায়ুপর্ব্ব অতিক্রম করিয়া আইসে; সেই সেই যন্ত্রেরই ক্রিয়া, যেন বোধ হয় যে, ঐ সকল স্নায়ু পর্ব্ব হইতেই নিষ্পন্ন হইতেছে, মস্তিষ্কস্থিত আত্মা হইতেই যে শক্তি আসিয়া ঐ ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছে তাহা হঠাৎ অনুভব করা কষ্টকর হয়।

আমাদের হৃদয়উদরাদি গহ্বরে এক একটী বড়মত স্নায়ুপর্ব্ব আছে, সেই স্থান হইতেই আত্মার শক্তি অনুপ্রযুক্ত হইয়া, ফুস্ফুস্, হৃৎপিণ্ডাদির কার্য্য নিষ্পাদন করে, এ নিমিত্ত, হঠাৎ বোধ হয় যেন, ঐস্থান হইতেই ঐসকল ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে। ফলতঃ ওখানেও চেষ্টা করিলে আত্মার অনেক গুলি শক্তির (যে গুলি ঐ স্নায়ুপথে প্রবাহিত হয়, সেই গুলির) অনুভব করা যাইতে পারে। এই নিমিত্ত শাস্ত্রে কখন কখন হৃদয়াদিতেও আত্মার ধ্যান করিতে বলিয়াছেন।

উক্ত স্নায়ুগুলি বিবিধ; দ্বিবিধ স্নায়ু দ্বারাই আত্মার ত্রিবিধশক্তির (জ্ঞানের শক্তি, পরিচালনার শক্তি, এবং শরীর ধারণের শক্তি; অর্থাৎ যাহার দ্বারা শরীরের পুষ্টি হয়, সেই শক্তির) ক্রিয়া হইয়া থাকে। এক জাতীয় স্নায়ুর দ্বারা জ্ঞান ও দেহ ধারণের কার্য্য, আর এক জাতীয় স্নায়ুর দ্বারা পরিচালনা ও দেহ ধারণের কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। এইজন্য প্রথম জাতীয় স্নায়ুকে জ্ঞাপকস্নায়ু আর দ্বিতীয় জাতীয় স্নায়ুকে পরিচালকস্নায়ু বলা যাইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক জ্ঞাপক স্নায়ুতেও অতি সামান্য মাত্রায় পরিচালনার ক্রিয়া হয় এবং পরিচালক স্নায়ুতেও অতি সামান্য মাত্রায় জ্ঞানের ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়।

পরিগ্রহ করে, সেই অবস্থার নাম "ইন্দ্রিয় এবং প্রাণাদি"। ইন্দ্রিয়াবস্থার পরেই শরীরের বহিঃস্তরে অথবা বাহিরের বস্তুর উপরে আত্মার ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়।

শক্তির আধার ভৌতিক পদার্থ নহে, ভৌতিক পদার্থের আধারই শক্তি।

শিষ্য।—আপনি এতকাল যে শক্তি ও আত্মার কথা বলিলেন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমরা বালক-কালাবধি অবগত আছি যে, "শরীরের মধ্যে যে কোন প্রকার ক্রিয়া হইয়া থাকে, তৎসমস্তই স্নায়ু এবং মস্তিষ্কের শক্তি হইতে নিষ্পন্ন। শক্তি কিছু ভৌতিক পদার্থ হইতে বিভিন্ন করার সামগ্রী নয়। মনুষ্যাদির দেহ যেরূপ গৃহাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক যথেচ্ছায় চলিয়া যায়, শক্তি সেইরূপ নহে—শক্তি ভৌতিক পদার্থেরই ধর্ম্ম। ভৌতিকপদার্থমধ্যেই শক্তির উৎপত্তি, আবার ভৌতিকপদার্থ মধ্যেই লয়, যেখানে ভৌতিক পদার্থ, সেই খানেই শক্তি। শক্তি ভৌতিকপদার্থ হইতে পৃথক্ হইয়া স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে পারে না।" কিন্তু আপনি যেন বলিতেছেন যে, শরীরের উপর যে সকল শক্তি কার্য্য করিতেছে তাহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে মস্তিষ্ক ও স্নায়ু প্রভৃতির উপর আধিপত্য করিয়া, নানা দিকে গমনাগমন করিতেছে। আবার এই শক্তিগুলিকে

উক্ত শক্তিত্রয় ঠিক এক জাতীয় পদার্থের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতে পারে না; এনিমিত্ত প্রত্যেক স্নায়ুর মধ্যেই কিছু কিছু বিসদৃশ তিন জাতীয় পদার্থ আছে। এক জাতীয় পদার্থ একটু বেশী শাদা আছে, একজাতীয় পদার্থ শাদার মধ্যেই একটু ঈষৎ ধূসর, আর এক জাতীয় পদার্থ শাদার মধ্যেই একটু ঈষৎ লাল। এই প্রভেদ অতীব দুর্লক্ষ; এ নিমিত্ত নবীনমতে অনেকে উহাতে কেবল শাদা পদার্থই বলিয়া থাকেন। যদিচ উক্ত ত্রিবিধ পদার্থই আছে সত্য, তথাপি তন্মধ্যে যে জাতীয় স্নায়ুতে যে শক্তির প্রবলরূপে প্রবাহ হয়, সেই জাতীয় স্নায়ুর মধ্যে সেই শক্তি প্রবাহের উপযুক্ত পদার্থই বেশী, আর অন্য শক্তি দ্বয়ের প্রবাহক পদার্থ অতি অল্প। এই মাত্র বিশেষ।

প্রকৃত বিষয়ের সুগমতার নিমিত্ত মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর অবস্থাদি অতি সংক্ষেপে কিছু বলিলাম। অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে ইহা সবিস্তারে প্রকাশের ইচ্ছা আছে।

আত্মার শক্তি বলিয়াও অনেকবার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা বুঝিতেছি যে, এই শক্তিগুলি আত্মানামক কোন পদার্থের মধ্যেই আছে। এই রূপ নানা প্রকার অসংলগ্ন কথার দ্বারা আমার দিগ্‌ভ্রম উপস্থিত হইতেছে; অতএব এবিষয়টা বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দেন।

অচার্য্য।—এবিষয়ের সর্ব্বাঙ্গমীমাংসায় দ্বিতীয় একখানি গ্রন্থ হইয়া উঠে, এখন তাহার সময় নয়। তবে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি শুন।—বাস্তবিক, শক্তি কখনও ভৌতিক পদার্থের মধ্যে থাকে না, শক্তিতেই ভৌতিক পদার্থ অবস্থিতি করে — শক্তিই ভৌতিক পদার্থের আলম্বন; ইহাই স্থিরতর সিদ্ধান্ত। একটু চিন্তা করিলেই, ইহা বুঝিতে পারিবে। সূর্য্য, পৃথিবী ও চুম্বকাদি পদার্থে যে আকর্ষণশক্তি জ্ঞাত হওয়া যায়, একটু মনোনিবেশ করিলে প্রমাণ হইবে যে, তাহার কোন আকর্ষণ শক্তিই, সূর্য্য, পৃথিবী বা চুম্বকের মধ্যে নাই, উহা সূর্য্যাদির বাহিরেও আছে, অভ্যন্তরেও আছে। সুতরাং শক্তির মধ্যে বা শক্তির অবলম্বনেই সূর্য্যাদি অবস্থিতি করিতেছে, ইহা বলা যাইতে পারে। যদি সূর্য্যাদির মধ্যেই আকর্ষণ শক্তি থাকিত, তবে পরস্পর দূরবর্ত্তী পৃথিবী চন্দ্রাদি ও চুম্বক লৌহের আকর্ষণ কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারিত না। কারণ, কোন প্রকার শক্তির, কোন বস্তুর উপর, কোন রূপ ক্রিয়া করিতে হইলে, সেই শক্তির সহিত, সেই বস্তুর যোগ হওয়া আবশ্যক, নতুবা তাহার কার্য্য হইতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ স্বীকার্য্য কথা। একটা উদাহরণ লও, তবেই ইহা বুঝিতে পারিবে; মনে কর,—আমার শরীর মধ্যে যদি তোমাকে ধাক্কা দেওয়ার নিমিত্ত একটা শক্তির পরিস্ফুরণ হয়, তবে তোমার শরীরও আমার শরীরের যোগ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, যোগ হইলেই আমার শক্তির সহিত তোমার সম্বন্ধ (যোগ) হইল, তখন তোমার উপর ধাক্কাটী লাগিবে, তুমি সরিয়া পড়িবে; কিন্তু যতক্ষণ তোমার এবং আমার শরীরের সংযোগ না হইবে, ততক্ষণ আমার ধাক্কা দেওয়ার শক্তি, তোমার উপর কার্য্য করিতে পারিবে না।

এখন দেখ, পৃথিবী সূর্য্য অপেক্ষা বহুলক্ষযোজন ব্যবধানে অবস্থিতি করে, চন্দ্র ও পৃথিবী হইতে অনেক দূরবর্ত্তী, চুম্বকলৌহ ও পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ কেন্দ্র হইতে অনেক দূর স্থিত। সুতরাং সূর্য্যাদির আকর্ষণ যদি

সূর্য্যাদিতেই পরিব্যাপ্ত ও অভি সম্বদ্ধ থাকে, তবে সেই আকর্ষণ শক্তির সঙ্গে পৃথিব্যাদির সহিত কোনরূপ সংযোগ হইতেছে না, অতএব সূর্য্য পৃথিবীকে, পৃথিবী চন্দ্রকে এবং উত্তর দক্ষিণ কেন্দ্র চুম্বকলৌহকে কদাচ টানিতে পারে না।

কিন্তু যদি স্বীকার করা যায় যে "আকর্ষণ শক্তিই সকল স্থানে পরিব্যাপ্ত ভাবে রহিয়াছে,—থাকিয়া সৌরপরমাণু গুলিকে একত্র পুঞ্জায়মান করিয়া রাখিয়াছে, পৃথিব্যাদি জড়পিণ্ডগুলিকেও সেই খানেই মিশাইবার চেষ্টা করিতেছে; এবং সেই ব্যাপক আকর্ষণ শক্তিই চুম্বকলৌহকে পৃথিবীর প্রান্তদ্বয়ে মিশানের চেষ্টা করিতেছে" ইহাতে উক্ত দোষ থাকিবে না। কিন্তু ইহা অতি গুরুতর ও শক্ত বিষয়, ইহা উত্তম রূপে বুঝাইতে অনেক কথার আবশ্যক; অতএব এই গুরুতর বিষয়ের বিশেষ উদ্ঘাটন না করিয়া, অন্য প্রকারেও তোমাকে প্রকৃত বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু এই বিষয়টিও যেন মনে থাকে।

দেহের মধ্যে দুই প্রকার শক্তি ক্রিয়া করে।

আমাদিগের দেহের মধ্যে দুই জাতীয় শক্তির ক্রিয়া হইতেছে. তাহার এক জাতীয় শক্তি স্বাভাবিক, অপর জাতীয়টী অস্বাভাবিক। এতদুভয়ের মধ্যে স্বাভাবিক শক্তিটি লইয়া, আমাদের এখানে কোনই কথা নাই, তাহাকে দেহের প্রত্যেক পরমাণুর ধর্ম্ম বলিলেও এখানে বিশেষ কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু অস্বাভাবিক শক্তি লইয়াই কথা, সেইটীকেই আমরা স্বাধীন —স্বতন্ত্র ও দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিতেছি এবং তাহাকেই জীবাত্মার শক্তি বলিয়াছি, স্নায়ু পথে তাহারই গতায়াত হওয়ার কথা বলিতেছি।

শিষ্য। স্বাভাবিক আর অস্বাভাবিক শক্তি বিশেষ করিয়া বলুন।

আচার্য্য। যে শক্তি মৃত্যুর পরেও দেহের উপর ক্রিয়া করে এবং প্রাণি-শরীর ব্যতীত সাধারণ জড়পিণ্ডে ও যাহার ক্রিয়া আছে, তাহা স্বাভাবিক শক্তি, ইহা দেহের শক্তি। আর যে শক্তি মৃত্যুর পরে কার্য্য করে না, প্রাণি-শরীর ব্যতীত অন্য জড়পিণ্ডে যাহার ক্রিয়া নাই, এবং যে শক্তি উক্ত স্বাভাবিক শক্তির উপর আধিপত্য করত, তাহার বিরুদ্ধেও ক্রিয়া করে,

সেই শক্তি অস্বাভাবিক, ইহা দেহের নহে, ইহা স্বতন্ত্র ও পৃথক্; ইহা বিশেষরূপে বুঝান যাইতেছে।

যে যে পদার্থের দ্বারা শরীরের অস্থিসমূহের নির্ম্মাণ হয়, সেই সেই পদার্থের পরস্পরে একটি রাসায়ন আকর্ষণশক্তি আছে, সেই শক্তির দ্বারা ঐ সকল পদার্থ গুলি রাসায়নিকভাবে মিলিত হইয়া, অস্থিগুলি গঠিত হইয়াছে। মৃত্যুর পরেও যখন অস্থিগুলি আস্ত থাকে, তখন এই শক্তিও থাকে, ইহা বলিতে হইবে; নচেৎ মৃত্যুর পর অস্থিগুলিকে আস্ত রাখিবে কে? এই প্রকারের রাসায়ন আকর্ষণ সকলজড়পিণ্ডের মধ্যেই দৃষ্ট হয়, কেবল প্রাণী শরীরে নহে। অতএব এই রাসায়ন শক্তিটি দেহের স্বাভাবিক। এইরূপ মাংস, মজ্জা, স্নায়ু, অন্ত্র, নাড়ী, শিরাদির মধ্যেও রাসায়ন আকর্ষণশক্তি আছে, তাহাও স্বাভাবিক। কারণ, মৃত্যুর পর, বহুদিন না হইলেও, কিছু সময় পর্য্যন্ত মাংস মজ্জাদি দেহাবয়বগুলি আস্ত থাকে। শরীরের প্রত্যেক অবয়বের মধ্যে একপ্রকার অপসারণশক্তিও আছে, সেই শক্তিদ্বারা শরীরের অংশ সকল বাষ্পাদি অপেক্ষাও অতিসূক্ষ্মতায় পরিণত হইয়া, চারি দিকে উড়ীয়া যাইতেছে—তদ্দ্বারা অনবরত শরীরের ক্ষয় হইয়া থাকে; সেইটিও দেহের স্বাভাবিক শক্তি। এইটি 'তাপশক্তি। এই দুই প্রকার স্বাভাবিক শক্তিকে দেহের গুণ বা ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিলেও বিশেষ হানি নাই।

এখন অস্বাভাবিকশক্তির কার্য্যও দেখ।—মনে কর, তোমার শরীরটী যেন শয়িত ও নিদ্রিত ভাবে আছে, কিন্তু নিদ্রিতাবস্থায় থাকিলেও শরীরের রাসায়ন-আকর্ষণ এবং অপসারণ শক্তি (তাপ) এতদুভয়ে অবশ্যই আপন আপন কার্য্য করিতেছে। ইতিমধ্যে যেন তুমি হঠাৎ জাগ্রৎ হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক গৃহের বাহিরে চলিলে; এখন এই যে গাত্রোত্থান হওয়া এবং গৃহের বাহিরে যাওয়া, ইহা অবশ্যই একটি শক্তির কার্য্য; শক্তি ব্যতীত এই জড় দেহকে পরিচালিত করিবে কে? কিন্তু তুমি যখন শয়িত ছিলে, তখন এই শক্তিটা ছিল না, কেন না, তখন এই শক্তিটি থাকিলে তোমার দেহটা শয়িত থাকিতে পারিত না, উহা তখনও উত্থিত ও পরিচালিতই হইত, অতএব এইটি একটি আগন্তুক শক্তি,—কোন্‌খান্ হইতে যেন এক অদৃষ্ট আগন্তুক শক্তি আসিয়া তোমার এই ১॥ মণ ভারী শরীরটাকে ঠেলিয়া

তুলিয়া গৃহের বাহিরে লইয়া চলিল। এই শক্তির নামই অস্বাভাবিক শক্তি। অথবা মনে করিয়া দেখ, তোমার ভৃত্য যখন তোমার প্রতি একটু অসদাচরণ করে, তখন তোমার মধ্যে কিরূপ ঘটনা হয়; তখন তোমার মধ্যে এক অদ্ভুতশক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া, শরীরের মধ্যে একপ্রকার হুলুস্থুল-ব্যাপার করিয়া তোলে। প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু যেমন বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া হেলাইয়া দোলাইয়া একাকার করে, তোমার শরীরের মধ্যেও সেইরূপ এক প্রকার ঘটনা করিতে থাকে। তখন ফুস্ ফুস্, হৃৎপিণ্ডাদি যন্ত্র সকল থর থর ভাবে কাঁপিতে থাকে, রুধিররাশি প্রবল-বেগে প্রবাহিত হয়, এবং প্রত্যেক শরীর যন্ত্রই অতিশয় বেগে নর্ত্তিত হইয়া উঠে। তখন তুমি বজ্রনিনাদে চীৎকার করিতে থাক, ভৃত্যের প্রতিকারের নিমিত্ত কত উল্লম্ফন প্রলম্ফন করিতে থাক, এই শক্তিও তোমার দেহের নহে এবং পূর্ব্বেও ছিল না, ইহা একটী আগন্তুক শক্তি; যে শক্তির দ্বারা এই ঘটনা হয়, ইহাও অস্বাভাবিক শক্তি। ইহা আত্মার পরিচালন শক্তির অন্তর্গত। এইরূপে জ্ঞানের শক্তি ও পোষণের শক্তিও জানিবে। এই সকল শক্তি তোমার দেহের নহে, ইহারা অন্যস্বাধীন শক্তি; ইহারা সর্ব্বদা তোমার দৈহিক শক্তির বিরুদ্ধ আচরণ করত দেহটাকে উলট্‌পালট্ করি-তেছে। অথচ উষাকালের অন্ধকার মধ্যে সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায়, অথবা ঘোর অরণ্য মধ্যে প্রসুপ্তসিংহের ন্যায় তোমার মস্তিষ্ক মধ্যেই অবস্থিতি করিতেছে। ইহারা চেষ্টা করিলে তোমার দেহ ছাড়িয়া বাহির হইতেও পারে, আবার প্রবেশেও সক্ষম।

অস্বাভাবিক শক্তি দেহের ধর্ম্ম নহে কিন্তু স্বতন্ত্র ও স্বাধীন।

শিষ্য। উহাকেও দেহের শক্তি বলিলে বাধা কি?

আচার্য্য। দেহের শক্তির বিরুদ্ধে কার্য্য করে বলিয়াই, উহা দেহের শক্তি নহে। দ্বিতীয়তঃ—এই সকল শক্তি যদি দেহের ধর্ম্ম হইত, তবে অস্থি মজ্জাদির পূর্ব্বোক্ত রাসায়নিক আকর্ষণ শক্তি ও অপসারণ শক্তির ন্যায় সর্ব্বদাই দেহের মধ্যে বিদ্যমান থাকিত; ক্ষণে-ক্ষণে প্রাদুর্ভূত ও ক্ষণে-ক্ষণে

তিরোহিত হইত না। তৃতীয়তঃ—দেহের বস্ত্র হইলে, এই শক্তির উৎপত্তিই আদৌ হইতে পারে না। ইহা বিস্তারপূর্ব্বক বলা যাইতেছে, কিন্তু এ কথাটি বুঝা বোধ হয় কিছু শক্ত হবে।

মনে কর, তুমি যখন নিদ্রিত হইয়া থাক; তখন অবশ্যই তোমার মস্তিষ্ক অবধি সমস্ত যন্ত্রগুলি প্রায় নিস্তব্ধ হয়। তৎপর যখন হঠাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক চলিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন এই দেড় মণ ভারী শরীরটি অনায়াসে চলিয়া যাইতে থাকে। এখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে, দেড় মণ ভারী এক খানি প্রস্তর খণ্ড টানিয়া নীতে যে পরিমাণ শক্তির আবশ্যক, তোমার শরীরের মধ্যেও প্রায় সেই পরিমাণ একটি শক্তির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এখন এই প্রবল শক্তিটী, তোমার দেহের কোন্ স্থান হইতে আসিল? শয্যায় শয়িত থাকিতে থাকিতে আপনি আপনিই মস্তিষ্ক বা স্নায়ু বা মাংসপেশীর মধ্যে ঐ শক্তির স্ফুরণ হইল, কি? না, একথা বলা যায় না। কারণ কোন শক্তিই আপনি২ পবিস্ফুরিত হয় না; একটী শক্তির দ্বারাই অপর একটী শক্তির বিকাশ হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত সিদ্ধান্ত। কিন্তু তোমার দেহ যখন শয়িত ভাবে ছিল, তখন তাহাতে এমত কোন প্রবল শক্তি দেখা যায় নাই। যে, শক্তির দ্বারা তোমার ঐ শক্তির উদ্দীপনা হইবে। মস্তিষ্কাদির মধ্যে ঐ শক্তি বীজভাবে ছিল, তৎপরে বিকাশিত হইল, তাহাও বলা যায় না। কারণ, বীজভাবে থাকিলেও তাহার স্ফুরণের নিমিত্ত, যে পরিমাণে তাহার স্ফুরণ হইবে, সেই পরিমাণ, আর একটী পরিস্ফুরক শক্তি চাই, নচেৎ উহার স্ফুরণ হইতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। কিন্তু সুপ্তদেহের মধ্যে সেই শক্তি কোথা?

অতি সামান্য একটু তাপ-শক্তির সংযোগে যেরূপ বারুদের মধ্যে প্রচণ্ড শক্তির উদ্দীপনা হয়, সেইরূপ শরীরের মধ্যেই কোন না কোন এক অংশের অতি সামান্য একটু শক্তির যোগ হইয়া, শরীরে এই প্রবল শক্তির উদ্দীপনা হয়, ইহাও বলা যায় না। কারণ সামান্য কোন একটী দ্রব্য বা শক্তির যোগে, যে অনেক প্রকার প্রবলতর ও নূতন রকম শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহা রাসায়নিক সংযোগজনিত রাসায়নিক-শক্তি। রাসায়ন সংযোগ ও রাসায়ন শক্তির উৎপত্তির দ্বারা, সেই দ্রব্যের পূর্ব্বাবস্থা বিনষ্ট হইয়া

নূতন আর এক রূপ অবস্থা, আকৃতি ও নাম হইয়া থাকে। অগ্নিসংযোগে বারুদের বিস্তৃতি এবং অন্ন হইতে মদ হওয়া ইত্যাদিস্থলে, সেই রাসায়নিক সংযোগ ও রাসায়ন শক্তি হইয়া থাকে এবং তাদৃশ বিকৃতিও পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু যে শক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া তোমার নিদ্রিত জড় দেহকে উত্থাপনপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া যায়, সেই শক্তি রাসায়নিক নয়। কারণ সেই শক্তির স্ফুরণ হইলে তোমার মস্তিষ্ক ও স্নায়ু প্রভৃতি অবয়ব গুলি মস্তিষ্কীয় ও স্নায়বীয় অবস্থাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক নূতন অভূতপূর্ব্ব কোনরূপ অবস্থা গ্রহণ করে না, শরীর গিয়া সোণা হয় না। দ্বিতীয়তঃ—শয্যা হইতে উঠিবার সময়, তোমার দেহের মধ্যে এমন কোন নূতন দ্রব্যের সংযোগও দৃষ্ট হয় না, যাহার রাসায়ন সংযোগে তোমার এই শক্তি প্রাদুর্ভূত হইতে পারে। তোমার নিদ্রাবস্থায়ও দেহের মধ্যে যে যে দ্রব্য ছিল এবং যাহাদের সহিত যোগ ছিল, জাগ্রৎ হইয়া উত্থানের কালেও তাহাই আছে, অতএব রাসায়ন সংযোগের দ্বারা যে শক্তির উৎপত্তি করিয়া তুমি উঠিতে চাও; সেই শক্তি তোমার উঠিবার পূর্ব্বেও সেই একই ভাবে থাকিতে পারে; সুতরাং উঠিবার পূর্ব্বেও তোমার উঠিয়া থাকা উচিত। অতএব ঐ সকল শক্তিকে দেহের শক্তি বলা যায় না।

কিন্তু ঐ সকল শক্তিকে দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ও স্বাধীন বলিলে, উক্ত কোন দোষই থাকে না। ইহার বিবরণ শুন। যে সকল অস্বাভাবিক শক্তি দেহের উপর আধিপত্য করিয়া ঝঞ্ঝা বায়ুর ন্যায় দেহকে উলট্ পালট্ করত অনবরত নানা প্রকার কার্য্যসাধন করিতেছে, তাহারা তিন জাতীয়। তাহার এক জাতীয় শক্তির গতি ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনী, যাহার কার্য্য—জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি, ও অন্যান্য ধর্ম্মসমূহ। আর এক জাতীয় শক্তির গতি অধঃস্রোতস্বিনী; ফুস্ফুস্, হৃৎপিণ্ড ও হস্ত পদাদি প্রত্যেক শরীরাবয়বে সর্ব্বদাই যাহার কার্য্য হইতেছে এবং কখন বা ক্রোধ কখনও কাম ইত্যাদি নানাপ্রকারে যাহার পরিস্ফুরণ হইতেছে। আর এক জাতীয় শক্তি উপষ্টম্ভক। এই শক্তির ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনী বা অধঃস্রোতস্বিনী কোন প্রকার গতিই নাই। এই শক্তির কার্য্য কেবল উক্ত উভয় প্রকার শক্তিকে স্তম্ভিত করা। এই শক্তির প্রবলতাবস্থায় মূর্চ্ছা প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

বলা বাহুল্য যে, উক্ত শক্তিত্রয়ের প্রথমটি জ্ঞানশক্তি, দ্বিতীয়টি পরিচালন-শক্তি, আর তৃতীয়টি পোষণশক্তি। উক্ত শক্তিত্রয় যথাক্রমে সাত্ত্বিক, রাজসিক, ও তামসিক নামে খ্যাত। এই শক্তি ত্রয়ের তিনটিই অথবা দুটি, ঠিক এক সময়ে প্রবল ভাবে স্ফুরিত হইতে পারে না, ইহারা এক সময়েতে এক একটি মাত্র প্রবল থাকে, আর দুটি দুর্ব্বল বা 'সংস্কার' (১০ পৃ ৮ পং) অবস্থায় থাকে। যখন ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনী শক্তি প্রবলা থাকে তখন অধঃস্রোতস্বিনী এবং উপষ্টম্ভক-শক্তি সংস্কারা-বস্থায় থাকে, যখন অধঃস্রোতস্বিনী শক্তি প্রবলা হয়, তখন ঊর্দ্ধ-স্রোতস্বিনী আর উপষ্টম্ভক শক্তি সংসারাবস্থায় থাকে, আবার যখন উপষ্টম্ভক শক্তি প্রবলা হইয়া উঠে তখন ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনী আর অধঃস্রোতস্বিনী এতদুভয়ই সংস্কারাবস্থায় থাকে। এই সময়ে নিদ্রা হয়। কিন্তু সংস্কারাবস্থা বা দুর্ব্বলতাবস্থায় থাকিলেও তাহার পুনরুত্থানের চেষ্টা বিলক্ষণ থাকে, এবং সময়ক্রমে নিযুদ্ধশীল মল্লদ্বয়ের ন্যায় পুনরুদ্দীপ্ত হয়। অর্থাৎ দুজন মল্ল কুস্তি করিতে করিতে যেরূপ একজন নীচস্থ ও অপর জন উপরিস্থ হইয়া, কিছুকাল পরে আবার ঐ নীচস্থ মল্ল উপরিস্থ মল্লকে পরাভব পূর্ব্বক আপনিই ঠেলিয়া উঠে, সেইরূপ ঐ সংস্কারাবস্থাপন্নশক্তিও আবার আপনিই উত্তেজিত হইয়া উঠে। তখন জাগ্রৎ অবস্থা এবং অন্যান্য ক্রিয়া হইতে থাকে। অতএব সমস্ত আপত্তিই মীমাংসিত হইল।

শিষ্য। মস্তিষ্কের শক্তিই ঐরূপ সংস্কারাবস্থায় থাকিয়া, এক এক বার উত্থিত হইয়া কার্য্য করে ইহা বলিলে হানি কি?

আচার্য্য। রাসায়নিক শক্তির সংস্কারাবস্থা থাকে না। উহার স্ফুরণ হইলে, কার্য্যের শেষ করিয়া নিজেও চিরদিনের মত বিলীন হইয়া যায়। মদের শক্তি অথবা বারুদের বিস্তৃতিশক্তি প্রকাশিত হইয়া, একবার বিলীন হইলে পুনর্ব্বার কখনও উত্থিত হয় না, ঐ একবারেই শেষ। অতএব তাহা বলা যায় না।

এরূপ আরও শত শত কারণ আছে যদ্দ্বারা প্রমাণীকৃত হইবে যে, উক্ত শক্তিগুলি দেহের নহে, উহা দেহ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পৃথক্। কিন্তু এ গ্রন্থ দর্শনশাস্ত্র নহে, সুতরাং ইহাতে এ বিষয় আর বিস্তার করা যায় না।

ফলতঃ কেবল বাহিরের তর্কই আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রমাণ নহে, যোগাবস্থায় হইলে যে, অন্তরে অন্তরে অনুভব বা মানসিক প্রত্যক্ষ হয়, ইহার মুখ্যতম প্রমাণ। এই স্থূলদেহ যেরূপ গৃহাদির মধ্যে পৃথক্‌ভাবে বিচরণ করিয়া বেড়ায়, জীবও তেমনি এই দেহের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে, ইহা যোগাবস্থায় মনে মনে প্রত্যক্ষ করা যায়। যদি তাহা বিশ্বাস না হয়, তবে আপাততঃ বরং ধরিয়াই লও যে, ঐ শক্তি গুলি স্থূলদেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ও স্বতন্ত্র।

জীবাত্মার সঙ্ক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।

উক্ত শক্তিসমূহ, আর এই দেহের মধ্যে যে সর্ব্বদাই তুমি চৈতন্যের অনুভব করিতেছ,—যে চৈতন্য তোমার সমস্ত শক্তি ও দেহের মধ্যে মাখামাখি হইয়া আছেন,—সেই চৈতন্য, এতদুভয় একত্রিত ভাবে "জীবাত্মা" বলিয়া কথিত হয়েন। আমরা অন্তরে অন্তরে 'আমি' বলিয়া যাঁহাকে সর্ব্বদা অনুভব করি, তিনি এই জীবাত্মা। (আমরা যতবার আত্মার শক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এই আত্মাকেই লক্ষ্য করিয়া।) মেঘোৎপন্ন তড়িৎ যেমন বায়ু মধ্যে বিচরণ করে, যন্ত্রোৎপন্নতড়িৎশক্তি যেমন যন্ত্রের তার স্পর্শ করিলে, শরীরের মধ্যে বিচরণ করে, এই শক্তিও চৈতন্যময়জীবও তেমন, এই জড়পিণ্ড-দেহের মধ্যে সম্পূর্ণ পৃথক্ ও স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতেছে। কিন্তু তড়িৎ যেমন মেঘাদিরই শক্তি, জীব তেমন দেহের শক্তি নহে, উহা দেহ থাকিলেও থাকে, না থাকিলেও থাকে। বুদ্ধি, মন, অভিমান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, চেষ্টা, ক্ষমা, ঘৃণা, চিন্তা, জ্ঞান, দয়া প্রভৃতি সমস্তই ঐ জীব শক্তির রূপান্তর মাত্র;—তাহা পরে বলিব; জীবাত্মার বিষয়ও দ্বিতীয় পর্ব্বে বাচনিক প্রমাণাদির সহিত বিশেষরূপে বুঝান হইবে।

আত্মার শক্তির অবস্থা ও ক্রিয়া প্রণালী এক রূপ সংক্ষেপে বলিলাম। এখন প্রস্তাবিত (৬৮ পৃঃ) ইন্দ্রিয়ও প্রাণাদিবিরোধ কাহাকে বলে তদ্বিষয় বলিতেছি শুন।

ইন্দ্রিয় নিরোধাদির লক্ষণ।

আত্মার সমস্ত শক্তিকেই স্নায়ু-মণ্ডলের দ্বারা সমস্ত শরীর পরিব্যাপ্ত হইতে না দিয়া, কেবল মস্তিষ্কের শেষসীমাও স্নায়ুর মূলপ্রদেশে মনের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া, রাখার নাম 'ইন্দ্রিয়-প্রাণনিরোধ'। আত্মার শক্তিকে ঐ মনের স্থান পর্য্যন্ত আসিতে না দিয়া, মস্তিষ্কের মধ্যে অভিমানে আবদ্ধ (সংযত) রাখার নাম "মানসনিরোধ।" এবং অভিমানের স্থান পর্য্যন্ত আসিতে না দিয়া, মস্তিষ্কের অভ্যন্তর প্রদেশে বুদ্ধিতে সংযত রাখার নাম 'অভিমাননিরোধ'। আর আহাদের প্রথম পরিস্ফুরণ হইতেও নিরুদ্ধ রাখার নাম 'বুদ্ধি নিরোধ।' এবং স্ফুরণের উদ্যম হইতেও সংযত করিয়া রাখা 'প্রকৃতিনিরোধ।"

ইন্দ্রিয় ও প্রাণ নিরোধের বিভাগ।

উক্ত পাঁচ প্রকার নিরোধের প্রত্যেকটিরই বহুবিধ বিভাগ আছে। তন্মধ্যে 'ইন্দ্রিয় ও প্রাণ-নিরোধ' প্রথমতঃ পঞ্চদশ ভাগে বিভক্ত। নয়ন-নিরোধ, শ্রবণ-নিরোধ, রসনা-নিরোধ, নাসিকা-নিরোধ, ত্বঙ্-নিরোধ; বাঙ্-নিরোধ, হস্ত-নিরোধ, চরণ-নিরোধ, পায়ু-নিরোধ, উপস্থ-নিরোধ; প্রাণ-নিরোধ, অপান-নিরোধ, ব্যান-নিরোধ, সমান-নিরোধ, এবং উদান নিরোধ।

নয়নেন্দ্রিয়ের নিরোধকে 'নয়ন নিরোধ' বলে, এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের নিরোধ 'শ্রবণ-নিরোধ', রসনেন্দ্রিয়ের নিরোধ 'রসনা-নিরোধ', নাসিকেন্দ্রিয়ের নিরোধ "নাসিকা নিরোধ", স্পর্শেন্দ্রিয়ের নিরোধ 'ত্বঙ্নিরোধ', বাগিন্দ্রিয়ের নিরোধ 'বাঙ্নিরোধ', হস্তেন্দ্রিয়ের নিরোধ—অর্থাৎ কোন বস্তু গ্রহণাদির নিমিত্ত যে হস্তের স্নায়ুর দ্বারা আত্মার শক্তি আসিয়া থাকে, সেই শক্তির নিরোধ, 'হস্ত-নিরোধ' চরণেন্দ্রিয়ের নিরোধ—অর্থাৎ গমনা-গমনাদির নিমিত্ত যে পদদ্বয়ের স্নায়ুর দ্বারা আত্মার শক্তি প্রবাহিত হয়, তাহার নিরোধ 'চরণ নিরোধ', পায়ু ইন্দ্রিয়ের নিরোধ,—আত্মার যে শক্তি মলাশয় ও মূত্রাশয়ের উপর প্রেরিত হইয়া, মল ও মূত্র বিসর্জ্জন করায়, তাহার নিরোধ 'পায়ু-নিরোধ', উপস্থেন্দ্রিয়,—যে শক্তি প্রেরিত

হইয়া আত্মার কাম প্রবৃত্তিরকার্য্য চরিতার্থ করে,—তাহার নিরোধ 'উপস্থ নিরোধ', প্রাণ,—যে শক্তির দ্বারা ফুস্‌ফুস্‌, হৃৎপিণ্ড ও তৎসংলগ্ন-মাংস-পেষীরক্রিয়া হইয়া, শ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে সেই শক্তি, তাহার নিরোধ 'প্রাণ-নিরোধ', অপান—যে শক্তি দ্বারা আমাদের উদরস্থ ভুক্ত পীত বস্তুর বিষাংশটা ঘর্ম্মাদি আকারে পরিত্যক্ত হইতেছে সেই শক্তি,—(নাভি অবধি ইহার কার্য্য অধিক) তাহার নিরোধ 'অপান নিরোধ', সমান,—যে শক্তি দ্বারা পাকস্থলী, ক্ষুদ্রপকস্থলী, যকৃৎ, প্লীহাদিযন্ত্র ও তৎসংলগ্নপেষীসমূহের ক্রিয়া নিষ্পাদিত হয় সেই শক্তি, এই শক্তির নিরোধ 'সমান নিরোধ', ব্যান,—যে শক্তির দ্বারা সর্ব্বাঙ্গের মাংসপেষীর ক্রিয়া হইতেছে সেই শক্তি,—তাহার নিরোধ 'ব্যান নিরোধ', এবং উদান,—আত্মার উৎক্রমণের শক্তি, তাহার নিরোধ' 'উদান নিরোধ' বলা যায়। এতদ্ব্যতীতও অনেক প্রকার ইন্দ্রিয় প্রাণাদির নিরোধ আছে এবং ইহার অন্তর্গত ও অপরিসংখ্যেয় প্রকার "ইন্দ্রিয়-প্রাণ নিরোধ" আছে, কিন্তু তাহা অতীব সূক্ষ্ম, অতীব দুর্গম, এ নিমিত্ত তাহার অবতারণা করা গেল না। যে কএকটি নির্দ্দিষ্ট হইল, ইহাদের সাধন হইলে অন্যগুলি আপনিই সাধিত হয়. সুতরাং তদ্বিবরণের প্রয়োজনও নাই।

উক্ত নয়ন নিরোধাদি পঞ্চদশ প্রকার নিরোধের প্রত্যেকটিই মৃদু, মধ্যম ও তীব্রভেদে তিন প্রকারে বিভক্ত; যথা—'মৃদু নয়ন নিরোধ', 'মধ্যম নয়ন নিরোধ', 'তীব্র নয়ন নিরোধ'। এবং 'মৃদু শ্রবণ নিরোধ,' 'মধ্যম শ্রবণ নিরোধ,' তীব্র শ্রবণ নিরোধ'। এইরূপ 'মৃদু রসনা নিরোধ', 'মধ্যম রসনা নিরোধ,' 'তীব্র রসনা নিরোধ' ইত্যাদি জানিবে।

আমাদের যে শক্তি চাক্ষুষ স্নায়ুর দ্বারা চক্ষু পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া সর্ব্বদা দর্শন কার্য্যের নিমিত্ত লালায়িত, সেই শক্তিকে চাক্ষুষস্নায়ুতে আসিতে না দিয়া, চাক্ষুষস্নায়ুর মূলপ্রদেশে সুদৃঢ়রূপে সংযত করাকে 'তীব্র নয়ন নিরোধ' বলা যায়। আর ঐ শক্তি স্বভাবতঃ যে বেগে আইসে, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র সংযম করার নাম 'মৃদুনয়ন নিরোধ' এবং এতদুভয়বিধ সংযমের মধ্যম অবস্থায় সংযমকে 'মধ্যমনয়ন নিরোধ' বলে।

এইরূপ শ্রাবণিক শক্তিকে পূর্ণমাত্রায় সংযত করার নাম 'তীব্রশ্রবণ'

নিরোধ,' অত্যন্ন সংযমে 'মৃদুশ্রবণ নিরোধ,' এবং উভয়ের মধ্যম অবস্থায় 'মধ্যমশ্রবণ নিরোধ'। এইরূপ "রসনা নিরোধ" এবং অন্যান্য নিরোধ সম্বন্ধেও জানিবে।

মানসাদি নিরোধের বিবরণ।

দেহের উপর আত্মার যে যে শক্তি কার্য্য করিতেছে, তাহার প্রত্যেকটিই যখন আত্মায় উৎপন্ন হইয়া, প্রথমে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে, তৎপর মধ্যে, তৎপর মস্তিষ্কের শেষ সীমায়, এবং তদনন্তর স্নায়ুমধ্যে প্রবাহিত হইতেছে, সুতরাং প্রত্যেক শক্তিই যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধি অভিমান ও মনের অবস্থা গ্রহণ করিয়া অবশেষে ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়ারূপে পরিণত হইতেছে, তখন তাহাদের ক্রিয়া অবস্থায়, অথবা ইন্দ্রিয় প্রাণাদিঅবস্থায়ও যত বিভাগ, যত সংখ্যা হইবে, মনের অবস্থায়ও তত বিভাগ, তত সংখ্যা হইবে, অভিমানের অবস্থায়ও তত বিভাগ, তত সংখ্যা হইবে, এবং বুদ্ধির অবস্থায়ও তত বিভাগ, তত সংখ্যা হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। সেতারের তারগুলি যেরূপ যেখান হইতে বাহির হইয়াছে, আর যে কাণ গুলিতে গিয়া শেষ হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের একই সংখ্যা একই বিভাগ থাকে; প্রতি ঘাটে-ঘাটে তারের সংখ্যার ইতরবিশেষ হয় না; ইহাও সেইরূপই জানিবে। অতএব, স্নায়ুর উপরে নয়নেন্দ্রিয়াদিরূপে যে ১৫ প্রকার শক্তি বিচরণ করে তাহা লইয়া, 'ইন্দ্রিয়প্রাণনিরোধ" যেরূপ পঞ্চদশ প্রকার, 'মানসনিরোধ' "অভিমাননিরোধ" 'বুদ্ধিনিরোধ', ও প্রকৃতিনিরোধ' ও সেইরূপ পনের২ প্রকার বলিয়া জানিতে হইবে; কিন্তু বিস্তারভয়ে তাহার প্রত্যেকের নামাদি বলিলাম না, তবে কেবল ভাবটি মাত্র যাহাতে সংগ্রহ করিতে পার, তাহা বলিতেছি,—দর্শনকার্য্যের নিমিত্ত যখন আত্মা হইতে শক্তি প্রসারিত হইয়া আসিতে থাকে, তখন ঐ শক্তিকে মনের স্থানে মনের অবস্থায় আসিতে না দিয়া, মস্তিষ্কের মধ্যে অভিমানে সংযত করা এক প্রকার, মানস নিরোধ; ঐরূপ শব্দ শ্রবণের নিমিত্ত যে শক্তি আইসে, তাহাকে অভিমানে সংযত করা আর এক প্রকার, 'মানসনিরোধ' এবং রস গ্রহণের নিমিত্ত

যে শক্তি আছে, তাহাকে অভিমানে সংযত করা, আর এক প্রকার, 'মানসনিরোধ' এইরূপে পঞ্চদশ প্রকার মানসনিরোধ। ঐ সকল শক্তিকে অভিমানের স্থানে, অভিমানের অবস্থায় আসিতে না দিয়া বুদ্ধিতে সংযত রাখার দ্বারায় অভিমান নিরোধও পঞ্চদশ প্রকার। এইরূপ'বুদ্ধি নিরোধ' পঞ্চদশ এবং প্রকৃতিনিরোধও পঞ্চদশ।

মানসাদি নিরোধেরও প্রত্যেকটি মৃদু, মধ্যম, তীব্র এই রূপ তিন প্রকার বিভাগাপন্ন,—যখন একবারে সম্পূর্ণ সংযম করা হয়, তখন 'তীব্র,' অতি-সামান্য মাত্রায় সংযম করা 'মৃদু' এবং তন্মধ্যবর্ত্তীসংযম 'মধ্যম'। ইন্দ্রিয়-নিরোধ' অবাধ পঞ্চপ্রকার নিরোধের মধ্যে ইন্দ্রিয়নিরোধ সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট তৎপর মানস-নিরোধ উৎকৃষ্ট, তৎপর অভিমান-নিরোধ, তৎপর বুদ্ধি নিরোধ, সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রকৃতি-নিরোধ। কিন্তু সাধনকালে ইন্দ্রিয় নিরোধাদিক্রমেই ইহাদিগের আয়ত্ততাও বিকাশ হইয়া থাকে। প্রথমে ইন্দ্রিয় প্রাণ নিরোধ সাধন করিতে হয়, তৎপর মানস অনিরোধ, তৎপর অভিমাননিরোধ, তৎপর বুদ্ধিনিরোধ, তৎপর প্রকৃতিনিরোধ। যথা "যচ্ছেদ্বাঙ্‌মনসি প্রাজ্ঞস্তদ্‌ যচ্ছেজ্‌জ্ঞান আত্মনি। জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তদ্‌ যচ্ছেচ্ছান্তআত্মনি। (কঠোপনিষদ্‌) পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটি প্রাণকে (ক) মনোমধ্যে সংযত করিতে হয়, পরে মনকে অভিমানে সংযত করিবে, অভিমানকে বুদ্ধিতে সংযত করিবে, এবং বুদ্ধিকে প্রকৃতিতে সংযত করিবে।

নিরোধ বিষয় আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই। এখন নিরোধ হইতে সমুৎপন্নধর্ম্মের বিবরণ শুন।

ধর্ম্মের বিবরণ।

যেরূপ নিরোধশক্তির নানা প্রকার বিভাগ, সেইরূপ আত্মজ্ঞান, ভগবদ্ভক্তি, বৈরাগ্য, ঔদাসীন্য ও ধৃতি, ক্ষমা প্রভৃতি এবং যাগদানাদি-জনিত-অপূর্ব্বনামক ধর্ম্মের ও প্রত্যেকটি অনেক প্রকারে বিভক্ত। সেই বিভাগ বিশেষরূপ না জানিলে, নিরোধ শক্তি হইতে কি প্রকারে ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, তাহা বুঝা অতি কষ্টকর। অতএব তাহার বিভাগ করা যাইতেছে।

আত্মজ্ঞানের বিভাগ।

সর্ব্ব প্রথমে আত্মজ্ঞাননামক পরম-ধর্ম্মের বিভাগাদি শুন (ক)। এখানে আত্মার অর্থ;—সুখ, দুঃখ, দয়াদি-সমস্ত-গুণ ও সমস্ত ক্রিয়া-রহিত নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত-স্বভাব, অখণ্ড, অদ্বিতীয়, কেবলমাত্র-চৈতন্য-স্বরূপ আত্মা বুঝিতে হইবে। আর জ্ঞান বলিতে, আনুমানিক জ্ঞান বা শুনা জ্ঞান নহে, কিন্তু মানসিক-প্রত্যক্ষ (মনে-মনে উপলব্ধি) বুঝিতে হইবে। ইহারই নাম 'ব্রহ্মানুভব' বা 'ব্রহ্মজ্ঞান', ব্রহ্মজ্ঞানেরই বিভাগাদি প্রদর্শিত হইবে। আত্ম-জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের বিভাগ জানিবার পূর্ব্বে "আত্মজ্ঞান নামে একটি কিছু আছে" এরূপ বিশ্বাস থাকা চাই, কিন্তু তাহাতেই বিশেষ সংশয় আছে; কারণ শাস্ত্র, যুক্তি, এবং তর্কাদির অনুসরণ করিলে দেখা যায় যে, আত্মার 'মানসিক-প্রত্যক্ষ', বা 'উপলব্ধি' বা আত্মজ্ঞান এরূপ কথা গুলি নিতান্তই অসম্ভবপর ও অসংলগ্ন। কারণ, যে ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতির দ্বারা আত্মা বা ব্রহ্মজ্ঞানের আশা করা যায়, তাহারা স্বয়ং অন্ধকারময় অপ্রকাশ-স্বভাব জড়পদার্থ (খ); সুতরাং তাহাদের দ্বারা আত্মার জ্ঞান হওয়া সম্ভবে না; যাহার নিজের প্রকাশ নাই, যে নিজে অন্ধকারময়, সে, কিপ্রকারে অন্যকে প্রকাশিত করিবে? অঙ্গার রাশি কখনও অন্যকে প্রকাশ করিতে পারে না। তবে যে, ইন্দ্রিয় ও মন আদির দ্বারা বাহিরের বিষয়ের জ্ঞান বা প্রকাশ হইতে দৃষ্ট হয়, তাহা ইহাদের নিজ হইতে নহে, তাহাও সেই আত্মা বা চৈতন্যেরই সাহায্য লইয়া। ইন্দ্রি-য়াদি জড়পদার্থ গুলি অগ্নি সংযুক্ত অঙ্গারের ন্যায়, স্বপ্রকাশ-স্বরূপ চৈতন্যের সহিত মাখা-মাখি ভাবে সম্মিলিত হইয়া, বাহ্য বস্তুর প্রকাশ করিয়া থাকে, চৈতন্যযুক্ত না হইয়া, উহারা কোন বিষয়েরই উপলব্ধি জন্মাইতে পারে না। এমন কি, চৈতন্যের সাহায্য ব্যতীত, ইন্দ্রিয়াদির আপনাপন স্বরূপেরও

(ক) আত্মজ্ঞানের শক্তি, আর আত্মজ্ঞান একই পদার্থ, অতএব আত্মজ্ঞানের বিভাগ হইলেই আত্মজ্ঞানের শক্তির বিভাগ করা হয়।

(খ) জড় শব্দে এখানে ইংরাজি-জড় বুঝিবেন না। যাহা স্বয়ংপ্রকাশ বা চৈতন্ত পদার্থ নয়, তাহাকেই আর্য্যেরা জড় পদার্থ বলেন। ইহাতে শক্তি ও ভৌতিক পদার্থ প্রভৃতি সমস্তই জড় পদার্থের অন্তর্ভূত।

প্রকাশ বা উপলব্ধি হয় না। সুতরাং সেই চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে তাদৃশ ইন্দ্রিয় বা মনের দ্বারা অনুভব করার কথাকে, এক প্রকার উন্মত্ত-বাক্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এ জন্যই শ্রুতি বলিতেছেন,—"বিজ্ঞাতার-মরে! কেন বিজানীয়াৎ ?" "যাঁহার দ্বারা নিখিল বিষয়ের জ্ঞানকার্য্যনিষ্পন্ন হইতেছে' তাঁহাকে আবার কিসের দ্বারা জানা যায় ?" এবং "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা। অস্তীতিব্রুবতোঽন্যত্র কথন্তদুপলভ্যতে ?" (কঠ) "পরমাত্মা বাক্য প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় কিম্বা চক্ষুরাদি-জ্ঞানেন্দ্রিয়, অথবা মন, বুদ্ধি-প্রভৃতির দ্বারা প্রাপ্ত হইতে পারেন না। সুতরাং কেবলমাত্র 'তিনি আছেন' একথা বলা ব্যতীত আর কিরূপে তাঁহাকে অনুভব করা যায় ?" এবং "ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি নবাগ্‌গচ্ছতি নো মনো নবিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ। অন্যদেব-তদ্বিদিতাদথোঽবিদিতাদধি। ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে।" (তলবকারশ্রুতি) "সেখানে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় বা মন, বুদ্ধি প্রভৃতি কেহই যাইতে পারে না; সুতরাং তাঁহার জ্ঞান হওয়া অসম্ভব; অতএব, নাম-গোত্রাদির-দ্বারা নির্দ্দেশপূর্ব্বক কিরূপে তাঁহাকে উপদেশ করা যায়, তাহা জানি না। তিনি ইন্দ্রিয় ও মন আদির বিষয়ীভূত ও অবিষয়ীভূত যাবত্ত স্থূল, সূক্ষ্ম, জড় পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ।" এরূপ আরও শত শত স্থানে লিখিত আছে, যাহা আমরা ভবিষ্যতে নানাপ্রকার প্রমাণ ও যুক্ত্যাদির সহিত অতিবিস্তারে ব্যাখ্যা করিব। অতএব "আত্মজ্ঞান" এ কথাটিই অমূলক বলা যায়।

কিন্তু তথাপি, যাহা কোন প্রকারে অনুভব করা যায় না, তাহা প্রমাণ করাও অসম্ভব; অতএব আত্মার নাস্তিত্বই আসিয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ— "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" (যজুর্ব্বেদ পুরুষসূঃ) "আত্মাকে অনুভব করিলেই, মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে, তদ্ব্যতীত মৃত্যু অতিক্রমের আর পন্থানাই" "মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহনা-নাস্তি কিঞ্চন" (কঠশ্রুতি) "মনের দ্বারাই জানা যায় যে, এই অনন্তজগতে সেই অদ্বিতীয় চৈতন্য পদার্থ ব্যতীত আর কিছুই নাই" "জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তম্ পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ' (শ্রুতি) "জ্ঞান প্রসাদ-

দ্বারা বিশুদ্ধবুদ্ধি হইলে ধ্যানের দ্বারা সেই পরমাত্মাকে দেখিতে পায়'। ইত্যাদি শত ২ শ্রুতি প্রমাণ থাকায় "আত্মজ্ঞান" অমূলক কথাও বলা যায় না।

এখন বড় বিষম সমস্যা উপস্থিত। শত২-শ্রুতি "আত্মার জ্ঞান হয় না" এইরূপ বলিতেছেন, আবার শত২ শ্রুতি আত্মার জ্ঞান বিষয়েও উপদেশ দিতেছেন। কেবল শ্রুতি কেন, দর্শন, সূত্র, সংহিতা, পুরাণ, ইতিহাস, তন্ত্রপ্রভৃতি সমস্তআর্য্যশাস্ত্রই সেই এক মাত্র আত্মজ্ঞানকে কেন্দ্রস্বরূপে লক্ষ্য করিয়া নানা প্রকার পন্থায় বিচরণ করিতেছেন। অতএব 'আত্মজ্ঞান নাই' বলিলে সমস্ত আর্য্যশাস্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়, আবার "আছে" বলিলেও সমস্ত আর্য্যশাস্ত্রের উপরই আক্রমণ করা হয়, সুতারাং বড়ই বিপদ উপস্থিত হয়, সংশয় নাই। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে মাতার ন্যায় হিতৈষিণী শ্রুতিই এই সমস্যার পরিপূরণ করিয়া, আমাদের এই বিপদ বিদূরিত করিয়াছেন। শ্রুতি বলেন যে, চিৎস্বরূপ পরমাত্মার প্রকৃত স্বরূপ যে, বুদ্ধি, মন প্রভৃতি জড় পদার্থের দ্বারা অনুভব করা যায় না, তাহা সম্পূর্ণ সত্য বটে, কিন্তু "যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ-নবিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাঙ্গতিম্"॥ (কঠশ্রুতি) যখন ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, অভিমান, বুদ্ধি ইহারা সকলেই বিলীন হইয়া যায়, ইহাদের কাহারইকোন প্রকার ক্রিয়া বা অস্তিত্বমাত্রও থাকে না, যখন কোনরূপ ধ্যান থাকে না, জ্ঞান থাকে না, চিন্তা থাকে না, জীবের আমিত্বও থাকে না, সেই সময়ে আত্মার পরম গতি হয়, সেই সময়ে চিৎস্বরূপ পরমাত্মা মেঘনির্ম্মুক্ত ভাস্করের ন্যায়, আপনিই নিজ স্বরূপে প্রকাশিত হইতে থাকেন। কিন্তু বুদ্ধি, মন প্রভৃতি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ প্রকৃত আত্মজ্ঞান কদাচ হইতে পারে না। আবার মন, বুদ্ধি প্রভৃতির লয় না হইয়া, তাহাদের বিকসিত অবস্থায়ও তাঁহাকে আর এক প্রকারে অনুভব করা যায়; কিন্তু তাহা তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ নয়, তাহা আত্মার বিকৃত স্বরূপ। "যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেথ ব্রহ্মণোরূপম্। যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষু"—(তলবকার শ্রুতি) "যদি কখনও তুমি মনেকর যে, 'আমি ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতেছি' তবে তাহা তোমার নিতান্ত ভ্রান্তি

এবং মিথ্যা কথা। কারণ, তুমি যে সর্ব্বদা তোমার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে মাখামাখি রূপে পরমাত্মার অনুভব করিয়া থাক, তাহা পরমাত্মার বিকৃত রূপ মাত্র।' অতএব জানা গেল, বুদ্ধি ও মনের দ্বারা নির্ম্মল আত্মজ্ঞান না হইলেও বিকৃতরূপ আত্মজ্ঞান আমাদের সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। সুতরাং শাস্ত্র দ্বারাই মীমাংসিত হইল যে, যেখানে আত্মাকে মন, বুদ্ধ্যাদির অবিষয় বলা হইয়াছে, সেখানে আত্মার প্রকৃত নির্ম্মলস্বরূপ লক্ষ্য করা হইয়াছে। ঐ সকল শ্রুতির তাৎপর্য্য এই যে, নির্ম্মল নিত্যশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ অদ্বিতীয় পরমাত্মা মন বুদ্ধ্যাদির দ্বারা অনুভব করা হয় না; মন, বুদ্ধি প্রভৃতির বিলয় হইলেই সেই পরম-জ্যোতি পর-সম্বল নিজরূপে প্রকাশিত হয়েন। আর, যে যে শ্রুতিতে মন, বুদ্ধি দ্বারা আত্মার জ্ঞান হওয়ার বিষয় লিখিত আছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, মন, বুদ্ধি-প্রভৃতি অন্তঃকরণের দ্বারা আত্মাকে মলিন ভাবে অনুভব করা যাইতে পারে। অতএব 'আত্মজ্ঞান' কথাটি এক প্রকারে নিতান্ত অসম্ভবপর হইলেও অন্য প্রকারে বিলক্ষণ সঙ্গত ও সম্ভবপর, সুতরাং আত্মজ্ঞান হওয়া এবং না হওয়া, উভয়ই সত্য হইল। এখন বিশেষরূপে এ বিষয়টির বিস্তার করা যাইতেছে শ্রবণ কর।

পরমাত্মা যখন অনুৎপন্ন, অবিনশ্বর, ব্যাপকপদার্থ এবং আমাদের শরীরাদি সকল বস্তুরই অন্তর বাহিরে অনুপ্রবিষ্ট ভাবে থাকিয়া, আমাদের চেতনতা সম্পাদন করিতেছেন;—তিনি আমাদের ভৌতিক দেহের অন্তরবাহিরে থাকিয়া ভৌতিকদেহের চেতনতা, ইন্দ্রিয়শক্তির অন্তর-বাহিরে থাকিয়া, ইন্দ্রিয়শক্তির চেতনতা, মনের অন্তর-বাহিরে থাকিয়া, মনের চেতনতা, অভিমানের অন্তর-বাহিরে থাকিয়া, অভিমানের চেতনতা, বুদ্ধির অন্তর-বাহিরে থাকিয়া, বুদ্ধির চেতনতা, এবং প্রকৃতির অন্তর বাহিরে থাকিয়া, প্রকৃতির চেতনতা সম্পাদন করিতেছেন। "অস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষমোতং মনঃ সহপ্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ।" (মুণ্ডকোপনিষদ্) "এই চৈতন্য-স্বরূপ আত্মাতেই ভূর্লোক ভুবোলোক স্বর্লোক এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণাদিপঞ্চক, মন, অভিমান, বুদ্ধি ও প্রকৃতি এতৎ সমস্তই ওতপ্রোত-ভাবে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। অতএব আমরা তাঁহাকে কখনও অনুভব

করি, আবার কখনও করি না, তাহা কদাচ হইতে পরে না। আমরা তাঁহাকে সর্ব্বদাই অনুভব করিতেছি;—কেবল আমরা কেন, পশু, পক্ষী, কীট প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে সর্ব্বদা অনুভব করিতেছে। তবে বিশেষ এই যে সর্ব্বদা তাঁহার প্রকৃতস্বরূপ না দেখিয়া অতি কদর্য্য-মলিনবেশে দেখিয়া থাকি।

অত্যুজ্জ্বল-নির্ম্মল সূর্য্যকিরণ যেরূপ মেঘের সহিত বিমিশ্রত হইয়া, সেই মেঘের সঙ্গে সঙ্গে সমাচ্ছন্ন ও ক্ষীণ প্রভ ভাবে পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ, সেই সুনির্ম্মল আত্মাও আমাদের অস্থি-মাংসাদি রচিত জড়-শরীরাদির সহিত মাখামাখি থাকায়, জড়-শরীরাদির সহিত অভিন্নভাবে, সুতরাং ক্ষীণ প্রভরূপে, সর্ব্বদাই অনুভূত হইতেছেন। "আমারা চেতন", "আমাদের চৈতন্য আছে", ইহা আমরা কখন্ না-বুঝিতেছি? কখন্ অনুভব না করিতেছি? তবে বিশেষ এই যে, শরীরাদি জড়পদার্থের গুণ—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ও সুখ দুঃখাদি শক্তি গুলি যেরূপ শরীরাদির সহিত অভিন্নভাবে অনুভব করিয়া থাকি, চৈতন্যকেও সেইরূপ শরীরাদির গুণ বলিয়া তাহার সহিত অভিন্ন ভাবে অনুভব করিয়া থাকি।

শিষ্য।—আপনি প্রথমে বলিলেন, "মন বুদ্ধি প্রভৃতি স্বয়ং জড় ও অন্ধকারময় পদার্থ, সুতরাং তাহারা আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারে না, তদ্দারা আত্মার জ্ঞান সাধিত হয় না", আবার পরে বলিলেন, "মন বুদ্ধ্যা-দির দ্বারা মলিন আত্মজ্ঞান সম্পাদিত হয়" একথার অর্থ কি?

আচার্য্য।—ইহার মধ্যে একটু রহস্য আছে, তাহা শুন;—অগ্নি, সংমিশ্রিত লৌহের ন্যায় চৈতন্য বা আত্মার সহিত বিমিশ্রিত মন, যেমন অন্য বাহ্য বিষয়গুলীকে অভ্যন্তরে প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়, সেইরূপ নিজের স্বরূপটিও প্রকাশ করিতে পারে; তাহার নিজের স্বরূপ তখন চৈত্যন্যের সহিত, মাখামাখী হইয়া, অভিন্নভাবাপন্ন হয়, এবং অভিন্ন ভাবেই তখন চৈতন্য আর মনের প্রকাশ হইয়া থাকে, তখন্ মন চৈত-ন্যের মত এবং চৈতন্যও মনের মত হইয়া, প্রকাশিত হয়েন, সুতরাং মলিনাত্মজ্ঞান হইল। কিন্ত উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড যেমন নিজের স্বরূপকে বাদ দিয়া পৃথক রূপে কেবল তাপের স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারে না,

চৈতন্যযুক্তমনও তেমন নিজের স্বরূপ বাদ দিয়া পৃথক্ রূপে কেবল আত্মার স্বরূপ উদ্ভাসিত করিতে পারে না; সুতরাং মনের দ্বারা কেবল মলিন আত্মজ্ঞানই সম্পাদিত হয়, কিন্তু নির্ম্মলাত্মজ্ঞান কদাপি তদ্দ্বারা হয় না। এবিষয় তৃতীয়, চতুর্থ, এবং পঞ্চমখণ্ডে অতি বিস্তার ক্রমে বলিয়া বুঝাইয়া দিব।

এইরূপ জড়যোগে জড়বেশে আত্মার ছয় প্রকার অবস্থা হয়, অতএব সেই ছয় প্রকারেই আত্মারি অনুভব হইতে পারে; আর কেবল নিজ স্বরূপের উপলব্ধি এক প্রকার, এইরূপে মোট সপ্ত প্রকারে আত্মার জ্ঞান হইয়া থাকে। যথা;—১ম,—'দেহাত্মজ্ঞান' ২য়,—'ইন্দ্রিয়—প্রাণাত্ম-জ্ঞান' ৩য়,—'মানসাত্ম-জ্ঞান', ৪র্থ,—'অভিমানাত্ম জ্ঞান', ৫ম,—'বুদ্ধ্যাত্ম জ্ঞান', ৬ষ্ঠ—'প্রকৃত্যাত্ম জ্ঞান' ৭ম,—'কেবলাত্মজ্ঞান'।

সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি-সংযুক্ত-দেহের সহিত অভিন্নভাবে চৈতন্যের জ্ঞান—'দেহাত্মজ্ঞান'। ভৌতিক দেহটার অনুভব না হইয়া, ইন্দ্রিয় শক্তি ও প্রাণাদি শক্তিগুলির সহিত, অভিন্নভাবে চৈতন্যর জ্ঞান—'ইন্দ্রিয়—প্রাণাত্মজ্ঞান'। স্থূলদেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদির অনুভব না হইয়া, মনের সহিত অভেদে আত্মার জ্ঞান—'মানসাত্মজ্ঞান'। দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, ও মনের অনুভব না হইয়া, অভিমানের সহিত মাখামাখি ভাবে চৈতন্যের জ্ঞান 'অভিমানাত্মজ্ঞান'। দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও অভিমানের অনুভব না হইয়া, বুদ্ধির সহিত মাখামাখি ভাবে চৈতন্তের জ্ঞান—'বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞান'। উক্ত কাহারই অনুভব না হইয়া, কেবল প্রকৃতির সহিত অভিন্নভাবে চৈতন্তের জ্ঞান—'প্রকৃত্যাত্মজ্ঞান'।

সর্ব্বশেষে দেহ অবধি প্রকৃতি পর্য্যন্ত যখন কিছুই অনুভূত হয় না, কোন বিষয়ের কোন প্রকার জ্ঞান বা চিন্তাদি কিছুই থাকে না, যে অবস্থায় ইন্দ্রিয় নাই, প্রাণাদি শক্তি নাই, মন নাই, অভিমান নাই, বুদ্ধি নাই, প্রকৃতিও এক প্রকার নাই, সমস্তই বিলীন হইয়া গিয়াছে, তখন আত্মার সমস্ত মল কাটিয়া গেল, প্রচণ্ড প্রতাপশালী সূর্য্যদেব মেঘমালা-বিনির্ম্মুক্ত হইলেন, তখন কেবল মাত্র চৈতন্তই বিরাজ করিতে লাগিলেন, জীবের চৈতন্তাংশ মাত্র ভাসমান হইল। তখন

জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান-কারণ বলিয়া কিছুই নাই, তখন কেবলই চৈতন্য, কেবলই আত্মা, কেবলই প্রকাশ, কেবলই জ্ঞাতা। ইহাই কেবলাত্মজ্ঞান; ইহাই পরম জ্ঞান, পরমধন, ইহারই নাম "ব্রহ্মজ্ঞান"।

দেহাদি জড়-পদার্থযোগে আত্মার সপ্ত প্রকার অবস্থা-ভেদে সপ্ত প্রকার বিভাগের বিষয় অনন্ত-জ্ঞান ভাণ্ডার শ্রুতিই বলিতেছেন।—সবা এষ পুরুষোঽন্নরস-ময়ঃ" (১),—"তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং সমেত্য ব্রূয়ুঃ"—"অন্যোঽন্তরাত্মা প্রাণময়ঃ" (২)—" অন্যোঽন্তরাত্মা মনোময়ঃ" (৩)—" অন্যোঽন্তরাত্মা বিজ্ঞানময়ঃ"— ৪-৫)—"প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময় আত্মা"—(৬) "প্রত্যগস্থূলো অচক্ষুরপ্রাণো, অমনা অকর্ত্তা চৈতন্যং চিন্মাত্রংসৎ"—৭। "সেই চৈতন্য স্বরূপ আত্মা স্থূলদেহের যোগে অন্নরসময় বা দেহময় হয়েন" (১) " এবং ইন্দ্রিয় শক্তির সহিত যোগে ইন্দ্রিয়ময় " প্রাণাদি শক্তির সহিত যোগে 'প্রাণময়' (২) "মনের সহিত যোগে মনোময়"—(৩) "অভিমান এবং বুদ্ধির যোগে বিজ্ঞানময় "—(৪-৫) প্রকৃতির সহিত যোগে 'আনন্দময়' হয়েন। (৬) কিন্তু "যিনি প্রত্যক্ স্বরূপ, যিনি স্থূল নহেন, যাঁহার কোন প্রকার ইন্দ্রিয় বা প্রাণ, মন, অভিমান কিছুই নাই, যিনি কেবল চৈতন্য, কেবলই চিৎ, এবং কেবল সৎ-পদার্থ তিনিই প্রকৃত আত্মা, ইহাই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ"।

এখন বলা বাহুল্য যে দেহাত্মজ্ঞান অবধি প্রকৃত্যাত্ম-জ্ঞান পর্য্যন্ত যে ছয় প্রকার আত্মজ্ঞান তাহা 'মলিনাত্মজ্ঞান'। এবং সপ্তমটি নির্ম্মলাত্মজ্ঞান।

দেহাত্মজ্ঞানাদির বিভাগ।

উক্ত ষড়্‌বিধ মলিনাত্মজ্ঞানের প্রত্যেকটি প্রথমে দুইভাগে বিভক্ত। যথা,—'সবৃত্তিক এবং নির্ব্বৃত্তিক। বাহ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইয়া আমাদের দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতির মধ্যেএক এক প্রকার ঘটনা বিশেষ হয়, সেই ঘটনা বিশেষকেই পূর্ব্বে বৃত্তি বলিয়া আসিয়াছি, সেই ঘটনা বা অবস্থাটি দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে থাকিতে-থাকিতে, সেই অবস্থাপন্ন দেহাদির সহিত মাখাইয়া যে, আত্মার জ্ঞান বা অনুভূতি হয়, তাহার নাম 'সবৃত্তিক মলিনাত্মজ্ঞান'। আর দেহাদির কোনপ্রকার বৃত্তি না থাকা-

কালে যখন কেবলমাত্র দেহাদির সহিত মাখাইয়া আত্মজ্ঞান হয়, তাহা 'নিবৃত্তিক-মলিনাত্মজ্ঞান।

সেই জ্ঞানগুলির এইরূপ নাম দেওয়া যাইতে পারে—'সবৃত্তিক দেহাত্মজ্ঞান' 'সবৃত্তিক-ইন্দ্রিয়—প্রাণাত্মজ্ঞান' 'সবৃত্তিক-মানসাত্মজ্ঞান' 'সবৃত্তিক-অভিমানাত্মজ্ঞান.' সবৃত্তিক-বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞান' আর 'সবৃত্তিক-প্রকৃত্যাত্মজ্ঞান'—এবং 'নির্ব্বৃত্তিক-দেহাত্মজ্ঞান' 'নির্ব্বৃত্তিকইন্দ্রিয়-প্রাণাত্মজ্ঞান' নির্ব্বৃত্তিক মানসাত্মজ্ঞান, 'নির্ব্বৃত্তিক-অভিমানাত্মজ্ঞান' 'নির্ব্বৃত্তিক-বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞান' আর 'নির্ব্বৃত্তিক প্রকৃত্যাত্মজ্ঞান'।

সবৃত্তিক দেহাত্মজ্ঞানাদির বর্ণনা।

বসন, ভূষণ, অভ্যঙ্গাদির দ্বারা দেহের যেরূপ আকৃতি বা অবস্থা—বিশেষ হয়, তাহাকে দেহের বৃত্তি বলা যাইতে পারে। সেই অবস্থা—বিশিষ্ট-দেহের সহিত অভিন্ন-ভাবে যে আত্মজ্ঞান হয়, অর্থাৎ বসন, ভূষণাদির দ্বারা শরীরের যে অবস্থা বিশেষ হয়, সেই অবস্থা, আর দেহ, এবং চৈতন্য-স্বরূপ-আত্মা এই তিনের মাখামাখি হইয়া যে 'আমিত্বের' জ্ঞান হয়, তাহার নাম 'সবৃত্তিক-দেহাত্মজ্ঞান'। মনে কর, তুমি স্নানের পর দিব্য—পরিষ্কৃত-বস্ত্র-পরিধান-পূর্ব্বক কঙ্কতিকাদির দ্বারা কেশ বিন্যাস এবং চন্দন আতরাদি দ্বারায় অনুলিপ্তাঙ্গ হইয়া দর্পণের দ্বারা নিজের প্রতি-মূর্ত্তি সন্দর্শনে মনে মনে আপনার সৌন্দর্য্য অনুভব করিতেছ। এখন একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পার যে, তোমার ঐরূপ সৌন্দর্য্যানুভবের মধ্যে তোমার চৈতন্য, আর দেহটি এবং বেশবিন্যাসজনিত অবস্থা এই তিনটিই একসঙ্গে মাখামাখিভাবে উপস্থিত হইতেছে। ধর,—তুমি যেন ঐ সময় অনুভব করিতেছ যে, "আমি অতি সুন্দর, ও সুশ্রী" এখন তোমার এই 'আমির' অনুভবটি অবশ্যই অচেতনভাবে হইতেছে না, সুতরাং এই 'আমি' অনুভবের সঙ্গে চৈতন্য পদার্থটি আছেন, এবং দেহ আর বেশভূষার সৌন্দর্য্য এ' উভয়তো আছেই। সুতরাং তোমার "আমি সুন্দর" এই অনুভবটী, তোমার আত্মা, দেহ ও সৌন্দর্য্য এই তিনটী লইয়াই হইতেছে; অতএব এইরূপ জ্ঞানের নামই 'সবৃত্তিক-

দেহাত্মজ্ঞান'। এইরূপ জড়াত্মজ্ঞান আপামর সাধারণ সকলেরই আছে, এই জ্ঞানের নিমিত্ত কোনরূপ যত্নের প্রয়োজন নাই. ইহা আপনা-আপনিই সর্ব্বদা হইতেছে। এই সবৃত্তিকদেহাত্মজ্ঞান জীবের সর্ব্বনাশের মূল, অতএব ইহা পরিহারের নিমিত্তই যত্ন করা উচিত। এইরূপ জ্ঞানে আত্মা এত মলিনভাবে প্রকাশ পায়েন যে, তাহা কিছুই নয় বলিলেও হয়। এমন কি, নিতান্ত জড়বুদ্ধি লোকেরা ইহা বুঝিতেই পারে না যে, এইরূপ অনুভবের মধ্যে আবার চৈতন্য পদার্থটিও আছেন। এইরূপ আত্মজ্ঞান গবাশ্বাদি পশুগণেরও সর্ব্বদা আছে। এখন সবৃত্তিক ইন্দ্রিয়-প্রাণাত্ম-জ্ঞানের বিষয় শ্রবণ কর।

কোন বস্তু সন্দর্শনকালে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের মধ্যে এক প্রকার ঘটনা বা অবস্থা বিশেষ উৎপন্ন হয়, এবং শব্দ শ্রবণকালে শ্রবণেন্দ্রিয়ের মধ্যে এক প্রকার অবস্থা হয়, এইরূপ এক এক বিষয়ের প্রত্যক্ষ সময়ে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই এক এক প্রকার ঘটনা বা অবস্থা বিশেষ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাই ইন্দ্রিয়গণের এক একটি 'বৃত্তি'। সেই বৃত্তি, আর ইন্দ্রিয়গণের নিজের স্বরূপ, আর চৈতন্য(আত্মা) এই তিনের একত্র মাখামাখিভাবে যে উপলব্ধি হয় তাহার নাম 'সবৃত্তিক ইন্দ্রিয়াত্ম-জ্ঞান'। প্রত্যেক বস্তুর দর্শনাদিকালেই আমাদের এই ইন্দ্রিয়াত্ম-জ্ঞান হইয়া থাকে। মনে কর, তোমার হস্তে একটু জল সংলগ্ন করা গেল, তখন জলের শৈত্যগুণ তোমার স্পর্শেন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে, তুমি শীতল স্পর্শের অনুভব করিতে লাগিলে। এখন, যেস্পর্শেন্দ্রিয়ের সহিত শীতল-স্পর্শের সংযোগে, তুমি ঐ শীতলতার অনুভব করিতেছ, সেই স্পর্শেন্দ্রিয়টি বাদ দিয়া, কেবল শীতলতার অনুভব করিতেছ তাহা কদাচ সম্ভবে না;—এই শ্বেতবর্ণ পুস্তকখানি বাদ দিয়া কেবল বর্ণ কএকটী কখনই দৃষ্ট হইতে পারে না। অতএব এই শীতল-স্পর্শের অনুভবের সঙ্গে ঐ স্পর্শগুণটি আর তোমার স্পর্শেন্দ্রিয়, এতদুভয়ই অনুভূত বা প্রকাশিত হইতেছে। তৎপর, অচেতনভাবেও যে ঐ অনুভবটি করিতেছ তাহাও নহে, চেতনভাবেই করিতেছ, সুতরাং তোমার চৈতন্যও তাহার মধ্যে আছেন। অতএব ঐ সময়ে তোমার স্পর্শেন্দ্রিয়, আর ঐ শীতলতা শক্তিটি এবং চৈতন্য বা আত্মা এই তিনেরই

অনুভব হইতেছে। কিন্তু ইহাতেও আত্মা নিতান্ত মলিন ভাবাপন্ন, ইহাতেও আত্মার অনুভব হয় বলিয়া বিবেচনা করা কষ্টকর হয়। এইরূপ আত্মজ্ঞান ও অপর সাধারণ সকলেরই সর্ব্বদা হইয়া থাকে, সুতরাং এই জ্ঞানও অযত্ন সুলভ।

এইরূপ, মনের বৃত্তি (৬৭পৃ) মন, ও আত্মা এই তিনের একত্র জ্ঞানের নাম "সবৃত্তিকমানসাত্মজ্ঞান" এবং অভিমানেব বৃত্তি. (৬৭) অভিমান, ও চৈতন্যের একত্রজ্ঞান, "সবৃত্তিক-অভিমানাত্মজ্ঞান" বুদ্ধির বৃত্তি, (৬৭) বুদ্ধি ও আত্মার পরস্পবের অভেদ-জ্ঞান "সবৃত্তিক বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞান" আর সমস্ত বৃত্তির সংস্কার, প্রকৃতি এবং আত্মা এই তিনের অভিন্নরূপে জ্ঞান হওয়ার নাম 'সবৃত্তিক-প্রকৃত্যাত্মজ্ঞান'।

উক্ত ষড়্‌বিধ সবৃত্তিক জ্ঞানই মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রকৃতি সকলেরই আছে, এবং আত্মার মলিনভাবেপ্রকাশের পক্ষেও ইহারা সকলেই সমান, কোনটির কিছু কমিবেশী নাই। অতএব এইরূপ 'সবৃত্তিকমলিনাত্মজ্ঞান' মনুষ্যের ধর্ম্ম নহে। ইহার দ্বারা মনুষ্যের কোন উন্নতিও নাই। প্রত্যুত এইরূপ জ্ঞানই আত্মাব সর্ব্বনাশের মূল। এখন নির্ব্বৃত্তিক দেহাত্মজ্ঞানাদি বলা যাইতেছে শুন।

নির্ব্বৃত্তিক দেহাত্মজ্ঞানাদির বর্ণনা।

দেহের বৃত্তিগুলি (৮৯ পৃ) বাদ দিয়া, কেবল দেহের সহিত আত্মার অভিন্নভাবে উপলব্ধি হওয়া 'নির্ব্বৃত্তিকদেহাত্মজ্ঞান'। বাহিরের পরিচ্ছদাদি মনে না করিয়া যখন কেবল দেহকেই 'আমি' বলিয়া অনুভব কব তখন এই 'নির্ব্বৃত্তিকদেহাত্মজ্ঞান' হয়। এই জ্ঞানও আমাদের সর্ব্বদাই হইয়া থাকে এবং পশুদিগেরও হয়। ইহাও একরূপ স্বাভাবিক জ্ঞান, ইহার নিমিত্ত ও কোনরূপ যত্ন বা চেষ্টাদি করা চাই না। ইহাতেও এত আচ্ছাদিতভাবে আত্মার অনুভব হয় যে তাহা আত্মার অনুভব নয় বলিলেও বলা যায়।

ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদির যখন কোন প্রকার বৃত্তি (৬৭পৃ) না হইয়া উহারা কেবল নিজ নিজের অবস্থাতেই থাকে তখন কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গণের নিজ নিজ

স্বরূপের সহিতই মাখাইয়া আত্মার জ্ঞান হয়,তাহার নাম—'নির্ব্বৃত্তিক ইন্দ্রিয়-প্রাণাত্মজ্ঞান'। ইহা মলিনাত্মজ্ঞান হইলেও, দেহাত্মজ্ঞানে আত্মা যাদৃশ মলিন ভাবে প্রকাশিত হয়েন, ইহাতে তদপেক্ষায় অনেক নির্ম্মল ভাব দেখা যায়। কারণ, অন্ধকার ময় স্থুল-জড়-দেহ অপেক্ষায় ইন্দ্রিয় শক্তিগুলি অনেক স্বচ্ছ। দর্পণ যত স্বচ্ছ হয় ততই মুখচ্ছবিও নির্ম্মল দেখা যায়। এই অনুভবটি পশু পক্ষীর নাই, সাধারণ মনুষ্যেরও নাই; ইহা সহজেও হয় না। দেহ হইতে পৃথক্-রূপে ইন্দ্রিয় শক্তির অনুভব না করিতে পারিলে ইহা হয় না। সুতরাং এই জ্ঞান লাভ করা বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা সাপেক্ষ। এই নির্ব্বৃত্তিক ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞান অবধিই আত্মা ক্রমে নিজস্বরূপে প্রকাশিত হইতে থাকেন। অতএব এই ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞান অবধি যত প্রকার আত্মজ্ঞান হয় তাহাই প্রকৃত আত্মজ্ঞানও মনুষ্যের ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয়।

মনের যখন কোন প্রকার বৃত্তি না থাকিয়া, কেবল নিজের স্বরূপে অবস্থিতি হয় তখন কেবল মনের সহিত বিমিশ্রণেই আত্মার উপলব্ধি হইয়া থাকে, সেই উপলব্ধির নাম—'নির্ব্বৃত্তিকমানসাত্মজ্ঞান'। ইহা সাধন করা আরও যত্ন সাপেক্ষ এবং তপস্যাসাধ্য। ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন আরও অনেক স্বচ্ছ, অতএব 'নির্ব্বৃত্তিক-ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞান' অপেক্ষায় 'নির্ব্বৃত্তিক মানসাত্মজ্ঞানে' আত্মা আরও একটু অধিকতর প্রকাশ পায়েন। ইহাই শ্রুতিও বলিতেছেন।—"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরম্মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্। সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোব্যক্তমুত্তমম্। অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো-ব্যাপকোঽলিঙ্গ এবচ। যজ্জ্ঞাত্বা মুচ্যতেজন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি।" (কঠশ্রুতি) "আত্মার প্রকাশ হওয়া সম্বন্ধে ইন্দ্রিয় অপেক্ষায় মন উৎকৃষ্ট, মন অপেক্ষায় অভিমান উৎকৃষ্ট, অভিমান অপেক্ষায় বুদ্ধি উৎকৃষ্ট, বুদ্ধি অপেক্ষায় প্রকৃতি উৎকৃষ্ট, এবং প্রকৃতি অপেক্ষায় আত্মা স্বয়ং উৎকৃষ্টতম,—যিনি ব্যাপক, অলিঙ্গ;—যাঁহাকে অনুভব করিতে পারিলে জীব বিমুক্ত হয়, অমৃত হয়।"

যখন অভিমানের কোন প্রকার বৃত্তি থাকে না, যাহা কেবল নিজের অবস্থায়ই থাকে, তখন কেবলমাত্র অভিমানশক্তির সঙ্গেই বিমিশ্রণ হইয়া আত্মার অনুভূতি হয়, সেই অনুভূতির নাম—'নির্ব্বৃত্তিক-অভিমানাত্মজ্ঞান'। ইহা আরও বহুচেষ্টাসাধ্য। মন অপেক্ষায় অভিমান আরও স্বচ্ছ, অত-

এব নির্ব্বৃত্তিকমানসাত্মজ্ঞান অপেক্ষায় নির্ব্বৃত্তিক অভিমানাত্মজ্ঞানে আত্মা আরও অধিকতর প্রকাশ পায়েন।

কোন প্রকার বৃত্তি না থাকাকালীন কেবল বুদ্ধির সঙ্গে বিমিশ্রণেই আত্মার জ্ঞান হয় তাহার নাম—'নির্ব্বৃত্তিক-বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞান'। ইহা আরও গুরুতর যত্ন ও চেষ্টাদি সাধ্য। অভিমান অপেক্ষায় বুদ্ধির অধিকতর স্বচ্ছতা-নিবন্ধন নির্ব্বৃত্তিকবুদ্ধ্যাত্মজ্ঞানে আত্মা আরও অধিকতর প্রকাশ পায়েন।

যখন কোন প্রকার বৃত্তির অতি সূক্ষ্ম সংস্কার অবস্থাও না থাকে, তখন বৃত্তি-রহিত প্রকৃতিমাত্র অবশিষ্ট থাকে, সেই অবস্থাপন্ন প্রকৃতির সহিত বিমিশ্রণে আত্মার প্রকাশের নাম "নির্ব্বৃত্তিকপ্রকৃত্যাত্মজ্ঞান"। প্রকৃতি অতীব স্বচ্ছাৎস্বচ্ছতম পদার্থ, সুতরাং নির্ব্বৃত্তিক প্রকৃত্যাত্মজ্ঞানে আত্মা প্রায় নিজ রূপেই প্রকাশিত হয়েন। এই জ্ঞান অতীবগুরুতর-যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা বিকাশিত হয়।

যখন প্রকৃতি পর্য্যন্তও আত্মার মাখামাখি ভাবে থাকে না, বিলীন হইয়া যায়। তখন নির্ম্মলাকাশে মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় 'স্বপ্রকাশ-পরমাত্মা' নিজেই প্রকাশিত হইতে থাকেন, "দিবীব চক্ষুরাততম্"। ইহাই "কেবলাত্মজ্ঞান", ইহাই সমস্ত জ্ঞানের শেষ, ইহার পরে আর কোনরূপ জ্ঞান নাই, ইহা হইলেই জীবের মুক্তি লাভ হয়।

নির্ব্বৃত্তিক দেহাত্মজ্ঞান অবধি নির্ব্বৃত্তিক প্রকৃত্যাত্মজ্ঞান পর্য্যন্ত ছয় প্রকার মলিনাত্মজ্ঞানের প্রত্যেকটীরই তিন-তিন প্রকার অবস্থা জানা আবশ্যক। তাহা এই,—

'অতিমাত্রদেহাত্মজ্ঞান. স্বল্প দেহাত্মজ্ঞান, এবং মধ্যম দেহাত্মজ্ঞান। আর অতি মাত্র ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞান, স্বল্প ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞান," মধ্যমইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞান। এবং অতি মাত্রমানসাত্ম জ্ঞান, 'মধ্যমমানসাত্মজ্ঞান, স্বল্প মানসাত্মজ্ঞান'। এইরূপ অভিমানাত্মজ্ঞান, বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞান ও প্রকৃত্যাত্মজ্ঞানের ও অবস্থা বিভাগ জানিবে।

জীবাত্মার শক্তিগুলি অত্যন্ত প্রবল ভাবে দেহের সহিত অভিসম্বদ্ধ থাকিলে অতিমাত্র দেহাত্মজ্ঞান হয়। ঐ শক্তিগুলি অত্যন্ত বিশ্লথভাবে দেহাভিসম্বদ্ধ থাকিলে স্বল্পদেহাত্মজ্ঞান হয়। আর এতদুভয়ের মধ্যম ভাবে দেহাভিসম্বদ্ধ হইলে মধ্যম দেহাত্মজ্ঞান হয়।

প্রগাঢ়-তর মেঘমালা যেরূপ সূর্য্যালোক-প্রকাশের বাধক, অতি তরল ক্ষীণতম-বাষ্পরাশি সেইরূপ নহে। সেই প্রকার ইন্দ্রিয়শক্তির অত্যন্ত প্রবলতা বা প্রগাঢ়তাবস্থায় অতিমাত্র-ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞান হইয়া থাকে। কারণ এ অবস্থায় আত্মা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অধিক পরিমাণে আচ্ছন্ন থাকেন। ইন্দ্রিয়শক্তির অত্যন্ত ক্ষীণতাবস্থায় স্বল্পইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞান হয়। কারণ এ অবস্থায় আত্মা পূর্ব্বাপেক্ষায় অনেক অল্পসমাচ্ছন্ন থাকেন। এতদুভয়ের মধ্যমাবস্থায় মধ্যম ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞান হইয়া থাকে। এইরূপ মন, অভিমান, ও বুদ্ধির প্রবল বেগাবস্থায়, ক্রমে অতিমাত্রমানসাত্মজ্ঞানাদি হইয়া থাকে, এবং উহাদের অত্যল্প বেগাবস্থায় স্বল্পমানসাত্মজ্ঞানাদি হয়, আর এতদুভয়ের মধ্যমাবস্থায় মধ্যমমানসাত্মজ্ঞানাদি বলা যাইতে পারে। প্রকৃতির ক্রিয়া বিশেষ না থাকিলে ও কথঞ্চিৎ এই ভেদ করা সম্ভবপর হয়।

আত্মজ্ঞানের বিভাগ ও বিবরণ শুনিলে, এখন যাঁহার নিমিত্ত সমস্ত আর্য্যগণ সর্ব্বদাই ব্যাকুলিত ছিলেন, এবং "সর্ব্বে বেদা যৎপদ—মামনন্তি, তপাংসি সর্ব্বাণিচ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি" (কঠ) "সমস্ত বেদ যাঁহাকে একবাক্যে প্রতিপাদন করিতেছেন; যাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়ার নিমিত্ত সমস্ত তপস্যা আচরিত হয়, যাঁহাকে প্রাপ্তীচ্ছু হইয়া ঋষিগণ কঠোরব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করেন, সেই আত্মারলাভের মুখ্যতম উপায় স্বরূপ এই আত্মজ্ঞানরূপ পরমগোপ্য পরমপূজ্য ধর্ম্মটি কি প্রকারে নিরোধশক্তি হইতে সমুৎপন্ন হয়, তাহা বলিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর।

আত্মজ্ঞানের বিকাশ।

গুরুদেব ভগবান্ পতঞ্জলি মহর্ষি বলিয়াছেন "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" (পাতঞ্জল দর্শন ১ পাদ ২ সূত্র) চিত্তের (ক) দুইপ্রকার নিরোধ সম্ভবে; এক, 'বৃত্তি-নিরোধ', (৬৬পৃ) ২য়,-"স্বরূপ-নিরোধ" (৬৬পৃ); যে অবস্থা বিশেষে এই দুই প্রকার নিরোধের কোন না কোন একটি নিরোধ হয় সেই অবস্থা বিশেষের নাম "যোগ"। এতদুভয় প্রকার নিরোধের

(ক) এখানে চিত্তশব্দে মন, অভিমান, বুদ্ধি প্রভৃতি বুঝিতে হইবে।

মধ্যে "বৃত্তিনিরোধ" অভ্যাস করিতে পারিলে, চিত্তের একাগ্রতা, বৃত্তিকমাদি-ধর্ম্ম, এবং অণিমালঘিমাদিধর্ম্মের পরিস্ফুরণ হয়। আর মন-অবধি প্রকৃতি পর্য্যন্তের "স্বরূপ-নিরোধ" হইলে, "তদাদ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্" (পা-১পা ৩সূ) নির্গুণ নিষ্ক্রিয় চিৎস্বরূপ পরমাত্মা প্রকৃতস্বরূপে প্রকাশিত হয়েন'। ইহার নামই প্রকৃত আত্মজ্ঞান।

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, যখন প্রকৃতি পর্য্যন্তের পূর্ণমাত্রায় ''স্বরূপ-নিরোধ'' হয়, তখনই আত্মার নিজস্বরূপেব জ্ঞান (প্রকৃতআত্মজ্ঞান) হয়। আর যখন "স্বরূপ-নিরোধ" না হইয়া ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতির কোন প্রকার বিষয়জনিত কোনরূপ বৃত্তি থাকে, কিম্বা বিষয়জনিত বৃত্তি না-থাকিয়া কেবল নিজের অস্তিত্বমাত্রও থাকে, তবে, "বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র" (পাত-১ পা-৪ সূ) ঐ সকল বৃত্তির সহিত একত্রে মাখাইয়া আত্মার জ্ঞান হয়।' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, মনপ্রভৃতির যখন কোনরূপ বিষয় জনিত বৃত্তি থাকে তখন "সবৃত্তিকমলিনাত্মজ্ঞান" (৮৮ পৃ) হয়, আর যখন বিষয়-জনিত বৃত্তি না থাকিয়া ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি কেবল নিজ-নিজের স্বরূপেই অবস্থিত হয় অর্থাৎ যখন উহাদের বৃত্তিনিরোধ (৭৬ পৃ) হয় তখন নির্ব্বৃত্তিক মলিনাত্ম জ্ঞান (৮৯ পৃ) হয়।

ইহার তাৎপর্য্য বিস্তৃতরূপে বুঝান হইতেছে। কিন্তু, সবৃত্তিক-মলিনাত্ম-জ্ঞানের বিষয় বিস্তার করা নিষ্প্রয়োজন; কারণ উহা কোন ধর্ম্মের মধ্যে গণ্য নয়। কেননা? উহা আপামর-সাধারণ মনুষ্য, ও পশু, পক্ষী প্রভৃতি সকলেরই আছে, এবং ঐরূপ আত্মজ্ঞান নিরোধ শক্তি হইতেও হয় না, উহা মুগ্ধাত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কিন্তু নির্ব্বৃত্তিক মলিনাত্ম-জ্ঞানেই আত্মা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে থাকেন। অতএব তাহারই প্রণালী প্রদর্শিত হইতেছে।

ইন্দ্রিয় ও প্রাণবৃত্তি নিরোধের দ্বারা দেহাত্মজ্ঞান নিবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞানের উৎপত্তি।

পূর্ব্বে যতপ্রকার নিরোধশক্তি বলা হইয়াছে, তাহার এক-এক প্রকার নিরোধ হইতে এক-একপ্রকার আত্মজ্ঞান বিকশিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ "ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরোধের" দ্বারা "ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞান" হয় এবং ইন্দ্রিয়-নিরো-

ধের দ্বারা "মানসাত্মজ্ঞান", মানস-নিরোধের দ্বারা "অভিমানাত্মজ্ঞান" অভিমাননিরোধের দ্বারা "বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞান," বুদ্ধিনিরোধের দ্বারা "প্রকৃত্যাত্মজ্ঞান," এবং প্রকৃতি নিরোধের দ্বারা যথার্থরূপ আত্মজ্ঞান হইয়া থাকে। ইহা বিস্তার ক্রমে বুঝান যাইতেছে।

মনেকর, তুমি স্বাভাবিক-অবস্থায় রহিয়াছ, স্বাভাবিকাবস্থায় তোমার জীবাত্মার শক্তিগুলি অতি-প্রবলভাবে স্নায়ুমণ্ডলের দ্বারা প্রবাহিত হইতেছে, সুতরাং তোমার সমস্ত শক্তি ঐ দেহটিকে আক্রমণ পূর্ব্বক দেহের সহিত জড়িত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু যতক্ষণ আত্মার শক্তিগুলি দেহের সহিত অত্যন্ত জড়িত থাকে ততক্ষণ ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন প্রভৃতির মধ্যে নানাবিধ বৃত্তি ক্রীড়া করিতে থাকে; সুতরাং আত্মার শক্তিগুলি ঐ সকল বৃত্তিদ্বারাই আকুলিত থাকে; অতএব ঐ সকল শক্তির নিজ-নিজ মূর্ত্তিটি কিরূপ তাহা অনুভব করা যায় না, কেবল বৃত্তিগুলিরই অনুভব হইতে থাকে;— কর্দ্দমাক্ত-জলের যেমন প্রকৃত স্বরূপ না দেখিয়া কেবল কর্দ্দমই দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহাও সেইরূপ। তোমার সমস্ত শক্তিগুলি যখন দেহের সহিত অত্যন্ত জড়িত হইয়া আছে তখন তাহাদের মধ্যে অসংখ্য-বৃত্তির পরিস্ফুরণ হইতেছে, নির্ম্মল সলিল কর্দ্দমাচ্ছন্ন হইতেছে। সুতরাং ইন্দ্রিয়াদির নিজ-নিজ মূর্ত্তি তুমি অনুভব করিতে পারিতেছ না, কেবল বৃত্তিগুলিরই অনুভব হইতেছে। জীবের শক্তিগুলি ঐরূপ দেহজড়িত থাকা হেতুই ঐ শক্তি যে দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ও বিভিন্ন পদার্থ তাহাও বুঝিতে পারিতেছ না। উহা যেন দেহেরই গুণ বা ধর্ম্ম বলিয়া অনুভব হইতেছে। জীবের শক্তিগুলি যখন দেহের সহিত জড়িত, তখন জীবের চৈতন্যও দেহের সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন, আত্মার সঙ্গে আর দেহের সঙ্গে অভেদ ভাব হইয়া গিয়াছে। তখন তোমার, অতিমাত্র দেহাত্মজ্ঞান (৯৩ পৃ) হইতেছে, পশুর ন্যায় আত্মাকে নিতান্ত জড়বেশে অনুভব করিতেছ; দেহ, শক্তি ও চৈতন্য ইহারা যে সম্পূর্ণ ভিন্ন২ পদার্থ তাহা কিছুই বুঝিতেছ না।

এখন যদি ভাগ্যক্রমে ঐ ইন্দ্রিয় ও প্রাণাবস্থাপন্ন—শক্তিগুলির যথা নিয়মিত-বৃত্তি সমূহের নিরোধ (৬৬পৃ) করিতে পার তবে, সুতরাং

তোমার দেহের সহিত সম্বন্ধ একবারে শিথিল হইয়া পড়িবে। অর্থাৎ স্বভাবাবস্থায় যেমন ঐ সকল জীব-শক্তির সহিত দেহের, রাসায়নিক সম্বন্ধের ন্যায় এক রূপ অভিন্নরূপ সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহা থাকিবে না, অথচ পরিপক্ককঞ্চুকের (খোলসের) সহিত যেমন সর্পদেহের শিথিল সংযোগ মাত্র থাকে (যতক্ষণ খোলসটি একবারে খশিয়া না যায় ততক্ষণ) সেইরূপ আল্গা মত সংযোগ মাত্র থাকিবে। কারণ, বাহ্যবস্তুর সম্বন্ধের দ্বারা প্রথমে দেহের উপর যে একএকটা ঘটনা উপস্থিত হয়, সেই ঘটনাগুলিকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করাই ইন্দ্রিয়গণের একএক প্রকার বৃত্তি (৬৬ পৃ)। অতএব সেই বৃত্তির নিরোধ করিতে হইলেই জীবের প্রথমতঃ দেহের উপর 'আত্ম ভাব'টিকে সঙ্কোচিত করিতে হয়। যদি দেহের উপরে জীবের আপনভাব কমিয়া যায় তবে আর দেহের ঘটনাসমূহকে জীব আপনার বলিয়া গ্রহণ করে না, সুতরাং ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি হইল না, বৃত্তির নিরোধ হইল। অতএব যতক্ষণ ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদিশক্তির সহিত দেহের বহিঃস্তরের অভেদ সম্বন্ধ থাকে, ততক্ষণ তাহাদের বৃত্তিনিরোধ সম্ভবে না। দর্শনেন্দ্রিয় যদি চক্ষুর পরদা পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া তাহার সহিত রাসায়নিক সংযোগের ন্যায় সংযুক্ত থাকে, শ্রবণেন্দ্রিয় যদি কর্ণ-পটহ পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া তাহার সহিত রাসায়নিক-যোগের ন্যায় সংযুক্ত থাকে, স্পর্শেন্দ্রিয় যদি চর্ম্ম পর্য্যন্ত পৌছিয়া তাহার সহিত রাসায়নসংযোগেরন্যায় সংযুক্ত থাকে, তবে তাহাদের বৃত্তি-নিরোধ অতি-ঘোরতর-কৃচ্ছ্রসাধ্য। কারণ, দর্শনের বিষয়, (আলোক) শ্রবণের বিষয়, (শব্দ) ও স্পর্শনের বিষয় (শীতোষ্ণাদি) প্রভৃতি বিষয় গুলি তখন সর্ব্বদাই চক্ষুকর্ণাদিতে সবেগে আঘাত করিতেছে, এবং বিষয়ের আঘাত লাগিলেই দেহের উদ্বোধনের সঙ্গে-সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের ও উদ্বোধন বা বৃত্তি হওয়া নিতান্ত সম্ভব পর হয়। এইরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেই জানিবে। অতএব ইন্দ্রিয় বৃত্তি-নিরোধের সময় স্থূল দেহটার সঙ্গে তোমার জীবের সম্বন্ধ শিথিল হইবে। দেহের সম্বন্ধ শিথিল হইয়া গেলে আর পূর্ব্বমত দেহের সহিত তোমার মাখামাখি থাকিল না;—তখন সুতরাং তোমার দেহাভিমান গেল, স্থূল দেহকে যে 'আমি' বলিয়া অনুভব বা অভিমান করিতেছিলে, সেই ভুল গেল।

তোমার চৈতন্য, ও তোমার শক্তি যে, দেহ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন তাহা বিলক্ষণরূপে অনুভব করিতে পারিলে এবং ইন্দ্রিয়গুলির যখন কোন প্রকার বৃত্তিই থাকিল না, তখন উহারা কেবল নিজনিজের স্বরূপেই থাকিল, যে কর্দ্দমের সহিত মাখাইয়া জলের নিজস্বরূপ দেখা যায় নাই, সেই-কর্দ্দম গেলে জলের নিজস্বরূপ প্রকাশিত হইল, ইন্দ্রিয়ও প্রাণাদির প্রকৃত মূর্ত্তিটি কি তাহা তুমি তখন দেখিতে পাইলে এবং দেহের উপর তোমার 'আমিত্ব'টি ছুটিয়া গেল, তখন কেবল ইন্দ্রিয় ও প্রাণ সমষ্টিকেই 'আমি'বলিয়া অনুভব করিতে পারিলে; কঞ্চুকবিশ্লথসর্প যেমন, কঞ্চুকের মধ্যে থাকিয়াও কঞ্চুকের গুণের দ্বারা অভিভূত হয় না, সেইরূপ তুমিও দেহেরমধ্যে থাকিয়াই দেহের গুণের দ্বারা অভিভূত থাকিলে না; তখন কেবল ইন্দ্রিয়ের সহিতই তোমার চৈতন্যের বিমিশ্রণ থাকিল এবং বৃত্তিশূন্য-ইন্দ্রিয়ের সহিতই বিমিশ্রণ হইয়া, তোমার চৈতন্যের অনুভব হইতে লাগিল, 'নির্ব্বৃত্তিক ইন্দ্রিয়-প্রাণাত্মজ্ঞান হইল (৯১ পৃ)।

এই বৃত্তি-নিরোধ যখন তীব্রমাত্রায় হয় তখন, দেহের সম্বন্ধ পূর্ণ মাত্রায় বিশ্লথ হইয়া পড়ে, দেহাত্মজ্ঞান একবারে নিবৃত্ত হয়, সুস্পষ্ট "অতিমাত্রইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞান" (৯৩ পৃ) হয়। আর যখন অতিমৃদু মাত্রায় বৃত্তি নিরোধ হয়, তখন অত্যল্পমাত্রায় দেহের সম্বন্ধ বিশ্লথ হয়, দেহাত্মজ্ঞানেরও অল্পমাত্র হ্রাস হয় এবং ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞানের ও অল্পমাত্রায়ই পরিস্ফুরণ হইয়া থাকে। আর ইহার মধ্যম রূপের বৃত্তি-নিরোধ হইলে সমস্তই মধ্যম মাত্রায় হইবে।

শিষ্য। ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি নিরোধ কালে, ইন্দ্রিয় শক্তিগুলি স্থূল-দেহ হইতে একটু বিযুক্ত হয়, তাহা বুঝিলাম, কিন্তু সেই জন্য, দেহাত্মজ্ঞান নিবৃত্ত হইবে কেন, তাহা বুঝিলাম না। চৈতন্য স্বরূপ আত্মা যখন পরিব্যাপ্ত পদার্থ এবং তাঁহার পরিব্যাপ্তি ও সার্ব্বকালিক—সর্ব্বদা একই প্রকার থাকে—কমি বেশী হয় না, তখন ইন্দ্রিয় শক্তি আকুঞ্চিত হইলেও চৈতন্য-স্বরূপ আত্মা আকুঞ্চিত হইলেন না, তাঁহার সহিত দেহের মাখামাখি সম্বন্ধ পূর্ব্বের মতই থাকিল, তবে দেহাত্মজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া, ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞান হইবে কেন?—গৃহের মধ্য হইতে মনুষ্যটি বহির্গত বা পৃথগ্‌ভূত

হইলেও আকাশের সহিত যে গৃহের মাখামাখি সম্বন্ধ আছে, তাহা বিনষ্ট হইতে পারে না, ইহাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর এইরূপ অদ্ভুত ইন্দ্রিয় নিরোধই বা কি প্রকারে নিষ্পন্ন হয়, তাহাও বুঝাইয়া দেন।

আচার্য্য। অতি গুরুতর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, কথাটি একটু ধীরভাবে বুঝিতে হইবে। প্রথমে একটি স্থূল দৃষ্টান্ত বুঝিয়া লও। মনে কর, সকল-দ্বার অবরুদ্ধ একখানি গৃহ আছে। ঐ গৃহখানির মধ্যে অবশ্যই বায়ুরাশিও পরিপূর্ণ আছে। পরে যেন ঐ গৃহের অভ্যন্তর হইতে বাষ্পরাশি সমুদ্গত হইয়া, গৃহের মধ্যবর্ত্তি, "বায়ুরাশিকে আবিল করিল। ঐ গৃহের ভিত্ত্যাদি ও তদভ্যন্তরস্থ বায়ুরাশির প্রত্যেক অণুর অন্তর বাহিরে যে অনন্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত ভাবে রহিয়াছে, ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। এখন এই আকাশকে দুইটি নাম দিতে পার, একটি,-'গৃহীয়-আকাশ' আর একটি,-"বায়বীয় আকাশ"। ঐ আকাশটি যদিচ নিতান্ত নির্ম্মল পদার্থ, তথাপি ঐ গৃহের ভিত্তি, ছাত ও তদভ্যন্তরস্থ বায়ুরাশির সংস্পৃষ্ট হইয়া, আবৃতপ্রায় ও মলিনবেশে পরিণত হইয়াছে; যেখানে গৃহের ভিত্তি, ছাত ও অভ্যন্তরস্থ বায়ুরাশি আছে, সেখানে আকাশনির্ম্মলভাবে পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু তন্মধ্যে, যেখানে গৃহের ভিত্তি ও ছাত, সেখানে আকাশ নিতান্তই মলিনবেশধারী, আর যেখানে বায়ুপূর্ণ, সেখানে অপেক্ষাকৃত কিছু নির্ম্মল। কিন্তু ঐ বায়ুতে গৃহের বাষ্পরাশি বিমিশ্রিত হওয়ায়, আকাশ কেবল বায়ুরাশির সহিত মাখাইয়া যেরূপভাবে দেখা উচিত, তদপেক্ষা আরও অধিক মলিন ভাবাপন্ন হইয়াছে।

এখন যদি কোন প্রকারে ঐ বায়ুরাশির মধ্য হইতে গৃহের বাষ্পগুলি পৃথক্ করিয়া দেওয়া যায়, তবে ঐ বায়ু অনেকটা নির্ম্মল হয়, এবং সেই বায়ুর মধ্যে যে আকাশ দৃষ্ট হইতেছিল, তাহাও কিছু বিমল হয়। কিন্তু গৃহের ভিত্তির মধ্যে যে আকাশ তাহা পূর্ব্বমতই থাকিবে। তৎপর, যদি কোন কৌশলে ঐ বায়ুরাশিও বিনষ্ট করিয়া ফেলান যায়, তবে ঐ বায়ুর সঙ্গে যে আকাশ ছিল, তাহা আপন প্রভায় প্রভাসিত, হইতে থাকিবে, তাহাতে মলিনতা থাকিবে না; অথচ গৃহের ভিত্তির আকাশ সেই একই প্রকার মলিনবেশে থাকিবে। কিন্তু তদ্দ্বারা গৃহের মধ্যবর্ত্তী যে আকাশ তাহার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। এরূপ করুক, কিম্বা

বুঝিয়া লও। এখনে তোমার শরীরটিকে গৃহের স্থানে সন্নিবেশিত কর, এবং শক্তিময় জীবাত্মাটি,—যাঁহাকে তুমি অন্তরে অন্তরে "আমি" বলিয়া অনুভব করিতেছ (৭৭ পৃ) তাঁহাকে বায়ুর স্থানে, আর জীবাত্মার ইন্দ্রিয়াদির বৃত্তিগুলিকে (৬৬ পৃ) গৃহের বাষ্প স্থানে সন্নিবেশিত কর। কারণ তোমার দেহটি গৃহের ন্যায় চর্ম্ম মাংসাদি ভিত্তিবিশিষ্ট, জীব তাহার মধ্যে বায়ুর ন্যায় পরিপূরিত আছে এবং দেহের দ্বারা ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে বাষ্পের ন্যায় বিকৃতিজনক এক একটা বৃত্তি উৎপন্ন হইতেছে। আর আকাশের স্থানে পরম-মহৎসর্ব্বব্যাপী চৈতন্য পদার্থটি উপবিষ্ট করাও। কারণ অনন্ত অদ্বিতীয়-চৈতন্য-স্বরূপ আত্মাও আকাশের ন্যায় তোমার জীব ও দেহের প্রত্যেক অংশে অনুস্যূত-ভাবে রহিয়াছেন। এখন এই চৈতন্যকে দুটি নাম দিতে পার, এক, "দেহাবচ্ছিন্ন চৈতন্য", ২য় টি,-"জীবাবচ্ছিন্ন চৈতন্য"। দেহের সহিত মাখাইয়া যে চৈতন্য আছেন, তিনি দেহাবচ্ছিন্ন, আর জীবের সহিত বিমিশ্রিত যে চৈতন্য আছেন, তিনি জীবাবচ্ছিন্ন। যিনি জীবাবচ্ছিন্ন চৈতন্য তিনিই তোমার আত্মা, আর যিনি দেহাবচ্ছিন্ন চৈতন্য, তিনি তোমার আত্মা নহেন। যদিচ আত্মার বাস্তবিক কিছু পার্থক্য বা ভেদ নাই, তথাপি তোমার জীবের সঙ্গে আত্মার চৈতন্যের যতটুকু অংশ প্রকাশ পায়, সেই টুকুই তোমার আত্মা বলিয়া পরিগণিত হয়, সেই টুকুই তুমি অনুভব করিতে পার,আর যে টুকু তোমার পরিধি ছাড়াইয়া দেহের মধ্যে মাখা অছে সেই টুকু তুমি অনুভব করিতে পার না; সুতরাং সেই টুকু তোমার আত্মা নয় ইহা বলা যায়। কিন্তু তোমার (জীবের) শক্তি গুলি যখন স্নায়ু পথে প্রবাহিত হইয়া, দেহের চর্ম্ম পর্য্যন্ত প্রত্যেক সূক্ষ্মাংশে অনুপ্রবিষ্ট ও অতিসম্বদ্ধ হয়, তখন তোমার জীব আর দেহ যেন এক হইয়া যায়। সুতরাং তখন দেহাবচ্ছিন্ন চৈতন্য আর তোমার জীবাবচ্ছিন্ন চৈতন্যেরও যেন পার্থক্য থাকে না। অতএব তখন দেহের সঙ্গে মাখাইয়াই তোমার চৈতন্যের অনুভব হয়। গৃহাভ্যন্তরবর্ত্তী বায়ু যদি ভিত্তি প্রভৃতির অন্তরেং অনুপ্রবিষ্ট থাকে, তবে সেই বায়ুর আকাশ আর ভিত্তির মধ্যবর্ত্তী আকাশ এতদুভয় ভিন্ন বলিয়া অনুভব করা হয় না, এক বলিয়াই অনুভব হইয়া থাকে।

এখন দেখ, গৃহস্বরূপ-দেহ হইতে বায়ু স্থানীয় জীবশক্তি-গুলিকে একটু পৃথক্ করিতে পারিলে, বাষ্পস্বরূপ-বৃত্তিগুলিও জন্মিতে পারিল না এবং বায়বীয় আকাশের ন্যায় জীবাবচ্ছিন্ন আত্মাও গৃহীয় আকাশের স্থানীয় দেহাবচ্ছিন্ন আত্মা হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িল। এবং গৃহীয় আকাশ মলিন থাকিলেও যেরূপ বায়বীয় আকাশ মলিন থাকিবে না, তদ্রূপ দেহাবচ্ছিন্ন আত্মার মলিনতা থাকিলেও জীবাবচ্ছিন্ন আত্মার (তোমার আত্মার) মলিনতা বিদূরিত হইবে এবং বায়বীয় আকাশে যেরূপ গৃহীয় আকাশ বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে না, সেইরূপ তোমার জীবাবচ্ছিন্ন আত্মার ও দেহাবচ্ছিন্নআত্মা বলিয়া অনুভূতি হইতে পারে না। এই প্রকারে ইন্দ্রিয় বৃত্তি নিরোধের দ্বারা দেহাত্মজ্ঞান নিবৃত্তিএবং ইন্দ্রিয়-প্রাণাত্মজ্ঞানের বিকাশ সাধিত হইয়া থাকে। (নরোধ শক্তি কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, তাহা পরে বলিব।) এই ইন্দ্রিয় প্রাণাত্মজ্ঞানের অবস্থায় বাহিরের কোন বস্তুর দর্শন, শ্রবণ বা স্পর্শনাদি কিছুই হয় না, হস্তপদাদির পরিচালনও হয় না, ফুপ্‌ফুস্, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী প্রভৃতির ক্রিয়াও একরূপ অবরুদ্ধই হয়; সমাধি-প্রকরণে এবিষয়ের বিস্তার হইবে। এখন ইন্দ্রিয় ও প্রাণের স্বরূপ নিরোধের দ্বারা কি হয় তাহা শুন।

ইন্দ্রিয় ও প্রাণেরস্বরূপনিরোধের দ্বারা ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞানের নিবৃত্তি এবং মানসাত্মজ্ঞানের উৎপত্তি।

ইন্দ্রিয় ও প্রাণের বৃত্তিনিরোধপূর্ব্বক যখন ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞান হইতেছে, তখন জীবের শক্তিগুলির যে বিশেষ ক্ষয়বৃদ্ধি হইতেছে তাহা নহে, জীবের শক্তিগুলি তখনও সেই পূর্ব্বের মত মস্তিষ্কের মধ্য হইতে বিস্তৃত হইয়া, ক্রমে স্নায়ুসহস্রের অগ্রভাগ অথবা দেহের চর্ম্ম প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতেছে,এবং সেই পূর্ব্বের মতই উত্তপ্তলৌহপিণ্ডের মধ্যে যেরূপ তাপপূরিত থাকে, সেইরূপ, দেহের সকল স্থানেই যেন পরিপূরিত রহিয়াছে! এ সময় যদি ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদি শক্তির বেগ সংরুদ্ধ করিয়া, কিছু খর্ব্বকরা যায় তবেই "মৃদুইন্দ্রিয় প্রাণ-নিরোধ" (৮১ পৃ) হইল; এবং ইন্দ্রিয়াদি শক্তি গুলিও একটু হাল্‌কা হইল, সুতরাং ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞান পূর্ব্বাপেক্ষা একটু শিথিল হইল অর্থাৎ মধ্যম ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞান হইল (৯৭ পৃ) পরে ইন্দ্রিয়াদি শক্তিকে আর একটু

অধিক সংযত করিলে "মধ্যম ইন্দ্রিয় প্রাণ নিরোধ" (৮১ পৃ) হইল। তখন ইন্দ্রিয়াদি শক্তিগুলি আরও হাল্‌কা হইয়া গেল, সুতরাং ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞান আরও অস্ফুট বা শিথিল হইয়া পড়িল, অর্থাৎ "স্বল্প ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞান" (৯৩ পৃ) হইল। পরে ইন্দ্রিয়শক্তি গুলিকে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করিয়া স্নায়ুর মূলপ্রদেশে মনের স্থানেই রাখিতে পারিলে. যখন শক্তি গুলি স্নায়ুর মধ্যে কিছুই আসিতে পারিল না, তখন "অতিমাত্র ইন্দ্রিয়-প্রাণ নিরোধ" হইল, ৮১ পৃ) তখন ইন্দ্রিয়াবস্থাই থাকিল না, এবং যখন ইন্দ্রিয়াদির স্বরূপই বিদ্যমান থাকিল না, তখন অগত্যাই "ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞান"ও একবারে বিনষ্ট হইল ; আধার বিনষ্ট হইলে, আধেয় অগত্যা বিনষ্ট হয়; বস্ত্র দগ্ধ হইলে তাহার শুভ্র বর্ণটিমাত্র থাকিতে পায় না। উক্তাবস্থায় কোন প্রকার স্নায়ুর মধ্যেই কোন প্রকার শক্তি থাকিল না; স্বপ্নাবস্থায় যেমন অনেকগুলি শক্তি স্নায়ু-মণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া, মস্তিষ্কের মধ্যেই বিজৃম্ভিত হয়, তখনও সেইরূপ জীবের সমস্ত শক্তিগুলি, সমস্ত স্নায়ুমণ্ডল পরিত্যাগ পূর্ব্বক মস্তিষ্কের মধ্যেই মনের স্থান পর্য্যন্ত বিজৃম্ভিত হইতে লাগিল। তখন মনের মধ্যে নানা প্রকার চিন্তাদি বৃত্তি হইতে লাগিল। এবং মনের বৃত্তি, (৬৭) মন আর আত্মা এই তিনের একত্রে অনুভব অর্থাৎ সবৃত্তিক মানসাত্মজ্ঞান (৯২ পৃ) হইবে।

এখন মানস-বৃত্তি নিরোধের দ্বারা মনের বৃত্তিগুলি বিনষ্ট হইলে, কেবল মনের সহিত বিমিশ্রণেই আত্মার অনুভব হইবে, অর্থাৎ নির্ব্বৃত্তিক মানসাত্মজ্ঞান হইবে (৯২ পৃ) এবং যে বৃত্তিস্বরূপ আবরণের আচ্ছাদন থাকাতে এপর্য্যন্ত মন কি পদার্থ তাহা বুঝিতেছিলে না, মনের নিজ মূর্ত্তি অনুভব হইতেছিল না, সেই আবরণ—সেই সমস্ত বৃত্তি গুলি মন হইতে বিদূরিত হইল, সুতরাং মনের প্রকৃত স্বরূপ কি তাহাও বুঝিতে পারিলে। গৃহাভ্যন্তরবর্ত্তী দর্পণে সর্ব্বদা চারি দিক্ হইতে প্রতিচ্ছবি নিপতিত হয় বলিয়াই, যেরূপ তাহার নিজমূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হয় না, সেই প্রকার মনও সর্ব্বদা একএকটী বৃত্তি যুক্ত থাকে বলিয়াই, তাহার নিজমূর্ত্তি অনুভব করা যায় না, মনটি কি পদার্থ, তাহার প্রকৃত স্বরূপটি কি, তাহা বুঝাযায় না। এই সময়ে তুমি স্থূলদেহ ও ইন্দ্রিয়প্রাণাদির অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া, মনকেই 'আমি'

বলিয়া অনুভব করিতে থাকিবে। এবং ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞানে যে আনন্দের উপলব্ধি হইয়াছিল তদপেক্ষা সহস্রগুণ আনন্দের উচ্ছ্বাস হইবে। এ অবস্থায়ও বাহ্যজ্ঞান এবং হস্তপদাদির পরিচালনা এবং ফুস্‌ফুস্ হৃৎপিণ্ডাদির ক্রিয়া অবরুদ্ধই থাকিবে। এখন অবধি সকল প্রকার আত্মজ্ঞানের অবস্থায়ই এই প্রকার থাকিবে। এই প্রকারে "ইন্দ্রিয় প্রাণ নিরোধের" দ্বারা মনের স্বরূপোপলব্ধি ও মানসাত্মজ্ঞান হইয়া থাকে। ইহা 'অতিমাত্র মানসাত্মজ্ঞান' জানিবে। (৯৩ পৃ)

মানস নিরোধের দ্বারা মানসাত্মজ্ঞানের নিবৃত্তি ও অভিমানাত্মজ্ঞানের উৎপত্তি।

ইন্দ্রিয়ের নিরোধ হইল, প্রাণের নিরোধ হইল, মনেরও সকল প্রকার বৃত্তিরই অবরোধ হইল, অতিমাত্র মানসাত্মজ্ঞান হইতেছে, আত্মার শক্তিসমূহ মস্তিষ্কের অভ্যন্তরপ্রদেশ হইতে মনের স্থান পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, এখন ঐ শক্তি গুলিকে যদি আর একটু সংযত করা যায়, তবে 'মৃদুমানস নিরোধ' হইল (৮২) মন-অবস্থাপন্ন শক্তি সমষ্টি আর একটু হাল্‌কা হইয়া পড়িল ; সুতরাং 'মানসাত্মজ্ঞান' একটু অস্ফুট হইল অর্থাৎ 'মধ্যম মানসাত্মজ্ঞান' হইল। (৯৩) পরে ঐ শক্তিকে আর একটু সংযত করিলে শক্তি গুলি আরও হাল্‌কা হইল, সুতরাং তখন মানসাত্মজ্ঞান আরও অস্ফুট হইয়া পড়িল অর্থাৎ 'স্বল্পমানসাত্মজ্ঞান" হইল। এখন যদি সম্পূর্ণরূপে এই শক্তিসমষ্টিকে অভিমানের স্থানে (মস্তিষ্কের মধ্যে) অভিমানের মধ্যে সংযত রাখিতে পার, মনের স্থান পর্য্যন্ত আসিয়া মনের অবস্থায় পরিণত হইতে একেবারে না দাও, তবেই 'তীব্রমানস' নিরোধ হইল। (৮২পৃ) মানস নিরোধ হইলেই, মনের অস্তিত্ব থাকিল না, সুতরাং আধারের নাশে আধেয়ের নাশ হইল ; তোমার 'মানসাত্মজ্ঞান' একবারে বিনষ্ট হইল। তখন কেবলঅভিমানের বৃত্তি (৬৭ পৃ) অভিমান, এবং আত্মা এতত্রিতয়ের বিমিশ্রণে "সবৃত্তিক - অভিমানাত্মজ্ঞান" হইবে। পরে অভিমানেরও বৃত্তি-নিরোধ করিলে অভিমান আপনার স্বরূপে অবস্থিত রহিল। সুতরাং তখন তুমি অভিমানের নিজ মূর্ত্তি অনুভব করিতে পারিলে। এবং কেবল অভিমানের

সহিত বিমিশ্রণেই আত্মার জ্ঞান অর্থাৎ "নির্ব্বৃত্তিক অভিমানাত্মজ্ঞান" (৯৩পৃ) হইতে থাকিবে। এ অবস্থায় দেহ, ইন্দ্রিয়াবস্থা, প্রাণাবস্থা ও মানসাবস্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক মস্তিষ্কের অন্তঃপ্রদেশে থাকিয়া, কেবল অভিমানেই তোমার 'আমির' অনুভব হইবে, এবং "মানসাত্মজ্ঞানে" যে আনন্দ অনুভূত হইয়াছিল, তদপেক্ষা সহস্রগুণ আনন্দের উচ্ছ্বাস হইবে। ইহা "অতিমাত্র অভিমানাত্মজ্ঞান" (৯৪পৃ) জানিবে। এই প্রকারে মানস নিরোধের দ্বারা অভিমানাত্মজ্ঞানের উৎপত্তি হয়।

অভিমান নিরোধের দ্বারা অভিমানাত্মজ্ঞানের নিবৃত্তি ও বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞানের উৎপত্তি।

অভিমানাত্মজ্ঞানে আত্মার শক্তি গুলি মস্তিষ্কের অভ্যন্তর হইতে অভিমানের স্থান—মস্তিষ্কের অন্তঃপ্রদেশ পর্য্যন্ত আসিয়া পরিব্যাপ্ত হইতেছে; এখন যদি ঐ শক্তিগুলিকে আরও একটু সংযত কর, তবে 'মৃদু অভিমান-নিরোধ" (৮২ পৃ) হইবে, এবং অভিমানাবস্থাপন্ন শক্তি গুলি আরও একটু হাল্কা হইবে, সুতরাং অভিমানাত্মজ্ঞান পূর্ব্বাপেক্ষা অস্ফুট হইল, অর্থাৎ 'মধ্যম অভিমানাত্মজ্ঞান," (৮২পৃ) হইল। পরে আরও একটু সংযত করিলে, 'মধ্যম অভিমান-নিরোধ" হইল, (৮২পৃ) তখন অভিমানাবস্থাপন্ন শক্তি গুলি আরও হাল্কা হইয়া পড়িল, সুতরাং অভিমানাত্মজ্ঞান আরও অপরিস্ফুট হইবে, অর্থাৎ 'স্বল্পঅভিমানাত্মজ্ঞান' (৯৩পৃ) হইবে; অবশেষে আত্মার শক্তিগুলিকে একবারেই অভিমানের স্থান পর্য্যন্ত আসিতে না দিয়া, যদি বুদ্ধিস্থানে (মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে) বুদ্ধিতেই সংযত রাখ, তবে অভিমান হইতেই পারিল না, সুতরাং "অতিমাত্র অভিমান নিরোধ" (৮২পৃ) হইল। আধারের বিনাশে আধেয়ের বিনাশ হইল, অভিমানের অস্তিত্ব বিনষ্ট হওয়ায় "অভিমানাত্মজ্ঞানও" একবারে বিনষ্ট হইল। তখন কেবল বুদ্ধি বৃত্তি, (৬৭ পৃ) বুদ্ধি আর আত্মা এই তিনের একত্র অনুভব হইতে লাগিল। অনন্তর বুদ্ধি বৃত্তিরও নিরোধ করিলে সুতরাং বাষ্পপরিমুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় বুদ্ধির নিজের স্বরূপ প্রকাশিত হইল; তখন বুদ্ধি পদার্থটি কিরূপ তাহা অনুভব করিতে পারিলে এবং তোমার কেবলমাত্র বুদ্ধির সহিত

বিমিশ্রণেই সেই আত্মার অনুভব হইতে থাকিবে; "বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞান" হইবে। (৮৩ পৃ) এতদবস্থায় দেহ, ইন্দ্রিয়াবস্থা, প্রাণাবস্থা, মানসাবস্থা ও অভিমানাবস্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক মস্তিষ্কের অভ্যন্তরেই তোমার অতি সূক্ষ্ম 'আমিটি' বিরাজ করিবে। ইহা অতিমাত্র বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞান জানিবে (৯৩ পৃ)। এই অবস্থায় পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্রগুণ আনন্দের উপভোগ হয়।

বুদ্ধি নিরোধের দ্বারা বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞানের নিবৃত্তি ও প্রকৃত্যাত্মজ্ঞানের উৎপত্তি।

বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞানে আত্মার শক্তি কেবল স্ফুরিতমাত্র হইয়া, মস্তিষ্কের গুহা-প্রদেশেই পরিব্যাপ্ত থাকে, এখন এই স্ফুরণের মৃদুমাত্র নিরোধে (৮২ পৃ) 'মধ্যম বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞান" হইবে, (৯৩পৃ) এবং 'মধ্যমমাত্রার নিরোধে(৮২পৃ) অত্যস্ফুট বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞান অর্থাৎ "স্বল্পমাত্র বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞান" হইবে, (৯৩পৃ) পরে যখন উহার স্ফুরণ হইতেও একবারে নিবৃত্তি অর্থাৎ "তীব্র বুদ্ধিনিরোধ' (৮২পৃ) হইবে। তখন বুদ্ধির উৎপত্তি হইল না, সুতরাং বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞানের বিনাশ হইল। কিন্তু সেই সমস্ত শক্তির পরম সূক্ষ্ম অবস্থাস্বরূপ প্রকৃতির অস্তিত্ব থাকিল এবং তাহার অতি সূক্ষ্ম স্ফুরণ (বৃত্তি) হইতে থাকিল, সুতরাং সেই বৃত্তি, আর প্রকৃতি আর আত্মা, এই তিনের বিমিশ্রণে অতি সূক্ষ্ম এক রূপ অনুভব হইতে লাগিল। পরে আবার সেই বৃত্তিটীরও নিরোধ করিলে কেবল নির্ব্বৃত্তিক প্রকৃতিমাত্র থাকিল, তখন প্রকৃতির নিজ অবস্থা আর প্রকৃতির সহিত বিমিশ্রিত চৈতন্যের অতি সূক্ষ্মতম অনুভব হইতে লাগিল। এই অবস্থায় দেহ ইন্দ্রিয়াদি সমস্ত অবস্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অতুল আনন্দ অনুভব করত সেই দুর্লক্ষ্য গুহাতে তোমার 'আমি' অবস্থিতি করিবে; ইহা "অতিমাত্র প্রকৃত্যাত্মজ্ঞান"।

প্রকৃতি নিরোধে পরমাত্মার প্রকৃতস্বরূপে বিকাশ।

অবশেষে যখন প্রকৃতিরও মৃদু, মধ্যম ও অতিমাত্র নিরোধের দ্বারা এককালে পরিস্ফুরণ না থাকিবে তখন, যে গুহা হইতে মেঘস্বরূপ শক্তি বিকীর্ণ হইয়া অলৌকিক প্রকাশস্বরূপ পরমাত্মা মার্ত্তণ্ডকে আবরণ করিয়া-

ছিল সে সেই অনন্ত প্রকৃতিতে মিশিয়া গেল; তখন কোন শক্তি নাই, ধ্যান নাই, জ্ঞান নাই, চিন্তা নাই, তখন সমস্ত এককালীন নিস্তব্ধ, সমস্ত নীরব, তখন 'তুমি' নাই, বুদ্ধি নাই, অভিমান নাই, মন নাই, ইন্দ্রিয় নাই, প্রাণ নাই, তখন কেবলই চৈতন্য, কেবলই আত্মা, কেবলই আনন্দ, কেবলই প্রকাশ। ইহারই নাম "প্রকৃত-আত্মজ্ঞান", ইহা হইলেই জীবের কর্ত্তব্যকার্য্য সংসাধিত হইল, জীব সর্ব্বদুঃখ হইতে বিমুক্ত হইল, ভববন্ধন খুলিয়া গেল। এইরূপে সর্ব্বনিরোধের দ্বারা পরমাত্মার প্রকাশ বা প্রকৃত আত্মজ্ঞান সাধিত হইয়া থাকে। এখন ঔদাসীন্য-নামক মহাধর্ম্মটি কি প্রকারে বিকাশ প্রাপ্ত হয় তাহা শ্রবণ কর।

ঔদাসীন্য ধর্ম্মের বিবরণ।

ঔদাসীন্য নামক ধর্ম্মের বিকাশ কি প্রকারে হয়, তাহা বুঝিবার পূর্ব্বে, ঔদাসীন্য কাহাকে বলে তদ্বিষয় এবং তাহার বিশেষ বিবরণ জানা নিতান্ত আবশ্যক; অতএব প্রথমে ঔদাসীন্যের লক্ষণ ও তদীয় বিবরণ বলিতেছি।

আমরা, যে সর্ব্বদা অন্তরে অন্তরে " আমি-অহম্ " বলিয়া আমাদের নিজের অনুভব করিয়া থাকি, তাহা, আমাদের স্থূলদেহ এবং ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন প্রভৃতি সমস্ত জড়পদার্থ, আর, অঙ্গার-সংযুক্তাপের ন্যায়, ইহাদের সহিত অভিন্নভাবে বিমিশ্রিত চৈতন্য পদার্থ, এই দুইকে লইয়াই হয়, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; সুতরাং ঐ জড়শক্তি আর চৈতন্য এই দুটী পদার্থ মিশাইয়াই আমরা একটি "আমি" হইতেছি; কিন্তু তথাপি চৈতন্যই এই "আমি" জ্ঞানের মুখ্যতম বিষয়, মুখ্যতম আলম্বন, অর্থাৎ চৈতন্য পদার্থটিকেই মুখ্যরূপে নির্ভর করিয়া আমাদের অভ্যন্তরে ঐ "আমিত্বের" অনুভবটি হয়, এবং দেহেন্দ্রিয়াদি জড় পদার্থ গুলি, বস্ত্রের শ্বেত-পীতাদি বর্ণের ন্যায়, তাহার সঙ্গে-সঙ্গে অনুভূত হয়। আকাশ দেখিব বলিয়া উন্মুখ হইলে, অভ্র বায়ু পরিপূর্ণ আকাশই দৃষ্ট হইলেও, কেবল মাত্র আকাশই যেমন মুখ্যতম লক্ষ্য হইয়া থাকে, অথবা বহুতর সৈন্য-সামন্ত-সমভিব্যাহারে কোন রাজার গমন করা কালে, যেমন সমস্তগুলি লোকই দর্শকগণের নয়নগোচর হইলেও, রাজাই তাহাদের মুখ্যতম লক্ষ্য হইয়া

থাকেন, আবার রাজারও মনে-মনে তখন একটী পরিব্যাপক ও বিস্তৃত 'আমিত্বের' অনুভব হয়, তাহার মধ্যে ঐ সমস্ত সৈন্য-সামন্ত এবং রাজা নিজেও থাকেন; কিন্তু ঐ ব্যাপক 'আমির' মধ্যে নিজের দেহটিকেই মুখ্য-ভাবে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, এবং দেহই তাঁহার মুখ্যতম 'আমি'। অথবা বিবাহের বর, যেমন নানাবিধ বাদ্যভাণ্ড ও লোকজনে সমাবৃত হইয়া গমনের কালে, ঐ সমস্ত লোকজনের সহিতই একটি ব্যাপক 'আমি' মনে করে, অথচ তন্মধ্যে নিজ দেহটিকেই মুখ্যতম লক্ষ্য করিয়া থাকে, দেহই তাহার মুখ্যতম 'আমি'। অথবা তুমি যেমন শাল, বনাত, বর্ম্মপ্রভৃতি কতকগুলি বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া ঐ কাপড় চোপড় গুলির সহিতই একটা 'আমির' অনুভব কর, অথচ সেই 'আমির' মধ্যে দেহটিকেই মুখ্যরূপে লক্ষ্য করিয়া থাক, দেহটিই তোমার মুখ্যতম 'আমি'। সেইরূপ, সর্ব্বদাই যে 'আমির' অনুভব করিতেছ, ইহাতেও চৈতন্যই মুখ্যতম আশ্রয়, চৈতন্যই মুখ্যতম আলম্বন, চৈতন্যই মুখ্যতম 'আমি'; আর অন্য দেহাদি জড়পদার্থগুলি কেবল চৈতন্যের সঙ্গের সঙ্গী মাত্র, তাই সেই জড়দ্রব্যগুলিও তোমার 'আমির' মধ্যে প্রকাশিত হয়।

আবার রাজার নিজের দেহ বাদ দিয়া, কেবল সৈন্যসামন্ত লইয়াই যেমন রাজার 'আমিত্বটি' থাকে না, কিন্তু সৈন্যসামন্ত বাদদিলেও থাকে; কিম্বা বরের নিজের দেহ বাদ দিয়া, কেবল বরযাত্রী লইয়াই যেমন বরের 'আমি-ত্বটি' থাকে না, কিন্তু বরযাত্রী বাদ দিলেও বরের 'আমি' থাকে, এবং তোমার দেহটি বাদ দিয়া কেবল শাল বনাত লইয়াই যেমন তোমার 'আমি' থাকিতে পারে না, কিন্তু শাল, বনাত, পিরাণ বাদ দিলে তোমার 'আমি' অক্ষতই থাকে; সেইরূপ তোমার চৈতন্যাংশটা বাদদিয়া কেবল জড়শক্তি লইয়াই "আমিত্বটি" থাকে না। কিন্তু প্রকৃতি অবধি সমস্ত জড়-পদার্থ-গুলি বাদদিলেও, কেবল চৈতন্যাংশটি লইয়াই তোমার 'আমি' থাকিবে ইহা নিশ্চয়। অতএব চৈতন্যাংশটিই তোমার মুখ্য 'আমি' বলিয়া জানিবে, এবং প্রকৃতি অবধি জড় পদার্থ গুলি, অর্থাৎ প্রকৃতি, বুদ্ধি, অভিমান, মন, ইন্দ্রিয়, প্রাণাদি ও স্থূল দেহ, ইহারাই গৌণ 'আমি' বলিয়া জানিবে।

কিন্তু ক্রিয়া করার সময়ে, ঐ প্রকৃত্যাদি জড়পদার্থগুলি অপ্রধান বা গৌণ নহে, তখন জড়পাদর্থ ই মুখ্য, জড়পদার্থই প্রধান। রাজার যেরূপ সমস্ত কার্য্যই ভৃত্য ও অমাত্যাদির দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তিনি স্বয়ং কোন কার্য্যই করেন না, এমন কি, তাঁহার গমনাগমন কার্য্যও নিজে করেন না, তাহাও বাহক-বেহারা বা অশ্বাদির দ্বারা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, সেইরূপ শরীরের অভ্যন্তর ও বাহিরে যে কোনরূপ ক্রিয়া হইতে দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই তোমার "আমির" সেই অপ্রধান বা গৌণাঙ্গস্বরূপ প্রকৃত্যাদি জড়পদার্থের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়;—কোন ক্রিয়া বুদ্ধিদ্বারা নিষ্পন্ন হয়, কোন ক্রিয়া অভিমানের দ্বারা, কোন ক্রিয়া মনের দ্বারা, কোন ক্রিয়া ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, কোন ক্রিয়া প্রাণাদির দ্বারা এবং কোন ক্রিয়া দেহের দ্বারা সম্পাদিত হয়। দেহের দ্বারা বাহিরের বস্তুর উপর ক্রিয়া হয়,—যেমন হস্ত দ্বারা কোন বস্তুর গ্রহণাদি করা, পদের দ্বারা গমনাগমন করা ইত্যাদি। আর প্রাণের দ্বারা ফুস্‌ফুস্ হৃৎপিণ্ডাদির ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় "প্রাণমুখ নাসিকা গতি-বা হৃদয় বৃত্তিঃ" (পা-দ-৩-পা ৩৮ সূ) সমানের দ্বারা পাকস্থলী, ক্ষুদ্রপাকস্থলী ও যকৃৎপ্রভৃতির ক্রিয়া হয়, "সমংনয়নাৎ সমানশ্চানাভিবৃত্তিঃ" (ঐ) অপানের দ্বারা মল মূত্রাদি বিষাংশ-বিমোক্ষণের ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় "অপনয়নাদপানশ্চাপাদতলবৃত্তিঃ" (ঐ) উদানের দ্বারা আত্মার উদ্গতি নিষ্পন্ন হয় "উন্নয়নাদুদানশ্চাশিরোবৃত্তিঃ" (ঐ) ব্যানের দ্বারা সমস্ত রক্তবহা নাড়ীর রক্তবহন ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। "ব্যাপীব্যানঃ" (ঐ) ** এবং "প্রতিশাখা নাড়ী সহস্রাণি ভবন্তি আসুব্যান-শ্চরতি" (প্রশ্নোপ ৩ প্র) আর কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা হস্তপদাদির কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, এবং চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞানের কার্য্য, মনের দ্বারা কল্পনা ও চিন্তাদি কার্য্য, অভিমানের দ্বারা অহঙ্কার, আর বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চয়জ্ঞান ও অধ্যবসায়াদি কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ" (গীতা) 'জড়পদার্থের দ্বারাই সমস্ত ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়' আর তোমার সেই মুখ্য "আমি" চৈতন্য কোন ক্রিয়াই করেন না, অথচ তিনিই সমস্ত কার্য্যের স্বামী, সমস্ত কার্য্যের প্রভু; রাজা যেমন কোন ক্রিয়া না করিলেও, পুরের স্কন্ধে চলিলেও, ঐ সকল ভৃত্যাদির স্বামী; কারণ তিনি নিজে কার্য্য না করিলেও, তাঁহা হইতেই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া উহারা সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া

থাকে;—কাহার কি কার্য্য, কি রূপে কি করিতে হইবে, তাহার শিক্ষা ও জ্ঞান রাজা হইতেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং উহারা যেই যেকোন কার্য্য করুক, তৎসমস্ত একমাত্র রাজারই পরিতৃপ্তির নিমিত্ত, উহাদের নিজের জন্য উহার কিছুই না। সেইরূপ জড় শক্তিগুলিও এই দেহের মধ্যে যে কোন কার্য্য নিষ্পন্ন করে, তাহা ইহাদের নিজের তৃপ্তি সাধনের নিমিত্ত কিছুই নয়, সমস্তই সেই রাজাস্বরূপ চৈতন্য-পুরুষের পরিতৃপ্তির নিমিত্ত। আমাদের বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সকলেই জড়পদার্থ, সুতরাং সকলেই মৃৎপিণ্ডাদির ন্যায় অন্ধ,—প্রকাশশূন্য দ্রব্য। অতএব ইহাদের ক্রিয়া-শক্তি থাকিলেও মৃৎপিণ্ডের ন্যায় নিজ নিজের সত্তার—অস্তিত্বের-প্রকাশও হয় না। অর্থাৎ উহারা যে এক একটী বিদ্যমান পদার্থ, তাহাই উহারা নিজে নিজে দেখিতে পায় না। সুতরাং অন্য বস্তুর অস্তিত্বও প্রকাশ করিতে পারে না, অগত্যা নিয়মপূর্ব্বক কোন ক্রিয়া করা উহাদের সাধ্যায়ত্ত নয়। কিন্তু তথাপি চৈতন্যের সহিত যোগ থাকাতেই ঐ সকল জড় শক্তি চেতন হয়; অন্ধকার স্থিত লৌহপিণ্ড যেমন অত্যন্ত উত্তাপের সহিত সংযুক্ত হইলে, নিজেও প্রকাশিত হয়, এবং নিকটবর্ত্তী বস্তুকেও প্রকাশিত করে, তদ্রূপ তোমার বুদ্ধি, মন প্রভৃতি জড় পদার্থগুলিও, সেই স্বপ্রকাশ পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইয়া, নিজেও প্রকাশিত হয়, এবং নিকটবর্ত্তী-বস্তুকেও প্রকাশিত করে, তাহাদের জ্ঞান জন্মায়, এবং তুমি যে মৃৎপিণ্ডের ন্যায় অন্ধ নও, তাহাও বুঝিতে পার, তোমার অস্তিত্বটি বুঝিতে পার। সুতরাং তোমার ঐ অন্ধজড় শক্তিগুলি বিচারপূর্ব্বক সমস্ত কার্য্য করিতে পারে, এবং চৈতন্য কেবল সাক্ষী-স্বরূপে অবস্থিতি করেন। ইহাই শ্রুতিও বলেন,—"সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ" "তিনি স্বয়ং কোন কার্য্য করেন না, তিনি সমস্ত ক্রিয়াগুণ শূন্য পদার্থ, তিনি কেবলই চৈতন্য, কেবলই প্রকাশ, তিনি কেবল সাক্ষী-স্বরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সহিত যোগ থাকাতেই জীবের বুদ্ধি, মন প্রভৃতি জড় পদার্থ গুলি প্রকাশ প্রাপ্ত হয়"।

আরও একটী দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা যাউক, তাহা হইলে, আর একটু বিশদভাবে বিষয়টী বুঝিতে পারিবে। এই পৃথিবী যদি ঘোরতমসাচ্ছন্ন থাকে,

কোন নক্ষত্র বা চন্দ্র প্রভৃতি কোন প্রকারজ্যোতির্য্যুক্ত পদার্থই প্রকাশিত না থাকে, তবে, ইন্দ্রিয়াদি সমস্তশক্তি বিদ্যমান থাকিতেও, তুমি কোন কার্য্যই করিতে পার না। কিন্তু যখন অনন্ততেজো-ভাণ্ডার সূর্য্যদেব প্রকাশিত হইয়া সকল বস্তুকে প্রকাশিত করেন, তখনই লোক দেখিয়া শুনিয়া কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু সূর্য্য কেবল বস্তু সমূহের প্রকাশ মাত্রই করিতেছেন, তদ্ব্যতীত, তিনি নিজহস্তে কাহাকেও কিছু করাইয়া দিতেছেন না; সেইরূপ, চৈতন্যের দ্বারা কেবল তোমার অন্ধকারাচ্ছন্ন জড় শক্তি গুলি প্রকাশিত মাত্রই হয়। প্রকাশ হইলেই তোমার বুদ্ধি প্রভৃতি জড় শক্তিগুলি আপনারাই কার্য্য করিতে পারে, এ নিমিত্ত রাজার ন্যায় চৈতন্যই তোমার জড়শক্তির স্বামী. এবং তোমার মুখ্যতম "আমি", অথচ ইঁহার কোনই ক্রিয়া নাই। দার্শনিকগণও একবাক্যে এই মতের সমর্থন করেন,--"নিগু ণস্য তদসম্ভবাদহ-ঙ্কার ধর্ম্মাহেতে" (সাঙ্খ্য) " চৈতন্য স্বরূপ আত্মা নির্গুণ ও নিষ্কর্ম্ম পদার্থ, তাঁহাতে কোন গুণ বা কোন ক্রিয়ানাই। অতএব তোমার সুখ দুঃখ, ইচ্ছা ক্রিয়া, অদৃষ্ট প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই তোমার জড়শক্তির ধর্ম্ম।"

কিন্তু হইলে কি হয়, তোমার জড়শক্তি আর ঐ চৈতন্য এতদুভয়ের এরূপ অলৌকিক গুরুতর সংযোগ আছে. যে, তদ্দ্বারা যেন চৈতন্য স্বরূপ আত্মা আর ঐ বুদ্ধি প্রভৃতি জড়শক্তি গুলি এক হইয়া গিয়াছে, জ্বলন্ত অঙ্গার ও তদীয় তাপ যেমন এক হইয়া যায়, চৈতন্য আর মন প্রভৃতি জড়বস্তুগুলিও, তেমন ভিন্নকরা অতি কষ্টকর। এজন্য,"তস্মাৎ তৎসংযোগা দচেতনং চেতনা-বদিব লিঙ্গম্। গুণ কর্তৃত্বেপিতথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ" (সাঙ্খ্য কারিকা) "মন প্রভৃতি জড়পদার্থগুলি বাস্তবিক অচেতন পদার্থ হইয়াও, সেই চৈতন্য পদার্থের সংযোগে চেতনপদার্থের ন্যায় প্রতিভা পাইতেছে, আবার মন প্রভৃতি শক্তিই, বাস্তবিক পক্ষে, সকল প্রকার কার্য্যের কর্ত্তা এবং চৈতন্য একবারে অকর্ত্তা হইলেও, সেই কর্ত্তা-জড়শক্তির সংযোগে উদাসীন পরমাত্মাও দেহের কর্ত্তা বলিয়া প্রতিভাত হইতেছেন। 'অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহ মিতিমন্যতে' (গীতা)

এইরূপে জড়শক্তি আর চৈতন্য এতদুভয়ের গুণ পরস্পর উভয়েতে আরোপিত হয়। স্বভাব-শীতল লৌহপিণ্ড যেমন অত্যন্ত উত্তাপের সহিত

সংযুক্ত হইলে তাপ আর লৌহ্ এক হইয়া গিয়া লৌহের গুণ তাপে, এবং তাপের গুণ লৌহে আরোপিত হয়, অর্থাৎ সেই উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডের স্পর্শে যখন কোন বস্তু দগ্ধ হইয়া যায়, তখন বলা হয় যে "লোহায় হাত পুড়িল" কিন্তু বাস্তবিক লোহায় কখনও কিছু পোড়ে না, পোড়ে তাপে, সুতরাং এখন তাপের গুণই লোহায় আরোপ করা হইল। আবার যখন ঐ তপ্ত লৌহপিণ্ডকে বলা হয় যে, "অগ্নিটা বড় ভারী" তখন লৌহের গুণ তাপে আরোপ করা হয়। কারণ ভারত্ব লৌহের গুণ; তাপ কখনও হাল্‌কা বা ভারী হইতে পারে না। সেইরূপ আমরাও যখন আমাদের বুদ্ধি, মন প্রভৃতি জড়পদার্থ-গুলিকে "আমি" বলিয়া লক্ষ্য করিয়া মনে-মনে অনুভব করি যে, "আমি চেতন পদার্থ," তখন চৈতন্যের ক্ষমতা, জড়পদার্থ-অন্তঃকরণাদিতে আরোপ করা হয়; কারণ মন প্রভৃতি অন্তঃকরণের নিজের চৈতন্য নাই। আবার যখন সেই মুখ্য "আমি কে" লক্ষ্য করিয়া মনে করি যে, "আমি বিলক্ষণ চিন্তাশীল" ইত্যাদি, তখন জড়ের গুণ চৈতন্যে আরোপ করা হয়। কারণ আমাদের চিন্তাদি ক্ষমতা চৈতন্যের নহে—উহা মনের ক্ষমতা, তবে চৈতন্যের সহিত সংযোগ না থাকিলে মন অবশ্যই চিন্তা করিতে পারে না, কিন্তু তাই বলিয়া চিন্তা চৈতন্যের গুণ হয় না। সূর্য্যের আলোক না থাকিলে তুমি গমন করিতে পার না, বলিয়া গমন করা সূর্য্যালোকের গুণ নহে, গমন করা আমারই দেহের গুণ বা ক্রিয়া।

এইরূপে সুখ, দুঃখ, মোহ প্রভৃতি সমস্তগুলি জড়গুণ তোমার সেই মুখ্য 'আমি' চৈতন্যে আরোপিত হইয়া, তুমি নানাপ্রকার দুঃখাদির দ্বারা পরি-পীড়িত হইতেছ, "কর্ত্তাস্মীতি নিবধ্যতে" (শ্রুতি)। কিন্তু যদি কোন কৌশলে এই মিথ্যা আরোপটি না হয়, তবে আর তোমার মুখ্য 'আমি'র (চৈতন্য-স্বরূপ আত্মার,) কোনরূপ দুঃখই থাকে না, তখন জড়ের গুণ জড়েই থাকে, দুঃখাদি কোন প্রকার জড় ধর্ম্মই তোমার প্রকৃত 'আমি'কে সংস্পর্শ করিতে পারে না, ইহা বাস্তবিক তত্ত্ব, বাস্তবিক সত্য।

এই পরম সত্য মহামন্ত্র স্মরণ রাখিয়া যদি সমস্ত কার্য্যের কর্তৃত্ব হইতে নিজের আত্মাকে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে রাখা যায়, তবে তাহারই নাম ঔদাসীন্য" বা "ঊদাসীনতা"। উদাসীনতা থাকিলে কোন প্রকার জড়গুণই

আত্মাকে সংস্পর্শ করে না, সুতরাং আত্মার দুঃখাদি কিছুই থাকে না, সর্ব্বদাই অপরিমিত আনন্দ সমুদ্রে ভাসিতে থাকে। ঔদাসীন্য পদার্থটি কি বুঝিতে পারিলে, এখন তাহার বিভাগাদি শ্রবণ কর।

ঔদাসীন্যের বিভাগ।

উক্ত ঔদাসীন্য বা উদাসীনতা নামক মহাধর্ম্ম প্রথমে ছয় প্রকারে বিভক্ত। ১ম, "দৈহিক ঔদাসীন্য", ২য়, "ঐন্দ্রিয়িক ও প্রাণিক ঔদাসীন্য", ৩য়, "মানসিক ঔদাসীন্য," ৪র্থ, "আভিমানিক ঔদাসীন্য" ৫ম, "বৌদ্ধ ঔদাসীন্য" এবং ৬ষ্ঠ, "প্রাকৃতিক ঔদাসীন্য"। দেহের কৃত কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব হইতে আত্মাকে পৃথক্ রাখার নাম "দৈহিক ঔদাসীন্য"; ইন্দ্রিয়গণ ও প্রাণাদির কৃত কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব হইতে আত্মাকে পৃথক্ রাখার নাম "ঐন্দ্রিয়িক ও প্রাণিক ঔদাসীন্য"; মানসকৃতকার্য্যের কর্ত্তৃত্ব হইতে আত্মাকে পৃথক্ রাখার নাম 'মানসিক ঔদাসীন্য'; অভিমানের কৃতকার্য্যের কর্ত্তৃত্ব হইতে আত্মাকে পৃথক্ রাখার নাম 'আভিমানিক ঔদাসীন্য'; বুদ্ধির কৃতকার্য্যের কর্ত্তৃত্ব হইতে আত্মাকে পৃথক্ রাখার নাম, 'বৌদ্ধ ঔদাসীন্য', এবং প্রকৃতির কৃতকার্য্যের কর্ত্তৃত্ব হইতে আত্মাকে পৃথক্ রাখার নাম 'প্রাকৃতঔদাসীন্য'। এই হইল ছয় প্রকার ঔদাসীন্য, এখন ইহাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন ফলও বলা যাইতেছে।

যখন 'দৈহিক ঔদাসীন্যের' বিকাশ হয়, তখন দৈহিকদুঃখাদি আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না, এবং 'ঐন্দ্রিয়িক ও প্রাণিকঔদাসীন্য' হইলে ঐন্দ্রিয়িক দুঃখাদিও সংস্পর্শ করে না। 'মানসিকঔদাসীন্য' হইলে মানসিক দুঃখাদি আত্মাকে অভিভব করে না। 'আভিমানিক ঔদাসীন্য' হইলে আভিমানিক দুঃখাদি আত্মাকে সুখী দুঃখী করে না। 'বৌদ্ধ ঔদাসীন্য' হইলে, বুদ্ধির দুঃখাদি আত্মার কিছুই করে না এবং 'প্রাকৃত ঔদাসীন্য' হইলে প্রকৃতির দুঃখাদি ও আত্মাকে সংস্পর্শ করে না।

উক্ত ষড়্‌বিধ ঔদাসীন্যের প্রত্যেকটিই স্বল্প, মধ্যম ও অতিমাত্রভেদে তিন প্রকারে বিভক্ত হইতে পারে। যথা 'স্বল্প দৈহিক ঔদাসীন্য", 'মধ্যমদৈহিক ঔদাসীন্য' এবং 'অতিমাত্রদৈহিক ঔদাসীন্য'; 'স্বল্প ঐন্দ্রিয়িক

ঔদাসীন্য,' 'মধ্যম ঐন্দ্রিয়িক ঔদাসীন্য, এবং অতি মাত্র ঐন্দ্রিয়িক ঔদাসীন্য; 'স্বল্প মানসিক ঔদাসীন্য,' 'মধ্যম মানসিক ঔদাসীন্য,' এবং 'অতিমাত্র মানসিক ঔদাসীন্য;' এইরূপ আভিমানিক, বৌদ্ধ, ও প্রাকৃত ঔদাসীন্য সম্বন্ধেও বুঝিবে। দেহের কৃতকর্ম্মের কর্তৃত্ব হইতে, সম্পূর্ণরূপে আত্মাকে পৃথক্ রাখার নাম 'অতিমাত্র দৈহিক ঔদাসীন্য', এবং অত্যল্প অস্ফুটমত পৃথক্ রাখা 'স্বল্প দৈহিক ঔদাসীন্য, আর ইহার মধ্যম অবস্থায় পৃথক্ রাখার নাম 'মধ্যম দৈহিক ঔদাসীন্য'। এই রূপ স্বল্প—ঐন্দ্রিয়িকঔদাসীন্যাদিও জানিবে।

ঔদাসীন্যের স্বল্প, মধ্যম, ও অতিমাত্র মাত্রানুসারে দেহাদির দুঃখভোগের হ্রাসও স্বল্প, মধ্যম এবং অতিমাত্র মাত্রায়ই জান্মবে। অর্থাৎ স্বল্প দৈহিক ঔদাসীন্য হইলে, দৈহিক সুখ দুঃখের স্পর্শও আত্মাতে স্বল্পমাত্রায়ই হ্রাস প্রাপ্ত হইবে, এবং অতিমাত্র দৈহিক ঔদাসীন্য হইলে দৈহিক সুখ দুঃখের অতিমাত্র ক্ষয়, আর এতদুভয়ের মধ্যম অবস্থার ঔদাসীন্য হইলে দৈহিক সুখ দুঃখেরও মধ্যমাবস্থায় হ্রাস হইবে; এইরূপ 'স্বল্প ঐন্দ্রিয়িক ঔদাসীন্যাদিতে' ও জানিবে। এই হইল ঔদাসীন্যের বিভাগ এবং ফল; এখন ইহার উৎপত্তির নিয়ম বলা যাইতেছে,—

আমাদিগের দেহাত্মজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া যখন "ইন্দ্রিয় প্রাণাত্ম জ্ঞান জন্মে, তখন দৈহিক ঔদাসীন্য ধর্ম্ম বিকাশিত হয়, এবং ইন্দ্রিয় প্রাণাত্মজ্ঞান নিবৃত্তি হইয়া যখন মানসাত্মজ্ঞান জন্মে, তখন "ঐন্দ্রিয়িক ও প্রাণিক ঔদাসীন্য প্রকাশিত হয়। এই রূপ উপরিস্থ স্তরের এক একটিতে আত্মজ্ঞান হইলে, তাহার নিম্নস্থ স্তরে ঔদাসীন্য জন্মিয়া থাকে। ঊর্দ্ধতন এক এক প্রকার আত্মজ্ঞানের সমকাল ব্যতীত কোন প্রকার ঔদাসীন্যই হইতে পারে না। যতক্ষণ এই স্থূলতম দেহটাকেই আত্মা বলিয়া অনুভব হইতে থাকে,—দেহের সহিত অভিন্নভাবে আত্মাকে উপলব্ধি করা হয়, ততক্ষণ জন্ম সহস্রেও দেহের কৃতকার্য্যকে "আত্মার কার্য্য (আমার কার্য্য) নয়" বলিয়া ঐ কার্য্যের কর্তৃত্ব হইতে আত্মাকে—পৃথক্ রাখিতে পারিবে না, সুতরাং দৈহিক ঔদাসীন্য হইবে না। কিন্তু দেহাত্মজ্ঞান নিবৃত্তি হইলে অন্যের দেহের ন্যায় এই দেহই নিজ হইতে ভিন্ন বলিয়া অনুভূত হয়, অতএব অন্যের কৃত কার্য্যের কর্তৃত্ব যেমন

আমাকে সংস্পর্শ করেনা, তেমন এই দৈহিক কার্য্যের কর্তৃত্বও আত্মাতে বর্ত্তিতে পারে না।

ঐন্দ্রিয়িক ও প্রাণিক ঔদাসীন্যাদি সম্বন্ধেও এই রূপই জানিবে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞান থাকিতে, ঐন্দ্রিয়িক ঔদাসীন্য কদাচ হইতে পারে না, এবং মানসাত্মজ্ঞান থাকিতে, কদাপি মানসিক ঔদাসীন্য প্রকাশিত হইবে না, অতএব আত্মজ্ঞানের ন্যায় ঔদাসীন্যও এক এক প্রকার নিরোধের কার্য্য ইহা অবধারিত হইল; এখন এ বিষয় বিশেষ রূপে বুঝান যাইতেছে শ্রবণ কর।

মনে কর, প্রথমে তোমার ইন্দ্রিয়বৃত্তিনিরোধ (৬৭পৃ) হইল, তখন পূর্ব্বোক্ত রীত্যনুসারে (৯৫পৃ) তোমার দেহাত্মজ্ঞান নিবৃত্তি হইয়া ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞান হইতে লাগিল। এ অবস্থায় দেহকেই যখন তুমি আত্মা বলিয়া বুঝিতেছ না, তখন তোমার নিজের দেহই, রামদাস শ্যামদাসের দেহের ন্যায় বিভিন্ন হইয়া থাকিল। সুতরাং রামদাসের কৃত কার্য্যে, যেরূপ তোমার কেন কর্ত্তৃত্ব থাকে না, সেইরূপ তোমার নিজ দেহের কৃতকার্য্যেই তোমার আত্মার কর্তৃত্ব বোধ থাকিবে না, সুতরাং দৈহিক ঔদাসীন্য হইল। এইরূপে ইন্দ্রিয়নিরোধের দ্বারা ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞান নিবৃত্তি হইয়া, এক সময়ই মানসাত্মজ্ঞান ও ঐন্দ্রিয়িক ঔদাসীন্য হইবে, তৎপর মানস নিরোধের দ্বারা মানসাত্মজ্ঞান নিবৃত্তি হইয়া, অভিমানাত্মজ্ঞানের সঙ্গেই মানসিক ঔদাসীন্য হইবে, এবং অভিমান নিরোধের দ্বারা অভিমানাত্মজ্ঞাননিবৃত্তি পূর্ব্বক বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞানের সঙ্গেই আভিমানিক ঔদাসীন্য হইবে, পরে বুদ্ধিনিরোধের দ্বারা বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞান নিবৃত্তিপূর্ব্বক, প্রকৃত্যাত্মজ্ঞানের সঙ্গেই বৌদ্ধ ঔদাসীন্য হইবে, পরে প্রকৃতিনিরোধের দ্বারা প্রকৃত্যাত্মজ্ঞাননিবৃত্তিপূর্ব্বক যথার্থ আত্মজ্ঞানোৎপত্তির সঙ্গেই প্রাকৃত ঔদাসীন্য হইবে। এইরূপে নিরোধ-শক্তি হইতে ঔদাসীন্য মহাধর্ম্মের বিকাশ হয়।

শিষ্য। আত্মজ্ঞান ও ঔদাসীন্য নামক মহাধর্ম্ম দুটির এ পর্য্যন্ত যে কিছু বলিলেন, তাহাতে বুঝিলাম যে, চরম আত্মজ্ঞান ও চরম ঔদাসীন্য রূপ ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে হইলে, আত্মার সকল প্রকার ক্রিয়া বা বৃত্তিকে এককালীন অবরুদ্ধ করিতে হয়, নতুবা উচ্চতম আত্মজ্ঞান, ও উচ্চতম

ঔদাসীন্য হইতে পারে না। কিন্তু যদি শরীরের মধ্যে কোন প্রকার ক্রিয়াই আদৌ না হয়. তাহা হইলে, হয় মৃত্যু, না হয়, মহা মূর্চ্ছা হইবে, তাহা নিশ্চিত? কারণ শরীরের ক্রিয়াই জীবন বা চেতনাবস্থার লক্ষণ; তবে কি আপনার এই সিদ্ধান্ত হইল যে, ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে হইলে, মৃত্যু কিম্বা অচৈতন্য হওয়া আবশ্যক? জীবিত বা চেতন থাকিয়া আত্মজ্ঞানাদি হওয়া কদাপি সম্ভবে না কি?

আচার্য্য।—উচ্চতম আত্মজ্ঞান ও উচ্চতম ঔদাসীন্য-ধর্ম্ম সাধনের প্রথম অবস্থায়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মজ্ঞান ও ঔদাসীন্যাদি থাকে ততক্ষণ, মৃত্যু অবশ্যই হয় না বটে, কিন্তু মহামূর্চ্ছার ন্যায় অচেতন অবস্থা নিশ্চয়ই হয়, তাহা সত্য; এবং ধ্যানভঙ্গ হইয়া, চেতন হইলেই আবার সেই আত্মজ্ঞান ও ঔদাসীন্য তিরোহিত হয়, তাহাও সত্য। পরন্তু ক্রমাগত এই অনুষ্ঠান করিতে করিতে, অভ্যাসের পরিপক্কতাবস্থায় অবশেষে এক সময়েই শরীরের ক্রিয়া ও আত্মজ্ঞানাদি ধর্ম্ম প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহাই শাস্ত্র বলিয়াছেন, "স যদত্র কিঞ্চিৎপশ্যতি অনন্বাগত স্তেন ভবতি স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব"—(শ্রুতি) "আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ কারের অভ্যাস পরিপাট্য দ্বারা, অবশেষে আত্মা একই সময়ে সেই আনন্দময় লোক এবং বাহ্যজগৎ, এতদুভয়লোকে বিচরণ করিয়া থাকেন, আত্মা একদাই যেন ধ্যান নিমগ্ন এবং বিষয়ব্যাপারে ব্যাপৃত বলিয়া লক্ষিত হয়েন; এ অবস্থায় তিনি যে সকল কার্য্য করেন, তাহাতে কিছুমাত্র আসক্ত হয়েন না।" ইহার তাৎপর্য্য এই—কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বেই সেই কার্য্যের কারণটি থাকা আবশ্যক, কিন্তু কার্য্যনিষ্পত্তির পরে, কারণ না থাকিলেও কোন অনিষ্ট হইতে পারে না; ইহাই কার্য্য ও কারণের নিয়ম। শস্যের উৎপত্তির পূর্ব্বেই ক্ষেত্র থাকা নিতান্ত আবশ্যক হয়, কিন্তু শস্য পক্ক হইলে, তাহা কর্ত্তন করিয়া নিলে, তখন আর সেই ক্ষেত্রে পুষ্করিণী হইলেও কোনই হানি হয় না। এবং সন্তান উৎপত্তির পূর্ব্বেই পিতামাতার থাকা চাই, কিন্তু আপন শরীর হইতে সন্তান প্রসব করিবার পরে, মাতা বিনষ্টা হইলেও সন্তান বিদ্যমান থাকিবে। সেইরূপ, ধর্ম্মবিকাশ ও ধর্ম্মোন্নতির পূর্ব্বে, আত্মার অধঃস্রোত-

স্থিনী গতির নিরোধ করা চাই, কিন্তু ধর্ম্মের পরিপক্কতা হইলে, তখন নিরোধ না থাকিলেও ধর্ম্মনাশের কোন আশঙ্কা নাই। নিরোধশক্তির ক্রমিক অভ্যাস দ্বারা প্রবল সত্ত্বগুণ-সমুদ্ভূত আত্মজ্ঞানের শক্তি, আত্মজ্ঞান ও ঔদাসীন্যাদিধর্ম্মগুলি ক্রমাগত পূর্ণভাবে বিকসিত হইতে হইতে মনের মধ্যে উহার সংস্কাররাশি (১৩পৃ-২পঃ) সঞ্চিত হইতে থাকে, সঞ্চিত হইয়া যখন সেই সংস্কার গুলি অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে, তখন ঐ সংস্কার বলে, আপনাআপনিই ঐ সকল ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলি স্ফুরিত হইতে থাকে। সুতরাং তখন সেই পূর্ব্বকার নিরোধ শক্তি না থাকিলেও সঞ্চিতধর্ম্মের বিনাশ হইবে কেন? তাহা কদাচ সম্ভবপর নহে। এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তির বিরোধী বিষয়ানুরাগ বা দেহাভিমান প্রভৃতি কোন অপকারক বৃত্তিও তখন হইতে পারে না, অথচ বিলক্ষণ রূপ চেতন থাকিয়া, সমস্ত বিষয়কার্য্য করা যায়।

ইহা কিরূপ তাহা শুন;—মনেকর, তুমি যেন সমাধি করিয়া সহস্রবার পরমাত্মার উপলব্ধি করিয়াছ—সহস্রবার বুঝিতে পারিয়াছ যে, পরমাত্মা সাক্ষাৎ বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, তিনি তোমার দেহাদি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং নিতান্ত নির্গুণ ও নির্ধর্ম্ম পদার্থ। এবং যখন ঐ রূপ আত্মজ্ঞান হইয়াছে, তখন অবশ্যই তোমায় কোন আন্তরিক চিন্তা, অনুভূতি বা বাহ্য-জ্ঞানাদি কিছুই ছিল না, এবং পরে তুমি যখন চেতন হইয়া উঠিলে তখন তোমার বাহ্যজ্ঞান হইল। কিন্তু এখন বাহ্যজ্ঞান হইলেও সেই সমাধি অবস্থায় তুমি যে সকল পরমসত্য অনুভব করিয়াছ, তাহার প্রগাঢ় সংস্কার সেই সত্যগুলি অবশ্যই তোমার মনে পড়িবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং সেই পরমসত্য আত্মজ্ঞানের বিষয় স্মরণ থাকিতে, ঐ স্থূল দেহই তোমার আত্মা, এইরূপ মিথ্যাজ্ঞান-স্বরূপ (দেহাভিমান) হইতে কখনই অবকাশ পাইবে না। যথার্থ জ্ঞান থাকা সময়ে মিথ্যাজ্ঞান কদাচ আস্পদ করিতে পারে না। অন্ধকারাচ্ছন্ন ক্ষুদ্রবৃক্ষটিকে একবার বৃক্ষ বলিয়া জানিতে পারিলে, তাহা স্মরণ থাকিতে, কখনও আর সেই বৃক্ষকে ভূতজ্ঞান করিয়া কেহই ভয়োদ্বিগ্ন হয় না। অতএব আত্মজ্ঞানের স্মরণ থাকিতে, কখনই দেহাভিমান হইতে পারে না, এবং দেহাভিমান না হইলে, দেহাভিমান-মূলক বিষয়ানুরাগও অবশ্যই হইবে না। যেরূপ আত্মজ্ঞানের

বিষয় বলিলাম, এইরূপ ঔদাসীন্য ধর্ম্মেরও ধ্যানাবস্থায়, সহস্র সহস্র বার অনুশীলনের দ্বারা দেহ ও আত্মার পার্থক্য এবং পরমাত্মার অকর্তৃত্বাদি অনুভব করিলে, জাগ্রৎ অবস্থায় ও তাহার জাজ্জ্বল্যমান স্মরণ থাকা নিবন্ধন, দেহাভিমান বা বিষয়ানুরাগাদি নীচ বৃত্তি গুলির মনে আসিবার অবকাশই থাকে না। ভ্রান্তি ও অভ্রান্তি এক সময়ে হয় না; রাগ, বৈরাগ্যও এক সময়ে হয় না।

কিন্তু তদ্দ্বারা দৈহিক কার্য্য নিষ্পন্ন হওয়ার কোন বাধা হয় না। কারণ "সংস্কারলেশতস্তৎ সিদ্ধিঃ" (সাঙ্খ্যদর্শন)। এই বহুমূল্য সূত্রটির তাৎপর্য্য বুঝিবার পূর্ব্বে আরও একটি বিষয় স্মরণ করিয়া লও। একটি ক্লক্ ঘড়ীর স্প্রিংএর পূর্ণবেগ থাকিতে, এক একবার পেণ্ডুলমটী বন্ধ করিলে পরে, আবার কর সংসর্গ মাত্রেই পেণ্ডুলমটী দোলিতে থাকে, এবং পুনর্ব্বার ঘড়ীর অন্য সমস্ত যন্ত্রের ও ক্রিয়া হইতে থাকে, ইহা অবশ্যই অবগত আছ। কিম্বা মনে কর, রেলওয়ের গাড়ী শ্রেণী পূর্ণবেগে চলিতেছে, এখন হঠাৎ, ব্রেক্‌ম্যান ব্রেক্ কসিয়া এঞ্জিনের গতি স্থগিত করিল, কিন্তু পরে আবার ব্রেক্ ছাড়িয়া দিলেই হুহু শব্দে গাড়ী সমূহ চলিবে। এই দৃষ্টান্ত দুটী এইখানে যোজনা করিতে হইবে। আমাদের দেহের অভ্যন্তরের মস্তিষ্ক অবধি বাহিরের চর্ম্মাবরণ পর্য্যন্ত যাহা কিছু আছে, তৎসমস্ত যে এক একটি যন্ত্র স্বরূপ, ইহা বারংবার প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এই সমস্ত যন্ত্রগুলিকে আমরা জন্মের সময়েই এরূপ একটি পূর্ণবেগ দিয়া রাখিয়াছি,—যদ্দ্বারা জীবন থাকা পর্য্যন্তই ঐ যন্ত্রগুলি কার্য্য করিতে পারে। পরে নিরোধশক্তি দ্বারা সেই সমস্তগুলি যন্ত্রের গতিই অবরুদ্ধ করা গেল। অনন্তর আবার যখন ঐ নিরোধের শৈথিল্য হইবে, তখন মনে পূর্ব্বকৃত অধঃস্রোতস্বিনী বৃত্তির সংস্কার গুলির লেশমাত্র পরিস্ফুরিত হইলেই মস্তিষ্ক নর্ত্তন করিয়া উঠিবে। শরীরের সমস্ত যন্ত্রই আবার স্ব স্ব ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইবে। কিন্তু এই ক্রিয়ার বেগ পূর্ব্বাপেক্ষা কম হইবে, সন্দেহ নাই। এ দিকে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি গুলিও উদ্দীপ্ত হইয়া, আপন আপন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে এবং আসক্তি বিহীন হইয়া, সকল প্রকার দৈহিক কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে থাকিবে। অথচ ঔদাসীন্যাদি উর্দ্ধস্রোতস্বিনী শক্তির প্রভাবে

আত্মার গতি উৰ্দ্ধমুখীই থাকিবে সন্দেহ নাই; কিন্তু কোন বিষয় চিন্তা করিতে করিতে গমন করা কালে, যেরূপ চিত্তটি সেই বিষয়েই নিমগ্ন থাকে, অথচ মধ্যে মধ্যে এক একবার অতি সূক্ষ্মকালের জন্য গমনের দিকেও যায়, সেইরূপ অতি সূক্ষ্মকালের নিমিত্ত এক একবার অধঃস্রোতস্বিনী গতিও হয়। এবং সেই অতি সামান্য কালের নিমিত্ত, যে এক একটু অধঃস্রোতস্বিনী গতি হয়, তদ্দ্বারাই সমস্ত শরীর-যন্ত্রের কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, এ নিমিত্ত বোধ হয়, যেন ঠিক এই সময়ই আত্মার ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনী এবং অধঃস্রোতস্বিনী এই উভয় প্রকার গতিই হইতেছে, কিন্তু তদ্দ্বারা আত্মার কোন অনিষ্ট হইতে পারে না।

আরও;—উক্ত অবস্থাপন্ন মহাত্মা, যৎকাল পর্য্যন্ত অসমাহিত অথবা জাগ্রৎ ভাবে থাকেন, ততক্ষণ কেবলই জাগ্রৎ থাকেন তাহা নহে, তাঁহার ঐ অবস্থায় সমাধিও থাকে। অর্থাৎ তিনি যদি ৫ ঘণ্টা জাগ্রৎ থাকেন, তবে তন্মধ্যে হয়ত ৪ ঘণ্টা সমাধিতে থাকেন, আর ১ ঘণ্টা জাগ্রৎ থাকেন, কিন্তু একক্রমে চারি ঘণ্টা ও এক ঘণ্টা নহে, উহা মধ্যে মধ্যে ফাঁক দিয়া। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—তাদৃশ মহাত্মার পূর্ব্বাভ্যস্ত প্রবল নিরোধ শক্তির প্রবলতর সংস্কার গুলি মনের মধ্যেই থাকে, তাহা মন হইতে বিদূরিত হয় না। আবার এদিকে সংস্কার বিকাশের নিয়ম ও এই যে, যেশক্তির সংস্কারগুলি প্রবল থাকে, সেই সংস্কার গুলিই বারংবার বিকাশিত হয়। এ জন্য ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তির ভগবান্‌ই অধিক সময় মনে হয়েন, এবং কুপ্রবৃত্তিপরায়ণ-লোকের কুপ্রবৃত্তিরই অধিক সময় উদয় হয়। সেইরূপ নিরোধ পরায়ণ মহাত্মার জাগরণ অবস্থায় ও নিরোধ শক্তিই অধিক সময়ে বিকাশিত হয়, আবার সময় সময় ব্যুত্থান শক্তির ও কার্য্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ নিরোধ সংস্কারের প্রবলতা নিবন্ধন ৪ পল কাল যদি নিরোধশক্তি বিকাশিত হয়, তবে ১ পল মাত্র ব্যুত্থান শক্তির বিকাশ হয়। এবং যতক্ষণ নিরোধ থাকে, ততক্ষণই আত্মার পূর্ণ বিকাশ, আর যতক্ষণ ব্যুত্থান, ততক্ষণ বিষয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে। কিন্তু সময়ের সূক্ষ্ম বিভাগ বাহির হইতে লক্ষ্যকরা যায় না, এনিমিত্ত বোধ হয় যেন, তিনি সর্ব্বদাই ব্যুত্থিত, এবং সর্ব্বদাই নিরুদ্ধ, যেন সর্ব্বদাই যোগী, সর্ব্বদাই ভোগী, যেন সর্ব্বদাই আত্মজ্ঞানী

সর্ব্বদাই বিষয়জ্ঞানী; ইহারই নাম সিদ্ধাবস্থা। মহর্ষি দুর্ব্বসা, বামদেব, শ্বেতকেতু, কপিল, পতঞ্জলি, বেদব্যাস, এবং শুকদেব প্রভৃতি মহাত্মগণ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। ভগবান্ দুর্ব্বসা স্থূলদেহ লইয়া সংসার মধ্যে বিচরণ করিতেছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার আত্মা সেই আধ্যাত্ম জগতেই বিরাজিত; সেই আতাম্র রুক্ষরুক্ষ এলো থেলো জটামণ্ডল ও শুভ্র শ্মশ্রু গুম্ফে বেষ্টিত মুখমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী, দুর্ব্বাসার অত্যুজ্জ্বল শান্তপ্রভ নয়নদ্বয় যেন বিষয়াভিমুখে প্রসারিত হইয়াও হৃদয়ের গহ্বরস্থ কোন দুর্লক্ষ্য মণির অন্বেষণ করিতেছে, শ্রবণদ্বয় নানাবিধ ধ্বনি সমূহের পরিগ্রহ করিতেছে সত্য, অথচ যেন সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু শুনিতেছে। প্রত্যেক পরম ঋষিমহাত্মারই এইরূপ হয়। অতএব ধর্ম্মের অভ্যাসের পর জাগ্রৎ অবস্থায় ও ধর্ম্ম হইতে পারে, সন্দেহ নাই। ইহাই উক্ত সূত্রের ভাব।

এখন ভক্তিনামক পরমধর্ম্ম কি প্রকারে নিরোধশক্তি হইতে সমুৎপন্ন হয়, তাহা বলিতেছি, তৎপরে ধৃতি, ক্ষমা, দম প্রভৃতি ধর্ম্মের কথা বলিব। প্রথমে ভক্তি কাহাকে বলে তদ্বিষয় শ্রবণ কর!

ভগবান্ শাণ্ডিল্য মহর্ষি বলিয়াছেন, "সাপরানুরক্তিরীশ্বরে" (শাণ্ডিল্য-সূত্র-২ সূ) পিতা, মাতা, প্রভৃতি গুরুজন এবং পরমেশ্বরাদি আরাধ্যব্যক্তি বিষয়ে নির্ভয় ও নিঃস্বার্থভাবে যে স্বাভাবিক অনুরাগ হয়, তাহার নাম 'ভক্তি'। তন্মধ্যে গুরুজন বিষয়ক ভক্তিকে অপরা ভক্তি, আর পরমেশ্বর বিষয়ে ভক্তিকে পরাভক্তি বলা যায়।

উক্ত দ্বিবিধ ভক্তিই তিন ভাগে বিভক্ত হয় যথা,—মৃদু-অপরা ভক্তি, মধ্যম-অপরা ভক্তি, অতিমাত্র-অপরাভক্তি। এবং মৃদুপরাভক্তি, মধ্যম-পরাভক্তি, অতিমাত্র পরাভক্তি। গুরুজন বিষয়ে অত্যন্ত অনুরক্তির নাম অতিমাত্র-অপরাভক্তি, আর স্বল্পানুরাগের নাম মৃদুঅপরাভক্তি, এতদুভয়ের মধ্যমানুরক্তির নাম মধ্যম অপরাভক্তি। এবং পরমেশ্বর বিষয়ে স্বল্পানুরাগের নাম মৃদুপরাভক্তি, আর মধ্যম-অনুরাগ মধ্যম-পরাভক্তি, আর অতিশয়ানুরাগের নাম অতিমাত্র পরাভক্তি। এই অতি-মাত্র পরাভক্তিই ভক্তির চরম। মহাকৃপণ ব্যক্তির ধনের প্রতি যেরূপ অনুরাগ থাকে, অতিশয় স্ত্রৈণ ভাবাপন্ন লোকের স্ত্রীর প্রতি যেরূপ অনু-

রাগ থাকে, (স্বার্থপরভাবটুকু বাদ দিয়া) পরমেশ্বরের বিষয়েও সেইরূপ অনুরাগকে অতিশয় অনুরাগ বা অতিমাত্র পরাভক্তি বলে। যে অনুরাগের দ্বারা ভক্ত ভগবদ্গত প্রাণ হইয়া যান। পরমভক্তগণ এই ভক্তিই প্রার্থনা করিয়া থাকেন ;—

"যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েম্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥ (বিষ্ণু পুঃ ১অঃ ২০অ ১৭)।

মহাত্মা প্রহ্লাদ বলিতেছেন, " ভগবন্! বিষয়বান্ লোকের যেমন স্ত্রী-ধনাদি বিষয়ে নিশ্চল অনুরাগ থাকে, তোমাকে অনুস্মরণ করিতে করিতে আমারও যেন তোমার প্রতি সেইরূপ নিশ্চল অনুরাগ হয়।"

ভক্তিমাত্রেরই গতি ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনী, সুতরাং আত্মার অধঃস্রোতস্বিনী গতি থাকিতে ভক্তি হইতে পারে না। কারণ, অধঃস্রোতস্বিনী আর ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনী শক্তি, শীতোষ্ণাদির ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ। কিন্তু যে পরিমাণে অধঃস্রোতস্বিনী শক্তির হ্রাস হয়, সেই পরিমাণেই ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনী শক্তির বিকাশ হইতে পারে। শীতের মাত্রা যে পরিমাণে হ্রাস পাইবে, উষ্ণতার মাত্রা ঠিক সেই পরিমাণেই বাড়িবে। অতএব চিত্তের বিষয়াভিমুখীন গতি নিরুদ্ধ করিলেই ভক্তির বিকাশ হইতে পারে। যদি নিতান্ত অল্পমাত্রায় বিষয়াভিমুখী গতির নিরোধ হয়, তবে মৃদু ভক্তি হইবে, আর মধ্যমমাত্রায় নিরোধ হইলে মধ্যমভক্তি এবং অতিমাত্র নিরোধ হইলে অতিমাত্র ভক্তির বিকাশ হইবে। এখন ধৃতি প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি কি প্রকারে নিরোধ হইতে বিকসিত হয় তাহা বলিতেছি।

ধৃতির বিকাশ।

ধৃতি কাহাকে বলে তদ্বিষয় বলিয়াছি (৭ পৃ ৮ পং) এখন কেবল তদুৎপত্তি বিষয় বলিলেই হইবে।

কোন বস্তু দেখিলে, শুনিলে, অথবা অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা মাত্রে, যদি তৎক্ষণাৎ কিছু কালের নিমিত্ত আমাদের নয়নাদি ইন্দ্রিয়

শক্তির পরিচালনা বন্ধ হয়, তবেই উহা চিরদিনের নমিত্ত আমাদের স্মরণপথে থাকিতে পারে। আর যদি ঐ সময়ে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত স্থগিত না থাকিয়া, আবার কোন এক বিষয়ে লক্ষ্য করিতে থাকে, তবে পূর্ব্বদৃষ্ট বিষয়টির প্রগাঢ় জ্ঞান বা স্মরণ থাকা নিতান্ত অসম্ভব। কারণ প্রগাঢ়তর জ্ঞান, বা বিশিষ্টরূপ জ্ঞান হওয়া অথবা স্মরণ থাকা আমাদের ইন্দ্রিয়ের কার্য নহে, উহা মনের কার্য্য। অতএব যে বিষয়টির বিশেষরূপ জ্ঞান বা স্মরণ থাকিবে, সেই বিষয়টি লইয়া কিছুকাল পর্য্যন্ত মনের মধ্যে ক্রিয়া হওয়া আবশ্যক, এবং সেই ক্রিয়াটি হইতে গেলেও মনের একটু কাল অবকাশের প্রয়োজন, নতুবা মনের ক্রিয়া হইতে পারে না, কিন্তু তোমার ইন্দ্রিয়গণ, কোন বিষয় দেখা শুনা মাত্রে কিঞ্চিৎ কালের জন্য স্থগিত না হইলে, মনের সেই অবকাশ অসম্ভব। কারণ ইন্দ্রিয়-গণের বিষয়ের উপর বিচরণ কালে মনকেও তাহার সাহায্য দান করিতে হয়, সুতরাং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গেই ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়। অতএব ইন্দ্রিয় স্থগিত না হইলে মন অবকাশ পায় না। আর যদি ইন্দ্রিয়গণ স্থগিত হয়, তবে সেই অবকাশ মধ্যে আপন কর্ম্ম (বিশেষরূপ জ্ঞান ও স্মরণ রাখা) করিয়া লয়। মনে কর, একখানি কাগজ তোমার সন্নিহিত হইল। তখন অবশ্যই তাহার শাদা বর্ণটি গিয়া তোমায় নয়নে সংলগ্ন হইলে, নয়নেন্দ্রিয় তাহা গ্রহণ করিবে। পরে ঐ শাদা বর্ণের শক্তিটি তোমার চক্ষুর স্নায়ুর দ্বারা প্রবাহিত হইয়া, অবশ্যই মনের স্থান মস্তিষ্কপর্য্যন্ত উঠিবে। এখন ঠিক এই সময়ে যদি মনকে একটু বিবেচনা করার অবকাশ দেও, তবে সে ঐ সম্মুখস্থ কাগজ বস্তুটী, পূর্ব্বে দৃষ্ট কাগজের সহিত মিলাইয়া, যখন তাহার সমান বলিয়া বোধ করিবে, তখনই উহাকেও সেই 'কাগজ' বলিয়া বুঝিবে। আর যদি ঐ সময়ে তোমার চক্ষুরিন্দ্রিয়, একটু কাল বিশ্রাম না করিয়া, আবার ঐ কাগজখানির দিকেই অভিমুখীন হয়, তবে মন তাহারই সাহায্য করিতে থাকিল। পূর্ব্ব মতে বিবেচনার অবকাশ হইল না, সুতরাং বিশেষ জ্ঞান হইতে পারিল না। অর্থাৎ ঐ দ্রব্যটিকে কাগজ বলিয়া নির্ণয় করিতে পারিল না, সুতরাংকেবল মাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই এক প্রকার বাজারে জ্ঞান হইবে? অর্থাৎ বাজারে গিয়া যেরূপ

সহস্র সহস্র লোকজন সমষ্টিভাবে দৃষ্ট হয়, তাহার সঙ্গেসঙ্গে আরও কত দ্রব্যসামগ্রী দৃষ্টিসাৎ হয় বটে, কিন্তু, বিশেষ লক্ষ্য না করিলে তৎসমস্তেরই গোলেমালে একরূপ জ্ঞান হয়। কি কি দ্রব্য দেখিলাম, কাহাকে দেখিলাম তাহা কিছুই স্থিরতা হয় না। ইহারও কারণ—বিশেষরূপে মনোনিবেশ না হওয়া। সেইরূপ, ঐ কাগজখানি সম্বন্ধেও এক অনির্ব্বচনীয় ভাসা ভাসা জ্ঞান মাত্র জন্মিবে। সুতরাং হট্টগোলে দৃষ্টপদার্থের ন্যায় ঐ রূপে দৃষ্ট কাগজখানিরও স্মরণ থাকিতে পারে না।

• যাঁহাদের অভ্যাসপ্রভাবে নিরোধশক্তি বা সংযমেরক্ষমতা সঞ্চিত হইয়াছে, তাঁহাদের ইন্দ্রিয়াদির বল ও ইন্দ্রিয়াদির বেগ স্বভাবতই নিতান্ত খর্ব্বতা প্রাপ্ত হইয়া পড়ে, ইন্দ্রিয়াদির বল ও বেগ খর্ব্ব হইলেই স্মরণ কার্য্য অনায়াসে সাধিত হইতে পারে;—কোন বিষয়কে যতটুকু কাল মনের মধ্যে ধারণ করিয়া রাখিলে তাহার বিশেষরূপ জ্ঞান এবং স্মরণ থাকার উপযুক্ত ক্রিয়া হইতে পারে—ততটুকু কাল পর্য্যন্ত আপনা হইতেই ইন্দ্রিয়বৃত্তি স্থগিত হইয়া থাকে।

বোধ হয় কাহারই ইহা অবিদিত নাই যে, গবাশ্বাদি পশুদিগের নিরোধ শক্তি মাত্রেই নাই,—পশুরা কখনই ইচ্ছাপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গণ বা অন্তঃকরণের সংযম করিতে পারে না, পশুদের ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়ের সম্পূর্ণ অধীন, বিষয়ের দ্বারা যেরূপে পরিচালিত হয় সেইরূপই কার্য্য করিয়া থাকে, উপস্থিত মতে যাহা ঘটে, তাহাই পশুগণ করিয়া থাকে। এ নিমিত্ত উহাদের ইন্দ্রিয়শক্তি অত্যন্ত প্রবলা, সুতরাং অকাতরে অবিশ্রান্তে সর্ব্বদাই দর্শন, শ্রবণাদি আপন আপন কার্য্য নিষ্পন্ন করে, এমন কি, রাত্রিতেও পশুদিগের ইন্দ্রিয়শক্তির সম্পূর্ণ বিশ্রাম করা পরিলক্ষিত হয় না। উহারা সুষুপ্তির পরম সুখে একবারে বঞ্চিত,—উহাদের নিদ্রাও এক প্রকার জাগরণ, অথবা তন্দ্রাবিশেষ। কোন কোন পশুর আবার সেই টুকুও নাই। সুতরাং কোন একটী বিষয় দর্শন বা শ্রবণ করা মাত্রে, যতটুকু কাল ইন্দ্রিয়শক্তি সংযত হইয়া স্থগিত থাকিলে, মনের মধ্যে বিশিষ্টরূপ জ্ঞান বা স্মরণ থাকার উপযুক্ত ক্রিয়া হইতে পারে, ততটুক সময়ও স্থগিত হইয়া থাকে না। এ নিমিত্ত পশুদিগের কোন

বিষয়েরই বিশেষরূপ জ্ঞান হইতে পারে না, এবং তাহার ধারণা বা স্মরণও থাকে না। তবে অনেক বার দেখিতে দেখিতে কোন কোন পশুর অল্পকালের জন্য কিছু স্মরণ থাকা দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহা অতি অচির-স্থায়ী এবং অসম্পূর্ণ। সেই অতি সামান্য স্মরণশক্তিও লেশমাত্র নিরোধ-শক্তিরই ফল। অতএব এখন জানা গেল যে, সংযম শক্তি বা নিরোধ-শক্তি হইতেই স্মরণ শক্তির উৎপত্তি।

মনুষ্যদের স্বভাবতঃই অন্যপ্রাণী অপেক্ষায় নিরোধশক্তি অধিক পরিমাণে আছে, সুতরাং মনুষ্যের স্মরণশক্তিও স্বাভাবিকী। পরন্তু, স্বাভাবিকী হইলেও যাঁহারা সংযমের অভ্যাস না করিয়া উদ্দামপশুর ন্যায় আপনার শক্তি-গুলি যদৃচ্ছায় বিচরণ করিতে ছাড়িয়া দেন, তাঁহাদের যে কিঞ্চিৎ নিরোধ শক্তি আছে তাহাও ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া সঞ্চিতস্মরণশক্তিটুকুও তিরো-হিত হইয়া থাকে। আর যিনি সংযম শক্তির অনুশীলন করেন, তাঁহার ক্রমে এই শক্তির বৃদ্ধি হইয়া স্মরণশক্তিকে বর্দ্ধিষ্ঠ ও উন্নত করিতে থাকে। এখন ক্ষমার কথা শুন।

ক্ষমার বিকাশ।

ক্ষমা কি পদার্থ তাহা পূর্ব্বেই (৭ পৃঃ ৭ পঃ) বলা হইয়াছে, এখন ক্ষমার উৎপত্তি বিষয় বলিলেই হইবে। ক্ষমার মূল যে নিরোধ শক্তি তাহা অতি সহজেই বুঝা যায়। কারণ, ক্ষমার লক্ষণের মধ্যেই নিরোধ শক্তি রহিয়াছে। কেহ তোমার অনিষ্ট করিলে তাহার প্রত্যপকারের নিমিত্ত যখন মন উদ্ভ্রান্ত হয়, তখন তাহাকে নিরুদ্ধ—সংযত করিলেই ক্ষমা করা হইল, তাহা হইলেই মন প্রত্যপকার কার্য্যে নিবৃত্ত হইবে। পশুদিগের নিরোধ শক্তি নাই, সংযম নাই, ক্ষমাও নাই। তাহাদের অপকার করিলে যদি তাহারা ভীত না হয়, তবে অবশ্যই তাহারা প্রত্যপ-কারে যত্নবান হইবে।

দমের বিকাশ।

দম কাহাকে বলে তাহাও (৭ পৃঃ ৮ পং) বলিয়াছি, এখন বিস্তারিত শুন। অন্যের ধন, মান, যশ, বিদ্যাদি দেখিয়া নিকৃষ্টহৃদয়পুরুষের মনের মধ্যে

একটা আঘাত লাগে, সেই আঘাতে অতিশয় দুঃখপ্রদ একপ্রকার কুপ্রবৃত্তি বিজৃম্ভিত হয়, তাহার নাম ঈর্ষ্যা। সেই দুঃখপ্রদ ঈর্ষ্যাপ্রবৃত্তির শান্তির নিমিত্ত অন্যের ধন, মান, বিদ্যাদি বিনষ্ট বা খর্ব্ব করার জন্য নানাপ্রকার যত্ন হইয়া তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে থাকে। কিন্তু যখন পরধনাদি দর্শনে প্রথম মনের মধ্যে আঘাত লাগিয়া ঈর্ষ্যার পরিস্ফুরণ হইবে, তখন মনকে নিরুদ্ধ—সংযত করিতে পারিলে ঈর্ষ্যা বা পরাপকারের প্রবৃত্তিও হইতে পারে না। সেই সংযম বা নিরোধকেই দম বলা যায়। অতএব সহজেই বুঝা যায় যে, দম-শক্তি নিরোধ শক্তি হইতে সমুৎপন্ন।

অস্তেয়ের বিকাশ।

অস্তেয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে—(৭ পৃ ১১ পং)। যখন প্রলোভের পরতন্ত্র হইয়া অন্যায় পূর্ব্বক পরধনাদি গ্রহণের জন্য মনের চঞ্চলতা উপস্থিত হইতে থাকে, একমাত্র নিরোধই তখন নিস্তারের সম্বল। নিরোধের প্রভাবে চিত্ত সংযম করিতে পারিলেই চৌর্য্যাদি কুপ্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং অস্তেয় প্রবৃত্তিটাও স্বয়ংই নিরোধ শক্তি বিশেষ।

শৌচের বিকাশ।

শৌচ ও পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে (৭ পৃঃ ১২ পং)। মনের লঘুতা, অর্থাৎ এক প্রকার হাল্কা হাল্কা ভাব—বা নির্ম্মলতার নাম মনের শুদ্ধি বা শৌচ। আর মনের গুরুত্ব অর্থাৎ এক প্রকার ভারি ভারি মত ভাব বা আবিলতার নাম মনের অশৌচ। চিত্ত যতই বিষয়ের সহিত সমাসক্ত হইয়া জড়িত থাকে, ততই তাহার গুরুত্ব,—অর্থাৎ আত্মার শক্তিসকল বাহিরের নানা প্রকার বিষয়ের সংগ্রহের নিমিত্ত চক্ষু কর্ণাদি নানা দ্বারের দ্বারা চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া শরীরের প্রত্যেক অণুতেই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জড়িত হইয়া পড়িলে আত্মার এক প্রকার ভারীত্ব মত ভাব—জড়িত জড়িত ভাব—নিশীথে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন অরণ্য মধ্যে একাকী প্রবেশ করিলে যেরূপ আপনার অস্তিত্বে অন্ধ অন্ধ মত ভাব হয়, সেইরূপ অন্ধ অন্ধ মত ভাব, যাহা দেহাভিমানীদিগের সর্ব্বদা হইয়া থাকে। আর আত্মার শক্তি বা মন যতটুকু পরিমাণে দেহাদির সহিত অনাসক্ত হয়, অর্থাৎ দেহ হইতে আত্মা

হয়—বাহিরের দিক হইতে টানিয়া অন্তরে অন্তরে আকুঞ্চিত হইয়া থাকিতে পারে, ততটুকই লঘুত্ব বা এক প্রকার হাল্কা হাল্কা ভাব, ঘোর তমসাচ্ছন্ন অরণ্যানী হইতে আলোকময় ক্ষেত্রে ময়দানে আসিয়া পড়িলে যেরূপ ভাব হয় সেইরূপ ভাব হইয়া থাকে। এই গুরুত্ব আর লঘুত্ব, বা অশৌচ আর শৌচ, চিত্তের আসক্তিও অনাসক্তির রূপান্তর মাত্র। বিষয়ের আসক্তি ব্যুত্থানশক্তিসমুত্থিতঅধঃস্রোতস্বিনীগতির কার্য্য। আর অনাসক্তি নিরোধ-শক্তি সমুৎপন্ন ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনীগতির কার্য্য। সুতরাং চিত্তের লঘুতা বা শুদ্ধি নিরোধশক্তিমূলক।

ইন্দ্রিয় নিগ্রহের বিকাশ।

ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কি তাহা বলিয়াছি। (৭ পৃঃ ১৩ পং) ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বদাই আপন আপন বিষয়ের নিমিত্ত লালায়িত। বিশেষ, যখন কোন লোভজনক দ্রব্য সম্মুখে উপস্থিত হয় তখন আর ও দ্বিগুণতর বেগে ইন্দ্রিয় শক্তি বিজৃম্ভিত হয়। সেই সময়ে নিরোধশক্তি বলেই ইন্দ্রিয়গণ সংযত ও নিগৃহীত হইয়া থাকে। এখন ধীশক্তি বিকাশের প্রণালী বলা যাইতেছে।

ধীশক্তির বিকাশ।

ধীশক্তি (৭ পৃঃ ১৫ পং)। কোন এক বিষয় অধিককাল মনের মধ্যে রাখিয়া ক্রমে আলোড়ন করাকে 'চিন্তা' বলে। এইরূপ চিন্তা দ্বারা কোন বিষয়ের যথার্থ তত্ত্বের অবধারণ করাকে ধী বলে। যে শক্তি দ্বারা এইরূপ অবধারণ কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, সেই শক্তির নাম 'ধীশক্তি'। অতএব চিন্তা শক্তির কথা বলিলেই ধীশক্তিবিষয় ব্যাখ্যাত হইবে।

কোন বিষয়ের চিন্তা করিতে হইলেই এই দুটি সামগ্রী নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এক,—অন্য বিষয় হইতে চিত্তের অবকাশ থাকা, ২য়,—যে বিষয়টি চিন্তা করিতে হইবে, কেবল সেই বিষয়টিরই ধারাবাহীক্রমে আলোচনা করা। এই দুটি না হইলে চিন্তা হইতে পারে না। চিন্তনীয় বিষয়টি মনের মধ্যে রাখিয়া যত অধিক সময় পর্য্যন্ত মনের ক্রিয়া করা যায় ততই বিষয়টির এক এক অঙ্গের প্রকাশ হইতে থাকে। অনেক

কাল পরে, ক্রমে বিষয়টির সর্ব্বাঙ্গই মনোদর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়। তখন চিন্তা সম্পন্ন হইবে।

মনে কর, তুমি একটি আম্রপল্লব সন্দর্শন করিলে, কিন্তু এই আম্র পল্লবটির অনেকগুলি জ্ঞাতব্যঅঙ্গ আছে। তন্মধ্যে কোনটি প্রথম অঙ্গ, কোনটি দ্বিতীয়, কোনটি তৃতীয় ইত্যাদি। নয়ন সংযোগ মাত্রেই উহার যে অঙ্গটি প্রথম জানা যায়, সেইটি প্রথম অঙ্গ, যেটি তৎপর জানা যায়, সেইটি দ্বিতীয়, আর যেটি তৎপর প্রকাশ পায় সেইটি তৃতীয় অঙ্গ ইত্যাদি। হঠাৎ আম্রপল্লবটির উপর দৃষ্টি পড়িলে তৎক্ষণাৎ ইহার হরিদ্বর্ণটি মাত্র মনের মধ্যে প্রকাশ পায়। এ নিমিত্ত কেবল মাত্র হরি দ্বর্ণটিকেই উহার প্রথমাঙ্গ বলা যায়। তৎপরে যদি তৎক্ষণাৎ মন অন্য বিষয়ে ধাবমান না হইয়া অত্যল্পকাল বিশ্রামের পর, অর্থাৎ ঐ হরিদ্বর্ণটি-মাত্র ধারণা করিতে মনের যতটুক কাল আবশ্যক ততটুক কাল বিশ্রামের পর, আবার ঐ পল্লবটিকেই লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করে, তবে মনের প্রেরণ দ্বারা আর একবার ঐ পল্লবে চক্ষুর সংযোগ হইয়া পল্লবের আকৃতিটি, অর্থাৎ উহার বৃন্ত, এবং পত্রের মধ্যে নানা প্রকার শিরা, দীর্ঘ আকার, মধ্যে প্রশস্ততা, সূক্ষ্মাগ্রতা, স্বল্পবেধ ইত্যাদি অবস্থা গুলি মনের মধ্যে প্রকাশিত হয়। ইহা পল্লবের দ্বিতীয় অবয়ব। এই প্রথম অবয়ব ও দ্বিতীয় অবয়বের প্রকাশ যে ক্রমশঃ পরপর হয় তাহা একটি সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারাও বুঝিতে পার। পশ্চিমের রেলওয়ে গাড়ীতে যদি কখনও গতায়াত করিয়া থাক তবে যখন তোমার গাড়ী পূর্ণবেগে চলিতে থাকে, এবং সেই সময় বিপরীত দিক্ হইতে আর একটি গাড়ীর শ্রেণী আসিয়া তোমার পার্শ্ব দিয়া চলিতে থাকে, সেই সময় স্মরণ করিয়া দেখ, তাহা হইলেই ইহা বুঝিতে পারিবে। সেই সময়ে ঐ অপর গাড়ী শ্রেণী কিম্বা তাহার মধ্যবর্ত্তী মনুষ্যাদির বিশেষ কোন লক্ষণই পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না, কেবল কাল কিম্বা সবুজ একটি রঙ্গের এবং তাহার মধ্যবর্ত্তী মানুষ গুলির এক একটি বর্ণ মাত্র নয়ন গোচর হইয়া থাকে ; গাড়ীর গাত্রের চিত্রগুলি, কিম্বা তক্তার সন্ধিস্থ—দীর্ঘাকার রেখাগুলি, কিম্বা তন্মধ্যবর্ত্তী মনুষ্যের নাসিকা, মুখ, চক্ষু প্রভৃতি কিছুই জ্ঞানে প্রকাশিত হয় না। ইহার কারণ এই যে, নয়নেন্দ্রিয়

উহার কেবল বর্ণটিকে মনের কাছে প্রথম পৌছাইয়া দিয়া, যতক্ষণে মন ঐ বর্ণটি ধারণা করে, ততক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আবার গাড়ীর সহিত সংযুক্ত হইতে যতটুক কাল অতীত হয়, ততটুক কাল ঐ গাড়ীখানি ঠিক সেইখানে থাকে না, স্থতরাং চক্ষু আবার আসিয়া তাহাকে দেখিতে পায় না, অগত্যা গাড়ীর দ্বিতীয় অঙ্গের প্রকাশ হওয়া সম্ভবেনা, তাই কেবল প্রথমাঙ্গই দেখা যায়। অতএব ইহা স্বীকার্য্য যে, এক সময় দুইঅঙ্গ প্রকাশ না হইয়া ক্রমে ক্রমেই এক এক অঙ্গ প্রকাশ পায়। এখন পল্লবের তৃতীয় অঙ্গ শুন,—পল্লবের দ্বিতীয়াঙ্গ প্রকাশের পর যদি নয়নেন্দ্রিয় একটুকাল স্থগিত হইয়া মনকে ধারণার অবকাশ দেয়, এবং মনও অন্যদিকে গমন না করিয়া ঐ পল্লবটি লক্ষ্য করিতে থাকে, তবে সেই অবকাশে মনে পূর্ব্ব দৃষ্ট আম্রবৃক্ষের স্মরণ হয়, এবং তৎক্ষণাৎ সেই পূর্ব্বে দৃষ্ট পল্লবটির সহিত সম্মুখস্থ পল্লবটির তুলনা করার নিমিত্ত পুনর্ব্বার চক্ষু ঐ পল্লবাভিমুখে নিয়োজিত হইয়া সংযুক্ত হয় এবং ঐ দৃশ্যমান পল্লবটির বর্ণ আর আকৃতিটি পুনর্ব্বার মনের নিকট উপস্থিত করিয়া দিয়া একটুক বিশ্রাম করে, এই অবকাশে মন ঐ এখনকার দৃশ্যমান পল্লবটি এবং পূর্ব্ব দৃষ্ট সেই পল্লবটি এতদুভয়ের সম্পূর্ণ তুলনা করিয়া দেখে যে উভয়ই ঠিক একই জিনিষ, তখন মন স্থির করে যে "এই টিও আম্রবৃক্ষের পল্লব"। এনিমিত্ত এই অবস্থার নাম উহার তৃতীয় অঙ্গ। দ্বিতীয়াঙ্গ প্রকাশ অপেক্ষায় তৃতীয়াঙ্গ প্রকাশে আরও অধিক সময় পর্য্যন্ত মনকে অবকাশ দেওয়া চাই। কারণ এই সময় মনের মধ্যে পূর্ব্বের অপেক্ষায় অধিক অনেকগুলি কার্য্য হয়। প্রথম দৃশ্যমান পল্লবটির বর্ণ ও আকৃতি টি ধারণা করা তৎপর পূর্ব্ব দৃষ্ট পল্লবের সহিত তুলনা করা, তৎপর এইটিও আম্রপল্লব বলিয়া স্থির করা, এই তিনটি কার্য্য করিতে হয়। ইহাও চলন্ত গাড়ীদ্বয়ের দৃষ্টান্তেই বুঝিতে পার। চলন্ত গাড়ী যখন দ্বিতীয়াঙ্গ বিকাশেরই অপেক্ষা করে না, তখন তৃতীয়াঙ্গ প্রকাশের অপেক্ষা করে না, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

এই তৃতীয়াঙ্গ প্রকাশের পরও যদি ইন্দ্রিয়গণ স্থগিত থাকে এবং মন অন্য বিষয়ে প্রধাবিত না হইয়া সেই পল্লবটীকেই লক্ষ্য করিয়া থাকে, তবে যত অধিককাল ঐ অভিনিবেশ থাকিবে ততই আর আর অঙ্গগুলি ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে থাকিবে। হয়ত প্রথমে, কি কারণে পত্রগুলি ঐরূপ

চারিদিকে সাজান হইল তাহা প্রকাশ পাইবে, তৎপর কি কারণ ঐ পল্লবটির নবাবস্থায় তাম্রবর্ণ, মধ্যমাবস্থায় উজ্জ্বল সবুজ বর্ণ, তৎপরে নীলবিমিশ্রিত সবুজবর্ণ, অবশেষে পুরাতন অবস্থায় পীতবর্ণ হয়, তাহা নিশ্চয় হইবে, তৎপর কি কারণে পত্রগুলির বৃন্ত থাকা আবশ্যক, কি নিমিত্তইবা উহার সর্ব্বগাত্রে ঐরূপ শাদা শাদা শিরা সমূহ আছে, কেনইবা ঐ পত্রগুলির অগ্রভাগ সূক্ষ্ম হইল, ঐরূপ অল্পবেধবিশিষ্টপত্রসমূহেরদ্বারাইবা বৃক্ষের কি কার্য্য সংসাধিত হয়, পুরাতন পত্রসমূহ ঝরিয়া গিয়া পুনর্ব্বার নবপত্রোদ্‌গমের তাৎপর্য্য কি; প্রত্যেক বৃক্ষের পল্লব বিভিন্ন প্রকার কেন, কি হেতুইবা আম্রপল্লব ঈদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট হইল, ইত্যাদি অঙ্গসকল ক্রমে ক্রমে জ্ঞানে প্রকাশিত হইতে থাকে। মন ক্রমে ক্রমে একএক অঙ্গের মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া পরমানন্দে ভাসিতে থাকে। এক এক কৌশল এক এক তাৎপর্য্য অবগত হইয়া আত্মা চরিতার্থপ্রায় হইতে থাকে। এইরূপ ঘটনার নাম চিন্তা, এইরূপ ধারণার নাম ধী, এবং এইরূপ ক্ষমতার নাম ধীশক্তি। এই ধীশক্তির মূলভিত্তি নিরোধ শক্তি। কারণ, ক্রমেক্রমে ব্যতীত ঠিক একই সময়ে দুইটি বা ততোধিক বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে না, অতএব আম্রপল্লব চিন্তা কালীন, মন যদি অন্য বিষয়ে লিপ্ত হয়, তবে সেই সকল বিষয়েরই ক্রমিক জ্ঞান হইতে থাকে, সুতরাং আম্রপল্লবের এক এক অবয়বের উদ্ভাবন হইয়া তাহার চিন্তা হইতে পারে না। অতএব নিরোধ শক্তির প্রয়োজন। চিত্ত যখন আম্রপল্লবের প্রথমঅঙ্গটি (বর্ণটি) মাত্র গ্রহণ করিয়া অন্যদিকে ধাবিত হইতে চাহে, তখন তাহাকে নিরোধ পূর্ব্বক আম্রপল্লব দিকে রাখিতে পারিলেই উহার দ্বিতীয় অবয়ব (পল্লবের আকৃতি) প্রকাশিত হয়। তৎপর যতই চিত্তকে সংযত করিয়া ঐ আম্রপল্লবেই সম্বদ্ধ রাখা যায়, ততই তাহার অপরাপর অঙ্গ সকল বিকাশ প্রাপ্ত হইতে থাকে।

পশুদিগের নিরোধশক্তি নাই, তাহাদের ইন্দ্রিয় শক্তিও অত্যন্ত প্রবলা এবং অতীব কার্য্যাসক্ত, তাদের ইন্দ্রিয়শক্তি কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তও নিশ্চল হয় না। এজন্য পশুদের জ্ঞানে দৃশ্য বিষয়ের কেবল মাত্র প্রথম অঙ্গ ব্যতীত আর কোন অঙ্গই প্রকাশিত হয় না। প্রথমাঙ্গ প্রকাশ হইয়া যখন দ্বিতীয়াঙ্গ বিকাশিত হইবে, সেই সামান্যকালও উহাদের ইন্দ্রিয়শক্তি মনকে

অবকাশ দেয় না, মনকে সঙ্গে লইয়া ধারাবাহী ক্রমেই বিষয়াভিমুখে চলিতে থাকে। সুতরাং পশুদের কিছুমাত্র চিন্তা বা ধীশক্তির কার্য্য দৃষ্ট হয় না। অতএব নিরোধশক্তিই ধীশক্তির মূল।—

সত্যের বিকাশ।

সত্য। যাহার চিত্ত দুর্ব্বল তাহার সত্য রক্ষিত হয় না। যাহার চিত্ত যত অধিক পরিমাণে বিষয়াসক্ত, যাহার মনের অধঃস্রোতস্বিনীগতি যত প্রবলা, ততই তাহার চিত্ত অধিক পরিমাণে বিষয়ের অধীন, সুতরাং দুর্ব্বল। অতএব অত্যন্তঅধঃস্রোতস্বিনীবৃত্তিশালীরই সত্যনিষ্ঠা অসম্ভব। কিন্তু প্রবল নিরোধশক্তির প্রভাবে যাঁহাদের ঊর্দ্ধ স্রোতস্বিনী গতি প্রবলা, তাঁহাদের চিত্ত দুর্ব্বল হইতে পায় না, সত্য ও নষ্ট হয় না। যদিও কখন লোভ পরবশ হইয়া সত্যাপলাপের প্রবৃত্তি প্রবলা হয়, তবে তৎক্ষণাৎ নিরোধশক্তিপ্রভাবে চিত্ত সংযত করিলেই সত্য সংরক্ষিত হইল।

অক্রোধও এইরূপ। ক্রোধের উদ্দীপনা কালে চিত্ত নিরুদ্ধ করিলেই ক্রোধ হইতে পায় না। এইরূপে সমস্ত ধৰ্ম্মই নিরোধশক্তি হইতে সমুৎপন্ন. নিরোধ শক্তিই সকল ধর্ম্মের উপাদান কারণও মূল ভিত্তি।

শিষ্য। নিরোধশক্তি হইতেই সমস্ত ধর্ম্মের বিকাশ ও সমস্ত অধর্ম্মের ক্ষয় হয়, তাহা বিলক্ষণরূপে অবগত হইলাম। কিন্তু, আমরা যখন বিষয় পরবশ হইয়া অবশভাবে পাপবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হই, তখন আমাদের সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি হইয়া পড়ে, জ্ঞান বুদ্ধি সমস্তই বিলুপ্ত হয়, সুতরাং তখন নিরোধশক্তির উত্তেজনা পূর্ব্বক ঐ সকল পাপবৃত্তির বিনাশ করা অসম্ভব। ক্রোধ, ব্যভিচার হিংসা প্রভৃতিকুপ্রবৃত্তির কার্য্যগুলি যে নিতান্তঅকর্ত্তব্য তাহা অনেকেরই বিশ্বাস। কিন্তু যখন ঐসকল পাপবৃত্তির ঘটনা উপস্থিত হয়, তখন আত্মবিস্মৃত হইয়াই ঐ সকল কার্য্য করিয়া ফেলে। তত্পর ঐ কুৎসিত বৃত্তি গুলি চরিতার্থ হইয়া গেলে, যখন তাহার প্রতিক্রিয়ার সময় উপস্থিত হয়, তখন আবার ক্রমেক্রমে জ্ঞান, বুদ্ধি ঘটে আসিতে থাকে; অতএব তত্তৎকালে নিরোধশক্তির উত্তেজনা করিয়া

পাপবৃত্তির দমন করা কিরূপে সম্ভবে? আবার ধীশক্তিপ্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তির উত্তেজনাকালেও এইরূপ, তখনও একবিষয়ের চিন্তা করিতেকরিতে অলক্ষিতভাবেই চিত্ত অন্যত্র পরিচালিত হয়,—এক বিষয়ের চিন্তা করিতেকরিতে কোন্ অবকাশে কখন যে চিত্ত অন্যত্র গিয়া বসিয়াছে, তাহা তখন কিছুই অনুভব করা যায় না, সুতরাং তখন কি প্রকারে নিরোধের উত্তেজনা করিয়া মন বাঁধিয়া রাখিব?। ভক্তি প্রভৃতি সকল প্রকার ধর্ম্ম সম্বন্ধেই এইরূপ নিয়ম।

আচার্য্য। এ নিমিত্ত, পূর্ব্বেই নিরোধের সঞ্চয়করিয়া রাখিতে হয়। প্রবলনিরোধশক্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিলে কোনপ্রকার কুপ্রবৃত্তির পরিস্ফুরণ, অথবা ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিনাশ হইতেই পায় না, তবে প্রকৃত রূপে কৃতকার্য্য না হওয়া পর্য্যন্ত কখনও কখনও চিত্তের চঞ্চলতা হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতেও সাধারণ—অবশ—পুরুষপশুর ন্যায় একবারে আত্মবিস্মৃতি হইয়া যায় না। অধর্ম্ম প্রবৃত্তির উত্তেজনা কালে আত্মবিস্মৃতি না হইলে তৎক্ষণাৎ নিরোধশক্তির উত্তেজনাদ্বারা মনকে বলপূর্ব্বক সংযত করা যায়। এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিলে যে, নিরোধশক্তিহইতেই সমস্তধর্ম্মের উৎপত্তি ও বিকাশ হইয়া থাকে, সুতরাং নিরোধশক্তিই সমস্তধর্ম্মের মূল ও উপাদানকারণ (৬২ পৃঃ পঃ)। বেদবিহিতযজ্ঞাদি করিলে যেরূপধর্ম্মের উৎপত্তি হয় তাহাও এই নিরোধশক্তি হইতেই বিকসিত হয়; তাহা পরে বুঝাইব। ওঁ শ্রীসদাশিবঃ ওঁ।

ইতি।

শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি কৃতায়াম্ধর্ম্মব্যাখ্যায়াম্ধর্ম্মসাধনে ধর্ম্মোপাদানকারণবর্ণনং নাম দ্বিতীয়-খণ্ডং সম্পূর্ণম্।

ওঁ

শ্রীসদাশিবঃ।

শরণম্।

ধৰ্ম্মব্যাখ্যা।

তৃতীয় খণ্ড।

ধৰ্ম্ম সাধন।

ধৰ্ম্ম নিমিত্তাদি নির্ণয়।

যে যে কারণের দ্বারা নিরোধশক্তি সঞ্চিত হইয়া ধর্ম্মের বিকাশ হয়, অর্থাৎ ধর্ম্মের দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারণ বিবরণ।

শিষ্য। নিরোধশক্তির বিবরণ এবং নিরোধশক্তি হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি বিষয় সবিশেষ অবগত হইলাম, এখন যে যে উপায়ে নিরোধশক্তির বৃদ্ধি ও উন্নতি করা যায়, অথবা নিরোধের সংস্কারগুলি ঘনীভূত করিয়া ধর্ম্মের বৃদ্ধি করা যায়, সেই বৈরাগ্য, বিবেকজ্ঞান, ধারণা, ধ্যান ও সমাধিপ্রভৃতি নিমিত্তকারণগুলি,—যাহা ধর্ম্মের তৃতীয়কারণ বলিয়া পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা, (৬২ পৃঃ) এবং ধর্ম্মের দ্বিতীয়কারণের অর্থাৎ অসমবায়ীকারণের (৬২ পৃঃ ২৩ পং) বিবরণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক সবিস্তারে বলুন।

আচার্য্য। গুরুদেব-ভগবান্‌পতঞ্জলি এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন শুন;—"অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ" (পাংদ, ১ পা ১২ সূ) বিবেকজ্ঞানের অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতির 'বৃত্তিনিরোধ' এবং 'স্বরূপেরনিরোধ' হইয়া থাকে (৬৬ পৃ ১ পং)। পরন্তু, "তদপি বহিরঙ্গং নির্ব্বীজস্য" (ঐ ৩ পা ৮ সূ) পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতি নিরোধ বাদে (৭৯ পৃ ২৩ পং) সমস্ত প্রকার বৃত্তিনিরোধ এবং স্বরূপনিরোধ মাত্রেই (৬৬ পৃ ১ প) সাক্ষাৎসম্বন্ধে ধারণা, ধ্যান, ও সমাধি হইতেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু প্রকৃতির স্বরূপনিরোধ সম্বন্ধে (৭৯ পৃ ২৩ পং) ধারণা, ধ্যান, ও সমাধি ইহারা সাক্ষাৎ কারণ নহে;

বহিরঙ্গ কারণ, অর্থাৎ গৌণ কারণ। এতদতিরিক্ত ও নিরোধশক্তি বৃদ্ধির অনেক প্রকার কারণ আছে তাহা পরে বলিব।

শিষ্য। বিবেকজ্ঞান, বৈরাগ্য, ও বিবেকজ্ঞানের অভ্যাস কাহাকে বলে, এবং ধারণা, ধ্যান, ও সমাধি কাহাকে বলে তাহা সবিস্তারে বর্ণন করুন।

বিবেক দর্শনের বিবরণ।

আচার্য্য। বিবেকজ্ঞান, আর আত্মজ্ঞান প্রায় একই বটে, কেবল সামান্য কিছু প্রভেদ। দেহাদি জড় পদার্থের সহিত মাথাইয়া দেহাদির সহিত অভেদে আত্মাকে অনুভব করা, অথবা কেবলমাত্র নির্ম্মল বিশুদ্ধ আত্মাকে অনুভব করার নাম আত্মজ্ঞান; যাহা পূর্ব্বে অতিবিস্তারে বিবৃত হইয়াছে (৮৩ পৃ ১২ পং হইতে ৯৪ পৃ ১০ পং পর্য্যন্ত)। আর শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি জড়পদার্থহইতে যে চৈতন্যস্বরূপআত্মার সম্পূর্ণরূপ পার্থক্য বা বিভিন্নতা আছে, সেই পার্থক্য বা বিভিন্নতার অনুভব করার নাম বিবেক-দর্শন বা 'বিবেকজ্ঞান'।

অতএব উভয়ের এই পার্থক্য হইল যে, বিবেকজ্ঞানে, দেহাদি জড়-পদার্থ আর আত্মা এই উভয়েরই অনুভব হইয়া ইহাদের পরস্পরের পার্থক্যের অনুভব হইতে থাকে, অর্থাৎ দেহাদিজড়পদার্থ আর আত্মা এতদুভয়ই পৃথক্ পৃথক্‌রূপে অনুভূত হইয়া থাকে; আর আত্মজ্ঞানে তাহা নহে, আত্মজ্ঞানের সময় যখন প্রকৃত আত্মজ্ঞান হয় (৮৭ পৃঃ ২৬ পং) তখন কেবল আত্মারই জ্ঞান, অথবা যখন দেহাত্মজ্ঞানাদি হইয়া থাকে, (৮৭ পৃঃ ১৭ পং) তখন দেহাদির সহিত বিমিশ্রণে দেহাদি হইতে অপৃথক্ বা অভিন্ন-ভাবে আত্মার অনুভূতি হইয়া থাকে।

মনে কর, তোমার দেহাত্মজ্ঞান (৮৭ পৃ ১৭ পং) নিবৃত্ত হইয়া ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞান হইতেছে (৮৭ পৃ ১৮ পং) এখন আর তোমার স্থূল দেহটীর অনুভব হইতেছে না, দেহটি বাদ দিয়া কেবল ইন্দ্রিয়াদির সহিত মাথাইয়াই আত্মার অনুভব হইতেছে।

কিন্তু, যখন বিবেকজ্ঞান হইবে, তখন দেহটি বাদ দিয়া আত্মার অনুভব

হইবে না, দেহ আর আত্মা এই দুয়েরই পরস্পর ভিন্নভাবে অনুভূতি হইবে। অতএব বিবেকজ্ঞান আর আত্মজ্ঞান বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান হইল।

বিবেকজ্ঞান প্রথমতঃ ৬ প্রকারে বিভক্ত। ১ম;—দেহাত্মবিবেক, ২য়, ইন্দ্রিয়াত্মবিবেক, ৩য়,—মানসাত্মবিবেক, ৪র্থ,—অভিমানাত্মবিবেক, ৫ম,—বুদ্ধ্যাত্মবিবেক, ৬ষ্ঠ—প্রকৃত্যাত্মবিবেক।

স্থূলদেহহইতে চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার পার্থক্য অনুভব করা 'দেহাত্ম-বিবেক'। দশবিধ ইন্দ্রিয়, ও পঞ্চপ্রাণ হইতে আত্মার পার্থক্য অনুভব করা 'ইন্দ্রিয়াত্মবিবেক'। মন হইতে আত্মার ভিন্নতা অনুভব করা 'মানসাত্ম-বিবেক'। অভিমান হইতে আত্মার ভিন্নতা অনুভব করা 'অভিমানাত্ম-বিবেক'। বুদ্ধি হইতে আত্মার ভিন্নতা অনুভব 'বুদ্ধ্যাত্মবিবেক'। প্রকৃতি হইতে আত্মার ভিন্নতা অনুভব 'প্রকৃত্যাত্মবিবেক'।

এই ছয়প্রকার বিবেকের মধ্যে দেহাত্মবিবেক সর্ব্বাপেক্ষায় নীচ, তদপেক্ষায় ইন্দ্রিয়াত্মবিবেক উৎকৃষ্ট, তদপেক্ষায় মানসাত্মবিবেক উচ্চ, তদপেক্ষায় অভি-মানাত্মবিবেক উচ্চ, তদপেক্ষায় বুদ্ধ্যাত্মবিবেক উচ্চ, এবং সর্ব্বাপেক্ষায় প্রকৃতি-পুরুষবিবেক বা প্রকৃত্যাত্মবিবেক উচ্চতম। আর, ক্রমশঃ নীচনীচ বিবেকজ্ঞান হইয়া উচ্চউচ্চ বিবেকজ্ঞান সাধন হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রথম দেহাত্মবিবেক সাধিত হয়, তৎপর ইন্দ্রিয়াত্মবিবেক, তৎপর মানসাত্মবিবেক, তৎপর অভিমানাত্মবিবেক সাধিত হয় ইত্যাদি।

উক্ত প্রত্যেকবিবেক অল্প, মধ্যম ও অতিশয় মাত্রানুসারে, স্বল্প বিবেক মধ্যমবিবেক, অতিমাত্রবিবেক ইত্যাদিরূপে বিভক্ত হইতে পারে। ভৌতিক দেহ ও পরমাত্মার পার্থক্য সুস্পষ্টরূপ বুঝিতে না পারিয়া যদি আধআধ বুঝিতে পারা যায়, তাহার নাম 'স্বল্প দেহাত্মবিবেক', আর যদি ঐ পার্থক্য অনেকপরিমাণে অনুভব করা যায় তাহার নাম 'মধ্যমদেহাত্মবিবেক', যদি সংপূর্ণরূপে দেহ ও আত্মার ভেদ অনুভব করা যায় তাহার নাম 'অতিমাত্র দেহাত্মবিবেক'। এইরূপ ইন্দ্রিয়, বা প্রাণাদির সহিত পরমাত্মার সম্পূর্ণ ভিন্নতানুভবের নাম 'অতিমাত্র ইন্দ্রিয়াত্ম বিবেক' এবং ঐ পার্থক্যের অস্ফুট অনুভবের নাম 'মধ্যম ইন্দ্রিয়াত্মবিবেক, আর কিছুকিছু অনুভব 'স্বল্পইন্দ্রিয়াত্ম-বিবেক,' এইরূপ মানসাত্মবিবেক, অভিমানাত্মবিবেকাদি সম্বন্ধেও জানিবে।

এইক্ষণে অভ্যাস কি তাহা শুন। "তত্রস্থিতৌ প্রযত্নোঽভ্যাসঃ" (পা ১ পাঃ ১৩ সূ) বিবেকজ্ঞানের অবস্থায় চিত্তকে সর্ব্বদা রাখিবার নিমিত্ত প্রযত্ন, বীর্য্য, বা উৎসাহের নাম বিবেকদর্শনের অভ্যাস।

অভ্যাসের দ্বারা একএকপ্রকার বিবেকদর্শন আপনআপন মাত্রানুসারে তুল্যমাত্রার নিরোধশক্তি-বিকাশের সাহায্য করে। অর্থাৎ স্বল্প দেহাত্মবিবেক (১৩২ পৃঃ ২১ পং) মৃদুইন্দ্রিয়বৃত্তিনিরোধ (৬৭ পৃঃ ৩ পং) বিকাশের সাহায্য করে, মধ্যম দেহাত্মবিবেক (১৩২ পৃঃ ২২ পং) মধ্যম ইন্দ্রিয়বৃত্তি-নিরোধের সাহায্য করে, এবং অতিমাত্র দেহাত্মাবেক (১৩১ পৃঃ ২৩ পং) তীব্র ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরোধের সাহায্য করে। এইরূপ স্বল্প ইন্দ্রিয়-বিবেক মৃদু ইন্দ্রিয়নিরোধ, (৭৯ পৃঃ ১৬ পং) এবং অতিমাত্র ইন্দ্রিয়াত্মবিবেক, (১৩২ পৃঃ ২৬ পং) তীব্র ইন্দ্রিয়নিরোধ বিকাশের বিশেষ সাহায্য করে। ইত্যাদি

এই গেল বিবেক দর্শন, এখন বৈরাগ্য কি তাহা শুন—"দৃষ্টানুশ্রবিক-বিষয়-বিতৃষ্ণস্য বশীকার-সংজ্ঞা বৈরাগ্যম্" (পাত—(১ পা ১৫ সূ) যে কোন প্রকার সুখজনক বস্তু বা বিষয় সম্ভবে, তৎসমস্তেরই সম্মুখে উপস্থিতি কালেও তাহার গ্রহণ বা পরিত্যাগ এতদুভয়ে কোন প্রকার ইচ্ছা না হওয়ার অবস্থাকে বৈরাগ্য বলা যায়। এই বৈরাগ্যের নাম 'বশীকার।'

পরন্তু, অবান্তরভেদে, অর্থাৎ এই বৈরাগ্যের অন্তর্গত বৈরাগ্যের বিভাগ করিলে বৈরাগ্য অনেক প্রকার আছে,—একএক প্রকার সুখভোগে বিতৃষ্ণা লইয়া ভিন্ন ভিন্ন এক এক প্রকার বৈরাগ্য বলা যাইতে পারে। দেহের দ্বারা যে কোন প্রকার সুখ ভোগ করা যায়—তাহাতে বিতৃষ্ণা লইয়া 'দৈহিক-বৈরাগ্য', ইন্দ্রিয়জনিত সুখে বিতৃষ্ণা লইয়া 'ঐন্দ্রিয়িক-বৈরাগ্য, মানসিক সুখে বিতৃষ্ণা লইয়া 'মানসিক' বৈরাগ্য, আভিমানিক সুখে বিতৃষ্ণাদ্বারা 'আভিমানিক বৈরাগ্য', বুদ্ধিগত সুখে বিতৃষ্ণা লইয়া 'বৌদ্ধ-বৈরাগ্য', এবং প্রকৃতির সুখে বিতৃষ্ণা দ্বারা 'প্রাকৃত বৈরাগ্য' বলা যায়।

বসন, ভূষণ, অভ্যঞ্জন, ও পরিকর্ম্মাদিদ্বারা রূপলাবণ্যবৃদ্ধি করিয়া যে সুখ অনুভব করা যায় তাহার নাম দৈহিক সুখ ; তদ্বিষয়ে বিতৃষ্ণা হইলে দৈহিকবৈরাগ্য হয়। দশবিধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সকল সুখ অনুভব করা যায় তাহার প্রতি বিতৃষ্ণার নাম 'ঐন্দ্রিয়িকবৈরাগ্য' বলা যায়।

এক এক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এক এক প্রকার সুখানুভব হইয়া থাকে, সুতরাং ১০ প্রকার ইন্দ্রিয় দ্বারা ১০ প্রকার সুখভোগ হয়, তাহার একএকটি সুখে বিতৃষ্ণা দ্বারা ঐন্দ্রিয়িকবৈরাগ্য ১০ প্রকার।

দেহের সাহায্য না লইয়া কেবল মাত্র মনের দ্বারাও অনেক প্রকার সুখানুভব হইতে পারে, সুতরাং তাহারও প্রত্যেকটিতে বিতৃষ্ণাদ্বারা মানসিকবৈরাগ্য অসংখ্য। এইরূপ অভিমান ও বুদ্ধিনামক অন্তঃকরণের দ্বারাও অসংখ্য প্রকার সুখানুভব হইয়া থাকে, তাহার প্রত্যেক সুখে বিতৃষ্ণতা দ্বারা আভিমানিকবৈরাগ্য, বৌদ্ধবৈরাগ্য ও প্রাকৃতবৈরাগ্যও অসংখ্যেয়।

কিন্তু বৈরাগ্যের মধ্যেও উচ্চত্ব, নীচত্ব আছে, এবং নীচেরটি সাধনের পর উচ্চটির সাধন হওয়ার নিয়ম আছে।—দৈহিকবৈরাগ্য সর্ব্বাপেক্ষায় নীচ, তৎপর ঐন্দ্রিয়িকবৈরাগ্য উচ্চ, তৎপর মানসিকবৈরাগ্য উচ্চ, তৎপর আভিমানিকবৈরাগ্য উচ্চ, তৎপর বৌদ্ধবৈরাগ্য উচ্চ, এবং প্রাকৃতবৈরাগ্য সর্ব্বাপেক্ষায় উচ্চতম।

দৈহিকবৈরাগ্যের পর ঐন্দ্রিয়িকবৈরাগ্য জন্মিয়া থাকে, ঐন্দ্রিয়িকবৈরাগ্যের পর মানসিকবৈরাগ্য জন্মিয়া থাকে, মানসিকবৈরাগ্যের পর আভিমানিকবৈরাগ্য জন্মে, তৎপর বৌদ্ধবৈরাগ্য, সকলের পর প্রাকৃতবৈরাগ্য বিকসিত হয়।

উক্ত সমস্ত প্রকারের বৈরাগ্যই মৃদু, মধ্য, ও তীব্রাদি মাত্রার অনুসারে মৃদুবৈরাগ্য, মধ্যমবৈরাগ্য, ও তীব্রবৈরাগ্য ইত্যাদিরূপে ভাগ করা যাইতে পারে। যিনি দৈহিকসুখে অত্যন্ত বিরক্ত তাঁহার তীব্রদৈহিকবৈরাগ্য, যিনি অল্প মাত্রায় দৈহিকসুখে বিরক্ত তাঁহার মৃদুদৈহিকবৈরাগ্য, আর যিনি মধ্যমমাত্রায় দৈহিকসুখে বিরাগী তিনি মধ্যমদৈহিকবৈরাগ্যসম্পন্ন। এই মৃদু, মধ্য, তীব্রতার ইতর বিশেষে বৈরাগ্যের মাত্রাও অসংখ্যেয়। এই প্রকার ঐন্দ্রিয়িকবৈরাগ্য এবং মানসিকবৈরাগ্যাদি বিষয়েও জানিবে।

উক্ত সমস্ত বৈরাগ্যের প্রত্যেক বৈরাগ্যই আপন আপন মাত্রার সমমাত্রা সম্পন্ন একএক প্রকার নিরোধশক্তি বিশেষের বিকাশের সহায়তা করে। অর্থাৎ মৃদুমাত্রার দৈহিক-বৈরাগ্য মৃদুমাত্রায় ইন্দ্রিয়বৃত্তিনিরোধ বিকাশের সাহায্য করে। এবং মধ্যমমাত্রার দৈহিক-বৈরাগ্য মধ্যমইন্দ্রিয়বৃত্তি-নিরোধ বিকাশের সাহায্য করে, আর তীব্রদৈহিকবৈরাগ্য তীব্রইন্দ্রিয়বৃত্তি

নিরোধের প্রকাশক। এইরূপ মৃদু-ঐন্দ্রিয়িক-বৈরাগ্য মৃদু-ঐন্দ্রিয়িক-নিরোধ মধ্যম ঐন্দ্রিয়িক-বৈরাগ্য মধ্যম-ঐন্দ্রিয়িকনিরোধ এবং তীব্র ঐন্দ্রিয়িক বৈরাগ্য তীব্র ঐন্দ্রিয়িক নিরোধ বিকাশের সাহায্য করে। এইরূপ মানসিক বৈরাগ্য এবং মানসিক নিরোধাদি সম্বন্ধেও জানিবে।

কিরূপে বিবেকদর্শন বৈরাগ্যের দ্বারা নিরোধ-শক্তির বিকাশ হয়।

এখন্ কি প্রকারে বিবেকদর্শনাভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা নিরোধশক্তির বৃদ্ধি হয়, তাহা শুন। দেহের বহিস্তরে কিম্বা অভ্যন্তরে যে সকল ক্রিয়া হইয়া থাকে, তৎসমস্তই কেবল আত্মার পরিতৃপ্তি সাধনের নিমিত্ত। আত্মা আপন পরিতৃপ্তির নিমিত্ত সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত, সুতরাং এক এক বিষয়ের দ্বারা সুখ সাধনের আকাঙ্ক্ষায় তাহার এক এক শক্তিকে এক এক ইন্দ্রিয়াদির প্রণালীর দ্বারা শরীরের উপর নিয়োগ করে, তাই শরীরের নানাবিধ ক্রিয়া হইয়া থাকে। আত্মার অভিপ্রায় হয় যে, স্থূল দেহটি সুন্দররূপে সাজাইলে তাহার সুখ হইবে, তৎপর এই জড়পিণ্ড দেহটি সাজানের নিমিত্ত তাহার চেষ্টা ও ক্রিয়া হইয়া থাকে। আত্মার অভিপ্রায় সুস্বাদু-বস্তুদ্বারা রসনা ও উদর পরিপুষ্ট করিলে পরম সুখ হইবে, তাই সেই রসগ্রহণের নিমিত্ত রসনা প্রণালীর দ্বারা আত্মার শক্তিবিশেষ আসিয়া রসের পরিগ্রহ করে ইত্যাদি।

এখন মনে কর, তোমার যেন দেহাত্মবিবেক হইল। দেহাত্মবিবেকে যখন দেহ আর আত্মার ভিন্নতাঅনুভব হইতে লাগিল, তখন অবশ্যই, তুমি স্বাভাবিক অবস্থায় যেমন রামদাস শ্যামদাসের দেহটি তোমা হইতে বিভিন্ন মনে কর, সেইরূপ নিজের দেহই তোমার নিজ হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বোধ করিবে। সুতরাং রামদাসের দেহটি সাজাইলে যেমন তোমার সুখানুভব বা দুঃখানুভব কিছুই হয় না, সেইরূপ তোমার নিজ দেহেরপরিকর্ম্ম বা পরিচ্ছদদ্বারাও কোনই সুখানুভব হইতে পারে না, এবং রামদাসের জিহ্বায় সুস্বাদুদ্রব্য স্পর্শে যেরূপ তোমার সুখ সম্বিত্তি হয় না, সেইরূপ নিজ রসনায় সুস্বাদুদ্রব্য স্পর্শেও কোন সুখানুভব সম্ভবে না। সুতরাং রামদাসের দৈহিক সুখে যেমন তোমার স্বাভাবিক বৈরাগ্য রহিয়াছে, নিজের দৈহিক

সুখেও তেমন বিতৃষ্ণা হইবে অর্থাৎ দৈহিক বৈরাগ্য হইবে। অতএব তোমার আত্মা তখন আর নিজ দেহসজ্জার নিমিত্তও চেষ্টিত হইয়া দেহের উপর সেই কার্য্য সাধনের উপযুক্ত শক্তি প্রয়োগ করিবে না। রসাস্বাদের নিমিত্ত রসনার উপর শক্তি প্রয়োগ করিবে না। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি হইতে পারিবে না। আত্মার শক্তি দেহের সহিত সংযুক্ত থাকিয়াও যেন দেহ হইতে পৃথক্‌মত থাকিবে, তা হইলেই আত্মার ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরোধ হইল। এখন উক্ত দেহাত্মবিবেক ও দৈহিক বৈরাগ্যের মাত্রা যদি মৃদু হয়, তবে ইন্দ্রিয়-বৃত্তি নিরোধেরও স্বল্প মাত্রা হইবে আর দেহাত্ম বিবেক ও দৈহিক-বৈরাগ্যের মাত্রা মধ্যম হইলে ইন্দ্রিয়বৃত্তি-নিরোধের মধ্যমতা, এবং ঐ দেহাত্ম-বিবেক ও দৈহিকবৈরাগ্যের মাত্রা অতিশয় হইলে ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরোধেরও আতিশয্য হইবে।

ইন্দ্রিয়াত্মবিবেক আর ঐন্দ্রিয়িকবৈরাগ্যাদি দ্বারাও এইরূপ ইন্দ্রিয় নিরোধাদি হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ের সহিত আত্মার পার্থক্য অনুভব থাকিলে অর্থাৎ ঐ ইন্দ্রিয়াত্মবিবেক থাকিলে ইন্দ্রিয় সুখের নিমিত্ত আত্মার চেষ্টা হয় না, সুতরাং ঐন্দ্রিয়িক সুখে বৈরাগ্য হয়, অর্থাৎ ঐন্দ্রিয়িকবৈরাগ্য হয়। অতএব ইন্দ্রিয়ের স্থান পর্য্যন্ত আত্মার শক্তি আইসেনা, তাহার ঊর্দ্ধে মনের স্থানে আসিয়াই স্থগিত হয়, সুতরাং ইন্দ্রিয়ের স্বরূপ নিরোধ (৬৬ পৃ) সংসাধিত হয়, ইত্যাদি। এইরূপে বিবেকদর্শন ও বৈরাগ্যদ্বারা নিরোধশক্তি বিকাশ হইয়া থাকে।

শিষ্য। আপনার উপদেশের দ্বারা ক্রমে ক্রমে ঘোরতর অরণ্য মধ্যে আনীত হইলাম, এখন আর কোন দিকে কোন পন্থা পরিলক্ষিত হয় না। আপনার উল্ট পাল্টা কথাদ্বারা আত্ম হারা হইয়াছি। আপনি যে বিবেক ও বৈরাগ্যদ্বারা নিরোধ শক্তি বিকাশের সাহায্য স্থাপন করিয়া ইহাদিগকে ধর্ম্মের তৃতীয় কারণ রূপে সংস্থাপন করিতেছেন, সেই বিবেক দর্শন ও বৈরাগ্য এতৎউভয়ই আপনার পূর্ব্ব নিরূপিত প্রধান প্রধান দুটি ধর্ম্ম। অতএব ধর্ম্ম আবার কিরূপে ধর্ম্মের কারণ হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না, এই কাগজখানি কি প্রকারে কাগজখানির কারণ হইতে পারে তাহা বুঝা অসাধ্য। দ্বিতীয়তঃ, এ বিবেক দর্শন ও বৈরাগ্য যে নিরোধশক্তি হইতেই সমুৎপন্ন তাহা স্বীকার করিতে হইবে, কারণ ধর্ম্ম মাত্রেই নিরোধশক্তি

সমুৎপন্ন, বিবেকদর্শন ও বৈরাগ্য আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ (প্রথম খণ্ডে) করিয়াছেন, এখন আবার বিবেকদর্শন ও বৈরাগ্য হইতে নিরোধশক্তি বিকাশের কথা বলিতেছেন ইহাও বুঝা অসাধ্য। যে যাহার কারণ, আবার সেই তার কার্য্য, এরূপ উল্‌টপাল্‌টা কার্য্যকারণ ভাব সম্ভবে না। পিতা পুত্রের কারণ, আবার পুত্রও পিতার কারণ হইতে পারে না। তাহা হইলে পিতা ও পুত্র উভয়েরই উৎপত্তি অসম্ভব। পিতার উৎপত্তি কালে তাঁহার উৎপত্তির কারণ পুত্র নাই, সুতরাং পিতার উৎপত্তি হইল না, আবার পিতার উৎপত্তি নাই বলিয়া পুত্র হইতে পারে না। সেই রূপ, বিবেক দর্শন ও বৈরাগ্য হইতে নিরোধশক্তির বিকাশ, আবার নিরোধশক্তি হইতে বিবেকদর্শন ও বৈরাগ্যের বিকাশ, ইহা নিতান্ত অসম্ভব বোধ হইতেছে।

আচার্য্য। একটু নিবিষ্ট ভাবে দেখিলেই এ আপত্তি নিরাকৃত হইতে পারে। এই কাগজ খানির দ্বারা এই কাগজ খানিই জন্মিতে পারে না সত্য, কিন্তু এই কাগজখানি জল দ্বারা গলাইয়া আবার আর একখানি কাগজ জন্মাইতে পারাযায়, তাহা অসন্দিগ্ধ। এবং পুত্রও, যে পিতা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সেই পিতার জন্মের কারণ হইতে পারে না সত্য, কিন্তু সেই পুত্র কালক্রমে অন্য-পুত্রের পিতা হইতে পারে, তাহা অসন্দিগ্ধ। সেই প্রকার, একএকটি বিবেকদর্শন ও বৈরাগ্য অপর একএকটি বিবেকদর্শন ও বৈরাগ্যের কারণ হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন নিজেই নিজের কারণ নহে। এবং যে নিরোধশক্তিটির বিকাশ হইয়া যে বৈরাগ্য ও বিবেকশক্তির উৎপত্তি, সেই বৈরাগ্য, আর সেই বিবেকশক্তির দ্বারা সেই নিরোধশক্তটির উৎপত্তি কখনই হয় না। কিন্তু অপর একটি নিরোধশক্তি-বিকাশের সহায়তা করে, আবার সেই নিরোধশক্তির দ্বারা অপর একটি বিবেক ও বৈরাগ্যের পরিস্ফুরণ হয়। এইরূপে ক্রমেই বিবেক ও বৈরাগ্যের বৃদ্ধি এবং নিরোধশক্তির উন্নতি হইতে থাকে। ইহার বিশেষ বিবরণ শ্রবণ কর।

বিবেকদর্শন, বৈরাগ্য, নিরোধশক্তি প্রভৃতি সকলেই মনের এক একটি শক্তি ও বৃত্তি বিশেষ। যেমন ক্রোধ বৃত্তি, কাম বৃত্তি, প্রভৃতি বৃত্তিগুলি মনের মধ্যে পরিস্ফুরিত হইয়া অধিককাল থাকে না, কিছুকাল মাত্র থাকিলেই

পরে সংস্কার অবস্থায় পরিণত হইয়া মনের মধ্যে অবস্থিতি করে (১০ পৃ ৮প) সেইরূপ বিবেকদর্শন, বৈরাগ্য, নিরোধশক্তি প্রভৃতি বৃত্তিগুলিও মনের মধ্যে পরিস্ফুরিত হইয়া সচরাচর কিছুকাল মাত্র থাকিয়াই সংস্কার অবস্থায় পরিণত হইয়া মনের মধ্যে অবস্থিতি করে। ইহা পূর্ব্বেও একপ্রকার বলিয়া আসিয়াছি।

এখন মনে কর, তাড়িতযন্ত্রের তড়িৎ যেমন নানাবিধ তার-পথে প্রবলবেগে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হয়, তেমনি তোমার মস্তিষ্করূপ-যন্ত্র-বাসী জীবাত্মার শক্তিসকল, বিষয়-লালসা-পরবশে, সহস্র সহস্র স্নায়ু-পথের দ্বারা প্রবলবেগে ধাবমান হইয়া শরীরের করতল, পদতলাদি-শাখাপ্রশাখায় প্রবাহিত হইতেছে। সুতরাং পূর্ণবেগে তোমার দেহের সমস্তক্রিয়া চলিতেছে। এই সময়ে, গুরূপদেশ বা ধ্যান, ধারণা, অধ্যয়নাদিকারণে তোমার মৃদু-মাত্রায় ইন্দ্রিয়বৃত্তি-নিরোধের (৬৭ পৃ ৩ পং) বিকাশ হইল, সুতরাং তোমার আত্মার শক্তিগুলি, এইমাত্র যেরূপ প্রবলবেগে আসিয়া শরীরের উপর কার্য্য করিতেছিল, তদপেক্ষায় কিছু খর্ব্ববেগে আসিতে লাগিল। কিন্তু শক্তির সম্বন্ধের দ্বারা দেহের সহিত আত্মার এত মাখামাখিভাব; সুতরাং শক্তির সম্বন্ধ যত অধিক সুদৃঢ় ততই দেহের সহিত আত্মার বিমিশ্রিত ভাব অধিক সুদৃঢ়, আর শক্তির সম্বন্ধ যত শ্লথ ততই দেহের সহিত আত্মার বিমিশ্রিতভাব অল্প হইবে। অতএব এই মৃদু-ইন্দ্রিয়বৃত্তি-নিরোধ বিকাশের অবস্থায় তোমার আত্মার দেহের সহিত মাখামাখিভাবটা একটু কমিল। দেহের সহিত বিমিশ্রণভাব যে পরিমাণে কমিবে, সেই পরিমাণেই দেহ হইতে আত্মার পার্থক্য অনুভূত হইবে।

অতএব, তোমার এই মৃদুমাত্রায় ইন্দ্রিয়বৃত্তি-নিরোধকালে, যে অত্যল্প মাত্রায় দেহ ও আত্মার বিমিশ্রণভাব কমিবে, সেইরূপ অল্পমাত্রায়ই দেহ ও আত্মার পার্থক্যানুভব, অর্থাৎ স্বল্পদেহাত্মবিবেকের পরিস্ফুরণ হইবে। এবং স্বল্প-দেহাত্মবিবেকে যে পরিমাণে দেহও আত্মার পার্থক্য অনুভূত হইবে, সেই পরিমাণেই দৈহিকসুখে তুচ্ছ তাচ্ছীল্য বা বিতৃষ্ণা, অর্থাৎ মৃদুদৈহিকবৈরাগ্য হইবে।

আবার বিষয়ের প্রতি জীবের অনুরাগ যত অধিক, ততই জীবের শক্তির বহির্মুখীনগতির বেগ অধিক হইবে, আর বিষয়ানুরাগ যত অল্প, আত্মার শক্তির বেগও ততই অল্প হইবে। অতএব, মৃদুমাত্রায়-দৈহিকবৈরাগ্য হইলে মৃদুমাত্রায়

আত্মার অধঃস্রোতস্বিনীগতি কমিবে, সুতরাং নিরোধশক্তির একটু বৃদ্ধি করা হইল। কিন্তু এই বিবেকদর্শন ও বৈরাগ্যের দ্বারা যে নিরোধশক্তির উদ্দীপন করা হইল, তাহা পূর্ব্বের সেই নিরোধশক্তি নহে, (গুরূপদেশাদি শ্রবণে যে নিরোধশক্তি উত্তেজিত হইয়া এই স্বল্পদেহাত্মবিবেক ও মৃদুদৈহিক-বৈরাগ্য জন্মাইয়াছিল) ইহাকে অপর একটি নিরোধশক্তিই বলা যায়। অতএব বিবেকবৈরাগ্য দ্বারা নিরোধশক্তিবিকাশ হওয়া সিদ্ধ হইল।

এই অবস্থায় থাকিতে থাকিতে, আবার ব্যুত্থানশক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া আত্মার শক্তির বহির্ব্বেগ বৃদ্ধি করিয়া দিল; তখন অগত্যা, সেই পূর্ব্ব-সঞ্চিত নিরোধশক্তি টুকু, আর সেই 'স্বল্পমাত্রার দেহাত্মবিবেক' এবং সেই 'মৃদুদৈহিক বৈরাগ্য' তিরোহিত হইয়া, অর্থাৎ সেই নিরোধ, বিবেকদর্শন' ও বৈরাগ্য-শক্তি ইহারা সকলেই ব্যুত্থানশক্তির দ্বারা পরিভূত হইয়া মনের মধ্যেই সংস্কার অবস্থায় থাকিল।

প্রত্যেক শক্তি বা বৃত্তিরই, সংস্কারাবস্থায় থাকিয়া পুনর্ব্বার উত্তেজিত হওয়ার চেষ্টা থাকে; এবং সামান্য কোন কারণের সাহায্য পাইলেই পুনর্ব্বার উদ্দীপনা হয়; ইহা বারম্বার প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অতএব, তোমার এই সংস্কারাবস্থাপন্ন নিরোধ, বিবেক এবং বৈরাগ্যশক্তি ও পুনর্ব্বার উদ্দীপ্ত হওয়ার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছে; একজন মল্ল যেরূপ নিযুদ্ধ (কুস্তি) করিতে করিতে অপর একজন মল্লের দ্বারা পরিভূত হইয়া ও পুনর্ব্বার উত্তেজিত হইয়া উপরে উঠিবার চেষ্টা করে, তোমার নিরোধশক্তি, বিবেক-শক্তি, বৈরাগ্যশক্তিও তেমন ব্যুত্থানশক্তিদ্বারা পরিভূত হইয়া পুনর্ব্বার উঠিবার চেষ্টা করিতেছে।

এতদবস্থায়,আবার তোমায় গুরুদেব আসিয়া সেই পূর্ব্বের মত বলিলেন—"হে সোম্য! তুমি দেহাদি সমস্ত জড় পাদার্থ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তুমিই সেই অখণ্ড-অনন্ত-অদ্বিতীয়চৈতন্যস্বরূপ, তুমি নিতান্তনির্গুণ ও নিতান্ত নির্দ্ধর্ম্ম পদার্থ, তোমার কোন প্রকার ক্রিয়া বা গুণ নাই, সুখ দুঃখাদি সমস্তই দেহাদি জড়পদার্থের ধর্ম্ম, উহা তোমার চৈতন্যাত্মার ধর্ম্ম নহে, ইত্যাদি"—এইরূপ গুরূপদেশ এবং ধ্যানাদি-সাহায্যে তোমার সেই পূর্ব্বকার নিরোধসংস্কার, বিবেকসংস্কার ও বৈরাগ্যসংস্কার পুনর্ব্বার ব্যুত্থানশক্তিকে পরাজিত করিয়া

বিজৃম্ভিত হইয়া উঠিল; আবার নিরোধ, বিবেক ও বৈরাগ্য প্রকাশিত হইল। এখন দেখ, সংস্কারাবস্থাপন্ন বিবেক, বৈরাগ্যদ্বারাই আবার বিবেক, বৈরাগ্যাদি জন্মিল। ঐ সংস্কারাবস্থাপন্ন বিবেক বৈরাগ্যাদি, আর শেষেকার উৎপন্ন বিবেক বৈরাগ্যাদি, ইহারা অবশ্যই ঠিক একই নহে; অতএব নিজকেই নিজের জন্মান হইল না।

কিন্তু এই বিবেক বৈরাগ্যাদি, পূর্ব্বেকার বিবেক বৈরাগ্যাদি অপেক্ষায় অধিকতর তেজস্বী হইবে। কারণ প্রথম যে নিরোধ ও বিবেকাদি জন্মিয়াছিল, তাহা কেবল একমাত্র গুরূপদেশাদির বলে, আর এখন যে নিরোধ ও বিবেকাদি হইল, ইহা সেই গুরূপদেশাদি, এবং পূর্ব্বকার নিরোধাদির সংস্কার এতদুভয়ের বলে; সুতরাং কারণবলের আধিক্য হইল। কারণবলের আধিক্য হইলে কার্য্যবলের অগত্যাই আধিক্য হয় ইহাস্বতঃসিদ্ধ।

কিন্তু, পূর্ব্বের সেই ব্যুত্থানশক্তিও তোমার একবারে বিনষ্ট হয় নাই, তাহাও তোমার আত্মাতে নিরোধশক্তির পরাক্রমে অভিভূত—সংস্কারাবস্থায় থাকিয়া, সেই অপর মল্লের দ্বারা পরাভূত-মল্লের ন্যায় পুনর্ব্বার উত্তেজিত হইবার চেষ্টা করিতেছে, একটু সামান্য কারণের সাহায্য পাইলেই আবার উঠিতে পারে।

এতদবস্থায়, বিষয়জনিত উদ্বোধনের দ্বারা আবার সেই ব্যুত্থানশক্তি পরিস্ফুরিত হইয়া উঠিল, এবং বর্ত্তমান বিবেকদর্শন, বৈরাগ্য ও নিরোধশক্তি উহার দ্বারা পরিভূত হইয়া আর এক একটি সংস্কারাবস্থায় মনের আশ্রয়ে থাকিল। এখন আবার ব্যুত্থানশক্তিরই কার্য্য হইতে লাগিল।

সময়ে আবার সেইরূপ গুরূপদেশাদির দ্বারা ঐ নিরোধসংস্কার, বিবেকসংস্কার ও বৈরাগ্যসংস্কার উদ্দীপিত হইয়া দ্বিতীয় আর এক একটি নিরোধ, বিবেকও বৈরাগ্যের উৎপাদন বা প্রকাশন করিল, ব্যুত্থানশক্তি পরিভূত হইয়া আবারও সংস্কার অবস্থায় থাকিবে। পূর্ব্ব নিয়মানুসারে এবারকার বিবেকাদি পূর্ব্বেকার বিবেকাদি অপেক্ষায় আরও অধিক বলবান্ এবং অধিককাল স্থায়ী হইবে।

ক্রমে এইরূপ এক একবার ব্যুত্থানের স্ফুরণ ও আবার নূতন নূতন বলবান্ বিবেকাদির বিজৃম্ভন হইতে থাকিল। মনের যে বৃত্তিটির যত অধিকবার

যত অধিক বেগে পরিচালনা করিবে, ততই সেই বৃত্তিটির সংস্কার দৃঢ়মূল ও বলবান্ হইতে থাকিবে, এবং অবশেষে কেবল সেই সংস্কারের বলেই সেই বৃত্তিটি বারম্বার মনের মধ্যে স্ফুরিত হইতে থাকিবে, এবং ক্রমেই সেই বৃত্তির ঘন ঘন উদ্দীপন হইবে।

সাধারণ বিষয়ে দুই একটি বৃত্তির অবস্থা মনে করিলেও ইহা অনায়াসে বুঝিতে পার। একজন মনুষ্য,ক্রীড়াশীল লোকের সংসর্গে থাকিয়া,ক্রীড়াবৃত্তির অভ্যাস দ্বারা অক্ষক্রীড়াদি-বিষয়ে বিলক্ষণ নিপুণ হইলে,অবশেষে ঐ ক্রীড়াবৃত্তি তাহার এত প্রবল হইয়া থাকে,যে, তখন সেই লোকটি, হয় পাশা,না হয় দাবা, না হয় তাস, ইত্যাদি কোন প্রকার একটা ক্রীড়া না করিয়াই থাকিতে পারে না, সর্ব্বদাই আপনা আপনি সেই ক্রীড়া বৃত্তি তাহার মনের মধ্যে বিজৃম্ভিত হইতে থাকে। একজন লোক বণিক্ ব্যবসায়ে নিপুণতা লাভ করিলে, ক্রমে শেষে সর্ব্বদাই ক্রয় বিক্রয় সম্বন্ধীয় বৃত্তিগুলি তাহার মনে বিকসিত হইতে থাকে। ইন্দ্রিয়-পরায়ণ লোকের ক্রমিক ইন্দ্রিয় পরিচালনার দ্বারা অবশেষে সর্ব্বদাই সেই বৃত্তির পরিস্ফুরণ হইতে থাকে।

সকল প্রকার মনোবৃত্তি সম্বন্ধেই এইরূপ নিয়ম; সকল বৃত্তিরই পরিচালনার অভ্যাস দ্বারা অবশেষে ২৪ ঘণ্টাই প্রায় সেই বৃত্তি ন্যূনাধিকরূপে মনের মধ্যে উদ্দীপ্ত থাকে। সুতরাং বিবেক, বৈরাগ্যাদি বৃত্তি সম্বন্ধেও এই একই নিয়ম; ইহাদেরও ক্রমিক অভ্যাস দ্বারা সেই সেই বৃত্তির সংস্কারগুলি ক্রমে সুদৃঢ় ও বলবান্ ভাবে মনের মধ্যে সঞ্চিত হইতে থাকে, এবং ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হইতে থাকে; অবশেষে সংস্কার বলেই এই সকল বৃত্তি সর্ব্বদা মনে উদ্দীপিত হয়।

মনেকর, গুরূপদেশাদি এবং তোমার সেই সংস্কারের দ্বারা ৪।৫ বার পর্য্যন্ত নিরোধশক্তি ও বিবেকদর্শনাদি বৃত্তি পরিস্ফুরিত হইল; এখন প্রথম বারের সংস্কার অপেক্ষায় দ্বিতীয় বারের সংস্কার গুলি অধিক বলবান্ হইবে, দ্বিতীয়বারের সংস্কার অপেক্ষায় তৃতীয়বারের সংস্কার অধিক বলবান্, তৃতীয়বারের সংস্কার অপেক্ষায় চতুর্থবারের সংস্কার অধিক বলবান্,এইরূপ ক্রমে ক্রমে বলবান্ বলবান্ সংস্কার সঞ্চিত হইতে থাকিবে। সংস্কার যতই বলবান্ হইতে থাকিবে, ততই তাহার উদ্দীপনার চেষ্টা শীঘ্র শীঘ্র ফলবতী হইবে; অর্থাৎ এই সকল

সংস্কারের বল যতই বৃদ্ধি পাইবে, ততই ব্যুত্থানশক্তিকে পরাভব করিতে অধিক সমর্থ হইবে। কারণ যে বৃত্তির পরিস্ফুরণের বেগ যত অল্প এবং বারের সংখ্যাও যত কম হইবে, ততই সেই শক্তির দুর্ব্বলতা হইবে। অতএব নিরোধ-সংস্কারের ঘনত্ব ও বলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অগত্যা ব্যুত্থান-শক্তিস্ফুরণের সংখ্যা কমিতে থাকিবে, এবং তাহার দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। ব্যুত্থানশক্তি দুর্ব্বল হইলেই নিরোধ-সংস্কারের আধিপত্য বৃদ্ধি পাইবে। নিরোধাদি শক্তির বল বৃদ্ধি পাইলে অগত্যাই ব্যুত্থান শক্তিকে শীঘ্র শীঘ্র পরাভব করিয়া ঐ সংস্কারগুলি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতে পারে। সুতরাং নিরোধাদি সংস্কারগুলির ক্রমে ঘনিষ্ঠতা হইতে থাকিবে।

এরূপে, ক্রমে শতশতবার নিরোধশক্তি ও বিবেক, বৈরাগ্যাদি ধর্ম্মের অনুশীলন হইতে হইতে তাহাদের সংস্কার রাশি সঞ্চিত, বলিষ্ঠ ও ঘনীভূত হইতে হইতে অবশেষে ব্যুত্থান শক্তির নিতান্ত মৃদুতা হইয়া, হয় ত প্রগাঢ় সমাধি হইয়া পড়ে, না হয় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গড়ে ২৩ ঘণ্টাই নিরোধ, বিবেক, বৈরাগ্যাদি পরিস্ফুরিত ভাবে থাকে, আর ১ ঘণ্টা মাত্র ব্যুত্থানশক্তির কার্য্য হইতে পারে।

অর্থাৎ একক্রমেই যে ২৩ ঘণ্টা নিরোধ, আর ১ ঘণ্টা ব্যুত্থানশক্তির কার্য্য হয় তাহা নহে, কিন্তু প্রতিক্ষণেই হয় ত ২৩ বার নিরোধ ও বিবেক বৈরাগ্যাদিশক্তির পরিস্ফুরণ হইলে ১ বার মাত্র ব্যুত্থানশক্তি বিকাশিত হয়। এজন্য, তাদৃশ মহাত্মাকে বোধ হয়, যেন তিনি একই সময়ে বাহ্যবিষয় এবং আত্মজ্ঞানাদি ধর্ম্মরাজ্যে নিমগ্ন।

ইহাই জগদ্‌গুরু ভগবান্ বেদব্যাস-দেব বলিয়াছেন, "চিত্তনদী নামোভয়তো-বাহিনী ভবতি, কল্যাণায় বহতি পাপায়চ। যাতু কৈবল্য-প্রাগভারা বিবেক-বিষয়-নিম্না সাকল্যাণ বহা, সংসার-প্রাগভারা অবিবেক বিষয়-নিম্না পাপবহা। তত্র বৈরাগ্যেণ বিষয়-স্রোতঃ খিলীক্রিয়তে বিবেক দর্শনাভ্যাসেন বিবেক-স্রোত উদ্‌ঘাট্যতে, ইত্যুভয়াধীন শ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ" (পা, দ, ১ পা, ১২ সূ, ভাঃ) মনের দুই প্রকার প্রবাহ বা গতি আছে;—একটি কল্যাণ-প্রবাহ,—ধর্ম্মপ্রবাহ,—ঊর্দ্ধ-স্রোতস্বিনী-গতি, আর একটি পাপপ্রবাহ—দুঃখজনকপ্রবাহ—অধঃস্রোতস্বিনী-গতি। চিত্ত যখন বিবেক-

দর্শনাদি ধর্ম্মের দিকে প্রবাহিত হয়, যে বিবেকদর্শনাদির দ্বারা প্রকৃতি পুরুষের পার্থক্য অনুভব হইয়া আত্মার কৈবল্য মুক্তি হয়, সেইটি কল্যাণ প্রবাহ, আর যখন দৈহিক বিষয়ের দিকে প্রবাহ হয়, যে প্রবাহ বা গতির— দ্বারা আত্মার দেহের সহিত বিমিশ্রণ হইয়া বারম্বার জন্ম, মৃত্যু, দুঃখাদি হইয়া থাকে, সেইটি পাপগতি। এতদুভয়বিধপ্রবাহ-বিশিষ্ট চিত্তে, বৈরাগ্য বৃত্তি দ্বারা তাহার বিষয়াভিমুখের প্রবাহ বন্ধ হইয়া যায়; আর বিবেকদর্শনে ক্রমিক অভ্যাসের দ্বারা বিবেকের স্রোত উদ্‌ঘাটিত হইতে থাকে। এই প্রকারে বিবেক দর্শন আর বৈরাগ্য এতদুভয়ের দ্বারা নিরোধের বিকাশ হইয়া থাকে।"

এই প্রকারে বিবেক জ্ঞান, ও বৈরাগ্য দ্বারা নিরোধশক্তির বৃদ্ধি হইয়া ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু ধারণা, ধ্যানাদি ব্যতীত নিরোধ বা বৈরাগ্য বিবেকাদি কিছুই হইতে পারে না। অতএব ধারণা ধ্যানের দ্বারা কি প্রকারে নিরোধশক্তির বৃদ্ধি হইয়া ধর্ম্মোৎপত্তি হয় তাহা জানা আবশ্যক প্রথম ধারণা আর ধ্যান কাহাকে বলে শুন।

ধারণার লক্ষণ।

ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন,—"দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা" (পাত— দ—৩ পা—১ সূ) "নাভিচক্রে, হৃদয় পুণ্ডরীকে, মূর্দ্ধ্নি জ্যোতিষি, নাসিকাগ্রে, জিহ্বাগ্রে ইত্যেব-মাদিষু দেশেষু, বাহ্যে বা বিষয়ে চিত্তস্য বৃত্তি-মাত্রেণ বন্ধ ইতি বন্ধো-ধারণা। (ঐ ভাষ্য) নাভিচক্রে, হৃদয়পদ্মে, ব্রহ্মরন্ধ্রে, নাসিকাগ্রে, জিহ্বাগ্রে এবং তালুপ্রদেশে ইত্যাদি-স্থানে আত্মাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা, অথবা ঈশ্বরের কোন প্রতিকৃতি বা অন্য কোন বহিস্থিত বিষয়ে লক্ষ্য করিয়া আত্মার শক্তিকে আবদ্ধ রাখার নাম ধারণা; ধারণা-দ্বারা নিরোধ ও আত্মজ্ঞানাদি ধর্ম্মের বিকাশ হয়।"

ধারণাদ্বারা ধর্ম্মের উন্নতি।

শিষ্য। কি প্রকারে ধারণা দ্বারা ধর্ম্মের উন্নতি, তাহা সবিশেষ বলুন।

আচার্য্য। ধারণাদ্বারা আত্মার চঞ্চলতা নিবৃত্তি হয়; চঞ্চলতা নিবৃত্তি হইলেই নিরোধ হইতে পারে, এবং অন্যান্য ধর্ম্মও বিকসিত হয়। আত্মার

চঞ্চলতাই যে অধর্ম্মের মূল, এবং আত্মার স্থিরতাই ধর্ম্মের মূল, তাহা দ্বিতীয় খণ্ডে অতি বিস্তারে বুঝাইয়াছি।

পূর্ব্বে যে ইন্দ্রিয়বৃত্তি-নিরোধ-প্রভৃতি নানাবিধ নিরোধ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, (৬৬ পৃঃ ২৬ পং) বিশেষ যত্ন করিলেও নির্দ্দিষ্ট স্থান ব্যতীত শরীরের মধ্যে যে কোন স্থানেই আত্মাকে বসাইয়া তাহার কোন প্রকার নিরোধই হইতে পারে না। যেখান হইতে আত্মার শক্তি প্রথম প্রবাহিত হইয়া চলে, কিম্বা যেখানে গিয়া ঐ শক্তি এক প্রকার শেষ পায়, অথবা যেখানে গিয়া বাহিরের কোন বস্তুর সহিত সংযুক্ত হয়, কিম্বা যেস্তানে আত্মার শক্তি একটু রূপান্তরিত হইয়া উত্তেজিত ও অনুপ্রযুক্ত হইয়া থাকে, কেবল সেই সেই স্থানেই আত্মার শক্তি অবরুদ্ধ বা সংযত করিয়া আয়ত্ত করাযায়। আর যে যে স্থানের দ্বারা আত্মার শক্তি বরাবর প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যায়, অবস্থিতি করে না, সেখানে আত্মাকে অবরুদ্ধ করা যায় না; অর্থাৎ মস্তিষ্ক, কিম্বা মস্তিষ্কের শেষভাগ, অথবা স্নায়ুপর্ব্ব, কিম্বা শরীরের চর্ম্মান্তপ্রদেশ, এই সকল স্থানেই ধারণা হয়, আর স্নায়ুর মধ্যস্থানে আত্মাকে রাখিয়া ধারণা কদাচ হয় না। ইহা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিতেছি শুন। জীবাত্মা মস্তিষ্কবাসী ইহা সমস্ত শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন ও পরীক্ষা এবং প্রত্যক্ষ অনুভবের দ্বারা নির্ণীত; সুতরাং মস্তিষ্কের মধ্যেই প্রথমে জীবাত্মার শক্তি পরিস্ফুরিত হইয়া চারিদিকে চলিয়া যায়; এজন্য মস্তিষ্কই এক রূপ ঐ শক্তির খনি বলিলেও হয়। অতএব সেই থানে অর্থাৎ মস্তিষ্কের মধ্যে—ব্রহ্মরন্ধ্রে আত্মার শক্তি নিরুদ্ধ করিয়া রাখা যায়। প্রত্যেক স্নায়ুপর্ব্ব (৭০ পৃ ২০ পং) ই আত্মার শক্তিকে এক একটু রূপান্তরিত করত উত্তেজিত করিয়া অনুপ্রযুক্ত করিয়া দেয়; সুতরাং প্রত্যেক স্নায়ুপর্ব্বই কিছু কিছু পরিমাণে মস্তিষ্কের কার্য্য করে বলিয়া, প্রত্যেক স্নায়ুপর্ব্বই আত্মার এক একটি ক্ষুদ্র বসতি স্থান—বা বিশ্রাম স্থান বলিতে পারা যায়(ক)। অতএব, স্নায়ুপর্ব্ব মধ্যেও আত্মার শক্তি অবরুদ্ধ করিয়া রাখা যায়। কিন্তু বড় বড় স্নায়ুপর্ব্ব ব্যতীত অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্নায়ুপর্ব্বে নিরোধ করা সম্ভবে না;—এ নিমিত্ত নাভি চক্রে—নাভির

(ক) ৭০ পৃ ২১ অবধি ৭১ পৃ ১০ পং পর্য্যন্ত দেখ।

সমস্থানবর্ত্তী-অভ্যন্তর-প্রদেশে যে সুবৃহৎ স্নায়ু-পর্ব্ব আছে, এবং হৃদয় পুণ্ডরীকে, অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের সন্নিহিত যে বড় মত স্নায়ু-পর্ব্ব আছে তাহাতে, আর কুলকুণ্ডলিনীর স্থানে—মূলাধারাদিতে—আত্মার শক্তি নিরুদ্ধ করিয়া রাখা যাইতে পারে।

মস্তিষ্কহইতে বিসর্পিত হইয়া শরীরের চর্ম্মপর্য্যন্ত আসিয়াই আত্মার শক্তি একরূপ শেষ পায়, অথবা শরীরসংলগ্ন কোন বাহ্য বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হয়; অতএব শরীরের চর্ম্ম প্রদেশেও আত্মার শক্তিকে অবরুদ্ধ করা যায়। সুতরাং নাসিকাগ্রে, জিহ্বাগ্রে, ইত্যাদি স্থানে আত্মার শক্তি অবরুদ্ধ করা যায়। কারণ ঐ সকল স্থানেই আত্মার শক্তি আসিয়া শেষ পায়, অথবা রসনাদিসংলগ্ন মধুরাদি-রস, ও শীতোষ্ণাদি-স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হয়। কিন্তু আত্মার শক্তি প্রবাহিত হইয়া যাইতে যাইতে সংযত করা সম্ভবে না;—স্নায়ুমণ্ডলের দ্বারা আত্মার শক্তি প্রবাহিত হয় (৭০ পৃ, ৫ পং)। অতএব স্নায়ুর মধ্যে আত্মার শক্তি-নিরুদ্ধ করিয়া রাখা যায় না। চেষ্টা করিলেও তাহা বিফল হইবে। আর কোন বাহ্য বিষয়ে লক্ষ্য করিলেও চিত্তের ধারণাকার্য্য সংসাধিত হয়।

শরীরপ্রদেশে ধারণার প্রণালী ও তৎফল।

এখন ধারণার বিবরণ শুন।—মনে কর, তোমাকে যেন হৃদয়পদ্মে অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের সন্নিহিত স্নায়ু-পর্ব্বে ধারণা করিতে হইবে, কিন্তু তুমি এই স্থূল দেহটাবাদে শরীরের অভ্যন্তরের তত্ত্ব কখনও অনুভব কর নাই;—যাহা কিছু তোমার জ্ঞান, ধ্যান, সমস্তই এই মোটা দেহটা লইয়া,—মোটা দেহকেই তুমি 'অহং,—আমি' বলিয়া বিশ্বাস ও অনুভব করিতেছ। আত্মার শক্তি বা আত্মা, বা হৃদয় পুণ্ডরীক কিছুই কখনও অনুভব কর নাই,—সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ। অতএব প্রথম হৃদয় পদ্মই তোমার অনুভব করা অতীব দুরূহ, তৎপর আত্মার শক্তির অনুভব করা আরও অসম্ভব। এজন্য প্রথম তোমাকে আত্মশক্তি বা হৃৎপিণ্ড অথবা তৎসন্নিহিত স্নায়ুপর্ব্বের দিকে লক্ষ্য না করিয়া সমস্ত বক্ষপ্রদেশটিই মনের দ্বারা(চক্ষুর দ্বারা নহে)লক্ষ্য করিয়া থাকিতে হইবে। সমস্ত বক্ষপ্রদেশটি লক্ষ্য করিয়া যখন কিছু বেশীকাল থাকিতে পারিবে, তখন

ফুস্‌ফুস্ দ্বয়, হৃৎপিণ্ড ও তৎসংলগ্ন মাংসপেশী (খ) অনুভব হইতে থাকিবে। ফুস্‌ফুস্ হৃৎপিণ্ডাদি অনেক কালপর্য্যন্ত লক্ষ্য করিয়া থাকিতে পারিলে আপনিই সেই ফুস্ ফুস্ হৃৎপিণ্ডাদি সংলগ্ন এবং তাহাদের মধ্যে অনুস্যূত স্নায়ুমণ্ডলের অনুভব হইতে থাকিবে। তৎপর সেই স্নায়ুমণ্ডলকে লক্ষ্য করিতে করিতে অনেক কালপরে আপনিই সেই স্নায়ুমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তি শক্তির অনুভব হইতে থাকিবে,—যে শক্তির দ্বারা তোমার ফুস্‌ফুস্ প্রতি মিনিটে ৭০।৭৫ বার নর্ত্তন করিতেছে এবং তোমার হৃৎপিণ্ড প্রতি মিনিটে ১৮।১৯ বার নর্ত্তন করিতেছে,—যে নর্ত্তন তুমি বক্ষের দিকে বাহির হইতে তাকাইলেও

[খ] তোমার বক্ষপ্রদেশটী যে, বাম ও দক্ষিণ দুভাগে বিভক্ত তাহা হৃদয়ের দিকে দৃষ্টি করিলেই বুঝিতেছ, এবং দুদিকেরই যে একএকটু উন্নত-আকৃতি আছে তাহাও দেখিতেছ ; ঐ ঈষৎ উচ্চ প্রদেশদ্বয়ের নীচে পাতলা মত কএক খণ্ড মাংসপেষী আছে, তাহার নীচে পাঁজরের অস্থি আছে, তাহার নীচে তোমার ঐ বক্ষপ্রদেশের গহ্বরটি পূরিয়া বাম, দক্ষিণে দুটি যন্ত্র আছে, তাহাদের আকৃতি একএকটি সবৃন্ত সুবৃহৎ ফুলকফীর ফুলের সহিত অনেকাংশে মিলে। ইহার বর্ণ কতকটা বেগুণে বেগুণে মত। এই যন্ত্র-দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, রক্ত পরিষ্কৃতি করা হয়। শ্বাসের কালে ঐ যন্ত্রের মধ্যগত লক্ষ লক্ষ ছিদ্রের মধ্যে বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া থাকে ; আবার প্রশ্বাস কালে সেই বায়ুগুলি বাহির হইয়া যায়। এই যন্ত্র দুটির নাম 'ফুস্‌ফুস্'। এই দুটি ফুস্ ফুস্ দুটি বৃন্ত বা বোঁটার সঙ্গে আঁটা আছে।

এই ফুস্‌ফুস্ দুটির মধ্যস্থানেই কিছু একটু বাম-ভাগে সরিয়া আর একটি যন্ত্র আছে, তাহার আকৃতি অনেকাংশে একটি পদ্ম কলিকার ন্যায়, ইহার বর্ণও পাণ্ডুর পদ্মের বর্ণের মত। ইহা ফুস্‌ফুস্-দ্বয়ের মধ্যে অধোমুখে অবস্থিত, ইহার একটি বৃন্তের মত আছে, তাহাতেই যেন ঝুলিতেছে, ইহার সঙ্গে সংলগ্ন বড় দুটি ধমনী আছে,—যাহা নলের মত ফাঁপা,—যাহা হইতে অনন্ত ক্ষুদ্রতম ধমনী সকল বাহির হইয়া পাদতল অবধি মস্তক পর্য্যন্ত শরীরের সর্ব্বাবয়বকে ওতপ্রোত ভাবে গাঁথিয়া রাখিয়াছে। উক্ত যন্ত্রটির ও কার্য্য রক্ত পরিষ্কার করা এবং রক্ত প্রেরণ করা অর্থাৎ এই

কিছু কিছু দেখিতে পাও,—যাহাকে সাধারণ লোকে "পাঁচ পরাণ কাঁপে" বলিয়া থাকে। এই ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া থাকিতে থাকিতে অনেক কাল পর আপনিই তোমার সেই হৃদয় পুণ্ডরীক নামক স্নায়ুপর্ব্ব (৭০ পৃ ২০ পঃ) ধরা পড়িবে। এবং সেইখানেই তোমার আত্মার শক্তির অনুভব হইতে থাকিবে। এইরূপে ক্রমেক্রমে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে গিয়া গিয়াঅবশেষে সেই প্রকৃত লক্ষ্য-স্নায়ু পর্ব্ব মধ্যেই আত্মার শক্তি লক্ষ্য করিয়া 'ধারণা' হইবে। যখন শরীরের অন্যান্য স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল মাত্র সমস্ত বক্ষপ্রদেশটিই লক্ষ্য করিয়া নিবিষ্ট থাকিবে, তখন তোমার জীবাত্মার ব্যুত্থানশক্তির (৬ পৃ ৪ পং) বিস্তৃতি একটু কমিবে—একটু আকুঞ্চিত হইবে, অর্থাৎ তোমার সর্ব্বদেহব্যাপিনী ব্যুত্থান-শক্তি সর্ব্বদেহ হইতে গুটিয়া হৃদয়ের দিকে যেন জড় হইতে থাকিবে; ব্যুত্থানশক্তির বলও একটু কমিবে; সুতরাং ফুসফুস্ হৃৎপিণ্ডাদির ক্রিয়া

যন্ত্র মধ্যে এক একবার চাপ লাগিয়া ঐ পূর্ব্বোক্ত নলাকার পদার্থগুলির দ্বারা পিচকিরির জলের ন্যায় রক্ত প্রবাহিত হইয়া সর্ব্বশরীরে পরিব্যাপ্ত হয়। এই নলাকার পদার্থের নাম 'ধমনী', এবং ঐ যন্ত্রটির নাম 'হৃৎপিণ্ড'।

হৃৎপিণ্ড বা ফুস্‌ফুসের নিজ হইতে কোন ক্রিয়া করার ক্ষমতা নাই, এবং ইহাদের সহিত সংলগ্ন অনেকগুলি মাংস পেষী—মাংসের চাপড়ী মত—আছে তাহাদের ও নিজের কোন কার্য্য করার ক্ষমতা নাই; কিন্তু পূর্ব্বে যে স্নায়ুর কথা বলা হইয়াছে (৬৮ পৃ ২৮ পং) সেই স্নায়ু সহস্র আসিয়া এই ফুস্ ফুস্, হৃৎপিণ্ড, ও তৎসংলগ্ন মাংসপেষী গুলিকে ওতপ্রোত ভাবে গাঁথিয়া রাখিয়াছে; তাহাদ্বারা প্রবাহিত হইয়া মস্তিষ্কস্থিত আত্মা হইতে শক্তি আসিতেছে, সেই শক্তি তোমার ঐ মাংসপেষী ও ফুস্ ফুস্, হৃৎপিণ্ডাদির আকুঞ্চন ও প্রসারণাদিক্রিয়া সাধন করিতেছে, এবং সেই আকুঞ্চন প্রসারণের শক্তি দ্বারা ফুস্ ফুস্, হৃৎপিণ্ড পরিচালিত হইয়া আপন২ কার্য্য সাধন করিতেছে। এই ফুস্ ফুস্, হৃৎপিণ্ডাদির নিকট একটি বড় মত স্নায়ু পর্ব্ব (৭০ পৃ ২০ পং) আছে, তাহা হইতেই স্নায়ু-সমূহ বাহির হইয়া ফুস্ ফুসাদির ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে। (যাঁহারা সংস্কৃতানভিজ্ঞ তাঁহারা মনে করিতে পারেন যে "শরীর স্থানের যেটুকু দেয়া হইল ইহা সংস্কৃত শাস্ত্রের কথা নহে, ইংরাজীর

একটু কমবেগে এবং ধীরে-ধীরে হইতে থাকিবে, সমস্ত শরীরটি আর তোমার অনুভবে আসিবে না, হৃদয়ভাগ ব্যতীত অন্য সমস্ত শরীরটা যেন অচেতন মত হইতে থাকিবে। কেবল বক্ষপ্রদেশই চেতন বলিয়া অনুভূত হইতে থাকিবে। (যে কারণে ইহা হয় তাহা সমাধি প্রকরণে বলিব) এতদবস্থায় নিরোধশক্তির কিছু বৃদ্ধি হইবে, আত্মজ্ঞানাদি ধর্ম্মের ও অত্যল্প-পরিমাণে বিকাশ হইবে।

তৎপর—যখন সমস্ত বক্ষপ্রদেশ লক্ষ্য করিতে করিতে ফুস্‌ফুস্, হৃদ্‌পিণ্ড ও তৎসংলগ্ন মাংসপেষীর অনুভব হইতে থাকিবে, তখন তোমার ব্যুত্থানশক্তির বিস্তৃতি আরও একটু কমিবে,—একটু আকুঞ্চন হইবে ; অর্থাৎ তোমার হৃদয় ব্যাপিনী ব্যুত্থানশক্তি বক্ষপ্রদেশের চর্ম্মান্ত-ভাগ পরিত্যাগ করিয়া একটু অভ্যন্তরে নিমগ্ন হইবে, ব্যুত্থানশক্তির বল আরও একটু কমিবে ; সুতরাং ফুস্‌ফুস্ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া আরও একটু কমবেগে ও ধীরে-ধীরে হইতে থাকিবে। মস্তিষ্কাদি সমস্ত যন্ত্রের ক্রিয়া আরও অধিক ক্ষীণ হইবে, এবং বক্ষপ্রদেশের চর্ম্মান্তভাগ আর তোমার অনুভবে আসিবে না, বক্ষ প্রদেশের উপরিস্থিত-স্তরটা যেন অচেতনমত হইতে থাকিবে। এঅবস্থায় নিরোধশক্তি আরও বৃদ্ধি পাইবে, এবং আত্মজ্ঞানাদি ধর্ম্মের অধিকতর বিকাশ হইবে।

তৎপর যখন হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুসাদিতে অনুপ্রবিষ্ট-স্নায়ু-সমূহের অনুভব হইতে থাকিবে, তখন তোমার জীবাত্মার ব্যুত্থান-শক্তির বিস্তৃতি আরও একটু কমিবে, আরও একটু আকুঞ্চিত হইবে ; অর্থাৎ তোমার ফুস্‌ফুস্, হৃৎপিণ্ড ও তৎসংলগ্ন মাংসপেষী-ব্যাপিনী-ব্যুত্থানশক্তি আরও একটু গুটিয়া এই স্থানের স্নায়ুর মধ্যেই জড় হইতে থাকিবে ; ব্যুত্থানশক্তির বেগ আরও একটু কমিবে ; সুতরাং ফুস্‌ফুস্, হৃৎপিণ্ডাদির ক্রিয়া আরও কমবেগে

অনুবাদ মাত্র" কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে সংস্কৃত শাস্ত্রেও এ সকল কথা বিশেষরূপ আছে, কিন্তু ইহাইত টিপ্‌পনী, আবার ইহার টিপ্‌পনী করিয়া সে সকল প্রমাণ তোলা নিতান্ত অনিয়ম এ নিমিত্ত তাহা উদ্ধৃত হইল না, অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে তাহা দেখাইব।

এবং ধীরে-ধীরে হইতে থাকিবে, অন্যান্য-সমস্ত-যন্ত্রের ক্রিয়াও অবরুদ্ধ প্রায় হইবে; সমস্তদেহ, বক্ষ প্রদেশ, ও ফুস্‌ফুস্, হৃৎপিণ্ডাদি প্রায় তোমার অনুভবে আসিবে না; এই স্থানের স্নায়ু-সমূহ-ব্যতীত অন্য সমস্ত-শরীরাবয়ব যেন অচেতন হইয়া আসিবে, কেবল ঐ স্নায়ু-সমূহই চেতন বলিয়া অনুভূত হইতে থাকিবে। এখন নিরোধ-শক্তি এবং আত্মজ্ঞানাদি-ধর্ম্মগুলি আরও অধিক প্রবল হইবে।

এইরূপে অনেককাল লক্ষ্য করিতে করিতে যখন ঐ স্নায়ু মণ্ডলের শক্তির অনুভব হইতে থাকিবে, তখন জীবাত্মার ব্যুত্থান-শক্তি আর ও আকুঞ্চিত হইবে, অর্থাৎ তোমার ঐ স্নায়ু-ব্যাপীনী ব্যুত্থান-শক্তি যেন আরও একটু গুটিয়া স্নায়ু-মণ্ডলের মধ্যেই জড়সর হইবে, ব্যুত্থান-শক্তির বল আরও কমিবে; সুতরাং ফুস্‌ফুস্-হৃৎপিণ্ডাদির ক্রিয়া আরও ক্ষীণতা-প্রাপ্ত হইবে এবং আরও বিরল-ভাবে হইবে; মস্তিষ্ক, পাকস্থলী-প্রভৃতি অন্যান্য-যন্ত্রের ক্রিয়া অতীব দুর্লক্ষ-ভাবে হইতে থাকিবে; তখন সমস্তদেহ, সমস্তবক্ষ-প্রদেশ, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, তৎসংলগ্ন-মাংসপেষী এবং তৎসংলগ্ন-স্নায়ুমণ্ডল অনুভবে আসিবে না; কেবল ঐ স্নায়ু-মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তি-শক্তিরই অনুভব হইতে থাকিবে। এখন নিরোধশক্তি এবং আত্মজ্ঞানাদিধর্ম্ম আরও অধিক প্রকাশ পাইবে।

তৎপর এইরূপ লক্ষ্য হইতে হইতে অবশেষে, যখন ঐ স্নায়ু-পর্ব্বের মধ্যেই ব্যুত্থান-শক্তির অনুভব হইতে থাকিবে, তখন জীবাত্মার ব্যুত্থানশক্তি একবারে আকুঞ্চিত হইয়া শরীরের সমস্তঅবয়ব সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া ঐ স্নায়ু-পর্ব্বের মধ্যেই জড় হইবে, ব্যুত্থান-শক্তির বল এত ক্ষীণ হইবে, যেন তাহার অস্তিত্বই থাকিবে না; সুতরাং শরীরের সমস্ত-যন্ত্রের ক্রিয়াই একবারে অবরুদ্ধ-প্রায় হইবে, তখন দেহের কোন অবয়বই অনুভবে আসিবে না, কেবল মাত্র অতীব ক্ষীণ-দশাপন্ন-লুপ্তপ্রায়-ব্যুত্থানশক্তি, আর ঐ স্নায়ু-পর্ব্বটি এবং অতীব প্রবলতাপন্ন নিরোধশক্তি ও আত্মজ্ঞানাদি-ধর্ম্মের বিকাশ এবং তাহাদেরই অনুভব হইতে থাকিবে; তখন তোমার অস্তিত্ব সমস্তশরীর পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র ঐ স্নায়ুপর্ব্বের মধ্যেই আসিবে এবং সেইখানেই তোমার অস্তিত্বের অনুভব হইবে। এই সময় পূর্ণ-নিরোধ-শক্তি প্রাদুর্ভূত

হইবে, আত্মজ্ঞানাদি-ধর্ম্মের পূর্ণমাত্রায় বিকাশ হইয়া উঠিবে। এখন হৃৎপদ্মে সম্পূর্ণ 'ধারণা' হইল।

কিন্তু যিনি কৃতকর্ম্মা তাঁহাকে স্থূল-বক্ষপ্রদেশ অবধি 'ধারণা' করিতে-করিতে ক্রমে এই হৃৎপদ্ম বা হৃদয়স্থ-স্নায়ুপর্ব্বে উপস্থিত হইয়া 'ধারণা' করিতে হয় না; তিনি যখন ইচ্ছা তখন, একবারেই এই হৃদয়পদ্ম-মধ্যে আত্মাকে 'ধারণা' করিতে পারেন; নাভিচক্রাদি অন্যান্য স্থানেও একবারেই 'ধারণা' করিতে পারেন।

নাভি চক্রাদি যেকোনস্থানে ধারণা কর, তাহাতেই এই একই নিয়মে ধারণা করিতে হইবে; এবং এই একই প্রকার ফল সাধিত হইবে, অর্থাৎ নাভিচক্রে 'ধারণা' করিতে হইলে, যিনি কৃতকর্ম্মা পুরুষ নহেন, তাঁহাকে প্রথম সমস্ত-উদর-দেশটা লক্ষ্য করিতে হইবে, উদর-দেশটা লক্ষ্য করিতে করিতে যখন অন্যদিকে মনের গতি না হইয়া উদর-দেশটাতেই মনের অভিনিবেশ হইবে, তখন ক্রমে ক্রমে আপনি আপনিই সমস্ত উদরটা পরিত্যাগ করিয়া উদরের মধ্যবর্ত্তী পাকস্থলী, পাকস্থলীর বাম দক্ষিণ-স্থিত প্লীহা এবং যকৃৎ, পাকস্থলীর নিম্নস্থিত-ক্ষুদ্র পাকস্থলী, এবং নাভিমূল সংলগ্ন-কতকগুলি-ধমনী ও তৎসংলগ্ন-পেষী-সকল অনুভূত হইতে থাকিবে (ক)।

(ক) উদর বলিয়া যাহা বাহির হইতে দেখায়ায়, তাহার সম্মুখটা কেবল চর্ম্ম আর তৎসংলগ্ন মাংস পেষীর দ্বারা আবৃত; উদরের দক্ষিণভাগ, বামভাগ, ও পৃষ্ঠভাগটা প্রথম চর্ম্ম, তাহার নীচে মাংসপেষী ও তাহার নীচে অস্থি-সমূহের দ্বারা আবৃত।

এইরূপ আবরণের দ্বারা দেহের মধ্যে একটি বিবর অথবা একটি কুঠরী হইল। এটির নাম দেহ 'মধ্য বিবর' এই কুঠরী মধ্যে অনেকগুলি যন্ত্র আছে, তন্মধ্যে আপাততঃ, মাংসপেষী বাদে চারিটি যন্ত্রকে প্রধান বলিয়া বুঝিতে পার। তাহার এক-একটির, সঙ্ক্ষিপ্ত বর্ণনা শুন।

এই মুখের প্রণালীটি একটি চোঙ্গের আকারে বক্ষ-প্রদেশের সমান মধ্য ভাগ দিয়া নিম্নাভিমুখে বরাবর লম্বমান হইয়াছে; এই প্রণালীটি স্বভাবতঃ তিন পর্ব্ব অপেক্ষায় কিছু বেশী মোটা হইবে। ইহা তোমার বক্ষ-প্রদেশের নিম্নস্থান

এই সকল গুলি লক্ষ্য করিতে২ পরে আপনিই এই সকল-যন্ত্র-সংলগ্ন স্নায়ু-মণ্ডল এবং তন্মধ্যবর্ত্তি শক্তির অনুভব হইবে। তৎপর নাভিচক্রে ধারণা হইবে।

মস্তিস্কের মধ্যে অথবা ব্রহ্মরন্ধ্রে 'ধারণা' করিতে হইলে প্রথম সমস্ত-মস্তক প্রদেশের অনুভব হইবে, তৎপর মস্তকের চর্ম্ম ও অস্থির বেষ্টনটি বাদ দিয়া সমস্তটা মস্তিষ্কের অনুভব হইবে, তৎপর মস্তিষ্কের অভ্যন্তর প্রদেশের অনুভব হইয়া "ধারণা" হইবে।

কিন্তু নাসিকাগ্র বা জিহ্বাগ্রাদি-স্থানে "ধারণা" করিতে হইলে প্রথমেই

পর্য্যন্ত আসিয়া ক্রমে দক্ষিণ ভাগে প্রায় পঞ্জরাস্থির নিকটে সরিয়া গিয়াছে; তৎপর দক্ষিণ-ভাগ হইতে ফিরিয়া আবার একটু নিম্নভাবে প্রায় সোঝাসোঝী বামভাগে গিয়াছে, বামভাগে গিয়া আবার নিম্নাভিমুখ হইতে হইতে দক্ষিণ-ভাগে কতকটা গিয়া আবার প্রায় নাভির নীচে ফিরিয়া আসিয়া সর্পেরন্যায় কএকটি কুণ্ডলী পাকাইয়া অবার নিম্নাভিমুখে গিয়াছে, ইহার শেষ মুখ গুহ্যদ্বার।

এই প্রণালীটার বর্ণ একটু কালিমামিশ্রিত শাদাশাদা,—ইহার মধ্যে বরাবর চোঙ্গেরন্যায় ফাঁক আছে, কিন্তু সেই মধ্যটার গাত্রে চারিদিকে শৈবালের মত আঁটা-আঁটা পিছিল-পিছিল একপ্রকার পদার্থ আছে।

এই প্রণালীটি যখন বক্ষপ্রদেশের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত গিয়া কিছুদক্ষিণ ভাগে সরিয়া আবার বামভাগ পর্য্যন্ত গিয়া কিছু দক্ষিণ ভাগাবিমুখে ফিরিয়াছে, তখন সেই স্থানটি, অর্থাৎ এই চোঙ্গাকার-প্রণালী দক্ষিণ ভাগ হইতে ফিরিয়া বামভাগ পর্য্যন্ত যাইতে উহার যে দীর্ঘতা টুকু ব্যয়িত হয়,—যাহা প্রায় ৮ অঙ্গুলীরও কিছু অধিক দীর্ঘ হইবে, সেই অংশটি অনেকটা মোটা, ইহার বেষ্টনটি প্রায় ১৬।১৭ অঙ্গুলী হইবে। তাহার পর, আবার সেই পূর্ব্বের মত সরু হইয়া গিয়াছে। এই মোটা স্থানটি রবারেরন্যায় স্থিতিস্থাপক গুণযুক্ত পদার্থের দ্বারা রচিত এবং ইহার দুই মুখই সরু, আর মধ্যটা ঐরূপ মোটা, ইহা আকারে প্রায় একটি ভিস্তিওয়ালার মশকের আকৃতি গ্রহণ করিয়া আছে।

আমরা যেসকল বস্তু পানাহার করি তাহা গলপ্রণালীর দ্বারা গিয়া প্রায়

ঐ সকলস্থান লক্ষ্য করা যাইতে পারে। কারণ, ইহাতে অভ্যন্তরে লক্ষ্য করিতে হয় না। প্রত্যেক রকম ধারণারই ফল ও তাহার প্রক্রিয়া একই প্রকার। এই গেল শরীরের মধ্যপ্রদেশের ধারণা, অতঃপর বাহ্য-বিষয়ের "ধারণার" প্রণালী শুন—।

বাহ্য বিষয়ে ধারণার প্রণালী ও তাহার ফল।—

বাহ্য-বিষয়ে "ধারণা" সম্বন্ধে পুরাণ,—"প্রাণায়ামেন পবনং প্রত্যাহারেণ চেন্দ্রিয়ম্। বশীকৃত্য ততঃ কুর্য্যাচ্চিত্তস্থানং শুভাশ্রয়ে" প্রাণায়ামদ্বারা প্রাণাদি শক্তি বশীভূত করিয়া, প্রত্যাহারের দ্বারা ইন্দ্রিয়-সমূহ বশীভূত করিয়া অনন্তর শুভআশ্রয়ে চিত্তের স্থাপন করিবে। শুভাশ্রয় বিষয়ে ও পুরাণ

৩ ঘণ্টা ৩॥ ঘণ্টা পর্য্যন্ত এই যন্ত্রটিতে অবস্থিতি করে, এবং এই যন্ত্রটির মধ্য হইতে এক প্রকার পাচক রস স্যন্দিত হইয়া (চোঁয়াইয়া) ভুক্ত বস্তু গুলিকে গলাইয়া ফেলে, ইহা এই যন্ত্রের কার্য্য। এই যন্ত্রটির নাম (পাকস্থলী)।

এই পাকস্থলীর দুদিকে যে দুটি যন্ত্র আছে,—যাহা বাম ও দক্ষিণ এই দুই পার্শ্বে সংলগ্ন, চিত্র ব্যতীত কেবল কথার দ্বারা তাহার আকৃতি বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। তাহার যেটি দক্ষিণদিকে সেইটি যকৃৎ, আর যেটি বামদিকে সেইটি প্লীহা। যকৃৎ হইতে পিত্ত নিস্যন্দিত হইয়া ভুক্তপীতদ্রব্যকে রূপান্তরিত করে। প্লীহা হইতেও একপ্রকার সাদা মত রস নিস্যন্দিত হয় সেই রস দ্বারাও যকৃতের মতই কার্য্য হয়।

পাকস্থলীর শেষ স্থান হইতে যে প্রণালীটি গিয়াছে তাহার কতকটা অংশের নাম ক্ষুদ্র পাকস্থলী। ক্ষুদ্র পাকস্থলীর সহিত পিত্তস্থলীর সহিত যোগ আছে, সেই পিত্তস্থলী হইতে পিত্ত নিস্যন্দিত হইয়া ক্ষুদ্র পাকস্থলীর মধ্যে গিয়া ভুক্তপীতদ্রব্যের সহিত সম্মিশ্রিত হইয়া তাহা দ্রব করিয়া দেয়। ক্ষুদ্র পাকস্থলী সেই দ্রব রস গ্রহণ করিয়া শিরা সমূহে অর্পণ করে।

উক্ত সমস্ত যন্ত্রেরই সংলগ্ন মাংসপেশী আছে, এবং সেই পেশীর মধ্যে অনুস্যূত স্নায়ু আছে তাহা হইতেই শক্তি প্রাপ্ত হইয়া ঐ সকল যন্ত্র আপনাপন কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকে,। উক্ত স্নায়ু সমূহের মূলে প্রায় নাভিসমস্থানে একটি সুবৃহৎ স্নায়ু পুর্ব্ব আছে, সেইটির নাম 'নাভিচক্র'।

বলিতেছেন,—"মূর্ত্তং ভগবতো রূপং সর্ব্বোপাশ্রয় নিস্পৃহম্। এষা বৈ ধারণা জ্ঞেয়া যচ্চিত্তং তত্র ধার্য্যতে। তচ্চ মূর্ত্তং হরেরূপং যদ্বিচিন্ত্যং নরাধিপ। তচ্ছ্রূয়তা মনা ধারা ধারণা নোপপদ্যতে। প্রসন্নবদনংচারু পদ্ম পত্র নিভ ক্ষণম্। সুকপোলং সুবিস্তীর্ণং ললাটফলকোজ্জ্বলম্। * * * ইত্যাদি"

ভগবানের সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন মৃণ্ময়াদি মূর্ত্তিতে চিত্তের অভিনিবেশ করার নাম ধারণা। হে নরাধিপ! যাহা ধারণাতে লক্ষ্য করিতে হয়, তাহা হরির মূর্ত্তরূপ, তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর, কারণ কোন একটি আধার ব্যতীত 'ধারণা' হওয়া অসম্ভব। সেই রূপ, প্রসন্ন-বদন, চারু-পদ্ম পত্রের ন্যায় নয়ন যুগল, সুন্দর কপোল সুগঠিত, সুবিস্তীর্ণ ললাট-ফলক এবং উজ্জ্বল * * *।

শিষ্য।—ধারণার বিবরণ যেরূপ বলিলেন, তাহাতে নিরোধশক্তি আর ধারণাশক্তি যেন একই বলিয়া বুঝিলাম, নিরোধশক্তি হইতে বিভিন্নভাবে ধারণাশক্তি বুঝিতে পারিলাম না। যদি বাস্তবিক এতদুভয় একই হয়, তবে নিরোধশক্তির ব্যাখ্যা করিয়া ধারণাশক্তি ব্যাখ্যার আবশ্যক কি?

আচার্য্য।—নিরোধশক্তি আর ধারণাশক্তি এক নহে, সম্পূর্ণবিভিন্ন, তবে ধারণাশক্তিও নিরোধশক্তি হইতেই সমুৎপন্ন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যে শক্তির দ্বারা ব্যুত্থানশক্তির বল কমাইয়া ক্রমে তাহাকে উদ্ধে-মস্তিষ্কের দিকে সংযত বা অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়া নিম্নাভিমুখে, অর্থাৎ শরীরের শাখা প্রশাখায়, প্রবাহিত হইতে না দেওয়া যায়, তাহার নাম 'নিরোধশক্তি' ইহা পূর্ব্বেই সবিস্তারে বলিয়াছি। ধারণা তাহা ঠিক নহে,—যে শক্তির দ্বারা আত্মার স্বভাব-চঞ্চল-সমস্ত-শক্তিকে হৃদয়াদি কোন স্থান লক্ষ্য করিয়া সেই এক স্থানেই নিবদ্ধ করিয়া রাখা হয়,—সেই একস্থান হইতে এদিক ওদিকে যাইতে না দেওয়া হয়, তাহার নাম 'ধারণাশক্তি'। নিরোধের সময় হৃদয়াদি কোন স্থান লক্ষ্য করিতে হয় না, কেবল আত্মার শক্তিমাত্রই বিলক্ষণ যত্ন সহকারে দৃঢ়তর লক্ষ্য করিয়া থাকিতে হয়; আর ধারণার সময় আত্মার শক্তির দিকে মুখ্যরূপে লক্ষ্য না রাখিয়া হৃদয়াদি স্থানের দিকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়;—ইত্যাদি পার্থক্য আছে। অতএব নিরোধশক্তি, আর (ধারণা) পৃথক্ পৃথক দুটি শক্তি।

শিষ্য।—ধারণার দ্বারা কিরূপে নিরোধশক্তি বৃদ্ধি, ব্যুত্থান শক্তির ক্ষয়, এবং আত্মজ্ঞানাদি পরম ধর্ম্ম সমূহের বিকাশ হয় তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিশেষ বিস্তার করিয়া বলুন।

আচার্য্য।—প্রথম তোমার স্বাভাবিক অবস্থাটি স্মরণ করিয়া লও;—স্বাভাবিক অবস্থায় তোমার ব্যুত্থানশক্তি মস্তিষ্ক-মধ্যে উত্তেজিত হইয়া দেহের সমস্ত শাখা-প্রশাখায় প্রবাহিত হইয়া সমস্তদেহ-পরিব্যাপ্ত-ভাবে রহিয়াছে, বক্ষপ্রদেশেও পরিব্যাপ্ত আছে।

এখন যেন তোমাকে হৃদয়পদ্মে ধারণা করিতে হইবে। সুতরাং তুমি পূর্ব্বকার নিয়মানুসারে স্থূল-বক্ষ-প্রদেশটা লক্ষ্য করিয়া মনোনিবেশ করিতে থাকিলে। তোমার মন কিন্তু স্থির হইয়া থাকার জিনিষ নহে, সুতরাং সে একবার চক্ষুর দিকে—একবার কর্ণের দিকে—একবার বাক্যযন্ত্রের দিকে—একবার পাকস্থলীর দিকে, অথবা হস্তপদাদির দিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। তুমিও তাহাকে বক্ষপ্রদেশেই বাঁধিয়া রাখার চেষ্টা করিতেছ, এক এক বার মন স্খলিত হইয়া যায়, এক একবার বক্ষ প্রদেশে লক্ষ্য করিয়া বক্ষ প্রদেশেই তাহাকে রাখিতে থাকিলে। বল দেখি, মন এক একবার স্খলিত-পদ হইয়া নানাদিকে যাইতেছে কোন্ শক্তির বলে? রজোগুণ-সমুৎপন্ন ব্যুত্থান-শক্তির বলে;—ব্যুত্থান শক্তিই তোমাকে, শরীরের হস্ত-পদাদি-শাখা-প্রশাখায় পরিচালিত করিতেছে। এখন যদি সেই মনকে হৃদয়াদি এক স্থানই লক্ষ্য করিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিলে, তবে অগত্যাই ব্যুত্থান-শক্তিকে ক্ষীণ করা হইল, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যুত্থানশক্তি ক্ষীণতা প্রাপ্ত না হইবে, ততক্ষণ, তুমি বক্ষ-প্রদেশে মনকে রাখিতে পারিবে না, ব্যুত্থান-শক্তি তাহাকে বলক্রমে অন্যত্র লইয়া যাইবে। অতএব 'ধারণা' কালে ব্যুত্থান-শক্তি অবশ্যই পরাভূত হইবে।

মনকে একস্থানে বাঁধিয়া রাখার চেষ্টা করিতেই তৎসঙ্গে অলক্ষিতভাবে মনের সংযমশক্তি—নিরোধ-শক্তি-উদ্দীপিত হয়। মন যদি এদিক ওদিকে না যাইতে পারিল, সুতরাং নিরুদ্ধই হইল।

যখন ব্যুত্থান-শক্তির সঙ্কোচ হইয়া ক্ষীণতা হইল, নিরোধেরও বৃদ্ধি হইল, তখন সুতরাং দেহের আত্মার সহিত শক্তির সম্বন্ধ শ্লথ হইয়া গেল,

সুতরাং দেহাত্মজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া,ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞানাদি(পৃঃ৮৭ পঃ১১)হইতে থাকিবে, দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ শিথিল হইলে, দেহের উপর আত্মার—'অহং, মম' ভাব ক্ষীণ হইলে, দেহাত্ম-বিবেক (পৃ৮৭ পঃ২৪) এবং 'দৈহিক' বৈরাগ্য (পৃ পঃ) আপনিই হইবে। তৎসঙ্গে সঙ্গে ভক্তি, ক্ষমা, ঔদাসীন্য, ধৃতি দম, শৌচ প্রভৃতি ধর্ম্ম ও অগত্যাই বিকাসিত হইতে থাকিবে।

বক্ষপ্রদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রমে ফুস্‌ফুস, হৃৎপিণ্ডাদি-স্থানে ধারণা যতই প্রগাঢ় হইতে থাকিবে, ততই নিরোধশক্তি, ও অন্যান্য আত্মজ্ঞানাদিধর্ম্মের বিকাশ ও বৃদ্ধি এবং ব্যুত্থান শক্তির ক্ষয় হইতে থাকিবে। অবশেষে যখন হৃৎপদ্মে অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডাদি সংলগ্ন স্নায়ু পর্ব্ব 'ধারণা' হইবে, তখন প্রকৃতিনিরোধ (পৃ৬৮ প৯) প্রকৃতাত্মজ্ঞান (পৃ৮৭ পঃ২৫) এবং অন্যান্য ধর্ম্মেরও পরাকাষ্ঠা হইবে, আর ব্যুত্থান-শক্তিরও একবারে ক্ষয় হইয়া সংস্কারাবস্থায় থাকিবে।

বাহ্য-বিষয়ের ধারণা-দ্বারা কি প্রকারে নিরোধশক্তি এবং আত্মজ্ঞানাদি-ধর্ম্মের বিকাশ ও বৃদ্ধি হয়, এবং ব্যুত্থান-শক্তির ক্ষয় হয় তাহা শুন। মনে-কর! তোমার সম্মুখে ভগবানের মৃণ্ময়ীপ্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে। তুমি চক্ষু দ্বারা এই মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া মনোনিবেশ করিতে থাকিলে। তোমার মন রজঃশক্তি বা ব্যুত্থানশক্তির প্রভাবে নানা দিকে নানা বিষয়ে যাইতে চেষ্টা করিতেছে, এখন কেবল মাত্র এই ভগবানের মূর্ত্তিতেই তাহাকে আবদ্ধ করিতে হইলে, তাহার নানা দিকে গতি-শক্তি বিনষ্ট করিতে হইবে, নানাদিকে গতি থাকিতে চিত্ত এক স্থানে আবদ্ধ হয় না। সুতরাং ব্যুত্থান-শক্তি দমন করা হইল। চিত্তের নানাদিকে গতিশক্তি বিনষ্ট করিলে অদৃশ্যভাবে নিরোধ-শক্তিরও বৃদ্ধি হইবে। সর্ব্বদেহ-ব্যাপক-ব্যুত্থান-শক্তির বিনাশ হইলে দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং আত্মজ্ঞান, বৈরাগ্য, ঔদাসীন্য, ভক্তি-প্রভৃতি-ধর্ম্মের পরিস্ফুরণ হইতে থাকে।

এই প্রকারে উভয়বিধ ধারণা দ্বারাই নিরোধ শক্তির বৃদ্ধি ও আত্মজ্ঞানাদি ধর্ম্মের বিকাশ, এবং ব্যুত্থান-শক্তির ক্ষয় হয়।

ধ্যানের বিবরণ।

এখন ধ্যান কাহাকে বলে তাহা শ্রবণ কর। গুরুদেব ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন "তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্" (পাত,৩পা২সূ) হৃদয়াদি কোন এক স্থানে (ধারণার) অভ্যাস হইলে সেইখানে কেবল একটি মাত্র বিষয় নিশ্চল ভাবে চিন্তা করার নাম ধ্যান। যতক্ষণ চিত্ত একবারে একাগ্র না হয়, ক্ষণে ক্ষণে অন্যান্য বিষয়েও যায়, ততক্ষণ প্রকৃত ধ্যান হয় না। অতএব যতক্ষণ সম্পূর্ণ একাগ্রতা না হইবে, ততক্ষণ ধ্যানাভ্যাস করিতে হইবে।"

ধ্যানবিষয়ে পুরাণ বলিতেছেন,—"তদ্রূপ-প্রত্যয়ৈকাগ্র্য-সন্ততিশ্চান্য নিস্পৃহা। তদ্ধ্যানং প্রথমৈরঙ্গৈঃ ষিড়্‌ভিষ্পাদ্যতে নৃপ।" অনন্যচিত্ত হইয়া ধারাবাহী ভগবানের চিন্তার নাম ধ্যান। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, আর ধারণা এই ছয়টি অঙ্গ দ্বারা ধ্যান নিষ্পন্ন হয়।"

শিষ্য।—ধারণা, আর ধ্যানের পার্থক্য কি তাহা বুঝিতে পারিলাম না বিশেষ করিয়া বলুন।

আচার্য্য।—ধারণাতে, হৃদয়, নাভিচক্র, ব্রহ্মরন্ধ্র প্রভৃতি এক একটি স্থানে লক্ষ্য করিয়া সেই স্থানে মনকে আবদ্ধ করিতে হয়; কিম্বা বহিঃস্থিত কোন মূর্ত্তি একদৃষ্টে দেখিয়া সেই স্থানে মন নিবদ্ধ করিতে হয়; ধ্যান তাহা নহে, ধারণার অভ্যাসের দ্বারা চিত্তের নানাদিকে গতিশক্তি বিনষ্ট হইলে, হৃদয়াদি স্থান বা বাহিরের মূর্ত্তি লক্ষ্য না করিয়া কেবল মাত্র চিন্তনীয় বিষয়টি লক্ষ্য করিতে হইবে,—অর্থাৎ ধারণাতে যেরূপ চিত্তকে শরীরের এক এক স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখার যত্ন করিতে হয়, ধ্যানে তাহা করিতে হয় না; শরীরের অবয়ব বাদ দিয়া কেবল চিন্তনীয়-বিষয়েরই চিন্তা করিতে হইবে। অতএব ধারণা এবং ধ্যান বিভিন্ন পদার্থ।

ধ্যানের দ্বারাও নিরোধের বৃদ্ধি, আত্মজ্ঞানাদি-ধর্ম্মের বিকাশ, এবং ব্যুত্থান-শক্তির বিনাশ হইয়া আত্মা কৃতার্থ হয়। যেরূপে তাহা হয় তাহা সমাধি প্রকরণেই বলিতেছি।

বুদ্ধি, অভিমান, মন ও ইন্দ্রিয়াদির বিশেষ বিবরণ।

শিষ্য। ধারণা ও ধ্যানের বিষয় একরূপ সংক্ষেপে বুঝিলাম এখন সমাধি কাহাকে বলে, কি প্রকারে সমাধি সাধিত হয়, এবং তদ্দ্বারা নিরোধ-শক্তি আর আত্মজ্ঞানাদি-ধর্ম্মের বিকাশ ও ব্যুত্থানশক্তি আর অধর্ম্মের ক্ষয় হয়, তাহা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করুন।

আচার্য্য।—সমাধির সবিস্তার-বর্ণনাতে বোধ হয় অনেকঅধ্যায় ব্যয়িত হইবে, ইহাতে বহুপ্রকার কথা উত্থিত হইবে, অনেক-বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে। তাহার আনুষঙ্গিক অনেকগুলি কথা জানা নিতান্ত আবশ্যক হয়, সেই সকল বিষয় বিশেষরূপে অবগত না হইলে সমাধি বিবরণের সুন্দর-রূপে অবগতি হয় না। কিন্তু যদি উপস্থিত মতে সেই সেইস্থানে সে সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়া বুঝাইতে হয় তবে সেইগুলি বুঝিতে বুঝিতেই প্রকৃতবিষয় একএক বার ভুলিয়া যাইবে,—আতহারা হইতে হইবে, সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাব বুঝিতে বড়ই অসুবিধা হইবে। এজন্য সেই বিষয়গুলি পূর্ব্বেই বলিয়া রাখি,—পরে একক্রমেই প্রস্তাবিতবিষয় ব্যাখ্যা করিব। তুমি এই বিষয়গুলি যত্ন-সহকারে শ্রবণ ও স্মরণ করিয়া রাখিও।

প্রথমতঃ বুদ্ধি, অভিমান, মন প্রভৃতির বিশেষ বিবরণ করিতেছি শুন— বুদ্ধি, অভিমান, মন ও ইন্দ্রিয় এবং প্রাণাদিশক্তি ইহাদের অবস্থা, প্রকৃতি, আকৃতি, ও ক্রিয়ারদ্বারা কিছু কিছু প্রভেদ থাকিলে ও স্বরূপতঃ কোন প্রভেদই নাই, স্বরূপতঃ ইহারা সকলেই এক পদার্থ ;—স্বরূপতঃ—বুদ্ধিও যে পদার্থ, অভিমানও সেই পদার্থ, মনও সেই পদার্থ, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণও সেই একই পদার্থ একটিমাত্র পদার্থই অবস্থাদি-ভেদে বুদ্ধি, অভিমানাদি পৃথক্‌২ নামে অভিহিত হয়। এবিষয় বুঝিবার নিমিত্ত প্রথমে এই কথাটি বুঝিয়া লও ;—

আমাদের মস্তিষ্ক-মধ্যে যে, ভৌতিক-পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথক্‌ভাবে তিন-প্রকার শক্তি ক্রীড়া করিতেছে,—যাহার একটি জ্ঞানেরশক্তি, আর একটি—পরিচালনেরশক্তি, আর একটি—পোষণকরারশক্তি বলা হইয়াছে,—যে শক্তি-ত্রয়ের সমষ্টি; আর চৈতন্য বা চেতনাশক্তি একত্রে বিমিশ্রিত হইয়া জীবাত্মা

বলা হইয়াছে (৭৮ পৃ ২৭ বা) যে শক্তিত্রয় এই দেহের রাজা ও হর্ত্তাকর্ত্তা, যে শক্তিত্রয়ের শাখা-প্রশাখা-বিস্তার হইয়া শরীরের মধ্যে অসংখ্যপ্রকার কার্য্য হইতেছে, সেই শক্তিত্রয় পরস্পরের সহিত এমন সুদৃঢ়-সম্বন্ধে একত্রিত ও মিলিত হইয়া আছে, তাহা অতি অদ্ভুত, এমন কি, এই শক্তিত্রয়ের পরস্পরের ভেদ অনুভব করা নিতান্ত দুঃসাধ্য।

শিষ্য। শক্তিত্রয় পরস্পর বিমিশ্রিত একথাটি কি রকম? ভূত ভৌতিক পদার্থেরই মিলন হইতে দেখিয়াছি,—মৃত্তিকা জলের সহিত মিলিত হয়, জল বায়ুর সহিত মিলিত হয়, দেখিয়াছি, কিন্তু শক্তির সহিত শক্তি কিরূপে মিলে তাহা কখনও দেখিনাই শুনিও নাই। অতএব আপনার উক্ত শক্তিত্রয়ের কিরূপ মিলন তাহা বুঝিলাম না।

আচার্য্য। বাস্তবিক শক্তির সম্মিলনই হইয়া থাকে, ভৌতিক-পদার্থের সম্মিলন কোন কাযের কথা নহে, কারণ যে যেখানে ভৌতিক-পদার্থের সম্মিলন বা বিমিশ্রণ দেখিতে পাও, সেই সেই খানেই শক্তির সম্মিলন আছে, শক্তির সম্মিলন না হইলে ভৌতিক-পদার্থের সম্মিলন হইতে পারে না, শক্তির সম্মিলনই ভৌতিক-পদার্থের সম্মিলন জন্মাইয়া দেয়। ইহা বুঝিবার পূর্ব্বে একটি দৃষ্টান্ত বুঝিয়া লও;—একটি তড়িৎ-শক্তি যে অপর একটি তড়িৎ-শক্তির সহিত আসিয়া সম্মিলিত হয়, তাহা কখনও দেখিয়াছ কি?।

শিষ্য। মেঘীয়-তড়িৎ-শক্তি পৃথিবীর তড়িৎ-শক্তিতে আসিয়া মিলিত হয়, অবগত আছি, এবং তড়িৎ-যন্ত্রেও তড়িদ্দ্বয়ের পরস্পর-সম্মিলন প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এখন অন্য কি বক্তব্য তাহা বলুন।

আচার্য্য।—যে তড়িৎ-শক্তির গতিও সম্মিলন দেখিয়াছ, তাহার আলম্বন যদি অতি ক্ষুদ্র হইত, এবং ঐ তড়িৎ-শক্তিটি বলবতী হইত, তাহা হইলে তড়িৎ-শক্তি চলিয়া যাওয়ার কালে নিজের আলম্বনটি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইত, এবং তড়িৎদ্বয়ের মিলনের সঙ্গে২ আলম্বনের মিলনও দেখিতে পাইতে। সাধারণ-তড়িতের দ্বারা ইহার দৃষ্টান্ত বড় ভালরূপ হইবে না। চুম্বকীয় তড়িতের একটি দৃষ্টান্ত বুঝিয়া লও;—চুম্বকধর্ম্ম তড়িত-শক্তিরই রূপান্তরমাত্র। একটি উত্তরগ-চুম্বক, আর একটি দক্ষিণগ-চুম্বক যদি নিকটবর্ত্তী হয়, তবে ঐ দুটি চুম্বকলৌহ গিয়া একত্রিত হয়। ইহার অর্থ এই যে, ঐ লৌহদ্বয়ের সংস্পৃষ্ট

দক্ষিণগ-চুম্বক-শক্তি এবং উত্তরগ-চুম্বক-শক্তি এতদুভয়ে পরস্পর মিলিবার নিমিত্ত চেষ্টা করে, এবং ক্রমে ঘনিষ্ট হইতে থাকে, অথচ সঙ্গে২ ঐ চুম্বক লৌহ-খণ্ডকেও লইয়া যাইতে থাকে, ক্রমে দক্ষিণগ-চুম্বক-শক্তি আর উত্তরগ-চুম্বক-শক্তি গিয়া পরস্পরে মিলিত হয়, অগত্যা তৎসঙ্গে২ তাহাদের আলম্বন-লৌহ-খণ্ডদ্বয়ও যুগপৎ পরস্পরে মিলিত হয়।

জলেজলে মৃত্তিকায়মৃত্তিকায় বিমিশ্রণকালে যে সম্মিলন দেখিতে পাও, তাহাও এই শক্তিদ্বয়েরই মিলন-জনিত। প্রত্যেক জলীয-ত্রসরেণুর (ক) অনুগত আকর্ষণ-শক্তি আছে, সেই আকর্ষণ-শক্তিই পরস্পরের সহিত মিলিত হয়, অগত্যা তৎসঙ্গে২ জলীয়-ত্রসরেণু ও মিলিত হয। প্রত্যেক পার্থিব অংশের অনুগত আকর্ষণ-শক্তি আছে, সেই শক্তিই পরস্পরের সহিত মিলিত হয়, অগত্যা তৎসঙ্গে পার্থিব-অংশও পরস্পরে সম্মিলিত হয়। সর্ব্বত্রই এইরূপ শক্তিরই সাম্মলনের সঙ্গে সঙ্গে ভৌতিক-পদার্থের সাম্মলন দৃষ্ট হয। এখন শক্তির সম্মিলন বুঝিলে?

শিষ্য। বুঝিলাম, এখন আত্মার সেই জ্ঞানশক্তি-প্রভৃতি-শক্তি-ত্রয়ের মিলন হইয়া কি হইল তাহা বলুন।

আচার্য্য। শরীর-মধ্যবর্ত্তী উক্ত-শক্তিত্রয় মিলিত হইয়া প্রথম যে অবস্থা গ্রহণ করে তাহার নাম 'বুদ্ধি,'। জ্ঞানাদি শক্তি-ত্রয়ের মুখ্য অবলম্বন স্থান মস্তিষ্কের অভ্যন্তর প্রদেশ; সুতরাং বুদ্ধির অবলম্বনস্থান মস্তিষ্কের অভ্যন্তর প্রদেশ। আত্মার জ্ঞানের শক্তি, পরিচালনার শক্তি, এবং পোষণের শক্তির অন্তর্গত যে কোন-শক্তির ক্রিয়া শরীরের মধ্যে হইয়া থাকে, তৎসমস্তই এই মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থান হইতে আসিতেছে, এই স্থান হইতেই প্রযুক্ত হইয়া সর্ব্বশরীরের মধ্যে কার্য্য করে, ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইযাছে। আত্মশক্তির এই প্রথম অবস্থাকে 'অধ্যবসায়' বা 'নিশ্চয়বৃত্তি' বলে। "অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ" (সাঙ্খ্য) অধ্যবসায় বা নিশ্চয়াত্মক বৃত্তি বলিলে কি বুঝা যায়, তাহা বোধ হয় এককথায় বুঝিতে পার নাই, এজন্য আরএকটু বিশদ করিয়া বলিতেছি।

(ক) নব্যমতের দুইটি জলজনক-পরমাণু আর একটি অম্লজনক-পরমাণু একত্রিত হইলে প্রাচীনমতের একটি জলীয় ত্রসরেণু বলাহয়। "ত্রসরেণুস্তুকৈস্ত্রিভিঃ" (অমর কোষ)

শক্তিজগতের ইহা একটি সাধারণ নিয়ম যে, যে যে শক্তি প্রবাহিত হইয়া চলিয়া গিয়া কার্য্য করে, সেই শক্তিমাত্রেরই তিন প্রকার অবস্থা আছে তাহা পূর্ব্বে (১৬ পৃঃ ৯ পং) বলিয়াছি, আবারও স্মরণ করিয়া দিতেছি ;—সেই তিনটি অবস্থার মধ্যে একটি অবস্থার নাম 'নিয়োগাবস্থা,' আর একটি অবস্থার নাম 'প্রবাহাবস্থা,' আর একটি অবস্থার নাম 'সূত্রাবস্থা'। মনে কর, মেঘ হইতে তড়িৎশক্তি আসিয়া পৃথিবীর সহিত সংযুক্ত হইতেছে, এখন ঐ তড়িৎশক্তি যতক্ষণ মেঘে থাকে, ততক্ষণ তাহার সূত্রাবস্থা বলা যায়, আর যখন ঐ শক্তি বায়ুরাশির স্তরে-স্তরে ভেদ করিয়া, পৃথিবীর দিকে আসিতে থাকে, তদবস্থাকে ঐ তড়িৎশক্তির প্রবাহাবস্থা বলা যায় এবং যখন পৃথিবীতে আসিয়া পৃথিবীর সহিত সংযুক্ত হয়, তদবস্থার নাম নিয়োগাবস্থা এই তিন অবস্থা হইল।

বহির্ব্বিচরণশীল শক্তিতে যেমন এই তিনটি অবস্থা দেখিলে, তোমার শরীরের মধ্যে যত প্রকার শক্তির কার্য্য হইয়া থাকে, তাহারও প্রত্যেকটিতেই এইরূপ তিনতিনটি অবস্থা আছে। মনে কর, তুমি হস্তদ্বারা রামদাসকে একটি ধাক্কা দিলে, এই ধাক্কাটি তোমার কোন্ শক্তির কার্য্য ? ইহা একটি অপসারণ-শক্তির কার্য্য ; এই অপসারণ-শক্তিটি প্রথম তোমার মস্তিষ্কের অভ্যন্তরবর্ত্তি-বুদ্ধিতে পরিস্ফুরিত হইলে, তৎপর মস্তিষ্ক হইতে ক্রমে হস্তের স্নায়ুর দ্বারা প্রবাহিত হইয়া কর পর্য্যন্ত আসিয়া পরে রামদাসের শরীরে বিনিযুক্ত বা মিলিত হইল, তখন ধাক্কা লাগিল, রামদাস সরিয়া পড়িল। এইক্ষণে যখন এই অপসারণ-শক্তিটির প্রথম পরিস্ফুরণ হইল, তখন ইহার 'সূত্রাবস্থা' এই অবস্থার নামই তোমার রামদাসকে ধাক্কা দেওয়ার 'অধ্যবসায়' বা ইচ্ছা বা নিশ্চয় বা বুদ্ধি-হওয়া বলা যায়। অর্থাৎ রামদাসকে ধাক্কা দেওয়ার জন্য যখন প্রথম তোমার ঐ ধাক্কা দেওয়ার শক্তির—একরূপ অপসারণ-শক্তির—পরিস্ফুরণ হয়, তখন ইহা বলা যায়, যে তুমি রামদাসকে ধাক্কা দেওয়ার নিমিত্ত অধ্যবসায়ী হইয়াছ, কিম্বা ইচ্ছাবান্ হইয়াছ, কিম্বা নিশ্চয় করিয়াছ, কিম্বা বুদ্ধি করিয়াছ। এসময়ে কেবলমাত্র মস্তিষ্কের মধ্যেই ঐ শক্তির ক্রিয়া হয়। তৎপর যখন ঐ শক্তিটি মস্তিষ্ক ছাড়িয়া হস্তের মাংসপেশী-সমূহে জড়িত-স্নায়ু-মণ্ডলের মধ্যে চলিয়া আইসে, তখন উহার প্রবাহাবস্থা বলা যায় ; এই

অবস্থার নাম, তোমার রামদাসকে ধাক্কা দেওয়ার 'চেষ্টা' বা 'সমীহা,' অর্থাৎ রামদাসকে ধাক্কা দেওয়ার জন্ত তোমার অপসারণ-শক্তিটি পরিস্ফুরিত হইয়া যখন তোমার হস্তের স্নায়ু-সমূহ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া আইসে, তখন ইহা বলাযায়, যে তুমি রামদাসকে ধাক্কা দেওয়ার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছ, অথবা সমীহা করিতেছ। এই সময় তোমার হস্তের মধ্যে ঐ অপসারণশক্তির ক্রিয়া হয়, এখন তোমার কার্য্যোদ্যম বাহির হইতেও বিলক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। তৎপর যখন ঐ অপসারণ শক্তিটি তোমার করতল-পর্য্যন্ত আসিয়া রাম দাসের শরীরের সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়,তখন উহার 'নিয়োগাবস্থা' বলা যায়, এই অবস্থাকে তোমার রামদাসকে আঘাত করার ক্রিয়া হওয়া বলা যায়।

অতএব ইহা বুঝিতে পারিলে, যে 'অধ্যবসায়' বা 'ইচ্ছা,' এবং 'চেষ্টা' বা 'সমীহা,' এবং 'ক্রিয়া' ইহারা সকলেই একই পদার্থ,—একই শক্তির নানা প্রকার স্থান ও অবস্থাভেদে নানা প্রকার সংজ্ঞাভেদ—নামভেদ—মাত্র। ন্যায়দর্শনের ভাষ্যে ভগবান্ বাৎস্যায়নদেব এইকথাই বলিয়াছেন,—"প্রমাণেন খল্বয়ংজ্ঞাতা অর্থমুপলভ্যতমর্থমভীপ্সতি জিহাসতি বা,তস্যেপ্সা-জিহাসা-প্রযুক্তস্য সমীহা প্রবৃত্তি রিত্যুচ্যতে, সামর্থ্যম্ পুনরস্যাঃফলেনাভিসম্বন্ধঃ"। "কোন বস্তুকে কোন কার্য্যে ব্যবহার করার সাধারণ নিয়ম এই,—প্রথম সেই বিষয়টির গুণাগুণ, ফল, ও প্রয়োজন জানা হয়, তৎপর সেই বিষয়টি গ্রহণ করা, কিম্বা পরিত্যাগ-করার নিমিত্ত ইচ্ছা হয়, তৎপর সেই ইচ্ছার পরিণাম-স্বরূপ সমীহা—চেষ্টা—হয় (ক) তৎপর সেই চেষ্টা বা সমীহার সহিত যখন ফলের সহিত—বস্তুর সহিত—সম্বন্ধ হয়, তখন তাহাকেই 'সামর্থ্য' বা 'ক্রিয়া' বলে।"

পরন্তু শক্তির এই এক নিয়োগাবস্থাকেই আবার অবান্তর-ভেদে তিন অবস্থার তিনভাগে বিভক্ত করা যায়, অর্থাৎ শক্তিটির যখন প্রথম পরিস্ফুরণ হয় এবং মস্তিষ্কের অভ্যন্তর প্রদেশেই থাকে, তখন তাহার নাম' অধ্যবসায়' বা ইচ্ছা 'বা' 'নিশ্চয়' বলা হয়, তৎপর যখন ঐ শক্তিটি মস্তিষ্কের অন্তরে আইসে, তখন সেই শক্তিরই নাম 'অহঙ্কার' তৎপর যখন সেই শক্তিটি মস্তিষ্কের

(ক) অত্রসমীহা সামানাধিকরণ্যেনোচ্যমানোপি প্রবৃত্তিশব্দঃ-অত্র প্রযত্নমেব গময়তি।

শেষসীমা এবং স্নায়ুর মূল-প্রদেশ, পর্য্যন্ত
'প্রবৃত্তি' বা, 'যত্ন'। অতএব অধ্যবসায়, অহঙ্কার, যত্ন, চেষ্টা,
ইহারা সকলেই একই শক্তির নামভেদ ব্যতীত আর কিছুই না।
মধ্যে যত প্রকার শক্তির ক্রিয়া হয়, তৎসমস্তেই এইরূপ ব্যবহার জানিবে।

ইহার মধ্যে আর একটি কথা আছে, তাহাও বুঝিয়া লও।—আমরা অনেক সময় একই বস্তুকে আধারও আধেয়-রূপে ভিন্ন-ভাবে ব্যবহার করিয়া থাকি, এবং ঐরূপ ব্যবহাব কবিয়া সেই একই বস্তর বিভিন্ন নামও দিয়া থাকি ;—যেমন ভিত্তিব গাত্র, পর্ব্বতের দেহ, ইত্যাদি। এখানে ভিত্তি, আর তাহার গাত্র, কিম্বা পর্ব্বত, আর তাহার দেহ বিভিন্ন এক একটি পদার্থ নহে, ভিত্তিও যে পদার্থ, ভিত্তির গাত্রও তাহাই, --পর্ব্বতও যে পদার্থ, পর্ব্বতেব দেহও তাহাই, অথচ 'যখন ভিত্তির গাত্র,' 'পর্ব্বতের দেহ' বলা যাইতেছে, তখন ভিত্তি আর তাহাব গাত্রকে, পর্ব্বত আর তাহার দেহকে ভিন্নভাবে ব্যবহার কবা, যাইতেছে, 'আমার ধন' 'আমার পুত্র' বলিলে যেরূপ আমি আর আমার ধন ও পুত্রকে ভিন্ন ভাবে ব্যবহাব করা হয়, এখানেও সেইরূপ ;—এখানে ভিত্তি আর পর্ব্বতকে, তাহাদের গাত্র আর দেহের আধারভাবে ব্যবহার করা হইতেছে,—আবার বাস্তবিক সেই বস্তুকেই তাহাদের 'গাত্র' এবং 'দেহ' বলিযা বিভিন্ন আধেয়ভাবে ব্যবহার কবা হইতেছে।

আত্মার শক্তিকেও আমরা এই প্রকার এক বস্তুতেই আধাব ও আধেয়-রূপ-ভিন্নভাবে ব্যবহাব করিয়া থাকি। পূর্ব্ব কথিত নানাপ্রকাব অবস্থাপন্ন আত্মশক্তিকে যখন আধেয়-ভাবে ব্যবহার করা যায়, তখন এক-এক অবস্থাভেদে অধ্যবসায়,—অহঙ্কাব, যত্ন, চেষ্টা বলা যায়,—আর যখন সেই শক্তিকেই আবার অধিকরণ-ভাবে ব্যবহার করা হয়, তখন বুদ্ধি, অভিমান, মন, ও ইন্দ্রিয় বলিয়া থাকি। অর্থাৎ শরীর-মধ্যে যে সকল, শক্তির ক্রিয়া হয়, তাহার প্রথম পরিস্ফুরণ-কালে (সূত্রাবস্থায়) তাহাকে, তাহার আধেয়-ভাবে ব্যবহার করিলে 'অধ্যবসায়' অথবা 'ইচ্ছা,' বা 'নিশ্চয়' বলা যায়, আর তাহাকেই আবার অধিকরণ-ভাবে ব্যবহার করিলে 'বুদ্ধি' বলা যায়, আর যখন ঐ শক্তিটি মস্তিষ্কের মধ্য-ভাগে আসিয়া ক্রিয়া করে তখন তাহাকে, তাহার আধেয়-ভাবে ব্যবহার করিলে, 'অহঙ্কার' বলা যায়,

ভাবে ব্যবহার করা যায়, তখন 'অভিমান' ... মস্তিষ্কের শেষ প্রদেশে আসিয়া ক্রিয়া করে,' তখন ... আধেয়-ভাবে ব্যবহার করিলে 'প্রবৃত্তি' 'বা যত্ন' বলা যায়, আর যখন তাহাকে অধিকরণ ভাবে ব্যবহার করা যায়, তখন 'মন' বলা হয়। এই শক্তি যখন স্নায়ু সমূহের মধ্যে ক্রিয়াকরে, তখন তাহাকে, তাহার আধেয়-ভাবে ব্যবহার করিলে, 'সমীহা' বা 'চেষ্টা' বলা যায়, আর যখন তাহাকে, তাহার অধিকরণ ভাবে ব্যবহার করা যায়, তখন 'ইন্দ্রিয়' বলা যায়। আর যখন এই শক্তি শরীরের সহিত সংলগ্ন কোন বহিঃস্থিত-বস্তুর সহিত সংযুক্ত হয় -তখন তাহাকেই.'ক্রিয়া' বলে। ক্রিয়াবস্থায় আর আধার বা অধিকরণ-ভাবে ব্যবহারের নিয়ম নাই, কেবলমাত্র 'ক্রিয়া' বলিয়াই ব্যবহার হইয়া থাকে। এইক্ষণে দেখা গেল যে, বুদ্ধি, অভিমান, মন, ইন্দ্রিয়, এবং অধ্যবসায়, যত্ন, চেষ্টা আর ক্রিয়া এই কথাগুলি কেবল একমাত্র শক্তিরই অবস্থা ও স্থানাদি ভেদে পৃথক্ পৃথক্ কএকটি নাম ভেদ মাত্র। ইহাই সমস্ত শাস্ত্রের দ্বারা প্রতিপন্ন হয়।

যথা,—"গুণক্ষোভে জায়মানে মহান্ প্রাদুর্ব্বভূবহ। মনো মহাংশ্চ বিজ্ঞেয় একং তদ্বৃত্তি ভেদতঃ।" (লিঙ্গপুরাণ) সত্ত্ব, রজ, এবং তম এই তিন প্রকার গুণ বা শক্তির বিক্ষোভ হইলে 'বুদ্ধি' বা 'ইচ্ছা'রূপের পরিস্ফুরণ হয়, তাহাই আবার ক্রমে বিজৃম্ভিত হইয়া অভিমান ও মন আদিরূপে পরিণত হয়। এক বুদ্ধিই ক্রিয়া ও অবস্থাভেদে নানা-সংজ্ঞায় বিভক্ত হয়"। আরও,—"অহমর্থোদয়ো যোঽয়ং চিত্তাত্মা বেদনাত্মকঃ। এতচ্চিত্ত দ্রুমস্যাস্য বীজং বিদ্ধি মহামতে।। এতস্মাৎ প্রথমোদ্ভিন্নাদঙ্কুরোভিনবাকৃতিঃ। নিশ্চয়াত্মা নিরাকারো বিত্যভিধীয়তে। অবুদ্ধিবুদ্ধ্যাভিধানস্য যাঙ্কুরস্য প্রপীনতা। সঙ্কল্প-রূপিণী তস্যাশ্চিত্ত-চেতো-মনোভিধা"। (যোগ বাশিষ্ঠ) "বুদ্ধি, অভিমান ও মন প্রভৃতি যাহা কিছু এই দেহের চেতনতা সম্পাদন করিতেছে, এতৎ-সমস্তের মূল-বীজ (মূলকারণ) আমিত্বভাব—আমিভাব—অতিসূক্ষ্ম-অহম্ভাব। শরীরের অভ্যন্তর কিম্বা বাহিরে কোন কার্য্য নিষ্পন্ন করার পূর্ব্বে প্রথমে অতি সূক্ষ্মভাবে আমিত্বের—নিজত্বের—পরিস্ফুরণ এবং তাহার অনুভব হয়, তৎপর সেই আমি-ভাবাপন্ন-শক্তির একটু বিজৃম্ভিত হইয়া যে অবস্থা হয়

তাহাকে (আধেয়ভাবে ব্যবহার করিলে) তাহার নাম 'বেদনা' (অধ্যবসায়) আর (আধারভাবে ব্যবহার করিলে) 'বুদ্ধি' বলা যায়; এই বৃদ্ধ্যবস্থারই একটু বিস্তৃতিও স্থূলত্ব হইলে ক্রমে (তাহাকে আধেয়ভাবে ব্যবহার করিলে) অহঙ্কার, ভাবনা, ও সংকল্প বা প্রবৃত্তি ইত্যাদি বলা যায়, আর (আধারভাবে ব্যবহার করিলে ক্রমে তাহাকে) অভিমান, চিত্ত, ও মন ইত্যাদি বলা যায়।

আর ও,—সাঙ্খ্যদর্শনের ১অ ৬৪সূত্রের ভাষ্যে গুরুদেব বিজ্ঞানাচার্য্য বলিয়াছেন,—"যদ্যপ্যেক-মেবান্তঃ-করণং বৃত্তিভেদেন ত্রিবিধং লাঘবাৎ, তথাপি বংশ-পর্ব্বস্থিবাবান্তর-ভেদমাশ্রিত্যান্তঃ-করণত্রয়ে ক্রমঃ, কার্য্যকারণভাব শ্চোক্তেঃ, যোগোপযোগি-শ্রুতি-স্মৃতি-পরিভাষানুসারাদিতি মন্তব্যম্" "যদি চ একই অন্তঃকরণ-নামক-শক্তি-বিশেষ নানাপ্রকার-ক্রিয়া ও অবস্থা-ভেদে বুদ্ধি, অভিমান, ও মন এই তিন নামে কথিত হয়, তথাপি যেরূপ আস্ত একটি বাঁশ এক হইলেও তাহার একএক পর্ব্বেরপর অপর-পর্ব্বের উৎপত্তি হয় বলিয়া পূর্ব্বপূর্ব্বপর্ব্ব-গুলিকে অপরাপর-পর্ব্বের কারণ বলা যায়, সেইরূপ, ইন্দ্রিয়ের কারণ মন, মনের কারণ অভিমান এবং অভিমানের কারণ বুদ্ধি এইরূপে কার্য্য কারণ ভাব কল্পনা করা যাইতে পারে। এইরূপ কল্পনা করিয়াই মূল-কার বুদ্ধি হইতে অভিমানের উৎপত্তি, অভিমান হইতে মনের উৎপত্তি ইত্যাদি বলিয়াছেন।"

মূল-সাঙ্খ্যদর্শনেও বলিয়াছেন "* * মহতোঽহঙ্কারঃ অহঙ্কারাৎ * * উভয়মিন্দ্রিয়ং (১ অ৬১ সূ) বুদ্ধি হইতে অভিমানের পরিস্ফুরণ হয়, অভিমান হইতে মন-ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদির বিকাশ হয়।" "উভয়াত্মকমনঃ" "গুণ-পরিণাম ভেদান্নানাত্বমবস্থাবৎ" (ঐ ২৬।২৭ সূ ২অ) মনকে জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় এতদুভয়ই বলা যাইতে পারে; কারণ জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চক আর কর্ম্মেন্দ্রিয়-পঞ্চক, ইহারা কেহই মন হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নহে, যেমন একই ব্যক্তি নানাবিধ অবস্থা ভেদে নানা প্রকার নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তেমন একই মন নানা-ইন্দ্রিয়ের অবস্থায় পরিণত হইয়া নানা-নামে কথিত হয়।" অতএব সাঙ্খ্যদর্শনদ্বারা ও প্রমাণীকৃত হইল যে, বুদ্ধি, অভিমান, মন ও ইন্দ্রিয়াদি, ইহারা একই শক্তির অবস্থা ও ক্রিয়া-ভেদে এক একটি নামান্তর মাত্র।

যোগদর্শনের ও,-"পঞ্চবৃত্তির্মনোবদ্ব্যপদিশ্যতে"—এই সূত্রের দ্বারা একথা

স্বীকৃত হইয়াছে। বাস্তবিক বুদ্ধি, অভিমান, ও মন প্রভৃতি সকলেই এক পদার্থ বলিয়াই সমস্ত শাস্ত্রেই কখনও বুদ্ধিকে লক্ষ্য করিয়া মন বলা হইয়াছে, কখন বা মনকে লক্ষ্য করিয়া বুদ্ধি বলা হইয়াছে, কখন বা অভিমান বা চিত্তকে লক্ষ্য করিয়া, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ইত্যাদি বলা হইয়াছে।

এজন্যই শ্রুতি বলিতেছেন "যচ্ছেদ্বাঙ্মনসি প্রাজ্ঞ স্তদ্যচ্ছেজ্‌জ্ঞানআত্মনি। জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিয়চ্ছে ত্তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি।" (কঠোপনিষদ্) "ইন্দ্রিয় সমূহকে মনে লয় করিবে, মনকে অভিমানে লয় করিবে, অভিমানকে, বুদ্ধিতে লয় করিবে, বুদ্ধিকে প্রকৃতিতে লয় করিবে"। বুদ্ধিপ্রভৃতি সমস্তই এক পদার্থ না হইলে একটিতে আর একটির লয় করা সম্ভবে না।

প্রশ্নোপনিষদেও এইরূপই বলিয়াছেন,—"যথাগার্গ্য। মরীচয়োর্কস্যাস্তং গচ্ছতঃ সর্ব্বা এবৈতস্মিংস্তেজোমণ্ডল একীভবন্তি। তাঃ পুনঃ পুনরুদয়তঃ প্রচরন্ত্যেবং হবৈতৎসর্ব্বং পরেদেবে মনস্যেকী ভবতি" "হেগার্গ্য! সূর্য্যের অস্তগমনকালে যেরূপ তাঁহার রশ্মি-সমূহ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া মিলিত হয় বলিয়া বোধ হয়, এবং বারম্বার উদয়ের সময়ও তাঁহার সঙ্গেসঙ্গেই উপস্থিত হয় সেইরূপ নিদ্রাদির সময় আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি মনেতে বিলীন হয়" *।

অতএব ইহা নিশ্চয় হইল যে, একমাত্র শক্তিকেই অবস্থা ও ক্রিয়াভেদে আধেয়ভাবে ব্যবহার করিলে ইহারা অধ্যবসায়, অহঙ্কার, প্রবৃত্তি বা যত্ন, সমীহা বা চেষ্টা, এবং ক্রিয়া বলা যায়, আবার সেই শক্তিকেই অধিকরণ ভাবে ব্যবহার করিলে বুদ্ধি, অভিমান, মন ও ইন্দ্রিয় বলিয়া থাকে।

দেহ মধ্যে আত্মার কার্য্যকারিণী শক্তি মূলে মোট,—জ্ঞানশক্তি, পরিচালন-শক্তি ও পোষণের শক্তি, এই তিন প্রকার-মাত্র হইলেও অবশেষে, শরীরের এক২ ইন্দ্রিয়াদির আধার-চক্ষু-কর্ণাদি-এক২যন্ত্রে পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়া করা হেতুক, অবান্তর-ভেদে তাহাকে অনন্তভাগে ভেদ করা যাইতে পারে, আর সেই প্রত্যেক শক্তিই পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে ইচ্ছা বা অধ্যবসায়, সমীহা বা চেষ্টা, এবং ক্রিয়া এই তিন অবস্থাপন্ন হইয়াই কার্য্য করে। অতএব ইচ্ছা বা অধ্যবসায়

---

* এই শ্রুতি-দুটির শঙ্করাচার্য্যকৃত উপলব্ধি একটু অন্য রকম আছে, তাঁহাতে কিছু দোষ বোধ হয় বলিয়া সেইরূপে উদ্ধার করিলাম না।

ও অনন্ত প্রকার, সমীহা বা চেষ্টাও অনন্ত প্রকার, ক্রিয়াও অনন্ত প্রকার। এবং বুদ্ধি, অভিমান, মন, ইন্দ্রিও অনন্ত প্রকার। অর্থাৎ যত প্রকার জ্ঞান-শক্তির ক্রিয়া হয়, যত প্রকার পরিচালন-শক্তির ক্রিয়া হয়, এবং যত প্রকার পোষণ-শক্তির ক্রিয়া হয়, তাহার প্রত্যেকটিই আধেয়ভাবে ইচ্ছা বা অধ্যবসায়, প্রবৃত্তি বা যত্ন, সমীহা বা চেষ্টা এবং ক্রিয়া, এই তিনটি অবস্থা গ্রহণ করে, আর (আধারভাবে) বুদ্ধি, অভিমান, মন,ও ইন্দ্রিয়, প্রাণ এই কএক অবস্থা গ্রহণ করে। তোমার দর্শন-শক্তির কার্য্য হইতেছে,—এই শক্তি যখন মস্তিকের অভ্যন্তরস্থ আত্মাতে প্রথম পরিস্ফুরিত হইয়াছিল তখন তোমার দর্শন করার বুদ্ধি হইল, বা ইচ্ছা, অধ্যবসায় হইল ইহা বলা যায়, ঐ শক্তিই আর একটু পরিচালিত হইয়া মনের স্থান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে দর্শন করার মন বা প্রবৃত্তি বা যত্ন করা হইল, আর একটু অগ্রসর হইয়া চাক্ষুষ-স্নায়ুর মধ্যে আসিলে তোমার দর্শন করার চেষ্টা বা সমীহা বা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের স্ফুরণ হইয়াছে বলা যাইতে পারে, পরে আর একটু অগ্রসর হইয়া যখন ঐ শক্তি চক্ষু সংলগ্ন বিষয়ের সহিত—নীল পীতাদি বর্ণের সহিত—সংযুক্ত হয় তখন তোমার দর্শন ক্রিয়া হইতেছে বলা যাইতে পারে।

এইরূপ যখন শ্রবণশক্তির কার্য্য নিষ্পন্ন হয় তখনও, এই শ্রবণের শক্তি যখন মস্তিষ্ক-মধ্যবর্ত্তী আত্মাতে প্রথম পরিস্ফুরিত হয়, তখন শব্দ-শ্রবণের বুদ্ধি এবং অধ্যবসায় বা চেষ্টা হইল, ঐ শক্তি কর্ণস্থ-স্নায়ুর মূল প্রদেশ এবং মস্তিষ্কের পার্শ্বের দিকে তাহার শেষভাগ পর্য্যন্ত আসিয়া অগ্রসর হইলে, তোমার শব্দ-শ্রবণের মন হইল এবং প্রবৃত্তি বা যত্ন হইল বলা যায়, আবার ঐ শক্তি আর একটু অগ্রসর হইয়া কর্ণের স্নায়ুর মধ্যে আসিলে শ্রবণের চেষ্টা বা সমীহা এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরিস্ফুরণ হইল বলাযায়। পরে ঐ শক্তি কর্ণ-পটহ পর্য্যন্ত আসিয়া কর্ণবিবর প্রবিষ্ট-শব্দের সহিত সংযুক্ত হইলে তখন শব্দ শ্রবণের ক্রিয়া হইল বলাযাইতে পারে।

এইরূপ তোমার রস-গ্রহণের ক্রিয়ার সময় যখন মস্তিকের অভ্যন্তর প্রদেশে তোমার আত্মাতে রসগ্রহণের নিমিত্ত শক্তির পরিস্ফুরণ হইল তখন রসগ্রহণের বুদ্ধি হইল, এবং ইচ্ছা বা অধ্যবসায় হইল, তৎপর ঐ শক্তি মনের স্থান পর্য্যন্ত আসিলে রসগ্রহণের মন হইল, এবং প্রবৃত্তি বা যত্ন হইল, তৎপর মস্তিষ্ক

পবিত্যাগ পূর্ব্বক রসনা-পর্য্যন্ত বিসর্পিত-স্নায়ু-সমূহের মধ্যে প্রবাহিত হয়, তখন রসগ্রহণের ইন্দ্রিয়-স্ফুরণ হইলএবং চেষ্টা বা সমীহা হইল বলা যায়। ঐ শক্তি তোমার রসনা পর্য্যন্ত আসিয়া অম্ল মধুরাদি-রসের সহিত সম্বদ্ধ হইলে, তোমার রসগ্রহণের ক্রিয়া হইল।

এইরূপ শরীরের কোন অবয়ব দ্বারা যখন শীতলোষ্ণাদি-স্পর্শের অনুভব করা হয়, তখন ঐ স্পর্শানুভব শক্তির প্রথম পরিস্ফুরণ কালের স্পর্শের ইচ্ছা বা অধ্যবসায় এবং বুদ্ধি করা হইল, শক্তি মনের স্থানে অগ্রসর হইয়া আসিলে স্পর্শের যত্ন বা প্রবৃত্তি এবং মন করা হইল, ঐ শক্তি মস্তিষ্ক পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরীর ব্যাপক স্নায়ু-সমূহের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া আসিলে স্পশের সমীহা বা চেষ্টা এবং স্পর্শেন্দ্রিয়ের স্ফুরণ হওয়া বলাযায়, ঐ শক্তি গাত্রের চর্ম্ম পর্য্যন্ত আসিযা অগ্নি জলাদির সহিত সংযুক্ত হইলে, স্পর্শের ক্রিয়া বলা যায। এইরূপ গন্ধাদি গ্রহণ-কালেও জানিবে। এই গেল জ্ঞান শক্তির ক্রিয়া।

পরিচালন-শক্তিব ক্রিয়া সম্বন্ধেও এইরূপই বুঝিতে হইবে। আমরা যখন পদ-পরিচালনা-দ্বারা গমন করিতে থাকি, তখন ঐ পরিচালনা শক্তি প্রথম মস্তিষ্কের অভ্যান্তবস্থ-আত্মাতে বিজৃম্ভিত হওয়া কালে গমনের বুদ্ধি হইল এবং ইচ্ছা হইল বলাযায়, তৎপর ঐ শক্তি অধোদিগে প্রসাবিত হইয়া মস্তিষ্কের নিম্ন-প্রদেশে তাহার শেষসীমায় মনের স্থান পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া আসিলে গমনেব মন হইল এবং যত্ন বা প্রবৃত্তি হইল বলা হয়, তৎপর ঐ শক্তি মস্তিষ্ক ছাড়িয়া শরীরেব অধঃশাখায পদ পর্য্যন্ত বিসর্পিত-স্নায়ু-সমূহের মধ্যে আসিলে গমনের সমীহা বা চেষ্টা হইল এবং গমনেন্দ্রিয়ের স্ফুরণ হইল বলা যায়, অনন্তর ঐ শক্তি পদতল পর্য্যন্ত আসিয়া ভূমির সহিত সম্বন্ধ হইলে গমন ক্রিয়া হইল বলাযায়।

এইরূপ মল-মূত্র বিসর্জ্জন-কালে আমাদের যে শক্তির দ্বারা মলাশয়াদির আকুঞ্চন এবং রেচন-দ্বারের প্রসারণ হয়, সেই শক্তি, প্রথম মস্তিষ্কাভ্যন্তরস্থ আত্মাতে পরিস্ফুরিত হইলে তাহার নাম মলাদি-রেচনের বুদ্ধি, এবং ইচ্ছা বা অধ্যবসায়, শক্তি, মস্তিষ্কের নিম্নতল-পর্য্যন্ত আসিলে তাহাকে মলাদি-রেচনের মন এবং প্রবৃত্তি বলে; এবং শরীরের অধঃপ্রাসাবিত-স্নায়ু-সমষ্টির

মধ্যে প্রবাহিত হইয়া আসিলে মলাদি রেচনের সমীহা বা চেষ্টা এবং হয় বলা যায়, আর মলাশয়ের শেষ স্থান পর্য্যন্ত আসিয়া কার্য্য করিলে মলমূত্র রেচনের ক্রিয়া হইল বলা যায়। কামক্রিয়া সম্বন্ধে ও এইরূপ জানিবে। আর আমরা কোন বাক্য বলিবার পূর্ব্বে প্রথম যখন ঐ শক্তি আত্মাতে উত্থিত হয়, তখন তাহাকে বাক্যের বুদ্ধি এবং ইচ্ছা বলে, সেই শক্তি মস্তিষ্কের সীমাস্থান পর্য্যন্ত আসিলে তাহাকে বাক্যের মন হওয়া এবং প্রবৃত্তি বলে আর সেই শক্তি হৃদয়-স্থান-বর্ত্তি-স্নায়ু-সমূহের দ্বারা প্রবাহিত হইয়া আসিলে তাহাকে বাগিন্দ্রিয় এবং বাক্যের চেষ্টা বলে, আর সেই শক্তি বাগিন্দ্রিয়-প্রণালী এবং দন্তোষ্ঠাদি-পর্য্যন্ত আসিয়া দেহাভ্যন্তর-বর্ত্তি-বায়ু-নিঃসারণ করা কালে (যেরূপ বায়ু-নিঃসারণ দ্বারা অকারাদি বর্ণ-মালার পরিস্ফুরণ হয়) তখন তাহাকেই আবার বাগিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বলে। এইরূপ হস্ত দ্বারা কোন বস্তু গ্রহণ করা কালেও জানিবে। এই গেল পরিচালন শক্তির বিষয়।

পোষণ শক্তির বিষয়ও এইরূপ জানিতে হইবে। আমাদের পঞ্চ প্রকার প্রাণ শক্তিই পোষণ শক্তির অন্তর্গত এক একটি শক্তি ইহা পূর্ব্বেই একরূপ বলিয়াছি (৮০ পৃ ১৪ পং) তাহা স্মরণ করিয়া দেখ। এখন আরও বিস্তারক্রমে বুঝাইতেছি। প্রথমতঃ প্রাণাদি শক্তির ক্রিয়াস্থানের যন্ত্রগুলির কার্য্য প্রণালী কতকটা বুঝা নিতান্ত আবশ্যক। প্রথম পাকস্থলীর ক্রিয়া বুঝ। পাকস্থলী এবং ক্ষুদ্র-পাকস্থলীর গাত্রের অভ্যন্তর-প্রদেশ হইতে এক প্রকার রস নিঃসৃত হইয়া ভুক্ত-পীত-দ্রব্যকে ক্লিন্ন (গলিয়া) করিয়া ফেলে, তৎপর, সেই ভুক্ত পীত-দ্রব্যের ক্লিন্নাকারে পরিণত রস আবার পাকস্থলী এবং ক্ষুদ্র পাকস্থলী প্রভৃতি যন্ত্র সকল চুষিয়া লইয়া শরীরসাৎ করে। পাকস্থলী প্রভৃতির গাত্র সংলগ্ন এক প্রকার অসংখ্য সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম শিরা আছে, সেই শিরা-সমূহের দ্বারাই ঐ রস চোষিত এবং পরিগৃহীত হইয়া সমস্ত দেহে পরিচালিত, এবং গৃহীত হইয়া দেহের সমস্ত অবয়ব পোষণ-প্রাপ্ত বা পুষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং পাকস্থলীর আশ্রয়ে এইরূপ ক্রিয়া হওয়া পোষণ-শক্তির কার্য্য, যে শক্তি দ্বারা এই ক্রিয়া সংসাধিত হয় তাহার নাম 'সমান শক্তি' 'সমন্নয়নাৎ সমানঃ' (শ্রুতি)

এই সমান-নামক শক্তি যখন প্রথম মস্তিষ্কাভ্যন্তরস্থ আত্মাতে প্রস্ফুরিত হয়, তখন তাহাকে সমানন-ক্রিয়ার বুদ্ধি, এবং ইচ্ছা বা অধ্যবসায় বলা যায়। ঐ শক্তি মস্তিষ্কের নিম্নতলে শেষ-স্থান-পর্য্যন্ত আসিলে, তাহাকে সমানন-ক্রিয়ার 'মন' হইল বলা যায় এবং যত্ন হইল বলা যায়,—পরে ঐ শক্তি মস্তিষ্ক পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেহের অধঃশাখায় প্রবাহিত-স্নায়ু-সমূহের মধ্যে অবরোহণ-পূর্ব্বক যখন অবসর্পিত হইতে থাকে,—তখন তাহাকে সমানন-ক্রিয়ার চেষ্টা হইল, এবং সমানের পরিস্ফুরণ হইল বলিতে হয়,—পরে ঐ শক্তি পাকস্থলী এবং ক্ষুদ্র পাকস্থলী-পর্য্যন্ত আসিয়া রস-পরিগ্রহের নিমিত্ত যখন পাকস্থলী-স্থিত সেই রসাকারে পরিণত ভুক্ত-দ্রব্যের সহিত সম্বন্ধ হয়, তখন তাহাকেই সমানের ক্রিয়া বলা যায়।

ফুস্‌ফুসদ্বয়ের মধ্যে চতুর্দ্দিক্ হইতে গিয়া দূষিত রক্ত সঞ্চিত হয়, এবং আমাদের প্রশ্বাসকালে বহিঃস্থ বায়ু গিয়া সেই ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করে, বায়ুর মধ্যে একরূপ আগ্নেয় বায়ু আছে, সেই আগ্নেয় বায়ুর দ্বারা ফুস্‌ফুসস্থ রক্তের দোষ সংশোধিত হইয়া যায়, তৎপর সেই রক্তহৃৎপিণ্ড মধ্যে গিয়া তদ্দ্বারা সর্ব্ব শরীরে পরিচালিত ও ব্যাপ্ত হয়। ফুস্‌ফুস্ যখন প্রসারিত হয়, তখন তন্মধ্যে বাহিরের বায়ু গিয়া প্রবেশ করে, আবার যখন আকুঞ্চিত হয়, তখন তাহার মধ্যবর্ত্তি-বায়ু বহির্গত হইয়া পড়ে। দূষিত রক্ত দ্বারা শরীরের পুষ্টি সাধন হইতে পারে না, তদ্দ্বারা পুষ্টির বাধাই হইতে থাকে, পোষণ শক্তিরও ইচ্ছা যে আপন পোষণ কার্য্যের বাধা সকল উল্লঙ্ঘন করিয়া দেহের পুষ্টি সাধন ও সংরক্ষণ করে। সুতরাং পোষণ শক্তিই একবার ফুস্‌ফুসের আকুঞ্চন করিয়া তন্মধ্যবর্ত্তি-দূষিত পদার্থের সহিত বায়ু রেচন করিয়া ফেলে,—আবার ফুস্‌ফুসকে প্রসারিত করিয়া পরিষ্কৃত-আগ্নেয়-বায়ু গ্রহণ করিয়া রক্তের পরিষ্কৃতি-সাধন-পূর্ব্বক সেই রক্ত দ্বারা দেহের পোষণ-সাধন করিয়া থাকে।

যে পোষণশক্তি ফুসফুসের উপর এইরূপ কার্য্য করিতেছে, তাহার নাম 'প্রাণশক্তি'। এই শক্তি যখন প্রথম আত্মাতে পরিস্ফুরিত হয়, তখন তাহাকে প্রাণনক্রিয়ার বুদ্ধি, এবং ইচ্ছা বা অধ্যবসায় বলা যায়; পরে যখন ঐ শক্তি মস্তিষ্কের নিম্নতলে তাহার শেষসীমায় মনের স্থানে উপস্থিত হয়, তখন তাহাকেই প্রাণনক্রিয়ার মন, এবং যত্ন বা প্রবৃত্তি বলা যায়, অনন্তর

যখন ঐ শক্তি মস্তিষ্ক পরিত্যাগপূর্ব্বক ফুস্‌ফুস্-স্পর্শী-নিম্নগ-স্নায়ুসমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অবসর্পিত হইতে থাকে, তখন তাহাকে প্রাণনক্রিয়ার চেষ্টা এবং প্রাণের স্ফুরণাবস্থা বলা যায়, তৎপর যখন ঐ শক্তি ফুস্‌ফুস্ পর্য্যন্ত আসিয়া তাহার আকুঞ্চন-প্রসারণ-কার্য্য সাধনকরত, ফুস্‌ফুসস্থ-দূষিত-বায়ু পরিত্যাগ করাইয়া ভাল-আগ্নেয়-বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া ফুস্‌ফুসস্থ-রক্তের সহিত সম্বন্ধ হয়, তখন সেই শক্তিকেই প্রাণনক্রিয়া বলা যাইতে পারে।

এইরূপ নাভির নিম্নস্থ অপান-শক্তি, সর্ব্বশরীর-ব্যাপক-ব্যান-শক্তি, ঊর্দ্ধগ উদান-শক্তি বিষয় ও যথাযোগ্য সমন্বয় করিয়া বুঝিবে।

জ্ঞান-শক্তি, পরিচালন-শক্তি, এবং পোষণ-শক্তির এই পঞ্চদশ প্রকার বিভাগ করিয়া ইহাদের প্রত্যেকেরই বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়াদি অবস্থা এবং প্রত্যেকেরই ইচ্ছা বা অধ্যবসায়, প্রবৃত্তি বা যত্ন, চেষ্টা বা সমীহা এবং ক্রিয়া অবস্থা অর্থাৎ প্রত্যেকেরই সূত্রাবস্থা, (১৭ পৃঃ ৯ পং) প্রবাহাবস্থা (১৭ পৃঃ ৯ পং) এবং নিয়োগাবস্থা ও (১৭ পৃঃ ৯ পং) দর্শিত হইল। কিন্তু ইহাদের অবান্তর-ভেদে শরীরের মধ্যে অসংখ্য প্রকার শক্তির ক্রিয়া হইতেছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই এইরূপ বুদ্ধি, মন, ও ইন্দ্রিয়াদি অবস্থা, এবং ইচ্ছা, যত্ন, চেষ্টা আর ক্রিয়া অবস্থা আছে ইহা নিশ্চয়, সুতরাং সেই সমস্তগুলি লইয়া বুদ্ধি, অভিমান, মন ও ইন্দ্রিয়াদির এবং ইচ্ছা, যত্ন ও চেষ্টাদির অপরিসংখ্যেয়ত্ব জানিবে। অর্থাৎ বুদ্ধি অসংখ্য প্রকার, অভিমান অসংখ্য প্রকার, মন অসংখ্য প্রকার, ইন্দ্রিয়প্রাণাদি অসংখ্য প্রকার, ইচ্ছা অসংখ্য প্রকার, যত্ন অসংখ্য প্রকার, চেষ্টা অসংখ্য প্রকার, এবং ক্রিয়াও অসংখ্য প্রকার জানিবে।

ইহার মধ্যে আরও অনেক কথা, অনেক আপত্তি, অনেক মীমাংসা আছে তাহা 'অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে' বিস্তার ক্রমে বলিবার ইচ্ছা আছে।

ফলতঃ—এখানে যতটুক বলিলাম তদ্দ্বারাই বোধ হয়, অধ্যবসায়, প্রবৃত্তি, যত্ন চেষ্টা, সমীহা ও ক্রিয়া এতৎসমস্তই যে এক পদার্থ,—একইশক্তির অবস্থা ও কার্য্য-ভেদে কেবল পৃথক্‌২ নাম করা হইয়াছে, তাহা অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছ। এখন আর একটি কথা শুন।

জ্ঞানশক্তি, পরিচালনশক্তি এবং পোষণশক্তির উৎপত্তি।

উক্ত জ্ঞানশক্তি, পরিচালনশক্তি আর পোষণশক্তি ইহারা ভিন্নপ্রকারের তিনপ্রকার-মূল-শক্তি হইতে সমুৎপন্ন হয়। জ্ঞানশক্তি সত্ত্বগুণ বা সত্ত্বশক্তি হইতে সমুৎপন্ন হয়,—পরিচালনাশক্তি রজোগুণ বা রজঃশক্তি হইতে সমুৎপন্ন হয়, পোষণশক্তি তমোগুণ বা তমঃশক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং পরিণামে, উক্ত-ত্রিশক্তির মধ্যে যাহার অন্তর্গত যত প্রকার শক্তির বিস্তৃতি হইয়াছে, তাহারাও সেই সেই মূল-কারণ-শক্তি হইতেই সমুৎপন্ন হয়, ইহা বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ জ্ঞানশক্তির অন্তর্গত যতপ্রকার শক্তি আছে, তাহা সত্ত্বশক্তি হইতে সমুৎপন্ন হইতেছে, যাহারা পরিচালনশক্তির অন্তর্গত শক্তি, তাহাবা রজঃশক্তি হইতে সমুৎপন্ন ; আর যাহারা পোষণ-শক্তির অন্তর্গত শক্তি, তাহারা তমঃশক্তি হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে।

শাস্ত্রে ইহাই বলিয়াছেন,—" সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিষ্ট-মুপষ্টম্ভকঞ্চলঞ্চরজঃ। গুরুবরণক মেবতমঃ, প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ॥" (সাঙ্খ্যতত্ত্বকৌমুদী) "সত্ত্বশক্তি অনুভবকালে লঘু অর্থাৎ হাল্‌কা-হাল্‌কা-মত মনে মনে অনুভব করা হয়, সত্ত্বশক্তি জ্ঞানজনকশক্তি, সত্ত্বশক্তি স্পৃহণীগ বলিয়া মনে মনে বোধ হয়। আর রজঃশক্তি সত্ত্বশক্তির বাধিকা এবং ইহা চলৎশক্তি—পরিচালন-শক্তি। আর তমঃশক্তি মনে মনে ভারী-ভারী বলিয়া অনুভব হয়, এই শক্তি জ্ঞানের আবরণ করে"। * * * " প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্॥" (পাতঃ-দঃ—২ পা ১৮ সূ) " প্রকাশশীলং সত্ত্বং ক্রিয়াশীলং রজঃ স্থিতিশীলং তম ইতি। এতে গুণাঃ পরস্পরোপরক্ত-প্রবিভাগাঃ পরিণামিনঃ সংযোগ-বিভাগধর্ম্মাণঃ ইতরেতরোপাশ্রয়েণোর্জ্জিত-মূর্ত্তয়ঃ পরস্পরাঙ্গাঙ্গিত্বেপ্যসম্ভিন্নশক্তিপ্রবিভাগাস্তুল্য-জাতীয়াতুল্য-জাতীয়শক্তিভেদানুপাতিনঃ, প্রধান-বেলায়ামপ্যুপদর্শিত-সন্নিধানা গুণত্বেপিচ ব্যাপারমাত্রেণ প্রধানান্তর্ণীতানুমিতাস্তিতাঃ পুরুষার্থ-কর্ত্তব্যতয়া প্রযুক্ত-সামর্থ্যাঃ সন্নিধিমাত্রোপকারিণো অয়স্কান্ত মণিকল্পাঃ প্রত্যয়মন্তরেণ একতমস্য বৃত্তিমনু বর্ত্তমানাঃ প্রধান শব্দবাচ্যাভবন্তি।" (ঐ সূত্রের ভগবদ্ বেদব্যাসকৃত ভাষ্য) " সত্ত্বশক্তি প্রকাশ-

শীল; অর্থাৎ জ্ঞানের উৎপাদিকা, রজঃশক্তি ক্রিয়াশীল, অর্থাৎ পরিচালিকা, আর তমঃশক্তি স্থিতিশীল, অর্থাৎ গুরুত্বের উৎপাদিকা (যাহাকে পোষণ-শক্তি বলা হইয়াছে।) এই তিনটি শক্তিই সর্ব্বব্যাপিকা, সুতরাং তোমার দেহের মধ্যেও বাস করিতেছে, এই শক্তিত্রয়ের নিজনিজ অংশ পরস্পরের দ্বারা উপরক্ত আক্রান্ত। অর্থাৎ সূর্য্যের নীল, পীত, হরিতাদি বিভিন্নপ্রকারের আলোকশক্তি যেরূপ পরস্পরের দ্বারা পরস্পরে উপরক্ত বা আক্রান্ত হইয়া সকলেই বিমিশ্রিতভাবে জগতে প্রকাশ পাইতেছে, এই প্রকাশশক্তি, ক্রিয়াশক্তি আর স্থিতি-শক্তিও সেইরূপ পরস্পরের দ্বারা উপরক্ত হইয়া বিমিশ্রিতভাবে রহিয়াছে। সত্বশক্তি বা প্রকাশশক্তি, রজঃশক্তি আর তমঃশক্তিদ্বারা উপরক্ত, রজঃশক্তি বা ক্রিয়া-শক্তি, সত্ব আর তমঃশক্তি দ্বারা উপরক্ত, এবং তমঃ শক্তি বা স্থিতিশক্তি; সত্বশক্তি আর রজঃশক্তি দ্বারা উপরক্ত। অর্থাৎ সত্বশক্তির উপরেও রজঃ আর তমঃশক্তির প্রভাব বর্ত্তিতেছে,—রজঃশক্তির উপরও সত্ব আর তমঃশক্তির প্রভাব বর্ত্তিতেছে, এবং তমঃশক্তির উপরেও সত্ব আর রজঃশক্তির প্রভাব বর্ত্তিতেছে। এই শক্তিত্রয় হ্রাস বৃদ্ধি দ্বারা সর্ব্বদাই অবস্থান্তরিত হইতেছে; সুতরাং এই শক্তিত্রয় পরিণামধর্ম্মী, এবং ইহাদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের নিয়মিত সংযোগ রহিয়াছে, সুতরাং ইহারা সংযোগধর্ম্মী, আবার যখন পরস্পরের মধ্যে একের হ্রাস হইয়া অপরের বৃদ্ধি বা আধিক্য হয়, তখন যেটির হ্রাস বা নিতান্ত ক্ষীণতা হইয়া পড়ে, সেইটির সহিত অন্য দুটি শক্তির বিভাগ হইল, অতএব এই শক্তিত্রয় বিভাগধর্ম্মীও বটে। এই শক্তিত্রয়ের মধ্যে সকলেই পরস্পরের বিরোধী, অর্থাৎ সত্বশক্তির বিরোধিনী রজঃশক্তি আর তমঃশক্তি; রজঃশক্তির বিরোধিনী, সত্বশক্তি আর তমঃশক্তি, এবং তমঃশক্তির বিরোধিনী, সত্বশক্তি আর রজঃশক্তি। এজন্য ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একের সাহায্যে অপরটির বলবৃদ্ধি বা উত্তেজনা হইয়া থাকে। অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধ-বিজাতীয়-তড়িৎ-শক্তিদ্বয়ের যেরূপ একটির দ্বারা অপরটির বলবৃদ্ধি হয়, অথবা পরস্পর বিরুদ্ধ-বিজাতীয়-চুম্বকধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে যেরূপ একটির দ্বারা অপরটির বলবৃদ্ধি হয়, অথবা নিযুদ্ধকারী (কুস্তিগির) মল্লদ্বয়ের মধ্যে যেমন একের বল-প্রয়োগের দ্বারা অপর জনের বল উত্তেজিত ও বিবৃদ্ধিত

হইয়া উঠে—সেইরূপ এই ত্রিশক্তির মধ্যেও পরস্পরের সঙ্ঘর্ষণ দ্বারাই পর স্পরের বলবৃদ্ধি বা প্রাদুর্ভাব হয়। অর্থাৎ রজঃশক্তি আর তমঃশক্তির সহিত সংঙ্ঘর্ষণ করিতে করিতে সত্বশক্তি বিজৃম্ভিত হইয়া উঠে, আবার সত্বশক্তি আর তমঃশক্তির সহিত সংঙ্ঘর্ষণ করিতে করিতে রজঃশক্তির প্রাদুর্ভাব হইয়া পড়ে এবং রজঃশক্তি আর সত্বশক্তির সহিত সংঙ্ঘর্ষণ করিতে২ তমঃশক্তির পরিস্ফুরণ হইয়া উঠে। শক্তিত্রয়ের এইরূপ পুরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকিলে কখনই কোনটিরও পরিস্ফুরণ বা হ্রাসবৃদ্ধি কিছুই হইতে পারিত না। প্রতিদ্বন্দ্বি-শক্তি দ্বারাই প্রতিদ্বন্দ্বি-শক্তির প্রভাব ও বলবৃদ্ধি হয়, ইহা শক্তি-জগতের সাধারণ ও সার্ব্বভৌম নিয়ম। সুতরাং এইরূপ স্থলে, দ্রষ্টব্যে এক শক্তি অপর শক্তির বিরোধিনী, হ্রাসকারিণী, বিনাশকারিণী বা প্রবল-শত্রু হইলেও অন্য দৃষ্টিতে এক শক্তি অপর শক্তির নিতান্ত আত্মীয় বন্ধুই বলিতে পারা যায়,—যেহেতু একটি বিরুদ্ধ-শক্তির ধর্ষণ ক্রিয়া না করিয়া কোন শক্তিরই প্রকাশ বা প্রাদুর্ভাব হওয়া সম্ভবে না। সত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই শক্তিত্রয় এইরূপে পরস্পরের সহিত একত্রিতভাবে থাকিলেও ইহাদের সাঙ্কর্য্য উৎপন্ন হয় না, অর্থাৎ ইহাদের একতা হইয়া যায় না, লক্ষণ দ্বারা ইহাদের সুস্পষ্ট পার্থক্য বিবেচনা ও অনুভব করা যায়। শক্তিত্রয় পরস্পর সঙঘর্ষণের দ্বারা যখন একটি বিজৃম্ভিত হয় আর অপর দুটি বিনষ্টপ্রায়-ক্ষীণদশা প্রাপ্ত হয়, তখনও তাহাদের সেই অতি সূক্ষ্মাবস্থার অনুভব না করা যায় তাহা নহে, যদিচ তখন তাহারা নিতান্ত ক্ষীণ তথাপি "বিরুদ্ধ শক্তির অস্তিত্ব ব্যতীত কোন শক্তিরই প্রভাব প্রকাশ পায় না" এই নিয়মানুসারে একটি বিরুদ্ধ শক্তির প্রবলতা দেখিলেই অপর দুটির অস্তিত্বও অনুমিত হয়। অর্থাৎ কার্য্যকালে প্রবল সত্বশক্তি দেখিলেই তাহার বিরোধিনী রজঃ আর তমঃশক্তি অতি ক্ষীণভাবে সঙ্গে সঙ্গে আছে, ইহা অনুমান করা যায়, এবং প্রবল রজঃশক্তি দেখিলেই তাহার বিরোধিনী সত্ব আর তমঃশক্তি সঙ্গে সঙ্গে অতি ক্ষীণভাবে আছে ইহা অনুমিত হয়। আর প্রবল তমঃশক্তি দেখিলেও তাহার বিরোধিনী সত্ব আর রজঃশক্তি অতি ক্ষীণভাবে সঙ্গিনী হইয়া আছে ইহা মনে করিতে হইবে। কারণ বিরুদ্ধ শক্তি সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীণভাবে না থাকিলে এই সকল শক্তির বল প্রকাশ হইতে পারে না।"

জ্ঞানশক্তি পরিচালনশক্তি ও পোষণশক্তির বিকাশ ও হ্রাস বৃদ্ধির নিয়ম।

উক্ত প্রকারের গুণসম্পন্ন-ত্রিবিধ-শক্তি হইতে আমাদিগেব উক্ত জ্ঞান শক্তি, পরিচালনশক্তি এবং পোষণ-শক্তির উৎপত্তি, সুতরাং ইহাদেব উক্ত শক্তি ত্রযের ন্যায়ই বিকাশ, বৃদ্ধি, ও হ্রসাদিব নিয়ম বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ আমাদের দেহ-মধ্যবর্ত্তিনী জ্ঞানশক্তি, পবিচালনা শক্তি এবং পোষণশক্তিব ও উপরিউক্ত নিয়মেই বিকাশ ও হ্রাস বৃদ্ধি ইত্যাদি হইযা থাকে। অর্থাৎ আমাদিগের মস্তিষ্ক-বাসিনী জ্ঞানশক্তি পবিচালনাশক্তি এবং পোষণশক্তি ও পরস্পবে পবস্পবেব দ্বাবা উপবক্ত বা আক্রান্ত অর্থাৎ বক্ত, পীত, নীলাদি ভেদে নানারূপে রঞ্জিত সৌব-আলোক-শক্তি যেরূপ পরস্পবেব দ্বাবা পরস্পরে উপরক্ত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে, আমাদের জ্ঞানশক্তি, প্রভৃতিও তথা ;—জ্ঞানশক্তি, পোষণশক্তি, এবং ক্রিয়াশক্তিব দ্বাবা আক্রান্ত, পবি-চালন-শক্তি, জ্ঞানশক্তি আর পোষণশক্তিব দ্বারা আক্রান্ত, এবং পোষণশক্তি ও জ্ঞানশক্তি আব পরিচালনশক্তিব দ্বাবা আক্রান্ত। অর্থাৎ জ্ঞানশক্তির উপরে ক্রিয়াশক্তি আব পোষণ শক্তিব প্রভাব বর্ত্তিতেছে, পবিচালনশক্তিব উপরে জ্ঞানশক্তি আর পোষণশক্তির প্রভাব এবং পোষণশক্তিব উপবে জ্ঞানশক্তি আর পরিচালনশক্তির প্রভাব বর্ত্তিতেছে।

জ্ঞানশক্তি, পবিচালন-শক্তি এবং পোষণশক্তি হ্রাসবৃদ্ধিদ্বারা সর্ব্বদাই অবস্থা-স্তরিত হইতেছে, কখনও জ্ঞানশক্তির হ্রাস পোষণশক্তির বৃদ্ধি, কখন বা পরিচালনশক্তির বৃদ্ধি এবং পোষণ শক্তির হ্রাস, কখন বা পবিচালন শক্তির হ্রাস জ্ঞানশক্তির বৃদ্ধি ইত্যাদি। সুতরাং এই শক্তিত্রয় পবিণাম-ধর্ম্মী, এবং পরস্পরের সহিত পরস্পরের নিয়মিত-সম্মিলন রহিয়াছে, সুতরাং ইহাবা সংযোগ-ধর্ম্মী, আবার যখন পরস্পরের মধ্যে একের হ্রাস হইয়া অপরের বৃদ্ধি বা আধিক্য হয় তখন যেটির নিতান্ত ক্ষীণতা হইয়া পড়ে, সেইটির সহিত অন্য দুটি শক্তির বিভাগ হইল, এ নিমিত্ত ইহাদিগকে বিভাগধর্ম্মীও বলা যাইতে পারে।

জ্ঞান, ক্রিয়া ও পোষণ-শক্তির মধ্যে সকলেই পরস্পরের বিরোধিনী। অর্থাৎ জ্ঞান-শক্তির বিরোধিনী পরিচালনশক্তি আর পোষণশক্তি, এবং পরিচালন-

শক্তির বিরোধিনী জ্ঞানশক্তি আর পোষণশক্তি, এবং পোষণশক্তির বিরোধিনী জ্ঞানশক্তি আর পরিচালনশক্তি। এজন্য ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একের সাহায্যে অপরটির বলবৃদ্ধি বা উত্তেজনা হইয়া থাকে, আবার একটির দ্বারা অপরটির বল হ্রাসপ্রাপ্তও হইয়া থাকে। অর্থাৎ কোন বিষয় দর্শন স্পর্শনাদি কালে যখন আমাদের জ্ঞানশক্তি বিজৃম্ভিত হইয়া—চক্ষু-কর্ণাদির স্নায়ুসমূহের দ্বারা প্রবাহিত হইয়া আসিতে থাকে, তখন পরিচালনশক্তি আর পোষণশক্তি ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হইয়া পড়ে, ক্রমে যখন আমাদের কোন বিষয়ে প্রগাঢ়তর জ্ঞান, অর্থাৎ স্থির-ভাবে কোনবস্তুর গম্ভীর-জ্ঞান—সর্ব্বাঙ্গ-প্রকাশক-জ্ঞান হইতে থাকিবে, তখন ঐ বিরুদ্ধশক্তি-দ্বয় একবারে ক্ষীণ বা নিরুদ্ধ—নিস্তব্ধ—হইবে। কারণ একটি বিরুদ্ধ শক্তির বল একবারে নিস্তেজ না হইলে অপর একটি বিরুদ্ধশক্তির বল প্রবল ভাবে উত্তেজিত হইতে পারে না,—এবং পরস্পর ধর্ষণশীল শক্তি সমূহের মধ্যে একটি বিরুদ্ধশক্তির বল যে মাত্রায় কমিবে অপর-একটির বলও ঠিক সেই পরিমাণেই বাড়িবে, একটি বিরুদ্ধশক্তিকে নিস্তেজ করিয়াই অপর একটির বিকাশ, অথবাএকটি শক্তিকে নিস্তেজ করার নিমিত্তই অপর একটি বিরুদ্ধ-শক্তির প্রাদুর্ভাব হয় ইহা বলা যাইতে পারে। অতএব আমাদের ঐ দর্শন-স্পর্শন-শক্তিটি যে পরিমাণে উদ্ভূত ও উত্তেজিত হইবে, পরিচালনশক্তি আর পোষণ-শক্তিও, ততক্ষণের নিমিত্ত, ঠিক্ সেই পরিমাণেই হ্রাস প্রাপ্ত ও নির্লক্ষ্য হইতে থাকিবে। অর্থাৎ ঐ সময় হস্ত-পদাদির পরিচালনা ক্রমে বন্ধ হইয়া আসিবে, এবং ফুস্ফুস্, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী-প্রভৃতির ক্রিয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িবে, ক্রমে অবশেষে নিস্তব্ধ হইবে।

এইরূপ যখন পরিচালনশক্তি বিজৃম্ভিত হইয়া হস্ত-পদাদির স্নায়ু-সমূহের দ্বারা প্রবাহিত হইয়া হস্ত পদাদির উপর পরিচালন কার্য্য করিতে থাকে, তখন জ্ঞানশক্তি আর পোষণশক্তি নিস্তেজ হইতে থাকে। যে পরিমাণে পরিচালনশক্তির বৃদ্ধি হয়, সেই পরিমাণেই অপর-শক্তিদ্বয়ের হ্রাস হইতে থাকে, অবশেষে যখন পরিচালনশক্তির পূর্ণ-মাত্রায় বৃদ্ধি, তখন অপরদুটিরও পূর্ণ মাত্রায় ক্ষীণতা হইয়া পড়ে। অর্থাৎ সম্মুখস্থিত কোন বস্তুর দর্শন-স্পর্শনাদির অনুভব বা কোন প্রকার চিন্তা এবং পাকস্থলী-প্রভৃতির ক্রিয়া, ততক্ষণ পর্য্যন্ত, অতীব ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইবে।

এইরূপ যখন পোষণশক্তি উত্তেজিত হইয়া স্নায়ুমণ্ডলে প্রবাহ-পূর্ব্বক ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী-প্রভৃতির উপরে পোষণকার্য্য চরিতার্থ করিতে থাকিবে, তখন জ্ঞান ও পরিচালনার শক্তি নিস্তেজ হইবে। যে পরিমাণে পোষণশক্তির বৃদ্ধি বা উন্নতি সেই পরিমাণেই আবার অপর দুটি শক্তির হ্রাস হইবে, অবশেষে পোষণশক্তির সর্ব্বাঙ্গীন বৃদ্ধি হইলে অপরদ্বয়ের সর্ব্বাঙ্গীন হ্রাস হইবে। অর্থাৎ দর্শন-স্পর্শনাদি সমস্ত প্রকার অনুভব চিন্তাদি কিছুই হইবে না, হস্ত পদাদির পরিচালনও হইবে না।

শিষ্য। একথার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না,—আমরা সর্ব্বদা যাহা স্বচক্ষে দেখিতেছি, অনুভব করিতেছি, তাহার বিরুদ্ধ কথা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়?—আমরা সর্ব্বদাই দেখিতেছি যে ঠিক এক সময়েই আমাদের জ্ঞানশক্তি, পরিচালনশক্তি, ও পোষণশক্তির কার্য্য হইতেছে,—দেখিতেছি—সর্ব্বদা আমরা যখন কোন বস্তু দর্শন করি, তখন আমাদের হস্তাদির পরিচালনা ও ফুসফুসাদির ক্রিয়া হইয়া থাকে, এবং হস্ত পদাদির পরিচালন কালে অন্য বিষয়ের জ্ঞান ও পোষণ-শক্তির ক্রিয়া হইয়া থাকে, আবার শ্বাস প্রশ্বাসাদিরূপ-পোষণ-শক্তির ক্রিয়া কালেও জ্ঞান-শক্তি ও পরিচালন-শক্তির ক্রিয়া হইয়া থাকে।

আচার্য্য। আমার কথাটির সূক্ষ্ম মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পার নাই। জ্ঞান-শক্তির পরিস্ফুরণ মাত্রেই যে হস্তপদাদি নিশ্চল, ও ফুস্ফুসাদি নিস্তব্ধ হইয়া পরিচালনশক্তি এবং পোষণশক্তি বিনষ্টপ্রায় হইবে, এইরূপ আমি বলি নাই, কেবল এই মাত্র বলিয়াছি যে এক এক শক্তির বৃদ্ধির মাত্রানুসারে অপরাপর শক্তির হ্রাস হয়, পরে একটির চরম উন্নতি হইলে অপর দুটির একবারে বিনষ্টপ্রায় অবস্থা হয়, সুতরাং তাহাদের ক্রিয়াও বিনষ্টপ্রায় হইয়া যায়।

প্রত্যেক শক্তি ও তৎকার্য্যেরই মাত্রার ইতর বিশেষ আছে। তুমি যখন স্বভাবাবস্থায় বসিয়া থাক, তখন মৃদু বা মধ্যম মাত্রায় তোমার পোষণশক্তি পরিস্ফুরিত হইতেছে, এবং মৃদু বা মধ্যম মাত্রায়ই তোমার পুষ্টির ক্রিয়া হইতেছে *।

---

* উদরস্থিত ভুক্ত পীতদ্রব্য প্রথম একরূপ সাদা ২ রসাকারে পরিণত হয়।

এখন তোমার জ্ঞানশক্তি, পরিচালনশক্তি এবং তাহাদের ক্রিয়া মধ্যম-মাত্রায় বা মৃদু মাত্রায় থাকিবে, অর্থাৎ এখন তোমার হস্ত পদাদির পরিচালন এবং সম্মুখস্থিত-বস্তুর দর্শন-স্পর্শনাদি ও কিছু২ হইতে থাকিবে, একবারে বন্ধ হইবে না।

আর আমরা যখন পরিপূর্ণ আহারটি করিয়া উঠি, তখন ৸০ আনা মাত্রায় পোষণশক্তির পরিস্ফুরণ হয়, তাহার ক্রিয়া ও ৸০ আনা মাত্রায় হইতে থাকে তখন সর্ব্বশরীর অতি গুরুতর—ভারী২ বোধহয়,আলস্য উপস্থিত হয়,এই সময় পরিচালনাশক্তি ও তাহার ক্রিয়া ৸০ আনা মাত্রায় কমিয়া যায়, তখন গমনাদি পরিচালনা কার্য্য করিতে, কিম্বা দর্শন-চিন্তাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য করিতে নিতান্ত অবসাদ অনুভুত হয়। ক্রমে পোষণশক্তির পূর্ণ-মাত্রায় বিকাশ, এবং তাহার ক্রিয়াও পূর্ণ-মাত্রায় হইতে থাকে, তখন আপনাকে এত গুরুতর বলিয়া—ভারী বলিয়া বোধ হয়, যেন নিজকে আর বহন করিতে পারি না, পরিচালনশক্তি, জ্ঞানশক্তি আর তাহাদের ক্রিয়া প্রায় পূর্ণ মাত্রায় ক্ষীণ হইয়া পড়ে, চক্ষু-প্রভৃতি সমস্ত-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নিস্তব্ধ হয়, হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া এককালে শিথিল হইয়া পড়ে, তখন শয়িত হইলাম, নিদ্রা হইল। ফুসফুস,হৃৎপিণ্ড ও পাকস্থলী প্রভৃতি-যন্ত্রের দ্বারা কেবল পোষণশক্তিই ক্রিয়া করিতে লাগিল। কিন্তু পরিচালন ক্রিয়া বন্ধ হইলে শরীরাবয়বের ক্ষয় হয় না, সুতরাং পুষ্টিশক্তি পূর্ণমাত্রায় উত্তেজিত হইলেও বিশেষ কার্য্য হইতে পারে না, বরং আর২ কএকটি কারণে তাহার কার্য্য কম কমই হইয়া থাকে।

হয়, তৎপর তাহা রক্তরূপে পরিণত হয়, তৎপর সেই রক্তীয় সূক্ষ্ম২ অংশ-সকল শরীরের অবয়বে পরিণত হয়, অর্থাৎ রক্তের কতকগুলি সূক্ষ্ম অংশ মাংসভাবে পরিণত হয়, কতকাংশ, অস্থিভাবে, কতকাংশ স্নায়ুভাবে, কতকাংশ মস্তিষ্কভাবে কতকাংশ মজ্জাভাবে, কতকাংশ বা নাড়ীভাবে, কতকাংশ ফুস-ফুসভাবে, কতকাংস বা হৃৎপিণ্ডভাবে পরিণত হয়। এইরূপ অসংখ্য প্রকারেই পরিণত হয়। এই ক্রিয়াকে পুষ্টির ক্রিয়া বা পোষণ-শক্তির ক্রিয়া বলা যায়।

শিষ্য। আমরা যাহা আহার করি তাহাও প্রায় /১, /১॥ ভারী হইবে, সেই জন্যই আহারের পর দেহটি ভারী বোধ হয় বলিনা কেন?

আচার্য্য। হস্তের দ্বারা /১, /১॥ সের-ভারী কোন দ্রব্য বহনে দেহটা যেরূপ ভারী বোধ হয়, আহারের পর তদপেক্ষায় অনেক অধিক ভারী বোধ হয় না কি? অবশ্যই হয়। ফলতঃ—আহারের পর ভিন্ন যখনই নিদ্রা বেগের উপক্রম হয়, তখনই জানিবে তমঃ-শক্তি পূর্ণ- মাত্রায় পরিস্ফুরণ হইয়াছে।

আবার আমরা যখন ধীরেধীরে বেড়াইতেবেড়াইতে চলিতে থাকি, তখন মৃদুমাত্রায় পরিচালনশক্তির বিকাশ হইতেছে, তখন দর্শন, চিন্তাদি জ্ঞানশক্তিব কার্য্য এবং পোষণশক্তির কার্য্য বেশ চলিতেছে, কিন্তু তুমি যখন অত্যন্তবেগে দৌড়িয়া চলিয়া যাইতে থাক, তখন তোমার পূর্ণমাত্রায় পরিচালনশক্তি বিকসিত হইল, ক্রমে মরী-বাচিজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িবে, দর্শনাদি-জ্ঞানশক্তি বিনষ্ট প্রায় হইবে, সম্মুখে দক্ষিণ-বামে কিছুই লক্ষ্য থাকিবে না, অনেককাল-পর্য্যন্ত থাকিয়া থাকিয়াই নিশ্বাসাদি ক্রিয়া হইবে, পোষণশক্তির ততটুককালের নিমিত্ত বিলক্ষণ হ্রাস হইবে।

তবে অবশ্যই অনেক সময় যেন মনে হয় যে ঠিক এক সময়ই দুটি শক্তির প্রবলভাবে পরিস্ফুরণ হইতেছে, কিন্তু তাহা বাস্তবিক সত্য নহে। বাস্তবিক সেখানেও এমত সূক্ষ্মরূপ পৌর্ব্বাপর্য্য-বৈলক্ষণ্য আছে তাহা সহজে অনুভব করা যায় না, অর্থাৎ সেখানেও অতিদুর্লক্ষ্য-দ্রুতভাবে একটি শক্তির পরেই আর একটির বিকাশ হয়।

জ্ঞানশক্তি বিষয়ে ও এইরূপ জানিবে। জ্ঞানশক্তির ও নানা প্রকার মাত্রা আছে, তদনুসারে অপর-শক্তিদ্বয়ের হ্রাস হইয়া থাকে। জ্ঞানশক্তির মাত্রায় ন্যূনাতিরেক বুঝিতে গেলে জ্ঞানশক্তিটি—ঠিক কিরূপ বস্তু, জ্ঞান কি প্রকারে উৎপন্ন হয় ইত্যাদি বিষয় একটু বিশেষরূপ না জানিলে হয় না। অতএব প্রথম তাহার বিবরণ বলা আবশ্যক।

জ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয়।

আমাদের যদি কোন প্রকার বিষয়জ্ঞান না থাকে, তবে কি আমরা

মৃৎপিণ্ডের ন্যায় অন্ধ পদার্থ হই ? যদি দর্শন জ্ঞান, শ্রবণজ্ঞান, রসজ্ঞান, স্পর্শনজ্ঞান, গন্ধজ্ঞান কিম্বা মানসিক কোন বিষয়ের চিন্তা বা স্মরণরূপ জ্ঞানও আমাদের কোন সময়ে না থাকে, তবে কি তখন আমরা কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় জ্ঞানশূন্য পদার্থ হই ?—কখনই না, না,—আমরা তখনও জ্ঞানশূন্য পদার্থ হই না। কোন বিষয়েরই যদি জ্ঞান না হইল তবে কিসের জ্ঞান হইবে ? হইবে, আমার নিজের জ্ঞান হইবে, তখন কেবলমাত্র আমাকেই আমি অনুভব করিতে থাকিব। আমার মধ্যে যে সকল শক্তি আছে,—যে সকল শক্তির সমষ্টি একত্রিত করিয়াই (আমি) যে পরিচালন শক্তি আমার সমস্ত দেহ মধ্যে পরিব্যাপ্তভাবে যেন পোরা রহিয়াছে, যে পোষণ-শক্তি আমার শরীর ব্যাপিয়া ক্রীড়া করিতেছে, যে জ্ঞান-শক্তি শরীরের প্রত্যেক শাখা প্রশাখায় বিস্তৃতভাবে রহিয়াছে সেই সাত্বিক রাজসিক তামসিক শক্তিত্রয়ের সমষ্টিস্বরূপ—আমাকেই আমি অন্তরে অন্তরে অনুভব—জ্ঞান—করিতে থাকিব ; ইহাকেই সর্ব্বদেহব্যাপক একটা (আমি) অনুভব করিব।

শিষ্য। আপনার এবাক্যাবলীর যে কোন অর্থ আছে, এরূপই আমার বোধ হইতেছে না।

আচার্য্য। তুমি যে এসমস্ত বিষয়গুলি এইরূপই বুঝিবে, তাহা আমি পূর্ব্বেই অবগত আছি, তথাপি আমার মনের বেগে ভগ্ন-সংযম হইয়া এত পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হইয়াছি, একজন অরণ্য-বাসীলোক,—যিনি যাবজ্জীবনে একখানি তৃণ কুটীর কিরূপ তাহাও সন্দর্শন করেন নাই, তাঁহার হৃদয়পটে একটি সমস্ত কলিকাতা সহরের চিত্র করিয়া দেওয়া বোধহয় কাহারও ক্ষমতা নাই ইহা আমার নিতান্ত বিশ্বাস আছে। তোমরা বাহিরের ইট, এমারৎ, বিল্ডিঙ, বালাখানা, গাছ, পালা ব্যতীত, স্বপ্নেও একবার নিজ শরীর মধ্যে প্রবেশ কর নাই ; অথচ আমি তোমাদিগকে ক্রমাগত সেই দেহ মধ্যগত তত্বকথা না বুঝাইয়া ছাড়িব না, ইহা আমার বালকের ক্রীড়ার ন্যায় ফলশূন্য অনুষ্ঠান বটে। তথাপি যদি শুনিতে শুনিতে ভবিষ্যতে কখনও বুঝিতে পার এই আশায় বলিতেছি।

তুমি যে সর্ব্বদাই তোমার অস্তিত্বের অনুভব করিতেছ, তাহা কিছুই

বুঝিতে পারিতেছ না কি?—তুমি যে সর্ব্বদাই আছ তাহা তোমার মনে আসেনা?

শিষ্য। তাহাতো আসেই, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে তাহা বর্ণন করিতে পারি না।

আচার্য্য। তুমি কিছু না দেখিয়া শুনিয়া একটু কাল চুপ করিয়া বসিয়া থাক দেখি, তোমার নিজের অস্তিত্ব কিছু বুঝ কি না?।

শিষ্য। দেখিলাম, কিন্তু কিছুই বুঝিলাম না।

আচার্য্য। যাহা বলি তাহা কর তবেই কিছু বুঝিতে পারিবে। চেয়ার হইতে নাম, মোজা পেণ্টুলন, চাপকান, টুপী এসব ছাড়, ধুতি চাদর পরিধান পূর্ব্বক একখানি কুশাসন পাড়িয়া আমার সমীক্ষ্যে বইস, দুই উরুর উপরে অথবা নীচে দুই খানি পা বিন্যস্ত কর, মেরুদণ্ডটা সবল ও সম্পূর্ণ ঋজু কর,—যেন সম্মুক দিক্, পশ্চাৎ-দিক্, কিম্বা দক্ষিণ-দিক্, বাম দিক্, কোন দিকেই শরীরটার ঝুঁকি না থাকে, মস্তকটা ঋজু কর, ঘাড় যেন কোন দিকে অবনত্র হয না—ঝোঁকে না, উত্তরাস্য হও, আপন ক্রোড়ে উত্তান ভাবে একখানির উপর আর একখানি করিয়া হস্ত দু খানি রাখ, নয়ন দুটি এমত ভাবে রাখ যে, তুমি লক্ষ্য করিলে পর কেবল নাসিকার অগ্রদেশ ভিন্ন তাহার উপর, নীচ, বা দক্ষিণ-বামে, সম্মুখে আর কিছুই লক্ষিত নাহয়। যদি ইহা না পার, তবে যাবত চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই রাখ, ধীর গম্ভীর-ভাবে অচঞ্চল হইয়া থাক, এখন কিছুই চিন্তা করিও না,—কোন দিকে মন দিওনা, কোন দিকে চক্ষু দিওনা, কোন দিকে কাণও দিওনা ৫ পল কাল থাকিয়া দেখ। কেমন কিছু বুঝিতে পার কি?

শিষ্য। কতকটা বুঝিয়াছি বটে।

আচার্য্য। কিরূপ বুঝিলে বল দেখি?—

শিষ্য। তাহা বিশেষ বর্ণন করিতে পারি না, তবে এই মাত্র বলিতে পারি, যে আমরা কোন বিষয়ে মন দিলে, কিম্বা চক্ষু কর্ণাদি কোন বিষয়ে থাকিলে যেন, সেই২বিষয়ের একটা না একটা জ্ঞানহয়, এখন তাহা কিছুই হইতেছিলনা।

আচার্য্য। তুমি কি অচেতন হইয়া ছিলে?

শিষ্য। অচেতন ও হই নাই, জাজ্বল্যমান অনুভূতি ছিল।

আচার্য্য।—যে অনুভূতি ছিল উহাই তোমার 'নিজের' অনুভূতি, এবং তুমি তোমার নিজকেই কেবল অনুভব করিতে ছিলে। ইহার প্রকৃত রহস্য শুন ;—

কাচপাত্রের অভ্যন্তরবর্ত্তী-জ্বলন্ত-বর্ত্তিকা যেরূপ কাচের সাহায্যে আপন জ্যোতিকে দ্বিগুণতর-উত্তেজিত করিয়া সমস্ত-গৃহটিকে আলোক-শক্তি-পরিপূরিত করিয়া থাকে ; আমাদের অসংখ্যেয়-জড়শক্তির আকর এবং অসংখ্য শক্তিময়-জড় আর চৈতন্যময়,—অর্থাৎ চৈতন্যপদার্থদ্বারা-বিমিশ্রিত-জড়-শক্তি ময়আত্মাও সেইরূপ আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে বাস করিয়া মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুমণ্ডলের সাহায্যে আপনার অংশস্বরূপ জ্ঞানশক্তি, পরিচালনশক্তি এবং পোষণশক্তিকে মস্তক-অবধি পাদ-পর্য্যন্ত শরীরের প্রত্যেক-অবয়বে,—প্রত্যেক অণুতেঅণুতে বিকীর্ণ করিয়া দেহটি পরিপূরিত করিয়া আছেন, ইহা অনেকবারই বলিয়াছি। এখন অবশিষ্ট কথা শুন,—

স্বয়ং প্রকাশ-বিহীনদশা (শলৃতা) আর তৈল যেমন তাপ-সংযোগে, তাপেরই সাহায্যে, সেই দশাও তৈলাকার পরিত্যাগ-পূর্ব্বক একটী আপীত-চম্পক-কলিকাকারে (দীপাকারে) পরিণত হইয়া উজ্জ্বলতা ধারণ-পূর্ব্বক প্রকাশ-বিশিষ্ট হয়, অথবা স্বয়ং প্রকাশবিহীন একটা লৌহপিণ্ড যেরূপ তাপের সহিত মাখা-মাখি হইয়া নিজের অন্ধকারত্ব—কালিমা—অপ্রকাশত্ব—অবস্থা পরি-ত্যাগ-পূর্ব্বক প্রজ্বলিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকে ; কিন্তু তাপের সহিত সংযুক্ত হইয়া ঐ লৌহ, কিম্বা দশা আর তৈলের যে ঐরূপ আলোকশক্তি-বিশেষ হইল তাহা বাস্তবিক ঐ লৌহ, বা বর্ত্তিকা-তৈলেরও নহে,—আবার শুধু তাপেরও নহে, কিন্তু উভয়ের ; এবং তাপের সম্বন্ধাধীনমাত্রেই লৌহাদির মধ্যে ঐরূপ আলোকশক্তি পরিস্ফুরিত হইয়া লৌহাদির নিজ-নিজের অন্ধকারত্ব বা কালিমা বিদূরিত করিয়া উহাদিগকে প্রকাশমান করে, সেইরূপ আমাদিগের যে সর্ব্বদা নিজ-নিজের একপ্রকার আভ্যন্তরিক প্রকাশ হইতেছে তৎসম্বন্ধেও জানিবে, অর্থাৎ আমা-দেরও জড়শক্তির সমষ্টি-ময় আত্মাও সেইরূপ স্বয়ং প্রকাশবিহীন-অন্ধকার-ময়-জড়পদার্থ (বাহিরে দৃশ্যমানভার—প্রভৃতিপদার্থের মধ্যে প্রবাহশালী-তড়িৎশক্তির ন্যায় জড়পদার্থ) হইলেও চৈতন্য পদার্থের সহিত নিতান্ত দুর্ভেদ্য

বিমিশ্রণভাব থাকাতে সর্ব্বদাই দেহগৃহের অভ্যন্তরে উজ্জ্বলিতভাবে প্রকাশমান হইয়া আছে, দেহেরমধ্যে যেন আর অন্ধকার নাই—পাদ অবধি মস্তক পর্য্যন্ত কোন-খানেই অন্তরেং অপ্রকাশ নাই, কোন স্থানেই যেন আর অন্ধতা নাই, অন্তরেং সর্ব্বত্রই যেন এক রূপ প্রকাশভাব রহিয়াছে। এইরূপ এক প্রকার আন্তরিক-প্রকাশঅবস্থার নাম আমাদের 'আমির' উপলব্ধি বা 'আমির' জ্ঞান। এই বিমিশ্রিত উপলব্ধির মধ্যে আমাদের চৈতন্য এবং বুদ্ধি ইচ্ছাদি-অবস্থাপন্ন জ্ঞান-শক্তি পরিচালন-শক্তিপ্রভৃতি সমস্তশক্তি, সমস্ত-ইন্দ্রিয়াদি ও প্রাণাদি এবং স্থূল দেহটা পর্য্যন্ত পড়িবে, অর্থাৎ ইহাদের সকলকে লইয়াই এক প্রকার একটা প্রকাশভাব হইতেছে। আমাদের এইরূপ আন্তরিক উপলব্ধি স্বরূপ প্রকাশ ভাবটা দিন-দিন নূতনং জন্মিতেছে না, কারণ আমাদের চৈতন্য আর জড়শক্তির সংযোগ দিনং নূতন করিয়া জন্মিতেছে না, যে দিন আমার আমিত্ব সংগঠিত হইয়াছে সেই দিনই আমার চৈতন্য এবং জড়শক্তির সংযোগ হইয়াছে, সুতরাং সেই দিন হইতেই আমার 'আমির' মধ্যে ঐরূপ প্রকাশস্বরূপ জ্ঞানও হইয়াছে।

কিন্তু অবশ্যই, জড়তাপ শক্তির যোগে লৌহাদির আরক্তিমবর্ণ বা আলোকোদ্ভেদ স্বরূপ প্রকাশ লইয়া যে আমাদের আন্তরিক প্রকাশের তুল্য দৃষ্টান্ত যোজনা করা হইল, তাহা কখনই না; কারণ দৃষ্টান্ত আর দার্ষ্টান্তিক সম্পূর্ণ বিসদৃশ পদার্থ; কেননা আমাদের চৈতন্য পদার্থটি তাপশক্তির ন্যায় জড় পদার্থ নহে, আর আমাদের "আমির" অন্তর্গত যে শক্তিগুলি প্রকাশিত হইতেছে তাহারাও লৌহ পিণ্ডাদির ন্যায় ভৌতিক পদার্থ নহে, এবং আমাদের দেহের মধ্যে যে, 'আমি' সর্ব্বদা প্রকাশ পাইতেছি,—দেহের মধ্যে যেন কখনই অন্ধত্ব ভাব হইতেছে না, সেই প্রকাশও ঠিক উত্তপ্ত-লৌহপিণ্ডের প্রকাশের মত নহে, ইহারা পরস্পরে অত্যন্ত বিভিন্ন প্রকার। কারণ আমাদের দেহ-মধ্যে চৈতন্যপদার্থ, আর সর্ব্বদেহ-ব্যাপক দশ প্রকার ইন্দ্রিয়-শক্তি এবং পাঁচ প্রকার প্রাণাদি-শক্তিপ্রভৃতি সমস্তপ্রকার অস্বাভাবিক-শক্তির সমষ্টি (পৃষ্ঠা ২৬) এবং পদতল-অবধি-মস্তক-পর্য্যন্ত সমস্তটিদেহ, ইহাদের একরূপ অনির্ব্বচনীয় অত্যন্ত-মাখামাখি-ভাবের সংযোগ আছে, সেই সংযোগ

থাকাতে দেহের ভিতরে জ্ঞানশক্তি প্রভৃতি যে সকল শক্তি কার্য্য করিতেছে, তাহার প্রত্যেকশক্তির অস্তিত্ব এবং দেহের প্রত্যেক অবয়ব বা স্থূল-সূক্ষ্ম-সমস্ত অংশই এক প্রকার জাগ্রত ভাবে,—এক প্রকার ভাসমানভাবে—রহিয়াছে, ইহাদের অস্তিত্বের অন্ধতা হইতেছে না। সুতরাং বাহিরের সালোকের সাদৃশ্য কোথা? বাস্তবিকপক্ষে তোমার নিজের অনুভবশক্তি ব্যতীত ঐ ভাবটি কথার দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া নিতান্ত অসাধ্য, তবে আমি যদি আমার হৃদয়টি তোমার মধ্যে পূরিয়া দিতে পারি, তাহা হইলেই এই ভাবটি ঠিক ঠিকমত তোমার মধ্যে পৌছাইয়া দিতে পারি, নতুবা কোন ভাষাদ্বারা ব্যক্ত করিয়া ইহা পরের মনে পৌছাইবার জো নাই,—যে হেতু এ আভ্যন্তরিক ভাবগুলি ঠিক ঠিকমত প্রকাশের উপযুক্ত কোন ভাষাই নাই, এবং তাহা সম্ভবেও না। কারণ আমরা যে সকল কথা সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহার প্রত্যেকটি কথাই আমাদের বাহিরের দৃষ্টি দ্বারা, বাহিরের ভাবের দ্বারা সংগৃহীত এবং অভ্যস্ত, বা শিক্ষিত, সুতরাং তাহা অন্তরের ভাবের প্রকাশ করিতে পারে না। কারণ বাহিরের ভাব আর অন্তরের ভাব নিতান্ত অসদৃশ পদার্থ; কোন একটি বাহিরের ভাব আর কোন একটি অন্তরের ভাব, ইহাদের কোন অংশেই ঠিক মিল নাই, মিল থাকা কদাচ সম্ভবেও না।

'প্রকাশ' 'অন্ধ" 'জাগ্রৎ' 'ভাসমান' প্রভৃতিশব্দগুলি আমরা বাহিরের দৃষ্টিতে, বাহিরের ভাবেই সংগৃহীত ও অভ্যস্ত করিয়াছি; সূর্য্যাদি হইতে বিকীর্ণ জড়-পদার্থ-আলোকশক্তির দর্শনে, সেই আলোকশক্তির ভাবেই আমাদের 'প্রকাশ'কথাটি অভ্যস্ত আছে, সুতরাং 'প্রকাশ' কথাটি শুনিলে আলোক-মণ্ডলের ভাব ব্যতীত আর কিছুই আমাদের মনে আসিতে পারে না, হৃদয়ে ধারণা হইতে পারে না, কখনই না। কারণ যে অর্থে আমাদের যে কথাগুলি অভ্যস্ত আছে, সেই কথা শুনিলে আমাদের সেই অর্থ ব্যতীত আর কিছু মনে হইতে পারে না।

অন্ধ, কথাটি আমরা নয়ন-শক্তি-বিহীন-লোকের দর্শনে তাহারই ভাবে, অথবা অন্ধের অনুকরণ করিয়া নিজ-চক্ষুর্দ্বয় নিমীলনে একপ্রকার কাল-কালভাব আঁধার-আঁধারভাব দর্শনে সেইরূপ কাল-কাল-আঁধার-আঁধরিমত সন্দর্শনকরার ভাবেই অভ্যস্ত করিয়াছি, এখন

অন্ধ কথাটি শুনিলে আমাদের ঐ কাল-কালমত—আঁধার-আঁধারমত-ভাবদেখা অর্থ ব্যতীত আর কোন ভাব কখনই ধারণা হইতে পারে না।

'জাগ্রৎ' শব্দটিও আমরা চক্ষুর উন্মীলন-পূর্ব্বক চলিয়াফিরিয়া বেড়ানের অবস্থা দেখিয়া সেইভাবেই সঙ্গৃহীত ও অভ্যস্ত করিয়াছি, এবং 'ভাসমান' কথাটিও প্রকাশের ভাবেই অভ্যস্ত করিয়াছি, সুতরাং 'জাগ্রৎ,' 'ভাসমান' কথা শুনিলেও আমাদের এই অভ্যস্ত-প্রকারের ধারণাব্যতীত অন্যকোনপ্রকার ধারণা হইতে পারে না, ইহা নিশ্চয় কথা।

এখন দেখ, আমি প্রকাশাদিশব্দ দ্বারা যে ভাব তোমাকে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছি সেই ভাবটি, কোনমতেই প্রকাশাদি-শব্দের বাচ্য হইতে পারে না, কারণ প্রকাশাদি-শব্দ শুনিলে আমাদের মনেমনে যেরূপ-ভাবের ধারণা হয়, উহা ঠিক্ তাহা নহে,—উহাতে আলোকের মত ভাব নাই, জাগ্রতের ভাব নাই, ভাসমানের মত ভাব নাই,—অথচ অর্থের কিছুকিছু মাত্র সাদৃশ্য লইয়া এই সকল-শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে; সেই সাদৃশ্যও এক হিসাবে অতি অকিঞ্চিৎকর; পদতল অবধি মস্তক পর্য্যন্ত আমার আন্তরিক অস্তিত্বের মধ্যে যে ভাবটি হইতেছে, তাহা আলোকের ভাবের প্রকাশ না হইলেও,—আমার সমস্তদেহটার অভ্যন্তরে যে একটা অস্তিত্ব বর্ত্তমান আছে,—'আমি আছি' এই ভাবটি আছে, আমাদের আভ্যন্তরিক একটা অস্তিত্ব যে বিলুপ্ত হইতেছে না—অন্তরে অন্তরে 'আমিনাই' এই ভাবটা হইতেছে না, এই ভাবটিকেই প্রকাশ বা জাগরণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। এইরূপ ভাবটিরই নাম আমার নিজের অনুভূতি—আমার 'আমির' জ্ঞান—'আমির' উপলব্ধি ইহাই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

এই অনুভূতি বা জ্ঞান তোমার আত্মার কোন গুণ বিশেষ বা শক্তি বিশেষ নহে, এবং সর্ব্বদা উৎপন্নও হইতেছে না; কিন্তু যে দিন হইতে তোমার 'আমিত্ব' হইয়াছে, সেই দিন হইতেই চৈতন্য পদার্থের সহিত তোমার 'আমির' রাসায়ন-সংযোগের ন্যায় মাখামাখি ভাবটা আছে, সুতরাং

সেই দিন হইতেই অন্তরেঅন্তরে তোমার 'আমি' উক্ত প্রকারের প্রকাশ পাইতেছে, তোমার অস্তিত্ব সর্ব্বদাই অবিলুপ্তভাবে থাকিয়া 'আমি আছি' এইরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, তুমি যে সর্ব্বদাই আছ, তাহার নিমিত্ত প্রমাণান্তর চাহিতেছ না তোমার 'আমির' অনুভূতি হইতেছে। যদি এই উক্তপ্রকার প্রকাশভাবস্বরূপ আমাদের 'আমির' জ্ঞানটি, বস্ত্রাদির শাদা কাল রঙ্গের মত কোন গুণ-বিশেষ, অথবা লৌহাদিতে উৎপন্ন আলোক-শক্তির ন্যায় কোন শক্তিবিশেষ হইত, তবে বস্ত্রের রঙ্গের ন্যায়, কিম্বা লৌহাদির আলোক-শক্ত্যাদির ন্যায় সময়-সময় কমি-বেশী, এবং কখন বা একবারে বিনষ্ট, আবার কখন বা ভয়ানক উত্তেজিত, আবার কাহারও বা কিছু বেশী, কাহারও বা কিছুকম ইত্যাদি নানা প্রকার হইত; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা কদাচ হয় না। আমাদের অন্তরে অন্তরে যে "আমি আছি" এইরূপ-ভাবটা বা আমাদের 'আমির' জ্ঞান আছে। তাহা আমার জন্মাবধি সর্ব্বদাই একরূপ আছে, কোন অবস্থায় কখনই তাহার হ্রাস বৃদ্ধি, বা একবারে লোপ, অথবা অত্যন্ত উত্তেজিত ভাব, অথবা কাহার কিছু বেশী এবং কাহারও কিছু কম ইত্যাদি প্রকার ভেদ নাই। অতএব আমাদের 'আমির' অনুভব বা জ্ঞান বা পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রকাশ ভাবটা আমাদের 'আমির' কোন গুণ বা শক্তি বিশেষ নয়; কিন্তু উহা আমাদের চৈতন্যেরসত্তাশ্রিত—আমাদেরজড়-শক্তির পরিস্ফুরিত—সত্তাবিশেষমাত্র। এ কথাটা বড়ই দুর্গম, ইহা বুঝিতে হইলে বিশেষরূপ অনুভব-শক্তির আবশ্যক। যাহা হউক এখন আর ইহার বিস্তার করিব না, এই প্রস্তাবের শেষেই ইহা অধিক বিস্তার করিয়া দেখাইব।

কোন্ সময় আমাদের আত্মার অনুভূতিটা গ্রাহ্য হয়?

শিষ্য। মহাশয়! আমি এখনও সুস্পষ্টরূপে আপনার ভাবটি অনুভব করিতে পারি নাই। যদি সর্ব্বদাই অন্তরে অন্তরে আমার 'আমির' প্রকাশ হইতেছে—বা অনুভব বা জ্ঞান হইতেছে, তবে আমি তাহা বিশদরূপে বুদ্ধির বিষয় করিতে পারিতেছি না কেন?—অনুগ্রহ পূর্ব্বক আর একটু পরিষ্কাররূপে এ বিষয়টি বুঝাইয়া দিন।

আচার্য্য। বিস্তাররূপে বলিতে আমার কোনরূপ অলসতা বোধ নাই, কিন্তু আমি বড়ই দুর্ঘট-ঘটনা-সাধনের ব্যাপারে নিপতিত হইয়াছি; কারণ এদিকে তোমার, বাহিরের কতকগুলি জিনিষ-পত্রের জ্ঞান ব্যতীত আন্তরিক অনুভব শক্তি কিছু মাত্রই নাই,—একবারে অভাব, অথচ আমি তোমাকে সেই অন্তর্জগতের বিষয়গুলি যেন নিতান্তই বুঝাইব বলিয়া চেষ্টা করিতেছি, ইহা অবশ্যই আমার দুরাশা, এবং তোমার আমার দুজনেরই পরিশ্রম বিফল হইতেছে সন্দেহ নাই; তবে বলিয়া রাখিলাম, চিন্তা করিতে করিতে যদি কখনও বুঝিতে পার, তখন পরিশ্রমের সফলতা মনে হইতে পারিবে। যাহা হউক এখন তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয় শুন।

দেহাভ্যন্তরে যতগুলি অস্বাভাবিক শক্তি (পৃঃ২৬) একত্রে সমষ্টি ভূত হইয়া তোমার পদতলাবধি মস্তক পর্য্যন্ত একটি 'আমি' হইয়াছে, তৎ-সমস্তেরই সর্ব্বদা অন্তরে অন্তরে প্রকাশ হইতেছে তাহাতে কোনই সন্দেহ বা দ্বৈধ নাই, কিন্তু তোমার 'আমিত্বের' উৎপত্তি অবধি অদ্য পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই এইরূপ প্রকাশ হইতেছে বলিয়া সেই ভাবটি তোমার গ্রাহ্য হইতেছে না, পরন্তু যখন তোমার 'আমিত্বের' উপাদান বা এক একটি অংশ-স্বরূপ-শক্তি-গুলির মধ্যে একটু কিছু নূতনত্ব হয়, অর্থাৎ সেই অনেকগুলি শক্তির মধ্যে কোন রূপ একটির কিছু বেশীবৃদ্ধি বা বেশী হ্রাস ইত্যাদি কোন পরিবর্ত্তন হইয়া তোমার 'আমির' কোন রূপ পরিবর্ত্তন বা অন্য রকম ভাব হয়, তখনই তোমার 'আমির' অনুভব বা জ্ঞান বা উক্ত প্রকারের প্রকাশ ভাবটা গ্রাহে আইসে নচেৎ সহজে আইসে না।

ইহার একটা দৃষ্টান্ত বুঝিয়া লও, মনেকর, তোমার স্থূল দেহের জন্মা-বধি, দেহের অন্তরে বাহিরে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত বায়ুরাশি সর্ব্বদাই তোমার দেহটাকে অতিতীব্র-চাপন দ্বারা স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে, ইহা অবশ্যই সত্য, সুতরাং তাহার অনুভবই তুমি সর্ব্বদা করিতেছ, ইহাও নিশ্চয়,অথচ কিন্তু তুমি তাহা কিছুই সহজে গ্রাহ্য করিতে পারিতেছ না; তুমি যে সর্ব্বদা বায়ুরশির স্পর্শ করিতেছ তাহা লক্ষ্য করিতে পারিতেছ না, কিন্তু যখন সেই বায়ুর স্পর্শের একটু কোন রকম নূতনত্ব হয়, অর্থাৎ স্বভাবাবস্থায় যেরূপ

আছে, তদপেক্ষায় কিছু একটু ন্যূনাতিরেক বা পরিবর্ত্তন হয়, তবে বিলক্ষণ রূপে তাহা গ্রাহ্য করিয়া থাক; যখন বায়ুর স্রোত কোনদিক্ হইতে কোন দিকে চলিতে থাকে, তখন তাহার স্পর্শের অনুভব বিলক্ষণ গ্রাহ্যকর, কেননা যেভাবে তোমাকে বায়ুরাশি সর্ব্বদা স্পর্শ করিয়াছিল সেই স্পর্শের পরিবর্ত্তন হইল, আর যখন প্রবল গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড-কিরণের দ্বারা পরিব্যাপ্ত-বায়ুরাশি নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া যায়, তখনও শরীরটা যেন কিরকম কি রকম বোধ হয়—শরীরটা যেন আবরণশূন্য আবরণ শূন্য মনে হয়, আবার যখন প্রগাঢ়তর শীতকাল উপস্থিত, তখন তাপের কিছু হ্রাস হওয়াতে পরিব্যাপ্ত বায়ুরাশি একটু গাঢ় হয়—সুতরাং একটু পরিবর্ত্তন হইল, এই সময় যেন আবার আর কি একরকম বোধ হয়, সর্ব্বদেহ-ব্যাপক-বায়ুরাশির আবরণটা যেন একটু অনুভবে আইসে, শরীটা যেন একটু চাপাচাপা মনে হয়। সুতরাং তখন বায়ুরাশির স্পর্শ যে আমরা অনুভব করিতেছি তাহা বুঝিতে পারি।

এইরূপ সময় সময় পরিবর্ত্তিত এক একরূপ-স্পর্শের অনুভব করিয়া আমরা মনে করি যে 'বায়ু হইতে আমরা স্পর্শশক্তির অনুভব করিয়া থাকি' কিন্তু যদি বায়ুরাশির এইরূপ সাময়িক পরিবর্ত্তনের দ্বারা তাহার স্পর্শ-শক্তির পরিবর্ত্তন না হইত, তাহা হইলে, বায়ু হইতে যে আমরা স্পর্শ-শক্তির অনুভবকরি কিম্বা বায়ুর মধ্যে যে স্পর্শশক্তি আছে, হয়ত তাহাও আমরা স্বীকার করিতাম না।

আমাদের 'আমির' অনুভব সম্বন্ধেও এইরূপেই জানিতে হইবে। যখন হইতে আমি আছি, তখন হইতেই আমার 'আমির'ও সর্ব্বদা অনুভব হইতেছে, অথচ তাহা গ্রাহ্যে আসে না, আমরা যে সর্ব্বদা 'আমির' অনুভব করিতেছি, তাহা বুঝিতে পারিনা। কিন্তু যখন ভক্তি, ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, দ্বেষ, দুঃখ, শোক, হর্ষ, সুখ, প্রভৃতি কোন প্রকার বৃত্তি উত্তেজিত হইয়া দেহের মধ্যে বিজৃম্ভিত হয়, তখন ততটুকু সময়ের নিমিত্তই আমাদের অস্তিত্বের পরিবর্ত্তন হয়, আমাদের 'আমির' বা আত্মার অবস্থান্তর হয়, যে অবস্থায় পূর্ব্বে ছিলাম তাহার ব্যত্যয় হইয়া যায়; সুতরাং তখন 'আমাকে' আমি বিলক্ষণ গ্রাহ্য করিতে পারি, আমার অস্তিত্বের অনুভবটাও

গ্রাহ্য করি, আমি যে আমাকে অনুভব করিতেছি তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারি।

জ্ঞান স্বরূপ নির্ণয়ের অন্তর্গত ভক্তির অবস্থা নির্ণয়।—

যখন ভক্তি-শক্তির বিকাশ হয়, তখন আমাদের 'আমির'—জীবাত্মার—মধ্যে যেন কিরূপ এক শীত-বীর্য্য ভাব হয়, হৃদয়টা যেন জুড়াইয়া যায়, প্রচণ্ড গ্রীষ্মজ্বালায় সমস্তদিন দগ্ধ হইয়া—'হা বায়ু, হা জল' করিতে করিতে পূর্ণসুধাংশু-কিরণান্বিত সায়ংকালে তটিনী-তীরে বসিয়া কল্লোলশীকরাভিষিক্ত-সমীরণ সেবায় প্রাণ যাদৃশ সুশীতল হয়, ভক্তির উন্মীলনাবস্থায় যেন তাহারও সহস্রগুণে, প্রাণটা আপ্যায়িত হয়, আমাদের 'আমির' প্রতি-অণুতে অণুতে যেন সুধা ঢালিয়া সমস্ত 'আমিকে' পরিপূর্ণ করিয়া দেয়, আনন্দের যেন তরঙ্গ উঠিতে থাকে,—আনন্দের তরঙ্গে যেন আত্মাটা হেল্বিতে দোলিতে থাকে, তখন যে কি অদ্ভুত একশক্তিরই তরঙ্গ হয় তাহা বাহিরের কেহ বুঝে না। ইহাই আমাদের আত্মার—'আমির' পূর্ব্বাবস্থার পরিবর্ত্তন অবস্থা; কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের সময় আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে আমার এইরূপ অবস্থা হইয়াছে সুতরাং এই পরিবর্ত্তন সময় আমাদের 'অমিকে' বিলক্ষণ বুঝা যায় 'আমির' অনুভবটা গ্রাহ্যে আইসে ইহা বলা যাইতে পারে। কারণ ভক্তি অবস্থার এই অনুভবটা আমাদের সেই পূর্ব্বকার 'আমির' অনুভবটা অপেক্ষায় নূতন কোন একটা অনুভব নয়, সেই পূর্ব্বকার অনুভূতিরই জাগাইয়া উঠা অবস্থামাত্র।

জ্ঞান স্বরূপ নির্ণয়ের অন্তর্গত ক্রোধাদির অবস্থা নির্ণয়।

ক্রোধের বিজৃম্ভন সময়ে আমাদের 'আমি'—আত্মা—যেন বিকম্পিত হইয়া উঠে, আত্মা এমন এক তীব্র বেগে বিস্ফারিত হয়, যেন প্রবল বায়ু রাশির সাহায্যে প্রচণ্ড অগ্নি উজ্জিৃম্ভত হইয়া উঠে, 'আমির' মধ্যে যেন অপরিমিত উত্তেজনা পরিপূরিত হইয়া যায়, যেন কতই বল কতই সামর্থ্য বোধ হইতে থাকে; সুতরাং তখন আমাদের 'আমির' পূর্ব্বাবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়া তখন-

কারমত নূতন একপ্রকার অবস্থা হয়, এবং তখন আমরা বুঝিতে পারি যে আমার এইরূপ অবস্থা হইয়াছে, সুতরাং এসময় ও আমাদের সেই 'আমির'—আত্মার—অনুভব বিলক্ষণ আমাদের গ্রাহ্য হয়। কারণ এই ক্রোধাবস্থায় অনুভবও আমাদের সেই চিরন্তন অনুভবের জাগিয়া উঠা অবস্থা মাত্র।

ঈর্ষ্যা, অসূয়া, দ্বেষাদিশক্তির উদ্দীপনার সময়ও 'আমির' মধ্যে কিরূপ এক প্রকার বিক্ষোভ,—কিরূপ এক প্রকার কৃপণতা ভাব উদ্বেলিত হয় তাহা, যাহার 'আমির' মধ্যে হয়, সেই অনুভব করিতে পারে, তৎকালে তাহার 'আমি' পূর্ব্বাবস্থাঅপেক্ষায় পরিবর্ত্তিত-কিরূপ এক অবস্থায় আইসে, তাহা যাহার হয় সেই অনুভব করিতে পারে, এবং তখন সে বুঝিতে পারে যে 'এখন আমার এইরূপ অবস্থা হইয়াছে।' সুতরাং এসময় ও 'আমির' সেই পূর্ব্বতন অনুভূতিই আমাদের গ্রাহ্য হয়।

দুঃখের সময়ও, 'আমির' মধ্যে যেন কিরূপ একটা গুরুতর বাধা বা আক্রমণ উপস্থিত হয়। শরীরের কোনখানে একটা ফোড়া হইলে সেই স্থানটা ব্যাপিয়া আমাদের আত্মাকে যেন অগ্নি পিণ্ডের দ্বারা চাপিয়া চাপিয়া ধরে 'আমির' মধ্যে যেন কিরূপ এক প্রকার খরতরভাব—তীক্ষ্ণতীক্ষ্ণ ভাব—কি এক রূপ অসহনীয় ভাব উদ্দীপ্ত হয়। দুঃখের পূর্ব্বকার অবস্থাপরিবর্ত্তন হইয়া যায় এবং এখন বুঝাযায় যে আমার 'আমির' এই অবস্থা হইয়াছে। অতএব এই সময়ও আমাদের 'আমির' অনুভব বিলক্ষণরূপ গ্রাহ্য করা হয়।

শোকের সময়ও, বন্ধু বান্ধবাদির বিয়োগ হইলে আমাদের 'আমির' যেন কতকটা অংশ খসিয়া যায়, আমিত্বটা যেন চারিদিক হইতে চাপালাগিয়া অত্যন্ত আকুঞ্চিত ও ক্ষীণ হইয়া পড়ে,—যেন শূন্যশূন্য প্রতীতি হইতে থাকে 'আমির' পূর্ব্বাবস্থার অন্যথা হইয়া যায়, এই সময়ে ইহা বিলক্ষণ বুঝা যায় যে আমার এখন এই অবস্থা হইয়াছে, সুতরাং এখনও 'আমির' অনুভব গ্রাহ্য হইয়া থাকে আমির অনুভব আমরা বুঝিতে পারি।

হর্ষ সুখাদি কালেও এইরূপ আমাদের আমির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, বন্ধু জনের সন্দর্শনে আমাদের 'আমি' যেন উৎফুল্ল হইয়া ফাঁপিয়া উঠে, তখন যেন আমাতে আর আমিত্বটা ধরে না এইরূপ বোধ হইতে থাকে আমাদের 'আমি' তখন পূর্ব্বাবস্থা ত্যাগ-পূর্ব্বক অবস্থান্তরে পরিণত হয়। এখন

বুঝাযায় যে "আমি এই অবস্থাপন্ন হইয়াছি।" অতএব তখন 'আমির' অনুভব আমাদের গ্রাহ্য হয়

জ্ঞান স্বরূপ নির্ণয়ের অন্তর্গত ভক্তি প্রভৃতির প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়।—

শিষ্য।—ভক্তি ও ক্রোধাদি শক্তি উদ্দীপন কালে যেরূপ অনুভব হওয়ার কথা বলিলেন তাহাতে আমাদের 'আমির'—'নিজের'—আমাদের আপনাপন অস্তিত্বের—অনুভব হয়, তাহা কিরূপে স্বীকার করিতে পারি?—সাধারণ জ্ঞানে আমরা এইমাত্র বুঝি যে, ভক্তি, ক্রোধ ঈর্ষ্যাদি পদার্থগুলি এক একটি শক্তি বা এক একটি গুণ আমাদের আত্মাতে সময় সময় উৎপন্ন হয়, যখন উৎপন্ন হয় তখন কেবল ঐ ভক্তি প্রভৃতি গুণ গুলিকেই উপলব্ধি করিয়া থাকি, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আর কিছুই অনুভব করি না—আমাদের 'আমির' জীবাত্মার অনুভব করি না। ভক্তি প্রভৃতি গুণগুলি কিছু স্বয়ংই আমাদের 'আমি' নহে, উহারা 'আমির' আত্মার গুণ বা শক্তি বিশেষ, সুতরাং ভক্তি ক্রোধাদির বিকাশ হইলে—আমাদের 'আমির' আত্মার পরিবর্ত্তন কিরূপে হইল, এবং ঐ সকল গুণগুলি অনুভব করার সঙ্গেসঙ্গে কিরূপেআমাদের 'আমির' অনুভব করা হয়, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না এবং এই সকল জ্ঞান যে আমার আত্মাতে কোন গুণ বা শক্তি বিশেষ হইয়া জন্মিতেছে না সেই পূর্ব্বতন 'আমির' অনুভবটাই একটু জাগিল মাত্র তাহাও বুঝিতে পারিলাম না।

আচার্য্য।—ভক্তি ক্রোধাদি শক্তিগুলি যে অন্তরে অন্তরে প্রকাশ পায়—অনুভব হয়—তাহাতো তুমি বেশ বুঝিয়াছ?।

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ,—তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছি, তাহাতে কোন আপত্তি নাই, ক্রোধাদি এক একটি শক্তির বিজৃম্ভনকালে শরীর-মধ্যে যেরূপ ঝড়-বৃষ্টির আরম্ভ হয়, তাহা কোন্ চেতন-প্রাণীর অনুভব না হইয়া পারে।

আচার্য্য। তবে এখন শুন,—ভক্তি প্রভৃতি শক্তিগুলি আমাদের 'আমি'

হইতে—জীবাত্মাহইতে—পৃথক্ বা বিভিন্ন কোন বস্তু নহে,—উহা আমাদের 'আমির'—জীবাত্মারই—একএকপ্রকার অবস্থামাত্র। এই দেহের শৈশব-ভাব, যৌবনভাব, প্রৌঢ়ভাব, বা বার্দ্ধক্যাদিভাব যেরূপ আমাদের দেহটা হইতে অতিরিক্ত বিভিন্ন কোন বস্তু নহে, উহা দেহটারই একএকটী ভিন্ন-ভিন্ন প্রকার অবস্থামাত্র; ভক্তি, ক্রোধ, সুখ দুঃখাদি শক্তিগুলিও তেমন আমাদের 'আমির'—জীবাত্মার—একএকটী ভিন্ন ভিন্ন মত আকৃতি বা রূপান্তর মাত্র।

শৈশব অবস্থা হইতে যৌবন অবস্থায় আসিলে যেরূপ দেহের অভ্যন্তর ও বাহিরে প্রত্যেক অণুতে অণুতে পরিবর্ত্তন হইয়া যায়,—পূর্ব্বকার কিছুই আর সেভাবে থাকে না; ভক্তিক্রোধাদি-শক্তির উত্তেজনা হইলেওসেইরূপ আমাদের 'আমির'—জীবাত্মার—সর্ব্বাঙ্গীন পরিবর্ত্তন হয়, সকল অংশেরই পরিবর্ত্তন হয়, কোন অংশই পরিবর্ত্তন হইতে অবশিষ্ট থাকে না, অর্থাৎ প্রাসাদে চূর্ণলেপন করিলে, যেরূপ তাহার বহিস্থ-চর্ম্মটামাত্রই পরিবর্ত্তিত বা রূপান্তরিত হয়, সেইরূপ জীবাত্মার কেবল উপরে উপরেই কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হয় তাহা নহে, অন্তর বাহির সর্ব্বত্রই পরিবর্ত্তিত ও অন্যথা ভূত হইয়া থাকে। ভক্তি ক্রোধাদির অবস্থা ও বিকাশ প্রণালী আর একটু বিশদ ভাবে বিস্তার করিলেই ইহা পরিষ্কাররূপ বুঝিতে পারিবে।

অনেকবারই ইহা কথিত হইয়াছে যে, চৈতন্যের সহিত মাখামাখি ভাবাপন্ন-জ্ঞান-শক্তি, পরিচালন-শক্তি এবং পোষণ-শক্তি, এই তিন শক্তির সমষ্টিই আমাদিগের 'আমি'—আমাদের জীবাত্মা—(৭৮। ২৭) এবং এই শক্তিত্রয় যথাক্রমে সত্ত্ব-শক্তি, রজঃশক্তি, আর তমঃশক্তি হইতে সমুৎ-পন্ন। ইহা স্মরণ করিয়াই,এই বক্তব্য বিষয়গুলি তোমাকে বুঝিতে হইবে।

জ্ঞানস্বরূপ নির্ণয়ের অন্তর্গত ভক্তির প্রকৃতস্বরূপ নির্ণয়

ভক্তিকালে, তোমার 'আমির'—জীবাত্মার—অঙ্গ বা অংশ স্বরূপ জ্ঞান-শক্তির উপাদান-সত্ত্ব-শক্তির (১৭১।১৭২ পৃ) উত্তেজনা হয়, তৎপর এই সত্ত্ব-শক্তিরই কি একরূপ অদ্ভুত বিক্ষোভ হয়, যাহা অন্তরে অন্তরেই জানা যায়,

বাহিরে মুখে ব্যক্ত করা যায় না; তখন তোমার 'আমির' আর দুটি অঙ্গ অর্থাৎ রজঃশক্তি-সমুৎপন্ন-পরিচালনশক্তি(১৭১।১৭২পৃ),আর তমঃশক্তি-সমুৎপন্ন-পোষণ শক্তি (১৭১।১৭২পৃ) এতদুভয়ের সহিত উত্তেজিত-সত্বশক্তি,সমুৎপন্ন-ভক্তি-শক্তি ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয়, বিরুদ্ধ-শক্তির আক্রমণের দ্বারা বিরুদ্ধ শক্তির বলবৃদ্ধি পায় সুতরাং সত্বশক্তির উত্তেজন-দ্বারা ক্ষণকালের নিমিত্ত রজঃ-শক্তি-সমুৎপন্ন পরিচালনশক্তি, আর তমঃশক্তি সমুৎপন্ন-পোষণশক্তি উত্তেজিত হইয়া উঠে। তখন (ভাবাবেশের প্রথম অবস্থায়) হস্তাদির বিক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়, শিরঃ কম্পনাদিও হইয়া থাকে, কণ্ঠধ্বনি বিস্ফারিতভাবে হইতে থাকে, সন্নিহিত-শিরাদির প্রবল-বিক্ষেপদ্বারা চক্ষুকলিকার চতুর্দ্দিগ বর্ত্তী-জলাকারপদার্থ (অশ্রুবিন্দু) ঝরিতে থাকে, ফুস্‌ফুস্ প্রবল বেগে কার্য্য করিতে থাকে, ঘনঘন বেগবান্ নিশ্বাসপ্রশ্বাস বহিতে থাকে। পরে ক্রমে সত্বশক্তি বিজৃম্ভিত হইয়া বলবতী হইলে রজঃশক্তি আর তমঃশক্তি এককালীন ক্ষীণ হইয়া পড়ে সুতরাং রজঃশক্তি সমুৎপন্ন পরিচালনশক্তির কর্ম্ম (হস্তবিক্ষেপ, শিরঃকম্প, অশ্রুপাতাদি) এবং তমঃশক্তি-সমুৎপন্ন—পোষণশক্তির কার্য্য (ঘন ঘন বেগবান্ নিশ্বাসাদি) আর থাকে না। শরীর নিস্তব্ধ হইয়া যায়। এখন তোমার আত্মার রজঃশক্তি সমুৎপন্ন পরিচালনশক্তি আর তমঃ শক্তি সমুৎপন্ন পোষণশক্তি, এই দুইটি অঙ্গ বা অংশ প্রায় বিলুপ্ত হইয়া পড়িল। এখন ভাবাবেশের পূর্ণাবস্থা হইল ; অন্তরে অন্তরে যেন কিরূপ একটা উৎফুল্লভাব—অমৃত নিশ্যন্দী আনন্দময়-ভাব প্রকাশিত হইল, এখন পূর্ণমাত্রায় ভক্তি-শক্তির বিকাশ হইল,—এখন সমস্ত-বিষয়ের জ্ঞান, ধ্যান, চিন্তা, পরিচালনাদি এক কালীন নিস্তব্ধ হইয়া, কেবলই ভক্তি, কেবলই রস। এখন তোমার 'আমির' মধ্যে বাহির হইতে একটা ভক্তি শক্তি আসিয়া যোগ দেয় নাই, কিন্তু তোমার 'আমির' প্রত্যেক অংশই ভক্তি আকারে পরিণত হইয়া গেল। ভক্তির অবস্থাটি বাদ দিয়া আর তোমার 'আমির' কিছুই অবশিষ্ট নাই। অতএব তোমর সত্ব-শক্তির যে ভাবটিকে 'ভক্তি' এই নাম দিতেছ, তাহা তোমার সম্পূর্ণ 'আমির' 'জীবের' একটা অবস্থান্তর মাত্র। সুতরাং 'ভক্তি' নামে একটা গুণ বা শক্তি পদার্থ তোমার আত্মাতে 'আমিতে' জন্মিতেছেনা এবং এই ভক্তির

জ্ঞান বা উপলব্ধি নামেও কোন একটা গুণ বা শক্তিবিশেষ জন্মিল না; তবে কেবল বিশেষের মধ্যে এই হইল যে, পূর্ব্বে যে তোমার 'আমি' প্রকাশ পাইতেছিল, তাহা তুমি গ্রাহ্য কর নাই, আর এখন ভক্তিরউত্তেজনায় তোমার সেই 'আমির' পরিবর্ত্তন হইলে, সেই পূর্ব্বেকার প্রকাশ পাওয়া ভাবটাই সেই পূর্ব্বেকার অনুভূতিটাই গ্রাহ্য হইল মাত্র। আর নূতন কিছু জন্মিল না। এখন বুঝিতে পারিলে, যে ভক্তি তোমার—'আমি'—আত্মা—হইতে কোন অতিরিক্ত পদার্থ নয়, তোমারই অবস্থা বিশেষ মাত্র ভক্তি; 'তুমি' নিজেই ভক্তি। এবং এই ভক্তি অবস্থার অনুভব আর তোমার সেই চিরন্তন 'আমির' অনুভব ইহা একই জিনিষ অতিরিক্ত কিছু নয়, সেই পূর্ব্বতন অনুভবেরই জাগ্রিত অবস্থা মাত্র।

শিষ্য।—আজ্ঞা হাঁ বিলক্ষণ বুঝিয়াছি, এখন ক্রোধাদির কথা বলুন।

জ্ঞানস্বরূপনির্ণয়ের অন্তর্গত ক্রোধেরস্বরূপ নির্ণয়।

আচার্য্য।—ক্রোধও এইরূপ তোমার জীবাত্মার মধ্যে বাহির হইতে আসিয়া নূতন করিয়া উৎপন্ন কোন গুণবিশেষ অথবা শক্তিবিশেষ নহে, কিন্তু তুমি স্বয়ংই সর্ব্বাংশে ক্রোধরূপে পরিণত হইয়া যাও।

মনে কর, তুমি যেন স্থিরভাবে বসিয়া আছ, এমন সময় আর একটি লোক আসিয়া তোমাকে ধূর্ত্ত, শঠ, পাষণ্ড, জুয়োচোর, ও ছোট লোক, ইত্যাদি যাহা কিছু মিথ্যা কটূক্তি সম্ভবে, সমস্তই বর্ষণ করিতে লাগিল। বল দেখি, এখন এই দু জনের মধ্যে কিরূপ ঘটনা হইবে?—এরূপ হইলে তোমার অন্তরে ২ একরূপ আঘাত লাগে না কি?—এক একটি মিথ্যা কটূক্তি তোমার অন্তরকে আসিয়া বিদ্ধ করিতে থাকে নাকি?—তোমার অন্তরাত্মার অণুতে অণুতে সহস্র সূচ্যগ্রের ন্যায় প্রবেশ করিয়া অন্তরাত্মাকে যেন চাপিয়া রাখিতে চায় না কি?।

শিষ্য।—ঠিক এইরূপ ঘটনা যদিও জন্মাবধি হয় নাই বটে, কিন্তু হইলে পর যাহা বলিলেন, ঠিক সেইরূপ হওয়ারই সম্ভব মনে করি।

আচার্য্য।—ঠিক এইরূপ ঘটনা নিজেরই হওয়ার প্রয়োজন নাই, একটি

অনুভব করিয়া আর পাঁচটির মর্ম্ম বুঝাই চেতন মনুষ্যের লক্ষণ। কিন্তু কি কারণে ঐরূপ ঘটনা হয়, তাহা বোধ হয় জান না, তাহা শুন ; তোমার অন্তরে ধারণা আছে যে,“আমি এক জন সর্ব্বগুণসম্পন্ন ভাল লোক,আমি অতুল রূপবান্, বিদ্যাবান্, বুদ্ধিমান্ ধার্ম্মিক, কীর্ত্তিমান্ ইত্যাদি ;” যতক্ষণ এইরূপ ধারণা তোমার মধ্যে থাকে, ততক্ষণ তোমার ‘আমি’ যেন উৎফুল্লতায় ফাঁপিয়া থাকে, জোয়ারকালে গঙ্গাজল যেরূপ ফাঁপিয়া উঠিয়া গঙ্গাসংলগ্ন খাল, বিল, ঝিল, নালা, পয়নালা, সকলেরই মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত পুরিয়া ফেলে, সেইরূপ সমস্ত শক্তিময় বা সমস্ত শক্তির সমষ্টি স্বরূপ তোমার আমি—তোমার জীব—বিক্ষুব্ধ হইয়া শক্তিতরঙ্গের উচ্ছ্বাস দ্বারা সমস্ত মস্তিষ্ক, সমস্ত স্নায়ুমণ্ডল, সমস্ত পেষী, সমস্ত ধমনী, সমস্ত শিরা ও পদতলাবধি মস্তক পর্য্যন্ত সমস্ত চর্ম্মান্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত আপ্লুত পরিব্যাপ্ত করিয়া থাকে। যখন ‘আমি বড় সুন্দর’ বলিয়া ধারণা হয়, তখন চিম্‌নির মধ্যবর্ত্তি-জলন্তবর্ত্তিকা যেরূপ আপন আলোক শক্তির দ্বারা সমস্ত গৃহটি সর্ব্বতোভাবে পুরিয়া রাখে, সেইরূপ চেতনালোকে আলোকিত—তোমার মস্তিষ্কস্থিত শক্তিময় ‘আমি’ও উৎফুল্ল হইয়া সমস্ত দেহ পুরিয়া দেহের অণুতে অণুতে একবারে মাখাইয়া যায়, অবিরোধে—অনর্গলভাবে ‘আমির’ শক্তি সমূহের স্রোত শরীরের বাহিরের দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে, সমস্ত দেহটাই একটা উৎফুল্ল ‘আমি’ হইয়া যায়, পূর্ণমাত্রায় ‘অতিমাত্র দেহাত্মজ্ঞান’ (৮৯।১৪ ও ৯৩।১২) হইতে থাকে। ‘আমি বিদ্বান, আমি বুদ্ধিমান্, আমি ধার্ম্মিক’ ইত্যাদি সমস্ত প্রকার, অভিমানের কালেই আমাদের ‘আমির’—আত্মার—এইরূপ ঘটনা হইয়া থাকে তাহা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে পারিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়।

এইরূপ অবস্থায় যখন তোমাকে ঐ সকল মিথ্যা দুরুক্তি বর্ষণ করে, তখন তোমর ঐরূপ উৎফুল্লভাবে প্রবাহিত শক্তি সমূহের গতির প্রতিবন্ধক করা হয়,—তোমার ‘আমিকে’ যেন উজান পানে একটা ধাক্কা দেওয়া হয়। যখন বলিবে “তুমি অতি বিশ্রী নিতান্ত কুৎসিত কিম্বা নিতান্ত মূর্খ, পাপাত্মা, কুলাঙ্গার” ইত্যাদি, তখনই তোমার ঐরূপ ভাবাপন্ন ‘আমির’ বিরুদ্ধে ক্রিয়া হইল। ভাবিয়া দেখ, তুমি যদি বাস্তবিকই একটা কুলাঙ্গার

দুরাত্মা পুরুষ হও, আর যদি সেইরূপই তোমার ধারণাও থাকে,—তুমি যদি মনে মনে বিশ্বাস কর যে, আমি নিতান্ত কুৎসিত কাপুরুষ নিতান্ত দুরাত্মা কুলাঙ্গার, তবে আর তোমার 'আমি' ঐ পূর্ব্বোক্তমতে উৎফুল্ল ও বিক্ষোভিত হইয়া আপনশক্তির উচ্ছ্বাসদ্বারা সর্ব্বদেহ আপ্লুত করিয়া থাকে না; কিন্তু অতি বিষণ্ণভাবে, অতি সঙ্কোচিতভাবে যেন জড়সর হইয়া যেন গুটিয়া সুটিয়া থাকে।

সেইরূপ তোমাকে তিরস্কারের কালেওএক একটি দুরুক্তি কর্ণকুহরের দ্বারা তোমার অন্তরে অন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক ঠিক সেইরূপ অবস্থা ঘটায়, অর্থাৎ তোমার 'আমির' মধ্যে ঐরূপ সঙ্কোচ ভাব,—জড় সড় ভাব উপস্থিত করে, (ইহারই নাম তোমার অন্তরে অন্তরে আঘাত লাগা) কিন্তু তুমি অভিমানের দ্বারা ফাঁপিয়া রহিয়াছ তুমি সে আঘাত সহ্য করিবে কেন? তোমার, 'আমি' আরও উত্তেজিত হইল; তখন সাধারণ শক্তি বিষয়ে যেরূপ আঘাতের প্রত্যাঘাত হইয়া থাকে, এখানেও সেইরূপ ঐ দুর্ব্বাক্যাবলীর আঘাত দ্বারা তোমার সমস্তটা 'আমি'ই অত্যন্ত বিজৃম্ভিত হইয়া উঠিল, যেখান হইতে—যে ব্যক্তি হইতে—তোমার মধ্যে ঐরূপ আঘাত আসিতেছিল, সেই থান পর্য্যন্ত তোমার উজ্জৃম্ভিত 'আমির' ঢেউ লাগিতে প্রবৃত্ত হইল, অর্থাৎ যে লোকটা তোমাকে তিরস্কাররূপ আঘাত করিতেছে, তোমার সর্ব্বশক্তিময় সম্পূর্ণ 'আমি'ই সেই লোকটাকে পরিভবকরার নিমিত্ত চলিল,—ললাট ফলক দ্বারা চলিল, চক্ষুর দ্বারা চলিল, মুখদ্বারা চলিল, হস্তদ্বারা চলিল, সর্ব্বশরীর উলট্ পালট্ করিয়া চলিল। মুখের দ্বারা এমনধারা নানা প্রকার দুরুক্তি বর্ষণ হইতে লাগিল,—যে দুরুক্তি দ্বারা আপনাকে ভাল বলিয়া বুঝা যায়, এবং বিরুদ্ধবাদীকেই নিতান্ত নিকৃষ্ট বলিয়া বুঝায়, কেননা তাহা হইলেই তোমার আপনার সেই পূর্ব্বমত ফাঁপাভাবটি ঠিক হয় এবংবিরুদ্ধবাদীও প্রত্যাঘাত প্রাপ্ত হয়, হস্তের দ্বারা যে শক্তি প্রবাহিত হইতে লাগিল, সেই শক্তি হয়ত তাহার পৃষ্ঠদেশেই গিয়া সংযুক্ত হইয়া তাহাকে পূর্ণমাত্রায় প্রত্যাঘাত প্রদান পূর্ব্বক আপনার পূর্ণ অস্তিত্ব বজায় রাখিল; অর্থাৎ জলপূর্ণ পুষ্করিণীর মধ্যে একটা লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে

যেরূপ জলটা একবার বিক্ষোভিত ও উলট্‌পালট্‌ হইয়া কিছু কালপর আবার নিজের অবস্থায় সমান ভাবে অবস্থিতি করে সেইরূপ তোমার 'আমির' একটু বিক্ষোভ হইয়া আবার সেই পূর্ব্বকার মত শমতা প্রাপ্ত হইল। এইত ক্রোধ এবং তৎফলানুষ্ঠান হইয়া গেল। এখন দেখিলে, যে ক্রোধ আমাদের 'আমি' হইতে পৃথক্ কোন একটা গুণ বা শক্তি নহে, ভিত্তির রঙ্গের মত আমাদের 'আমির' গাত্রে কোন একটা গুণ বা শক্তি উৎপন্ন হয় না কিন্তু আমাদের 'আমির'ই একটা সর্ব্বাঙ্গীন পরিবর্ত্তন অবস্থা বিশেষ মাত্র; সুতরাং ক্রোধের অনুভব করা আর আমাদের 'আমির' অনুভব করা ইহা একই কথা হইল। এবং ক্রোধ যখন নূতন করিয়া কোন একটা গুণ 'আমাতে' জন্মিল না, তখন ক্রোধের অনুভূতিও নূতন করিয়া জন্মিল না, পূর্ব্বে যে তোমার চিরন্তন 'আমির' উপলব্ধি ছিল, তাহাই এখন জাগিয়া উঠিয়া তোমার গ্রাহ্য হইল মাত্র। এখন ঈর্ষ্যাদির কথা শুন।

জ্ঞানস্বরূপ-নির্ণয়ের অন্তর্গত ঈর্ষ্যাদির স্বরূপ নির্ণয়।

ঈর্ষ্যা ও অসূয়া বিষয়েও এই ক্রোধের ন্যায়ই যোজনা করিতে পার। পরকর্ত্তৃক তিরস্কার অপমান বা কোন প্রকার অপকার আসিয়া আমাদের পূর্ব্বোক্ত অবস্থাপন্ন 'আমির' মধ্যে, একটা আঘাত করিলে 'আমির' মধ্যে যে একটা উলট্‌ পালট্‌ ভাব হয় তাহার নাম 'ক্রোধ' (যাহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যা হইয়াছে) আর নিজ অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠতম কাহাকেও দেখিলে যে 'আমির' মধ্যে একরূপ বিক্ষোভ হয় তাহার এক অবস্থায় নাম 'ঈর্ষ্যা' আর এক অবস্থার নাম 'অসূয়া'। কিন্তু আন্তরিক পরিবর্ত্তন এই তিন অবস্থার সময়ই এক প্রণালীর হইয়া থাকে। ঈর্ষ্যা অসূয়া কালেও, বাস্তবিক তোমার ধন-সম্পত্তিবিদ্যাবুদ্ধি থাকুক, আর নাই থাকুক, তোমার যদি ধারণা থাকে যে তুমি একজন ভাল মানুষ, এবং পূর্ব্বের মত তোমার 'আমি' কাঁপিয়া, আপন শক্তি মাত্রার উচ্ছ্বাসের দ্বারা সর্ব্বশরীরটি আপুরিত করিয়া রাখে তাহা হইলেই তোমা হইতে বড় কোন ব্যক্তিকে দেখিলে নিজের

ক্ষুদ্রত্ব ভাব উপস্থিত হয়, তোমার 'আমির' সঙ্কোচ হয়—জড় সড় ভাব-হয়, কৃপণতা ভাব হয়। ইহাকেই তোমার 'আমির' মধ্যে এক প্রকার আঘাত হইল বলাযায়, এই আঘাতের প্রত্যাঘাত সাধনের নিমিত্ত অর্থাৎ তোমার 'আমি' অপেক্ষায় ঐ ব্যক্তিকে ক্ষুদ্র করিয়া নিজে পুনর্ব্বার পূর্ব্বাবস্থাতে (সেই বিক্ষুব্ধও ফাঁপা ভাবে) থাকিবার নিমিত্ত সমস্তটা 'আমি'ই উজ্জৃম্ভিত হয়, পূর্ব্বাপেক্ষায় ও বর্দ্ধিষ্ঠ হয়। (এখনই 'ঈর্ষ্যা' হইল বলাযায়) তৎপর, যদি পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যাঘাত সাধন করিতে পারিল,—তবেই ত পুনর্ব্বার পূর্ব্বাকার প্রাপ্ত হইল, নতুবা একএকবার উজ্জৃম্ভিত হইয়া উঠিয়া আবার সেই সঙ্কোচিত অবস্থায়ই থাকিবে। অতএব দেখ, ঈর্ষ্যা, অসূয়াও আত্মা হইতে পৃথক্,—আত্মার গাত্র-সংলগ্ন কোন প্রকার গুণ বা শক্তি নহে, জীবাত্মারই সমস্ত অঙ্গের একরূপ বিক্ষোভ বিশেষ মাত্র। সুতরাং ঈর্ষ্যা, অসূয়াদির অনুভব হওয়া আর আমাদের জীবাত্মা বা 'আমির' অনুভব হওয়া ইহা একই কথা। ঈর্ষ্যাদি যখন নূতন কোন গুণবা শক্তি বিশেষ আত্মাতে উৎপন্ন হইল না, তখন তাহার জ্ঞান বা অনুভবও নূতন করিয়া কিছু একটা জন্মিল না; চৈতন্য সংযোগে পূর্ব্বে তুমি যেরূপ প্রকাশিত হইতেছিলে, এখনও সেইরূপই প্রকাশিত হইতেছ, কেবল বিশেষ এই যে, পূর্ব্বে সেই প্রকাশ পাওয়াটা তুমি গ্রাহ্য করিতে না, এখন তোমার পরিবর্ত্তন অবস্থা হওয়ায় সেই প্রকাশ ভাবটা বা অনুভবটাই গ্রাহ্য করিতেছ।

জ্ঞানস্বরূপ-নির্ণয়ের অন্তর্গত আশার স্বরূপ-নির্ণয়।

এখন শোকের বিষয় বুঝ;—শোকের অবস্থাটা জানিতে হইলে, প্রথমে আশা বস্তটাকি তাহা জানা আবশ্যক, নচেৎ শোকটি কিরূপ ঘটনা, তাহা বুঝা বড় দুষ্কর। অতএব আশাটি কি জিনিষ তাহা শুন;—

সংসারেতে, আমাদের অনেক বিষয়েরই অভাব আছে, এবং সেই সকল অভাব যে আমাদের অবিদিত বা অচিন্তিত তাহাও নহে,—সেই অভাব গুলি জানিয়াই আমরা তাহার দূরীকরণের নিমিত্ত সর্ব্বদা ব্যগ্র হইয়া চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু যদি কখনও মনে হয় যে, "আমাদের

এ সকল অভাব পরিমোচন হইবার নহে, ইহা চিরদিনই থাকিবে,—আমার এইরূপ ঘোরদরিদ্রতা চিরদিনই থাকিবে, এক্ষণে যে চাকুরি করিতেছি, ইহা হইতে অবসৃত হইব, আর কুত্রাপি আমার চাকরি মিলিবে না, গৃহে টাকা নাই, এবং দীন-হীন-দরিদ্রকে কেহ ধারও দিবে না,—সুতরাং ব্যবসায়-বাণিজ্যদ্বারা বাঁচিবার ও সম্ভব নাই, ভূমি সম্পত্তিও নাই যে তদ্দ্বারা কোন উপকার হইবে, যে কএক বিঘা ব্রহ্মোত্তরাদি জমী আছে, তাহাও নিশ্চয়ই অনাবৃষ্টিতে দগ্ধ হইয়া যাইবে, বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে ও কেহ ধনীলোক নাই, যে তাঁহারা কেহ আমার সাহায্য করিবেন, গৃহে দুখানি আভরণ নাই, কিম্বা ন্যাল দুখানি গৃহ নাই যে তদ্দ্বারা কিছুদিন চলিতে পারে, সুতরাং ভবিষ্যতে আর আমার জীবিকার কোন উপায় নাই, বাঁচিবারই সম্ভাবনা নাই" এইরূপ ধারণা হইলে অন্তরে অন্তরে কিরূপ অবস্থা হয় তাহা বুঝ কি ? ।

শিষ্য।—আচ্ছা, এইরূপ ভাবটা একবার নিজের মনে আনীয়া একটু চিন্তাকরিয়া বলিতেছি।

আচার্য্য। ইহাই ভাল কথা, আধ্যাত্মিক ভাব সকল নিজের অন্তরে বিকসিত করিয়া না লইলে, কেবল বাহিরেব শুষ্কতর্কে কিছুই বুঝা যায় না, তাহাতে কেবল নিষ্কাশিতরস-ইক্ষুর কাষ্ঠ (ছোবড়া) 'চর্ব্বণ-মাত্র করা হয়।

শিষ্য।—চিন্তা করিয়া দেখিলাম, ঐ অবস্থাটা অতিভয়ঙ্কর অবস্থা, উহা ভাবিতে গেলে, অন্তরটা যেন শূন্য হইয়া পড়ে,—যেন নিতান্ত নিরালম্বন হইয়া পড়ে, আমার আমিত্ব যেন অতীবসঙ্কোচিত হইয়া জড় সড় হয়,—যেন গুটিয়াআইসে, হৃদয় ফাঁক্‌ফাঁক্ বোধ হয়, হস্ত-পদাদির মধ্যে ঝিন্‌ঝিন্—ঝিন্‌ঝিন্ করিয়া হস্ত-পদাদি অবসন্ন হইয়া আইসে, হৃদয় আকুঞ্চিত হয়, হস্ত-পদাদি যেন আর উত্তোলন করা যায় না, এইরূপ সকল অবস্থা উপস্থিত হয়।

আচার্য্য।—ঠিক বলিয়াছ,—যথার্থই ঐরূপ ঘটনা উপস্থিত হয় বটে।-কিন্তু যখন এইরূপ অবস্থা হয় যে, তুমি যেদিক্ তাকাও সেই দিকেই পরিপূর্ণতা সন্দর্শন কর, তখন ঠিক উহার বিপরীত ঘটনা হইয়া থাকে ;—তুমি যখন মনে কর,

"যে ক্রমে আমার ৫০৲ টাকার পর একশত, একশতের পর দুইশত, তাহার পর পাঁচশত, তাহার পর হাজার টাকা বেতন বৃদ্ধি হইবে, অতি উৎকৃষ্ট একটি বিল্ডিং, বাগানখানা ও বাগান বাড়ী হইবে, জমীদারী তালুকদারী হইবে, ক্ষেত্রে প্রচুর ধান্যাদি উৎপন্ন হইবে, এই যে একটি বাগান প্রস্তুত করিতেছি, ইহার এই সকল নানা জাতীয় তরু, লতা, ও গুল্মাদিতে অগণ্য ফল, ফুল, মূলাদি সমুৎপন্ন হইবে ইত্যাদি" এইরূপ ধারণা হইলে এখন আর তোমার 'আমির' সঙ্কোচ ভাব থাকে না, তোমার 'আমি' যেন উৎফুল্ল হইয়া ফাঁপিয়া উঠে,—'আমি' যেন আর দেহের মধ্যে ধরে না—উদ্বর্ত্তি উঠে, ভাদ্র মাসের জোয়ারকালে যেমন জাহ্নবীর সলিল উৎক্ষোভিত হইয়া ছাপাইয়া উঠে, এবং তৎসংলগ্ন-খাল-নালাদি দ্বারা তীব্রবেগে প্রধাবিত হইতে থাকে, সেইরূপ তোমার সর্ব্ব-শক্তিময় 'আমির' অংশ-স্বরূপ রাজস শক্তিগুলি বিক্ষোভিত হইয়া মস্তিষ্ক, স্নায়ুমণ্ডল এবং আপাদতল-শিরপর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া দেহটিকে অণুতে-অণুতে জড়িত ও আপ্লুত করিয়া রাখে, হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যেন সির্-সির্-সির্-সির্ করিয়া তোমার রাজসশক্তির প্রস্রবণ চলিতে থাকে, এবং দেহটিকে বিলক্ষণ প্রভাশালী করিয়া রাখে।

আমাদের 'আমির' এইরূপ বিজৃম্ভন বা উৎফুল্লতা অবস্থায় পরি-বর্ত্তনের নাম আমাদের 'আশা' ইহারই পূর্ব্বাবস্থার নাম অনুরাগ। অত-এব, এখন বুঝিতে পারিলে যে আশা অনুরাগ প্রভৃতি পদার্থ গুলি আমাদের আত্মার 'আমির' গাত্র-সংলগ্ন কোন গুণ বা শক্তি নহে, অপিতু আমাদের 'আমির' অন্তর-বাহির-সর্ব্বাঙ্গেই একটা বিক্ষোভিত অবস্থা বিশেষ মাত্র। অতএব আশা অনুরাগাদির অনুভব করা, আর আমাদের 'আমির' অনুভব করা ইহা একই কথা। আশা অনুরাগাদি নামে যখন কোন অতিরিক্ত একটা গুণ বা শক্তি বিশেষ নাই, আত্মারই এক প্রকার অবস্থা বিশেষ মাত্র, তখন সেই আশা ও অনুরাগের অনুভবও, আমাদের সেই চিরন্তন আমির অনুভবমাত্র, তবে বিশেষ এই যে পূর্ব্বে তুমি সেই অনু-ভব গ্রাহ্য করিতে পার নাই, এখন আশাবস্থায় তোমার আমির পরিবর্ত্তন অবস্থা হওয়াতে সেই অনুভূতিটাই একটু যেন জাগিয়া উঠিয়া গ্রাহ্য হইল

মাত্র। কারণ যখন আশাবস্থার বিকাশ হয়, তখন অন্তরে ইহা বেশ বুঝা যায় যে আমার এইরূপ অবস্থা বিশেষ হইয়াছে। এখন ভাবিয়া দেখ, এক-জনের যদি দুটি পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলেও তাহার ঐরূপ আশা হইয়া থাকে, সে মনে করে, এই পুত্র উপযুক্ত ও লব্ধ-বয়স্ক হইলে আমার বার্দ্ধক্যের অবলম্বন হইবে, এ আমার সমস্ত অভাব বিমোচন করিবে, আমার মান-সম্ভ্রমের উন্নতি করিবে" ইত্যাদি চিন্তা করিয়া তাহার 'আমির' উৎফুল্লতা ও বিক্ষোভাদি হইয়া পূর্ব্বোক্ত মতে তাহার সমস্ত শরীরটিকে আপ্লুত ও প্রভাশালী করিয়া রাখে।

জ্ঞানস্বরূপনির্ণয়ের অন্তর্গত শোকের অবস্থানির্ণয়।

পরে যখন হঠাৎ ঐ সকল ধনসম্পৎ চাকরি প্রভৃতি, অথবা ঐ পুত্রের অভাব হয়, তখন শিরে বজ্রপাত হয়, তখন আশাবন্ধন ছিন্ন হইল, 'আমি'-নদীতে ভাটা পড়িল, সেই উৎফুল্লতা, সেই বিক্ষোভ বিলুপ্ত হইল, 'আমি' সঙ্কোচিত হইয়া পড়িল, 'আমির' অংশ স্বরূপ শক্তিগুলি কুণ্ঠিত, ও আকুঞ্চিত হইয়া শরীরের অভ্যন্তরপ্রদেশে গুটিয়া জড়সড় হইল, আত্মার শক্তি-গুলি আকুঞ্চিত হইলে, কাহার সাধ্য যে আর ফুস্‌ফুস হৃৎপিণ্ড ও হস্ত পদাদি কার্য্য করাইবে? সুতরাং পরিচালকাভাবে তাহারা যেন নিস্তব্ধ হইয়া আসিল;—হৃৎপিণ্ড আর কার্য্য করিতে চায় না, ফুস্‌ফুস আর চলিতে চায় না, মস্তিষ্ক পরিচালিত হয় না, হস্তাদি ও আর সরে না, সমস্ত শরীর উল্লাসশূন্য এবং যেন সঙ্কীর্ণ বা সঙ্কোচিত হইয়া পড়িল, তাপের হ্রাসে যেমন পঙ্কজকলিকা গুটিয়া যায়, চুপ্‌সিয়া যায়, আত্মার হ্রাসাবস্থায়ও তেমন সমস্ত যন্ত্রগুলি গুটিয়া গেল।

কিন্তু এইরূপ তীব্রতর আঘাত পাইলেও আমাদের আত্মা—'আমি'—সঙ্কোচিত হইয়া থাকার বস্তু নহে, সাধারণ শক্তি যেরূপ বাধা পাইলেই আবার সেইআধার বাধা প্রদান পূর্ব্বক বিজৃম্ভিত হয়, সেইরূপ শক্তিময় আত্মা ও—আপন পরিচালনের বাধা অতিক্রম করার নিমিত্ত এক একবার অত্যন্ত বেগের সহিত বিক্ষোভিত হইয়া উঠে, এবং পূর্ণ মাত্রায় আপন শক্তি-বিস্তার দ্বারা দেহের উপর আধিপত্য করিতে চাহে, হৃৎপিণ্ডের উপর

একএকবার পূর্ণবেগ অর্পণ করে, সুতরাং রক্তের বেগ প্রবল হইয়া উঠে, ফুস্‌ফুসে পূর্ণবেগে শক্তি নিয়োজিত করে, ফুস্‌ফুস্ থাকিয়া থাকিয়া পূর্ণবেগে আকুঞ্চিত প্রসারিত হইতে থাকে, সুতরাং হৃদয়োচ্ছ্বাসক এক একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস হইতে থাকে, সেই নিরুদ্যম বাগ্‌যন্ত্রের উপর প্রাণপনে শক্তি প্রয়োগ করে, সুতরাং বাগ্‌যন্ত্রেও মুখের অস্বাভাবিক ব্যাদান ও বিকটভাব করিয়া মুখ-কুহরদ্বারা বায়ু নিঃসারণ করিতে থাকে, তদ্দ্বারা—"বাবা রে! আমার রাম রে! আমার প্রাণ রে!" ইত্যাদি বর্ণ সমষ্টিময় এক একটা উচ্চ চিৎকারধ্বনি হইতে থাকে; নিস্তেজ, ও সঙ্কোচিত চক্ষুদ্বয়ের দ্বারা প্রবল বেগে আত্মার শক্তির স্রোত চলে, তাই চক্ষু-কলিকার পার্শ্ব-সকলের আকুঞ্চন, বিস্ফারণ, এবং প্রেরণাদ্বারা চক্ষু কলিকার চতুর্দ্দিকস্থিত জলবৎ পদার্থ নিস্পন্দিত (অশ্রুপাত) হইতে থাকে, নিরুদ্যম ও সঙ্কোচিত হস্ত-পদাদি প্রত্যেক অবয়বের উপর অত্যন্ত বেগে আত্মার—'আমির'—শক্তিস্রোত বহিতে থাকে, তাই হস্ত, পদাদি আছড়া আছড়ী, এবং মৃত্তিকায় গড়াগড়ি হইতে থাকে, মাথা মুড় খুঁড়িতে থাকে। এই হইল শোকের অবস্থা।

অতএব, এখন জানা গেল যে শোক আত্মা হইতে—'আমি হইতে'—পৃথক্ বিভিন্নমত, অথচ ভিত্তির উপরে শাদা কাল রঙ্গেরমত, আত্মাতে সংলগ্ন কোন একটা গুণ বা শক্তি নহে, উহা আত্মারই—'আমির'ই—একটা সঙ্কোচ-বিকাশাদিরূপ সর্ব্বাঙ্গীন পরিবর্ত্তন অবস্থা মাত্র। সুতরাং শোকের অনুভব হওয়া আর আত্মার—'আমির'—অনুভব হওয়া একই কথা হইল। এবং শোক যখন একটা অতিরিক্ত কোন গুণ বা শক্তি বিশেষ নূতন করিয়া কিছু জন্মিল না আত্মারই অবস্থান্তরে পরিস্ফুরণ মাত্র, তখন শোকের অনুভব বা জ্ঞান নামেও নূতন কোন কিছু একটা জন্মিল না; শোকাবস্থার পূর্ব্বাবস্থায়ও যে তোমার সেই চিরন্তন 'আমির' অনুভূতি বা জ্ঞান ছিল, তাহাই যেন একটু জাগিয়া উঠিল মাত্র। শোকাবস্থায় তোমার আত্মার অবস্থা পরিবর্ত্তন হইল, সুতরাং সেই পূর্ব্বকার 'আমি' অনুভবটাই তুমি এখন বিশেষরূপে গ্রাহ্য করিলে মাত্র। এই শোকের অবস্থাতে অবশ্যই তুমি অন্তরে অন্তরে বুঝিতে পার যে,

'এখন আমার এইরূপ আন্তরিক অবস্থা হইয়াছে'· ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

জ্ঞান স্বরূপ নির্ণয়ের অন্তর্গত দুঃখের স্বরূপ নির্ণয়।

এখন দুঃখ ও সুখ কি তাহা শুন,— দুঃখ নামেও কোন একটা গুণ বা শক্তি আসিয়া আমাদের আত্মার মধ্যে উৎপন্ন হয় না। আমাদের আত্মার 'আমির'—যে যে শক্তি যখন যেভাবে প্রবাহিত হইয়া চলিতে থাকে,—তাহার মধ্য পথে যদি একটা বাধা পায়,—একটা ঠেকা পায়, তাহা হইলে সেই বাধাটা অতিক্রমের জন্য, আত্মার সেই. সেই শক্তিটি বিলক্ষণ চেষ্টা করে। সেইরূপ বাধিত ও উত্তেজিত-ভাবাপন্ন যে আত্মার—'আমির'—অবস্থা বিশেষ, তাহারই নাম 'দুঃখ,' এতদ্ভিন্ন অতিরিক্ত কিছুই না। দুঃখ অবস্থাটা বিশেষরূপ বুঝিবার পূর্ব্বে প্রথম আমাদের "স্বভাবাবস্থার" একটা অংশ বুঝিতে হইবে, নচেৎ দুঃখাবস্থাটা পরিস্ফুট হইবে না, অতএব প্রথম তাহাই বুঝিয়া লও,—

স্বভাবাবস্থায় হস্তপদাদির অগ্রদেশ পর্য্যন্ত তোমার আত্মার—'আমির'—অংশস্বরূপ পরিচালন, এবং পোষণ ও জ্ঞানশক্তি সকল অসংখ্য স্নায়ুসমূহের দ্বারা সর্ব্বদা প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে; সেই শক্তিই তোমার হস্তপদাদির পরিচালন এবং পোষণ ও অনুভূতির কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। কেবল ইহাতেই বোধ হয় কথাটা সুস্পষ্ট হইল না, সুতরাং ইহার আর একটু বিস্তার করা আবশ্যক তবেই অবাধে বুঝিতে পারিবে। তোমার হৃৎপিণ্ড হইতে (১৪৬।২০) যে রক্তবহা ধমনী বাহির হইয়াছে (১৪৬।২০) তাহার কতকগুলি শাখাধমনী, ক্রমে সরু হইয়া তোমার হস্তপদাদির অঙ্গুলীর অগ্রদেশ পর্য্যন্ত গিয়াছে, ঐ সকল ধমনী সমূহের মধ্যদিয়া হৃৎপিণ্ড হইতে রুধিরের স্রোত যাইতেছে, যাহা চিকিৎসকদের "হাতদেখার" স্থানে একটি অঙ্গুলী দ্বারা টিপিয়া ধরিলে বাহির হইতেও বিলক্ষণ অনুভব করিতে পার।

এইরক্ত কেবল হৃৎপিণ্ডের প্রেরণাদ্বারাই (১৪৬।২৭) তোমার করাঙ্গ পদতলাদি পর্য্যন্ত যাইতেছে কিম্বা আরও কোন প্রকার প্রেরণা আছে, আর

কি উদ্দেশেই বা এই রক্ত স্রোত করাগ্র পদতলাদি প্রদেশ পর্য্যন্ত যাইতেছে, তাহা দেখা চাই ; ফলতঃ হস্তাবয়ব সকলের পুষ্টি রক্ষণনিমিত্তই রুধিরের ঈদৃশী গতি হয় এবং হৃৎপিণ্ডের প্রেরণ ব্যতীত হস্তাদির পেষী সকলও ঐ হস্তাদির ধমনীর উপর এক একটু চাপ দিতেছে তদ্বারাও ধমনী পুরিত রুধির সকল করাগ্র-পদাগ্রাভিমুখে যেন ফস্‌কিয়া যাইতেছে।

এই কার্য্য কোন্ শক্তির দ্বারা হইতেছে?—আত্মরশক্তির দ্বারা,—আত্মার—'আমির'—পোষণশক্তির (১।১৬।২৭) অন্তর্গত "ব্যান" নামক শক্তি দ্বারা (৮০।২১)। আত্মার 'ব্যাননামক' শক্তি মস্তিষ্কবাসী আত্মা হইতে ছুটিয়া করপদাদি পর্য্যন্ত বিসর্পিত হইতেছে,—প্রত্যেক মাংসপেষীপ্রভৃতির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত স্নায়ুসমূহের দ্বারা প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। সেই ব্যানশক্তি দ্বারা নিযুক্ত বা প্রেরিত হইয়া অস্থি, মজ্জা, স্নায়ু, ধমনী, শিরা ও মাংসপেষী সকল ঐ অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম-ধমনীস্থ-রক্তাণু সকল চুষিয়া লইয়া আপনার, অঙ্গ পুষ্টি দ্বারা নিজ নিজ অস্তিত্ব রক্ষণ করিতেছে, এবং রক্তের মধ্যগত দূষিত-বিষাংশটা পরিত্যাগ করিতেছে, পরিচালনশক্তিও এইরূপ ঐ সকল স্নায়ু সমূহের দ্বারা বিসর্পিত হইয়া বাহু মূলাদিঅবধি করতল-পদতলাদি পর্য্যন্ত হস্তাদির মাংসপেষী গুলির সাহায্যে হস্তাদির পরিচালন কার্য্য ও গ্রহণাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। জ্ঞানশক্তিও ঐরূপ প্রসারিত হইয়া স্পর্শাদির অনুভূতি সাধন করিতেছে।

মনে কর, তোমার হস্তে একটি ব্রণ হইয়াছে, এখন অবশ্যই তুমি দুঃখ পাইতেছ ; অতএব এখনকার অবস্থাটি বুঝিলেই দুঃখজিনিষটা কি তাহা বেশ বুঝিতে পারিবে। ব্রণের অবস্থায় আমার হস্তের সেই ব্রণের স্থানে কএকটি শিরার মধ্যে কতকটা দুষিত রক্ত (বিশাক্ত রক্ত) জমিল, বিষাক্ত রক্ত জমা মাত্রেই সেইখানকার স্নায়ু, ধমনী,ও মাংসাদি বিকৃত হইয়া গেল, সেইখানকার রক্তের গতি একরূপ অবরুদ্ধ হইল। সুতরাং আত্মার পোষণ শক্তিও গিয়া সেইখানেই ঠেকিল এবং পরিচালন ও জ্ঞান শক্তি ও গিয়া অবরুদ্ধ হইতেছে, কেন না ওখানকার স্নায়ুগুলি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আত্মার শক্তি আপনার গমনের পথ হইতে ঐ বাধাদায়ক কুরক্তটা তাড়াইয়া দিয়া আপন কার্য্যকরার নিমিত্ত বিলক্ষণ জোর করিতেছে, এদিকে কুরক্তাশ্রিত

বিবও [আত্মারশক্তিকে বাধা দেওয়ার নিমিত্ত বিলক্ষণ জোর করিতেছে। আত্মার শক্তি এইরূপ বাধাগ্রস্ত হইলে সেই বাধাগ্রস্ত-শক্তিকেই 'দুঃখ' বলা যায় এবং আপনাকে যে এইরূপ বাধাগ্রস্ত ভাবে অনুভব করা, তাহারই নাম দুঃখানুভব করা। ইহাই গুরুদেব গৌতমমহর্ষি আপন ন্যায় দর্শনে বলিয়াছেন ;—বাধনালক্ষণং দুঃখমিতি" (১অ ১আ ২১সূ)

শরীরের অন্য কোন অবয়ব ব্রণাদি কিম্বা জ্বরাদি হইলেও দুঃখতত্ত্ব অন্বেষণ করিয়া এইরূপই বুঝিবে। অতএব ইহা নিশ্চয় হইল যে দুঃখ আত্মাতে সংলগ্ন কোন একটা গুণ বা শক্তি বিশেষ নহে, ইহা আত্মারই—'আমিরই'—বাধা প্রাপ্ত-অবস্থা মাত্র। সুতরাং দুঃখের অনুভব করা আর আত্মার 'আমির' অনুভব করা ইহা একই কথা, এবং দুঃখ নামে যখন অতিরিক্ত কোন একটা পদার্থ আসিয়া আত্মাতে জন্মিল না কেবল অবস্থার একটু পরিবর্ত্তন মাত্র, তখন দুঃখানুভব বা দুঃখজ্ঞান ও নূতন কোন একটা কিছু আত্মাতে জন্মে না, দুঃখের পূর্ব্বাবস্থায় যে সেই আজন্ম অভ্যস্ত আমাদের 'আমির' অনুভূতি বা জ্ঞান ছিল যাহা জন্মাবধি অভ্যস্ত বলিয়াই গ্রাহ্য করিতে পারি নাই কিন্তু এইক্ষণে দুঃখাবস্থায় আত্মার অবস্থা পরিবর্ত্তন নিবন্ধন সেই পুরাণ অনুভূতিটাই গ্রাহ্য করিলাম মাত্র। এখন সুখের কথা শুন--

জ্ঞানস্বরূপ নির্ণয়ের অন্তর্গত সুখেরস্বরূপ নির্ণয়।

সুখও কোন অতিরিক্ত পদার্থ নহে, আত্মার শক্তিগুলি শরীরের যেখানে যে ভাবে গিয়া কার্য্য করিতেছে, সেইখানে সেই ভাবে গিয়া অবিরোধে—অনর্গলভাবে কার্য্য করিতে পারিলেই আত্মার সেই অনর্গল ভাবাপন্ন—অবিরোধভাবাপন্ন—অবস্থাকেই সুখ বলে, এবং তাহার অনুভবই সুখানুভব। অর্থাৎ আমাদের হস্তীয়-স্নায়ু-সমূহের দ্বারা, পাদীয়-স্নায়ু-সমূহের দ্বারা, এবং কর্ণীয়-স্নায়ু, চাক্ষুষ-স্নায়ুপ্রভৃতি স্নায়ু মণ্ডলের দ্বারা আত্মার যখন যে শক্তির স্রোত উপস্থিত হয়, সেই শক্তি-স্রোতটার মধ্যে কোন বাধা না পাইয়া, বরাবর চলিয়া যাইতে পারিলে—সেইভাবাপন্ন আত্মার শক্তিকেই সুখ বলা হয়—। এজন্যই দার্শনিকগণ বলিয়াছেন, "প্রতিকূল বেদনীয়ং সুখম্" ( ) । ইহার কএকটা উদাহরণ বুঝিয়া লও,—

মনে কর, তুমি এখন যে বেতনে চাকরি করিতেছ, হঠাৎ তাহা হইতে আর কতকগুলি টাকা বেতন বৃদ্ধি হইল, কিম্বা হঠাৎ একটা পদোন্নতি হইল, অথবা হঠাৎ কতকগুলি অর্থ লাভ করিলে, কিম্বা তোমার নিঃসন্তান অবস্থায় একটী পুত্র উৎপন্ন হইল, এখন অবশ্যই তোমার সুখানুভব হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এখন তোমার অভ্যন্তরে কিরূপ ঘটনা হইবে?—তোমার আত্মার মধ্যে বস্ত্রের রঙ্গ করার ন্যায় নূতন কোন একটা গুণ সমুৎপন্ন হইবে কি? না তাহা কদাচ নহে, কিন্তু তোমার আত্মারই—'আমির'—ই একটু—অবস্থা পরিবর্ত্তন হইল, ইহা বুঝিতে হইবে;—এতদিন তুমি যে বেতনে চাকরী করিতেছিলে, অথবা যে পদে নিযুক্ত ছিলে, কিম্বা যে পরিমাণে তোমার ধনসম্পদ্ ছিল তদ্দ্বারা, কিম্বা তোমার অপুত্রতাদি অবস্থাতে, তোমার আত্মাতে অনেকগুলি অভাব বোধ ছিল; ইতঃ পূর্ব্বে যেরূপ দ্রব্য সকল আহারাদি করিতে তদপেক্ষায় ও সুস্বাদু চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, নানাবিধ-বস্তু সকল ভোজন করিবে বলিয়া, আতর গোলাপাদি নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্যের কমনীয় ঘ্রাণ লইবে বলিয়া, আপন অট্টালিকায় নয়নযুগলের সুশীতলতা কারক বিবিধ রচনা পরিপাটী-সম্বলিত বিচিত্র-শ্বেত, পীত, হরিতাদিবর্ণ মালা নয়নসাৎ করিবে বলিয়া, পর্য্যঙ্ক-পরিশোভিত-দুগ্ধ-ফেণ সদৃশ সুকোমলশয্যার সুকোমল স্পর্শানুভব করিবে বলিয়া, এবং শ্রুতিমধুর নানা প্রকার গীত বাদ্যাদি শ্রবণ করিবে বলিয়া, তোমার মস্তিষ্কবাসী আত্মা উৎফুল্ল ও বিক্ষোভিত হইয়া, প্রদীপের অংশস্বরূপ-অলোকশক্তির ন্যায়, আপন অংশ বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-স্বরূপ-শক্তিসমূহকে, চতুর্দ্দিক্‌বিসর্পিতস্নায়ু-মণ্ডলদ্বারা রসনাভিমুখে, নাসিকাভিমুখে, নয়নাভিমুখে, শ্রবণাভিমুখে এবং সর্ব্বশরীর-পরিব্যাপ্ত চর্ম্মাভিমুখে প্রেরণ করিয়া যেন সমস্ত শরীরটাকে ওতপ্রোত-ভাবে আক্রমণপূর্ব্বক পরিব্যাপ্ত ছিল।

কিন্তু হইলে কি হইবে, আমাদের 'আত্মার' শক্তিছটা, শরীরের সমস্তটা অবয়বে এত প্রসারিত ও বিকীর্ণ হইয়া থাকিলেও তাহা যথোচিত বিকসিত হইতে পারে নাই, আলম্বন-প্রাপ্তির অভাবে যেন সঙ্কোচিত হইয়াছিল; মালতী, যুতী-প্রভৃতি লতাবলি যেমন কাণ্ড হইতে

শত শত শাখায় সহস্রমুখী হইয়া প্রসারিত ও ইতস্ততো বিকীর্ণ হইয়াও প্রসারণ হওয়ার উপযুক্ত আলম্বনাভাবে (মাচা অভাবে—জাঙ্গলার অভাবে) ক্ষীণ-বীর্য্য, ক্ষীণ-প্রভ, জড়ীভূত, ও কুঞ্চিত-হইয়া থাকে—গুটিয়া জড়সড় হইতে থাকে,—সেইরূপ তোমার আত্মার শক্তিগুলিও উপযুক্ত আলম্বনের অভাবে ক্ষীণবীর্য্য, ক্ষীণপ্রভ, জড়ীভূত, ও কুঞ্চিত হইয়াছিল।

অভিমত-ধনাদির অভাবে সমস্ত-শক্তিরই আলম্বনের অভাব হইয়া থাকে, যাহার (টাকার) বিনিময়ে সংসারের সমস্ত দ্রব্যই সঙ্গৃহীত হয়, তাহার অভাবে আর কিসের দ্বারা অভিলষিত দ্রব্য-সংগ্রহ হইবে? অর্থাদির অভাবে অভিলষিত চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়াদি নানাবিধ সুস্বাদু দ্রব্যের প্রাপ্তি হইতেছিল না, সুতরাং রসনা প্রসারিত শক্তির আলম্বন ঘটিল না, আত্মার রসনাগত শক্তি যেন সেইখানেই জড়ীভূত ও কুঞ্চিত হইয়াছিল; আতর, গোলাপাদি সুগন্ধিদ্রব্য পাও নাই, নাসিকা পর্য্যন্ত বিসর্পিত-শক্তির আলম্বন ঘটে নাই, সুতরাং সেই শক্তি সেইখানেই জড়ীভূত, ও কুঞ্চিত হইয়াছিল, অট্টালিকা করিতে পার নাই, তাহার নানাপ্রকার অপূর্ব্ব চিত্র বিচিত্রতায় রঞ্জিত করা হয় নাই, নয়নাবলম্বিত শক্তি আলম্বন পাইল না, সুতরাং সেই শক্তি সেইখানেই জড়ীভূত ও কুঞ্চিত হইয়াছিল; পর্য্যঙ্কাদি-পরিশোভিত সুখজনক শয্যাদির সংগ্রহ না হওয়ায় সেই সুখানুভবের নিমিত্ত সর্ব্বদেহের চর্ম্ম-প্রদেশপর্য্যন্ত বিসর্পিণীআত্মার শক্তি, অভিলষিতআলম্বনের অভাবে সমস্ত দেহের চর্ম্ম পর্য্যন্ত আসিয়া সেইখানেই আকুঞ্চিত হইয়া চুপ্সিয়াছিল; নানাবিধ সুমধুর সঙ্গীত ধ্বনি শ্রবণ করিবে বলিয়া যে শ্রবণ শক্তি কর্ণকুহর পর্য্যন্ত বিসর্পিত হইয়াছিল, অর্থাভাবাদি প্রযুক্ত তাহা না পাওয়াতে, কর্ণান্ত-বিসর্পিণী আত্মার শক্তি সেইখানেই নিতান্ত মলিন ও আকুঞ্চিতাবস্থায় ছিল। এইরূপে অর্থাদির অভাবে উপযুক্ত মতে অভিলষিত আলম্বন না পাওয়ায় তোমার সর্ব্বদেহ ব্যাপিকা রাজসী শক্তি উক্ত প্রকারে আকুঞ্চিত ও জড়ীভূত হইয়াছিল, কোনটিই সর্ব্বথা পরিস্ফুটিত বা পরিপুষ্ট হইতে পারে নাই, উপযুক্ত আলম্বনের অভাবে তাহাদের প্রসারণের দ্বারগুলি যেন আবৃতপ্রায় ছিল।

শিষ্য।—আমাদের শক্তিগুলি যে নানাবিধ বিষয় ভোগের নিমিত্ত ঐরূপ প্রসারিত ভাবে অগ্রসর হইয়া থাকে তাহার প্রমাণ কি? আর

সেই বিষয়গুলি না পাইলেই যে ঐ শক্তিগুলি চুপ্সিয়া কুঞ্চিত হইয়া থাকে, তাহারই বা প্রমাণ কি?

আচার্য্য।—হস্তের দ্বারা যখন কোন একটী বস্তু গ্রহণ করা হয়, তখন কিম্বা তাহার পূর্ব্বে কি ঘটনা হয়, তাহা স্মরণ আছে কি?

শিষ্য।—আজ্ঞা হাঁ,—তাহা বেশ বলিতে পারি,—হস্তদ্বারা কোন বস্তু গ্রহণ করার পূর্ব্বে ঐ গ্রহণ করার শক্তিটী প্রথম আত্মাতে পরিস্ফুরিত হইয়া 'বুদ্ধি' 'ইচ্ছাদির' অবস্থা ধারণ পূর্ব্বক মস্তিষ্ক হইতে হস্তের স্নায়ুসমূহের দ্বারা প্রবাহিত হইয়া করাঙ্গুলীর অগ্রদেশ পর্য্যন্ত আসিয়া থাকে, তৎপর যখন ঐ গ্রহণীয় বস্তুটি পাওয়া যায়, তখন করাঙ্গুলীসমূহের দ্বারা তাহার সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তখন সেই দ্রব্যটী উত্তোলিত হয়, হস্তের দ্বারা গৃহীত হয়, ইহাই হস্তদ্বারা কোন বস্তু গ্রহণ করার ঘটনা।

আচার্য্য।—হস্তের দ্বারা যেমন স্থূল২ দ্রব্যগুলি গ্রহণ করা হয়, সেইরূপ, আমাদের চক্ষু কর্ণাদির দ্বারাও রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদি এক২টি বিষয় গ্রহণ করা হয়; হস্তের দ্বারা ধরিলে যেরূপ সেই দ্রব্যটা আমাদের আত্মসাৎ হয়, চক্ষুকর্ণাদির দ্বারাও সেইরূপ এক২টি রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শাদি বিষয়কে আত্মসাৎ করা হয়। অতএব হস্তদ্বারা কোন দ্রব্য গ্রহণ-কালেও আমাদের শক্তির মধ্যে যেরূপ ঘটনা হইবে, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদি বিষয়গুলি আত্মসাৎ করা কালেও ঠিক সেই ঘটনাই হইয়া থাকে, ইহা পরেই বিস্তৃত হইবে। অতএব রূপ রসাদি বিষয়গুলি গ্রহণ করার নিমিত্ত আমাদের আত্মারশক্তি যে অগ্রসর হয় তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং সেই গ্রহণীয় পদার্থগুলি না পাইলেই শক্তিগুলি যেন চুপ্সিয়া যায়।

এখন ভাবিয়া দেখ, পূর্ব্বোক্তমত অভাবের অবস্থায় যখন তোমার প্রচুর বেতন বৃদ্ধি বা অন্য কোন প্রকারে প্রচুর অর্থলাভ হইবে তখন সেই সমস্ত গুলি শক্তিই আপনাপন আলম্বন একরূপ পাইল অবশ্যই। ঠিক এই এই মুহূর্ত্তেই তোমার ঐ সকল দ্রব্য,—যাহার অভাবে তোমার আত্মার প্রসারিতশক্তি-গুলি আলম্বন শূন্য হইয়া চুপ্সিয়াছিল, তাহা সমস্তই আসাদিত বা উপস্থিত হইল না বটে; কিন্তু অর্থের দ্বারাই যখন ইচ্ছা মাত্রেই সকল দ্রব্যের সংগ্রহ হইতে পারে, তখন অর্থকেই সমস্ত দ্রব্যের একটি প্রতিনিধি বা একটি সমষ্টি-

স্বরূপ বলিতে হইবে। অতএব তোমার প্রচুরতর অর্থপ্রাপ্তি মাত্রেই আত্মার সমস্ত রাজসিক শক্তিগুলি যেন আপনআপন আলম্বনই প্রাপ্ত হইল, পূর্ব্বাবস্থার সেই প্রসারণদ্বারের কপাট টা যেন খুলিয়া গেল, এখন যেন তোমার আত্মা সমস্ত শক্তি সহকারে একটা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, প্রদীপের শল্‌তাটা বাড়াইয়া দিলে প্রদীপটা যেরূপ বিস্তৃত ও উৎফুল্ল হইয়া উঠে, সেইরূপ বিস্তৃত ও উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; ভাটা অবস্থার পর পূর্ণ জোয়ার অবস্থায় গঙ্গাজল যেমন ঈষৎ বিক্ষোভিত হইয়া খাল, নালা, পয়নালা, প্রভৃতিকে পরিপূর্ণরূপে আপ্লাবিত করিয়া চলে, তোমার আত্মাও যেন সেইরূপ একটু বিক্ষোভিত হইয়া সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলীকে পরিপূর্ণরূপে আপ্লাবিত করিয়া বাহিরের বিষয়াভিমুখে চলিতে লাগিল; তখন প্রসারিত লতাবলি যেন আলম্বন পাইল,—আত্মার সেই আকুঞ্চন ভাব, সেই জড়ীভূত ভাব,—সেই চুপ্সিয়া যাওয়ায় ভাবটা বিনষ্ট হইল, আত্মার সমস্ত শক্তিই রীতিমত প্রফুল্ল ও প্রসারিত হইয়া চক্ষুকর্ণাদি সমস্তদেহাবয়বের প্রতি অণুতে অণুতে বিসর্পিত হইয়া চক্ষু, কর্ণ, কপালাদি সমস্ত অঙ্গ প্রত্যাঙ্গকে উৎফুল্ল করিয়া তুলিল; তখন তোমার আত্মার শক্তিগুলি যে ঐ রূপ বিসর্পিত ও উৎফুল্ল হইয়া চারিদিকে বিচ্ছুরিত হইতেছে, তাহা যেন বাহির হইতেও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এখন তোমার আত্মার শক্তিসমূহ নির্ব্বিঘ্নে, নির্ব্বিরোধে,—অনর্গল ভাবে সমস্ত শরীরে পরিচালিত হইয়া রীতিমত সর্ব্বশরীর পরিব্যাপ্ত করিল। আত্মার—'আমির'—এইরূপ অবস্থাটির নাম 'সুখ'।

অতএব 'সুখ'নামে শাদা কাল বর্ণাদির মত কোন একটা গুণ বা শক্তি বিশেষ বাহির হইতে আসিয়া আত্মাতে সংলগ্ন হয় না, এবং আত্মার মধ্যে ও নূতন একটা কোন গুণ বা শক্তি উৎপন্ন হয় না। তখনকার মত, আত্মার পূর্ব্বাবস্থাটা, পরিবর্ত্তিত হইয়া আর এক প্রকার নূতন অবস্থা হইল বলিয়া "সুখ উৎপন্ন হইল" বলা যায়। সুতরাং সুখনামক কথাটা 'আত্মা' কথা হইতে পৃথক্ কথা হইলেও আত্মা আর সুখের কোন পার্থক্য নাই,—আত্মা জিনিষটাও যাহা সুখও তাহা, আত্মা স্বয়ংই সুখ, আত্মার সর্ব্বাঙ্গীন পরিবর্ত্তন অবস্থা বিশেষই সুখ।

সুখ যখন অতিরিক্ত কোন একটা গুণ বা শক্তি বিশেষ আত্মাতে জন্মিতেছে না, কেবল আত্মার একটা সর্ব্বাঙ্গীন পরিবর্ত্তন অবস্থা বিশেষমাত্র, তখন সুখানুভব আর আত্মার অনুভব ইহাও একই কথা। এবং এই সুখানুভব বা সুখ জ্ঞান নামেও কোন একটা গুণ বা শক্তি নূতন করিয়া আত্মাতে উৎপন্ন হইতেছে না। সুখাবস্থার পূর্ব্বে যে তোমার একটা চিরন্তন 'আমির' অনুভব ছিল বা জ্ঞান ছিল,—যাহা বায়ুরাশির স্পর্শের ন্যায় তোমার জন্মাবধি অভ্যস্ত আছে বলিয়া তুমি গ্রাহ্য করিতে না, এখন সুখাবস্থায় তোমার 'আমির' পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তোমার সেই পূর্ব্বকার আমির অনুভূতিটাই একটু জাগিয়া উঠিল মাত্র। কারণ এই সময় তুমি ইহা বিলক্ষণ অন্তরে অন্তরে বুঝিতেছ যে আমার এইরূপ অবস্থা টা হইয়াছে। সকল প্রকার সুখের অবস্থায়ই এইরূপ যথা যোগ্য যোজনা করিয়া লইয়া বুঝিতে হইবে।

আহারাদিজনিত সুখও কি আত্মারই অবস্থা বিশেষ ?

শিষ্য।—আপনার অদ্ভুত উপদেশের রহস্য কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যাহা বলিলেন ইহা প্রত্যক্ষেরও বিরুদ্ধ বিষয়। কারাণ আমরা স্বয়ংই ইহা অনুভব করিতেছি যে, যখন অপূর্ব্ব মনোহর মধুরঅম্লাদি রসযুক্ত দ্রব্য সকল আমাদের রসনা সংসর্গ করিয়া আত্মাকে সুকোমল স্পর্শ করে—যাহাতে একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় ভাব উপস্থিত হয়,—যাহার নিমিত্ত ত্রিভুবন সর্ব্বদা লালায়িত, যাহার নিমিত্ত মনু প্রভৃতি প্রাচীনগণের বিধি-নিষেধ পদদলিত করিয়া, পিতা মাতাদি অভিভাবকগণের শত শত অনুরোধ ও অনুতাপকে তৃণত্বে গণ্য করিয়া, সমাজের সহস্র পরিপীড়ন মস্তকে লইয়া, সমস্ত ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, এবং জাতিভেদে কুঠারাঘাত করিয়া সহস্র সহস্র লোক এত সমুৎসুক, সেই অমৃতোপম সুখ কি আত্মা হইতে পৃথক্ কোন পদার্থ নহে, কেবল আত্মারই পুরাতন অবস্থায় একটা পরিবর্ত্তনমাত্র? যাহা আমরা অখণ্ডিত-ভাবে একটি উৎপদ্যমান গুণ বলিয়া অনুভব করিয়া থাকি?। আপনার মতে এই সকল সুখানুভব

কালে আত্মার কোন্ শক্তিটা অনর্গল ও অবিরোধে কোথায় চলিয়া যাইতেছে,—যে অবস্থাটিকে আপনি সুখ বলিতে চাহেন তাহা বলুন।

আবার একটী সুরভি কুসুম নাসিকা সন্নিধানে ধরিলে সেই সৌরভ আত্মার নিকট উপস্থিত হইয়া এক প্রকার আমোদ অনুভব হয়, এখন নিশ্চয়ই জানা যাইতেছে যে, কুসুম সংসর্গেই আত্মার মধ্যে এক প্রকার গুণ জন্মাইয়া দিল, সেইটাকেই সুখ বলিয়া লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে, আবার পুষ্পটি সরাইয়া লইলেই সুখ আর জন্মাইল না,—সুখ গেল। ইহাতে আত্মার কোন্ শক্তি কোন্ দিকে কিরূপ অনর্গল বা অবিরোধভাবে চলিয়া যাইতেছে,—যাহাকে আপনি সুখ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন?

এবং নানা প্রকার নয়নমনোহর বিচিত্ররূপ সন্দর্শনে, কিম্বা প্রচণ্ড-গ্রীষ্মের সময় জাহ্নবীশীকর-সংসর্গি-সমীরণ-সংস্পর্শে, অথবা সুমধুর স্বর-তাল-লয়-সংযুক্ত গীতিবাদ্যাদি শ্রবণে যে প্রত্যক্ষই আত্মাতে সমুৎপন্ন গুণ বিশেষ বলিয়া একএক প্রকার সুখের অনুভব করা যায় তাহাও কি আত্মার শক্তি গুলির নির্ব্বিরোধে,—অনর্গল ভাবে বিসর্পিত হইয়া যাওয়া অবস্থাটি মাত্র, আত্মাতে উৎপন্ন কোন গুণ বিশেষ নহে?। যদি তাহাই হয়, তবে এই সকল সুখের সময় আত্মার কোন্ শক্তি কোথা হইতে কোন্ দিকে অবিরোধ ও অনর্গল ভাবে বহিয়া যাইতেছে তাহা দর্শন করান আবশ্যক।

শুধু সুখ বিষয়েই নহে, দুঃখ বিষয়েও এইরূপ অপত্তি উত্থিত হইতে পারে; অত্যন্ত বিস্বাদ বস্তুর রসনা সংযোগে,—অত্যন্ত দুর্গন্ধান্বিত বস্তুর নাসিকারন্ধ্র সংস্পর্শে, মধ্যাহ্ন কালের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড মণ্ডলাদির দৃষ্টিপাতে, অত্যন্ত শীতোষ্ণাদি স্পর্শে, এবং অতি কঠোর কর্কশধ্বনি শ্রবণাদিতে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, বাহিরের ঐ সকল বস্তু ও শক্তির সভ্যর্ষণেই আমাদের আত্মার মধ্যে একপ্রকার গুণ বিশেষ উৎপন্ন হয়, এবং উহা আত্মা হইতে বিভিন্ন সামগ্রী; সেইখানেও আপনার পূর্ব্বকথিত দুঃখ লক্ষণ (পৃ প) কিরূপে অধিকার করিবে, অর্থাৎ সেখানে আত্মার কোন্ শক্তি কিসের দ্বারা কি ভাবে বাধিত বা প্রতিবদ্ধ বা ধাক্কা প্রাপ্ত হয় এবং কোন্ বাধা দায়িনী বা প্রতিরোধ কারিণী

শক্তিকেই বা নিস্তেজ করার নিমিত্ত আত্মার শক্তি বিজৃম্ভিত হয়,—যে বাধা বা প্রতিরোধ-অবস্থাপন্ন এবং সেই প্রতিরোধ কে তাড়ানের নিমিত্ত উত্তেজনা-ভাবাপন্ন আত্মা-শক্তিকে আপনি দুঃখ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন তাহাও বুদ্ধির অগম্য।

শিষ্য কর্ত্তৃক শরীরের নির্ণয়।

আচার্য্য।—অধ্যাত্ম বিদ্‌গণের পরমানন্দবর্দ্ধক প্রশ্ন উপস্থিত করিয়াছ, আমি সাধ্যমত তোমার এইপ্রশ্ন মীমাংসায় যত্ন করিব; কিন্তু একটী কথা স্মরণ রাখিও, যে অত্যন্ত গুরুতর-বিষয়ের প্রশ্ন টা যত সহজে বুঝা যায়, উত্তরটা তত সহজে আয়ত্ত করা যায় না, একটু নিবিষ্ট ভাবে চিন্তা করিলে তবে এই সকল তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা হইতে পারে।

যে সিদ্ধান্ত সুখদুঃখ বিষয়ে করা হইয়াছে, বাস্তবিক তাহা সর্ব্বত্রই অপ্রতিহত থাকিবে, সকল প্রকার সুখদুঃখেই এই একই কথা। ইহা এক এক করিয়া বুঝানের চেষ্টা করা যাইতেছে শুন,—

কিন্তু প্রথমে তুমি একটি কথা বল দেখি? আমাদের এই শরীরটা কি (পদার্থ)?

শিষ্য। তাহা বেশ বুঝিয়াছি এবং বলিতেও পারি,—সাধারণ কোন চলন্ত শক্তিকে কোন বস্তুর সহিত সংযুক্ত করিতে হইলে যেরূপ একএকটি যন্ত্র বা আলম্বনের নিতান্ত প্রয়োজন হয়,—যেমন তড়িৎ-শক্তিকে প্রেরণ করার নিমিত্ত 'ব্যাটারি' (ইং নাম) কিম্বা তারাদির প্রয়োজন হয়, অথবা যেমন অশ্বের শক্তিকে শকটে সংযুক্ত করার নিমিত্ত যোক্ত্র প্রভৃতি চাই, সেইরূপ আত্মার চলন্তশক্তিগুলিকে বহিস্থিত ও অন্তরস্থিত নানাপ্রকার দ্রব্যের সহিত মিলিত বা সংযুক্ত করার নিমিত্ত, মধ্যে কতকগুলি যন্ত্র বা আলম্বন চাই,—যদ্দ্বারা আত্মার শক্তিগুলি পরিচালিত ও প্রবাহিত হইয়া বাহিরের বা অন্তরের নানাপ্রকার দ্রব্যের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া সেই দ্রব্যগুলিকে আপন আয়ত্ত করিতে পারে, সেই অপরিসংখ্যেয় যন্ত্র ও আলম্বনের সমষ্টি একত্রিত হইয়া,—একটীর পর আর একটি, তাহারপর আর একটি, এই ভাবে সজ্জীকৃত হইয়া যে

একটা দীর্ঘাকার আকৃতি হইয়াছে, তাহাকেই একটি কথারদ্বারা ব্যবহার করার জন্য সঙ্ক্ষেপে একটি নাম দেওয়া হয় সেই নামটি ‘শরীর’। অতএব এই দীর্ঘকার জনিষ্টাকে ‘শরীর’ নামের পরিবর্ত্তে আত্মার শক্তি প্রবাহ বা পরিচালনের যন্ত্র-সমষ্টি বলিলেও হইতে পারে; কারণ শরীরের মধ্যে এমত কোন একটু স্থান বা অংশ নাই, যেখানে আত্মার শক্তি পরিচালনা বা প্রবাহের সাহায্য না করিয়া কেবল সৌন্দর্য্য দর্শনাদির নিমিত্ত নিরর্থক রহিয়াছে, যথা হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, উদর, বক্ষ, ও তাহাদের অন্তর্গত পেষী, স্নায়ু, ধমনী, নাড়ী, শিরা, মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, ফুস্ফুস্ পাকস্থলী ইত্যাদি। ইহাই শরীরের লক্ষণ—

জ্ঞানস্বরূপ নির্ণয়ের অন্তর্গত আহারাদিজনিত সুখ দুঃখের স্বরূপ নির্ণয়।

আচার্য্য।—অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম! যে, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা তুমি বিলক্ষণ চিন্তা সহকারে ধারণা করিয়াছ, এবং বিস্মৃত হও নাই। এখন অন্য কথা শুন;—এই আত্মশক্তি পরিচালনায় যন্ত্রস্বরূপ-শরীরের অস্তিত্ব-রক্ষার নিমিত্ত কএকটী পদার্থের কিছু অধিক-মাত্রায় থাকা নিতান্তই আবশ্যক হয়,—যথা আজোট (ইং নাম) স্নেহ, গুড়, লবণ ইত্যাদি। এই সকল পদার্থগুলি না থাকিলে শরীরের অস্তিত্বই থাকে না, মস্তিষ্ক, স্নায়ুপ্রভৃতি সমস্ত শরীরাবয়বই অকর্ম্মণ্য ও অবসন্ন হইয়া পড়ে,—আত্মার কোনপ্রকার শক্তিরই পরিচালন করিতে পারে না, আর অনেকগুলি পদার্থ অতি সামান্য-মাত্রায় থাকিলেও চলে,—যথা, লৌহ, শীসক, চূর্ণ, ক্ষার ইত্যাদি। এ গুলিতেও দেহের অস্তিত্ব-রক্ষার ঐরূপই সাহায্য করে।

এদিকে আবার প্রতিক্ষণেই আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসাদি নানাবিধ কারণে শরীরের অন্তর্গত উক্ত সমস্ত প্রকার পদার্থেরই ক্ষয় হইয়া যাইতেছে,—শরীরের মধ্য হইতে চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া যাইতেছে; কিন্তু আহারের দ্বারা আবার আমরা তাহার সম্পূর্ণরূপ পরিপূরণ করিয়া থাকি। তন্মধ্যে যে যে দ্রব্যগুলি আমাদের শরীরের নিতান্ত প্রয়োজনীয়—যে যে বস্তুর অভাবে আমাদের শরীরাবয়ব সকল শিথিল, ক্ষীণবীর্য্য, আত্মার শক্তি পরিচালনে অশক্ত

হয়,—সুতরাং আত্মার শক্তি যথোচিত প্রবাহিত হইতে পারে না, সেই সেই বস্তুগুলি মুখ ও উদরস্থ করা মাত্রেই শরীরের সেই সকল বস্তুর অভাব বিদূরিত হয়, সেই দ্রব্যগুলি শরীরের সহিত সমবেত হয়, তখন শরীরটা বীর্য্য সম্পন্ন এবং আত্মার শক্তিসমূহের রীতিমত পরিচালনে সমর্থ হয়, আর আত্মার শক্তিগুলিও তখন অনর্গল ও অবরোধভাবে স্নায়ুমণ্ডলাদিতে চলিয়া ফিরিয়া আপন২ কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকে। অতএব ঐ সকল বস্তু আহার করা কালে আত্মা "সুখ" বলিয়া অনুভব করে; আর যে দ্রব্যদ্বারা ইহার বিপরীত ঘটনা হয়, তদ্দ্বারা আত্মার শক্তিরও ইহার বিপরীত অবস্থা হয়। ইহা বিস্তারিত মতে শুন,—

প্রথম ভাবিয়া দেখ, কি কি খাদ্যদ্রব্য আমাদের সুখকর ও কি কি দ্রব্য দুঃখজনক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমরা দেখিতেছি,—দুগ্ধ, ঘৃত, মৎস্য, মাংস প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য প্রায় সাধারণতঃ সকলেরই বিশেষ সুখবর্দ্ধন করে; তৎপর, কিছু কম পরিমাণে হইলেও কিন্তু আলু, পটোল, বেগুণ্ প্রভৃতিও সুখজনকস্বাদযুক্ত দ্রব্য। এবং কুইনাইন, অহিফেণ প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য সকলেরই অতিশয় অতৃপ্তিজনক।

আচ্ছা, দুগ্ধাদি দ্রব্যগুলি এত সুখকর, আর কুইনাইনাদিদ্রব্য এত অতৃপ্তিজনক কেন? ইহার কারণ এই যে দুগ্ধাদির মধ্যে আমাদের পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শরীরের পোষক ও রক্ষক—অনেকগুলি পদার্থ আছে। "দুগ্ধের মধ্যে যে আজোট ও গুড়াংশ আছে, স্নেহাংশ আছে, লবণাংশ আছে, এতব্যতীতও প্রস্ফুরক (ফস্‌ফরাস্) প্রভৃতি অনেক প্রকার পদার্থ আছে, তাহার প্রায় সকল গুলিই আমাদের দেহের প্রয়োজনীয় দ্রব্য। ঘৃতের মধ্যে মুখ্যকল্পে স্নেহাংশ আছে, গুড়াংশও লবণাংশ বড় বেশী নাই, অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদার্থও কিছু কিছু আছে। মৎস্যের মধ্যে গুড়াংশ আছে, স্নেহাংশ আছে, প্রস্ফুরকাংশ আছে, আজোট নামে এক প্রকার পদার্থ আছে, লবণাদি অন্যান্য পদার্থও অল্প অল্প আছে। মাংসের মধ্যেও মিষ্টাংশ আছে, স্নেহাংশ আছে, প্রস্ফুরকাংশ আছে, আজোটের অংশ (কিছু বেশী) আছে, এবং লবণাদি পদার্থও কিছু কিছু আছে। আর কুনাইনের মধ্যে "কোয়াসিয়া" নামে (ইংরাজী নাম) এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ

থাকে, অহিফেণের মধ্যে "মরফিয়া" নামে (ইংরাজী নাম) এক প্রকার বিষ থাকে।" এখন বলা বাহুল্য যে কুইনাইন অহিফেণাদি পদার্থের মধ্যে আমাদের শরীর-পোষক কোন পদার্থই নাই। যে পদার্থ আছে, তাহা আমাদের শরীরের বিনাশক ইহাতে তোমরাই বলিয়া থাকে। স্বভাবাবস্থায় একভরী কুইনাইন খাইলে মৃত্যু যদিও না হয়, তথাপি মৃত্যুর দশা বোধ হয় অবশ্যই হইবে, এক ভরী অহিফেণ ভক্ষণেও মৃত্যু হয়, ইহা অনেকের পরীক্ষিত আছে।

অতএব দুগ্ধাদি দ্রব্য আহারে সুখ বোধ হয়, আর কুইনাইনাদি দ্রব্য ভক্ষণে অত্যন্ত অপ্রীতি বোধ হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে দুগ্ধাদি দ্রব্য রসনা সংযোগ করা মাত্রেই উহার গুড়াংশ, স্নেহাংশ, লবণাংশ ও প্রস্ফুরকাদি অংশটা আমাদের রসনার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরাদির দ্বারা চোষিত হইয়া পরিগৃহীত হয়, এবং উদরস্থ হইয়া পাকস্থলী-সংলগ্ন শিরাদির দ্বারা ঐ সকল অংশ শরীরে পরিগৃহীত হয়, এবং তৎক্ষণাৎ আমাদের রসনা উদরাদি সমস্ত দেহাঙ্গ এবং রসনা উদরাদির সন্নিহিত শিরা, ধমনী, নাড়ী, স্নায়ু প্রভৃতি সমস্ত অবয়ব গুলিরই ঐ সকল দ্রব্যের অভাব মোচন হয়, এবং উহারা ঐ সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য গুলি পাইয়া আপনাপন আকৃতিকে পরিপুষ্ট করে, এবং তদ্দ্বারা পুনর্ব্বার উহারা পূর্ব্বের মত আত্মার শক্তি পরিচালনায় সম্পূর্ণ উপযুক্ত হয়, সুতরাং আহারের পূর্ব্বে উহাদের ক্ষীণতাপ্রযুক্ত যে আত্মার শক্তি প্রবাহে বাধা ছিল তাহা দূরীভূত হইল, এবং আত্মার শক্তিগুলিও আপনাপন নির্দ্দিষ্ট বিষয় লক্ষ্য করিয়া অনর্গল ও অবিরোধভাবে গতায়াত করিতে থাকিল, দেহের সমস্ত অবয়বেই আত্মার সমস্ত শক্তিগুলি অনর্গলও অবিরোধভাবে চলিতে থাকিল। এইরূপ অনর্গল ও অবিরোধভাবে আত্মশক্তির প্রবাহিত অবস্থার নামই 'আহার জনিত সুখ'। সুতরাং আহারের সুখনামে কোন একটা গুণ বা শক্তি আত্মাতে জন্মিল না, উহা আত্মারই অনর্গল ভাবে প্রবাহিত অবস্থা স্বরূপ একটু পরিবর্ত্তন ভাবমাত্র হইল।

খাদ্য বস্তু সকল উদরস্থ হইলে ক্রমেই আরও অধিক মাত্রায় আমাদের দেহ উহা গ্রহণ করে, দেহে ঐ সকল বস্তুর অভাব একবারে

বিদূরিত হয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল আত্মার শক্তি পরিচালন করিতে বিলক্ষণ উপযুক্ত হয়, আত্মার শক্তিগুলি অবাধে ইতস্ততঃ বিসর্পিত হইতে থাকে এবং সেই অবাধ ভাবে, অনর্গল ভাবে আত্মার শক্তির প্রবাহিত অবস্থাকেই আপ্যায়িতভাব বা তৃপ্তিসুখ, বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, অর্থাৎ ঐ সকল দ্রব্য ভোজনের পর যে আমাদের অন্তরে ঐ প্রকার তৃপ্তি বা সুখের ভাব আপ্যায়িতভাবটা আইসে, তাহা আত্মার ঐরূপ অনর্গল ভাবাপন্ন অবস্থাটি ব্যতীত নূতন কোন একটা গুণ তখন আত্মাতে জন্মেনা, সেই পুরাতন আত্মারই অনর্গল ভাবে স্ফূরণ স্বরূপ একটা পরিবর্ত্তন অবস্থা মাত্র। এই অবস্থাটা আহারের পূর্ব্বে ছিল না, আহারের পরেই হইল এ নিমিত্ত সুখাবস্থারও উৎপত্তি হইল বলাযায়।

আহার জনিত সুখনামে যখন নূতন কোন একটা গুণ বা শক্তি আত্মাতে জন্মিল না, তখন এই সুখানুভব বা সুখজ্ঞান নামেও কোন একটা গুণ বা শক্তি এইক্ষণে জন্মিল না, আহার করার পূর্ব্বে যে সেই আমাদের চিরন্তন 'আমির' অনুভব বা জ্ঞান ছিল, - যাহা জন্মাবধি থাকা হেতু আমরা গ্রাহ্য করিতে ছিলাম না, এইক্ষণে সুখস্বরূপ অবস্থান্তরে আমাদের সেই 'আমির' পরিবর্ত্তন অবস্থা হওয়াতে সেই পুরাণ 'আমি'—জ্ঞানটাই গ্রাহ্য করিলাম মাত্র। আত্মার একটা পরিবর্ত্তিত অবস্থা হইয়া কিছু বেশী কাল থাকিলেই সেই নূতন অবস্থাটাও অভ্যস্তমত হইয়া পুরাতন প্রায় হইয়া যায়, সুতরাং তখন ঐ নূতন অবস্থাটাও আর আমাদের গ্রাহ্যে আইসে না, তাহার অনুভবও গ্রাহ্য হয় না, আবার সেই 'আমির' অনুভবটা অগ্রাহ্য হইয়া পড়ে। এজন্য আত্মার সুখ দুঃখাদি অবস্থার দ্বারা কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হইলে যত টুকু কাল তাহার নূতনত্ব থাকে, ততটুক কালই আমরা সেই সুখ বা দুঃখাদির অনুভব করিয়া থাকি, অর্থাৎ সুখ দুঃখাদিরূপে আত্মাকে অনুভব করিয়া থাকি, তৎপর যেই উহা অভ্যস্ত হয়, তখন বাস্তবিক সেই সুখ দুঃখাদি অবস্থাটি থাকিলেও আর তাহার অনুভূতিটা আমাদের গ্রাহ্যে আইসে না ; এজন্য তখনও বলি,—"আমাদের সেই সুখ বা দুঃখ এখন নাই"।

আহার জনিত সুখাবস্থা দ্বারাই ইহার দৃষ্টান্তটা বুঝিয়া লও,—আমাদের আহারের পূর্ব্বে শরীরের যে যে বস্তুর ক্ষয় ও অভাব হইয়া শরীরের অনুপযুক্ততানিবন্ধন আত্মার শক্তি গুলি অনর্গল ও অবাধভাবে পরিচালিত হইতে পারে নাই, এখন উপযুক্তমত আহারের দ্বারা সেই সমস্ত অভাব বিদূরিত হইলে, কিছুকাল পর্য্যন্ত আত্মার শক্তি গুলি অবাধে ও অনর্গল ভাবে বিসর্পিত হইলে, পরে উহার আর সেইরূপ নূতনত্ব থাকিল না, পুরাণ হইয়া পড়িল,—উহাই আত্মার একটা স্থায়ী অবস্থার মত হইয়া পড়িল, পূর্ব্বকার মত হঠাৎ পরিবর্ত্তিত ভাবটা থাকেনা, সুতরাং আত্মা আর তাহা গ্রাহ্য করেনা, বিলক্ষণ অনুভব হইলেও সেটা গণ্য করে না; সুতরাং তখন আর "সুখের অনুভব হয় না" ইহাই বলিয়া থাকে। বাস্তবিক কিন্তু আত্মার শক্তির ঐ পূর্ব্বোক্তরূপ অবস্থা থাকা পর্য্যন্তই পূর্ব্বাবস্থায় অনুভব থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়ত শরীরের উপযুক্ত মত দ্রব্য আহরণ হইয়া গেলে, অর্থাৎ যে পরিমাণে তোমার দেহে স্নেহাদি পদার্থের আবশ্যক আছে, সেই পরিমাণে গ্রহণ হইয়া গেলে, শেষে তুমি বলপূর্ব্বক, কিম্বা লুব্ধতা দোষে আবার গুড়াদিপদার্থ মুখে দিলেও তোমার শরীর আর তাহা সেই সহস্র সহস্র শিরামুখের দ্বারা আত্মসাৎ করিবে না, সুতরাং তখন আর সেই পূর্ব্বকার মত শক্তিপরিচালনার আবশ্যক পদার্থের অভাব মোচন হইয়া নূতন রকমে আত্মার শক্তির অবাধ ও অনর্গল ভাবে পরিচালনা বা প্রবাহের অবস্থা হইতেছে না, সুতরাং তাহা আর তোমার গ্রাহ্য হইতেছে না, সুখাবস্থা বলিয়া গণ্য হইতেছে না, প্রত্যুত দুঃখজনকই বোধ হইতে থাকে।

আবার ইহাও দেখ, কতকটা মিষ্টদ্রব্য আহারের পর, শেষে যে সেই মিষ্টাদি দ্রব্য সকল ছাইএর মত বোধহয় তাহা কাহারও অনবগত নাই। ইহার তাৎপর্য্য এই যে-দেহে যে দ্রব্যের যে মাত্রায় প্রয়োজন হয়, যদি তদপেক্ষায় অতিরিক্ত পরিমাণের সেই বস্তু গুলি বলক্রমে দেহসাৎ করিতে থাকে, তাহা হইলে সেই বস্তু এক প্রকার বিষাক্তই হইয়া পড়ে, আত্মার শক্তি পরিচালনের ব্যাঘাত জনক হইয়া পড়ে; কারণ দেহের মধ্যে আবশ্যক বস্তুর অভাব হইলেও, দেহ যেরূপ অকর্ম্মণ্য আত্মার শক্তি পরিচাল-

নায় অযোগ্য হয়, আবার সেই সেই পদার্থের নিয়মিত মাত্রার অপেক্ষায় আতিশয্য হইলেও দেহটা অকর্ম্মণ্য হয়,—শক্তি পরিচালনায় অযোগ্য হয়। সুতরাং শক্তি পরিচালনায় বাধা পড়ে, এইজন্য শেষে সেই একই বস্তু দুঃখজনক বলিয়া অনুভব হইতে থাকে।' কিন্তু সুখ যদি বাহিরের দ্রব্যাদি দ্বারা বাহির হইতে উৎপন্ন, ও আত্মাতে সংলগ্ন এবং আত্মার অতিরিক্ত কোন একটা গুণ বিশেষ বা শক্তি বিশেষ হইত, তবে এরূপ কিছুই সম্ভব ছিল না। অর্থাৎ উদরটা পরিপূর্ণ হইলে, কিম্বা উপযুক্ত মত মিষ্টাদি দ্রব্য খাইলেও আবার ক্রমাগত সেই সকল দ্রব্য খাইতে কেবল সুখানুভবই হইত, কিন্তু শেষে সুখ না হওয়ার কিম্বা দুঃখ হওয়ায় কোনই কারণ হইত না; উদর যতই পরিপূর্ণ হউক না কেন, যতই মিষ্ট খাওনা কেন, মিষ্টাদি দ্রব্য খাইলেই, ক্রমাগত তোমার আহার জনিত সুখ হইতে থাকিবে; এবং দুঃখ হওয়ার তো কোন কারণই নাই, কারণ তোমার মতে, যখনই তুমি মিষ্টাদি দ্রব্য মুখস্থ করিবে, তখনই ঐ দ্রব্য রসনা-স্নায়ুর সাহায্য লইয়া তোমার আত্মার মধ্যে সুখাদি উৎপাদন করিবে, তাহা অব্যর্থ।

আরও দেখ, যদি বহিস্থ দ্রব্য সংযোগে আত্মার মধ্যে সুখ দুঃখ রূপ কোন একটা নূতন গুণ জন্মাইত, তাহা হইলে একই দ্রব্যের দ্বারা কাহারও সুখ কাহারও দুঃখ হইতে পারিত না, কিম্বা সুখদুঃখের তারতম্য হইত না, অর্থাৎ এক এক প্রকার খাদ্য বস্তুর দ্বারা সকলেরই সমান পরিমাণে সুখ বা দুঃখ হইত; কেন না সেই একই বস্তু, সকলেরই রসনাদির অন্তর্গত স্নায়ু ও আত্মার সংসর্গ করিতেছে; আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ হইলেই সে তাহার কার্য্য-সুখ দুঃখ জন্মাবে, যেহেতু তুল্য কারণ থাকিলে তুল্য কার্য্য হয়, ইহা পণ্ডিতগণ অঙ্গীকার করেন। বাস্তবিক কিন্তু এক-বস্তুর আহারের দ্বারা সকলেরই সুখ বা দুঃখ হইয়া থাকে না, একই মিষ্ট দ্রব্যের আস্বাদে তোমার সুখ হয়, আমার দুঃখ বোধ হয়; কাহার বা অধিক কটু দ্রব্যেই সুখ হয়, কাহার বা সামান্য কিঞ্চিৎ কটুদ্রব্যও (ঝাল) অতি দুঃখ প্রদ অনুভূত হয়, কাহারও বা বেশী মাত্রায় লবণ বা অম্লদ্রব্য সুখজনক, কাহারও বা ইহা অতি সামান্য পরিমিত হইলেও নিতান্ত দুঃসহ, এইরূপ প্রায়

প্রভৃতি ব্যক্তি-ভেদে প্রত্যেক দ্রব্যাহার জনিত সুখ দুঃখ সম্বন্ধেই অনন্ত প্রকার প্রভেদ ও বিরোধ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা তোমার মতে অসম্ভব।

ব্যক্তি ভেদে আহারজনিত সুখ দুঃখ প্রভেদের কারণ নির্দ্দেশ।

আর্য্য দার্শনিকদিগের মতে, এদোষ ঘটিতে পারে না, এবং সুন্দর মীমাংসাও হইতে পারে। তাহা বুঝাইয়া দিতেছি শুন। মনুষ্য যে স্থূল বিভাগের দ্বারা প্রায় তিন প্রকার প্রকৃতিতেই বিভক্ত, তাহা বোধ হয় অবশ্যই অবগত আছ, অর্থাৎ বাতিক প্রকৃতির, পৈত্তিক প্রকৃতির এবং শ্লৈষ্মিক প্রকৃতির। তন্মধ্যে যাঁহারা বাতিক প্রকৃতির লোক তাঁহারা বায়ুবৰ্দ্ধক দ্রব্যের দ্বারা সুখী হন না, যাঁহারা পৈত্তিক প্রকৃতির তাঁহারা পিত্তবৰ্দ্ধক দ্রব্যের দ্বারা সুখী হন না, আর যাঁহারা শ্লৈষ্মিক প্রকৃতির লোক তাঁহারা শ্লেষ্মাজনক বস্তুর আহারে পরিতৃপ্ত হন না। অর্থাৎ যাঁহার বাত প্রকৃতির দেহ তাঁহার স্বভাবতই চঞ্চলতা বা স্ফূর্ত্তি কিছু বেশী, এতদবস্থায় যদি তিনি আবার সেই চঞ্চলতা বা স্ফূর্ত্তিবৰ্দ্ধক (বায়ুবৰ্দ্ধক) বস্তু আহার করেন, তবে তাঁহার স্ফূর্ত্তি ও চঞ্চলতা আরও অধিক বৃদ্ধি পায়, প্রকৃত পরিমাণাপেক্ষায় অনেক অধিক হইয়া পড়ে, কিন্তু বাস্তবিক কল্পে তদ্দ্বারা আত্মার বিশেষ দুর্ব্বলতাই হইয়া পড়ে। সুতরাং আত্মা সেরূপ দ্রব্য চায় না।

এইরূপ যাহাদের শ্লেষ্মাধিক প্রকৃতি, তাহাদের স্বভাবতঃ স্ফূর্ত্তি বড় কম থাকে, এতদবস্থায় যদি স্ফূর্ত্তির হ্রাসকারক বস্তু (শ্লেষ্মজনক বস্তু) আরও অধিক খায়, তবে আর স্ফূর্ত্তিও বিহীন হইয়া আত্মা অবসন্ন হইয়া পড়ে, সুতরাং সে শ্লেষ্ম-বৰ্দ্ধক দ্রব্য ভাল বাসে না; এবং যাহার পিত্ত বৃদ্ধির প্রকৃতি তাহার স্বভাবতঃ অত্যন্ত স্ফূর্ত্তি থাকে, এতদবস্থায় যদি আরও অধিক স্ফূর্ত্তি জনক দ্রব্য (পিত্ত জনক বস্তু) আহার করে, তবে আরও অত্যন্ত স্ফূর্ত্তি হইয়া আত্মা বাস্তবিক পক্ষে বড় অবসন্ন হইয়া পড়ে। অতএব সে পিত্ত-বৰ্দ্ধক বস্তু ভাল বাসে না।

ইহার তাৎপর্য্য বিশেষরূপে বলিতেছি, কিন্তু একটু বিশেষ অভিনিবিষ্ট

না হইলে, এ বিষয়টি বুঝিতে পারিবে না। প্রথম একটি দৃষ্টান্ত বুঝিয়া লও,—তড়িৎ শক্তি যখন টেলিগ্রাফের তারের মধ্যদিয়া যায় তখন কিরূপ ঘটনা হয় তাহা জান কি? এবং বর্ষাকালাপেক্ষায় বসন্তকালীন নব মেঘোদয়ে অধিক বজ্রপাত হয় কেন তাহা অবগত আছ?

শিষ্য।—তাহা একরূপ জানি, কিন্তু তাহার সহিত এখানে কি সম্বন্ধ তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না।

আচার্য্য।—সম্বন্ধের কথা পরেই বলিতেছি, তুমি ইহার কি জান বল দেখি?

শিষ্য।—তড়িৎশক্তি যখন তারের মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যায়, তখন তারের পরমাণু রাশির মধ্যে এক প্রকার ধাক্কা লাগে, সেই ধাক্কাদ্বারা তারের পরমাণু রাশি পরিচালিত হয়, অর্থাৎ তাহার পরমাণু সমষ্টি যে ভাবে অবস্থিতি করিতেছে তাহার কিছু উলট্ পালট্ হয়। কিন্তু ঐ তড়িৎশক্তি চলিয়া যাওয়া মাত্রেই তারের পরমাণু রাশি আবার সেইমত যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয়। কারণ পরমাণু সকলের সর্ব্বদাই চেষ্টা আছে যে তাহারা পরস্পরে অতি সন্নিহিতভাবে সংযুক্ত ও সন্নিবেশিত হইয়া থাকে, কিন্তু যখন তড়িৎ শক্তি চলিয়া যায়, তখন উহাদের সেই অতি নৈকট্য ভাবে সন্নিবেশের কিছু ব্যাঘাত ঘটে, অর্থাৎ ঐ রূপ সন্নিবেশের পূর্ণমাত্রায় না হইলেও, অনেকটা বাধা জন্মায়, আবার এই সন্নিবেশও তড়িৎশক্তির পরিচালনে কতকটা বাধা জন্মায়, তড়িৎশক্তিও সেই বাধা অতিক্রমণ পূর্ব্বক কোন একদিকে চলিতে থাকে, তাই একটা ধাক্কাধাক্কী উপস্থিত হয়।

আচার্য্য।—তার যদি কিছু মাত্র বাধা না জন্মাইত তবে কি হইত?

শিষ্য।—তাহা আদৌ সম্ভবে না, যতক্ষণ তারের তারত্ব থাকিবে,—তারের অবয়ব সন্নিবেশ থাকিবে, ততক্ষণ অন্য একটা চলন্তশক্তি তাহার মধ্য দিয়া গেলে, নিশ্চয় তাহার পরমাণু রাশি ঐ শক্তিকে বাধা দিবে, ইহা অব্যর্থ সিদ্ধান্ত। বিশেষতঃ বাধা না পাইলে কোন শক্তিই উত্তেজিত হইয়া চলিয়া যাইতে পারে না, বাধাই শক্তির জোর ও উত্তেজিত হওয়ায় মুখ্যকারণ।

আচার্য্য।—ঠিক বলিয়াছ, এখন আর একটির বিষয় বল।

শিষ্য।—জল পদার্থটা তড়িৎশক্তির অত্যন্ত পরিচালক দ্রব্য, অর্থাৎ তড়িৎশক্তি গতায়াতে অতি সামান্য পরিমাণে বাধা জন্মায়, কিন্তু বিশুষ্ক বায়ুরাশি তড়িৎশক্তির অপরিচালক, অর্থাৎ অতি তীব্রতর বাধা জন্মাইয়া থাকে। বর্ষাকালে প্রতিদিনই প্রায় বর্ষণ হইতেহইতে মেঘও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী বায়ু রাশি নিতান্ত সিক্ত (জলকণা বিমিশ্রিত) হইয়া যায়, সুতরাং তখন সেই বায়ু, তড়িৎশক্তির বিলক্ষণ পরিচালক, অর্থাৎ তড়িৎশক্তি পরিচালনে অতি সামান্য পরিমাণে বাধাজনক হয়, সুতারাং তখন মেঘাদির মধ্যে অতি সামান্য পরিমাণে একটু তড়িৎশক্তি জন্মিলেও তৎক্ষণাৎ পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে, তড়িৎ অধিক জমিতে পায় না, তাহার স্ফূর্ত্তি বা উত্তেজনা ও বলবৃদ্ধি হইতে পারে না, বজ্রপাতও হয় না; কারণ পণ্ডিতগণ অধিক পরিমাণে উপচিত-তড়িৎশক্তির গতায়াতকেই 'বজ্রপাত' বলিয়া থাকেন।

আবার যখন বসন্তাদি কাল উপস্থিত হয়, তখন বৃষ্ট্যাদি না হওয়াতে, বায়ুরাশি নিতান্ত শুষ্ক ও রুক্ষ হইয়া যায়, সুতরাং তড়িৎশক্তির অত্যন্ত অপরিচালক হয়; সেই কারণবশত মেঘীয় তড়িৎশক্তি পৃথিবীতে আসিতে পারে না, অথচ আসিবার জন্য বিলক্ষণ চেষ্টা করিতে থাকে, ক্রমে তাহার বলবৃদ্ধি হইতে থাকে। ক্রমে অধিক তড়িৎশক্তি একত্রে জমিতে থাকে, পরে যখন অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠে, তখন বায়ু রাশির সেই প্রবল বাধাও অতিক্রমণ করিয়া বায়ু বিদারণ পূর্ব্বক পৃথীবীতে আসিয়া পড়ে, ইহাই বজ্রপাত। এখন আপনি কি বলিবেন বলুন।

আচার্য্য।—যাহা বলিলে ইহাই সত্য। এখন তুমি এই দৃষ্টান্তটি তোমার নিজের মধ্যে যোজনা করিয়া লও, তবেই বায়ু বৃদ্ধির প্রকৃতিতে, বায়ু বর্দ্ধক দ্রব্য খাইলে আত্মার শক্তি দুর্ব্বলা হইবে কেন, তাহা বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিবে ইহার বিস্তার করা যাইতেছে শুন;—

আমাদের আত্মার শক্তি ও যে তার-প্রবাহিনী তড়িৎশক্তির ন্যায়, অসংখ্য স্নায়ুমণ্ডলের মধ্যদিয়া সর্ব্বদা পরিচালিত হইয়া গতায়াত করিতেছে, তাহা অনেক বারই বিস্তার ক্রমে বলিয়াছি। ঐ শক্তি গুলি

যখন স্নায়ু মণ্ডল দ্বারা প্রবাহিত হইয়া চলিতে থাকে, তখন স্নায়ু মণ্ড-লের পরমাণু রাশির যথাযোগ্য সন্নিবেশের কিছু ব্যত্যয় হয়,—পরমাণুগুলি নিয়মিত সন্নিবেশ অপেক্ষায় একটু উলট্ পালট্ হওয়ার উদ্যুক্ত হয়; কিন্তু ঐ পরমাণুগুলির স্বজাতীয় আকর্ষণ বলে আবার তৎক্ষণাৎ সেই পূর্ব্ব-মত যথাযোগ্য সন্নিবেশে অবস্থিত হয়। পরমাণুগুলির সন্নিবেশ যতই সুদৃঢ়, যতই ঘন, অবিরল বা কঠিন, ততই আত্মার শক্তি পরিচালনার অধিক পরিমাণে বাধাজন্মায়, সুতরাং সেই সন্নিবেশের উলট্ পালট করিয়া যাইতে আত্মার শক্তির অধিক উত্তেজনা ও অধিক মাত্রায় বলব্যয়ের আবশ্যক; সুতরাং আত্মার অধিকপরিমাণে বল বৃদ্ধি বা উপচয়ের প্রয়োজন হয়, আর যতই ঐ পরমাণু সন্নিবেশটা শ্লথ হইবে ততই তাহার পরমাণু রাশি উলট্ পালট্ করিয়া যাইতে আত্মার শক্তির অনায়াস হইবে, সুতরাং তাহার উত্তেজনা ও বিস্তৃতি অতি কম হইবে, তাদৃশ বলোপচয়ও হইবে না, সামান্য মাত্রায় একটু স্ফূর্ত্তি হওয়া মাত্রেই তৎক্ষণাৎ স্নায়ু সমূহের দ্বারা চলিয়া যাইবে। কিন্তু ইহাতে, আপাততঃ যেন আত্মার আর ও অধিক স্ফূর্ত্তি বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে, ফলে তাহা বাস্তবিক স্ফূর্ত্তি নহে,—তাহা চঞ্চলতার নামান্তর মাত্র। এই গেল আত্মার ও স্নায়ুর অবস্থা বিবরণ; এখন বায়ু বৃদ্ধির লোকের পক্ষে বায়ু বর্দ্ধক দ্রব্য সুখ জনক নয় কেন তাহা শুন;—

(দ্রব্যবিশেষে বাতিক প্রকৃতির সুখ দুঃখ হয় কেন ?)

বাতিক প্রকৃতির অর্থ এই যে, তাহাদের স্নায়ুগুলি স্বভাবতই কিছু শ্লথ,—স্নায়ুর পরমাণু রাশির সন্নিবেশটা অপেক্ষাকৃত একটু বিরল,—একটু ঢিলা মত থাকে; এজন্য তাহাদের আত্মার শক্তি গুলি স্বভাবতঃই কিছু চঞ্চলা, এবং দুর্ব্বলা ও প্রকৃত-উত্তেজনা বিহীন হয়, অথচ ঐ চঞ্চলতা নিবন্ধনই বোধহয় যেন বেশী পরিমাণেই উত্তেজিত হইতেছে। এতদবস্থায় যদি ঐ লোক বায়ু বর্দ্ধক বস্তু (ক) আহার করে, তবে তদ্দ্বারা স্নায়ুর পুষ্টি সাধন

(ক) যে বস্তুর দ্বারা স্নায়ুর পুষ্টি জন্মে না বরং ক্ষয়ই হইয়া থাকে এবং রুক্ষতা ও শুষ্কতা জন্মে তাহার নাম বায়ু বর্দ্ধক বস্তু।

হইল না, প্রত্যুত আরও শ্লথতা ও দুর্ব্বলতা হইল, তাহা হইলে অগত্যাই আত্মার শক্তির প্রকৃত উত্তেজনা (স্ফূর্ত্তি) যাহাকে বলে, তাহা হইল না, বল বৃদ্ধিও হইলনা, প্রত্যুত হ্রাসই হইল,—স্নায়ুমণ্ডলের মধ্যে না আসিতে মস্তিকের অভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মশক্তির যেরূপ পূর্ণ উত্তেজনা ছিল, স্নায়ুমণ্ডলের মধ্যে আসিয়া স্নায়ুর বল না পাইয়া সেই উত্তেজনাটা যেন ফস্‌কিয়া গেল,—কোন একটা বস্তু লক্ষ্য করিয়া একটা ধাক্কা দিলে যদি সেই বস্তুটা নিতান্ত অক্লেশেই সরিয়া যায়, তবে যেমন ধাক্কার বেগটা আমাদের অভ্যন্তর হইতে পূর্ণবেগে আসিয়া ও শেষে ফুস্‌ফাস হইয়া যায়, কিম্বা বড় ক্রোধ ও উদ্যম উত্তেজনার সহিত যথোচিত আড়ম্বর পূর্ব্বক একটি শিশুকে আক্রমণ করিলে যেরূপ শিশু কর্ত্তৃক সেই বলের উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া না হওয়ায় আমাদের সেই বেগবল যেন নিস্তেজ হইয়া যায়, এখানেও সেইরূপই যেন মন্দ হইয়া যায়, সুতরাং অনর্গলও অবিরোধ ভাবে আত্মার শক্তি প্রবাহ হইল না। অতএব ঐরূপ বস্তু ভক্ষণে তাহার সুখ হইবে না, আত্মার শক্তি গুলি যতটুকু উত্তেজিত হওয়া আবশ্যক ও উচিত, ততটুক উত্তেজনার সহিত অনর্গল ও অবাধ ভাবে প্রবাহিত হইতে পারে না; প্রত্যুত, যখন আবশ্যক ও উপযুক্ত মত বল ও উত্তেজনার সহিত চলিয়া যাইতে এক প্রকার বাধাই পাইল, তখন একরূপ দুঃখ অবস্থাই হইল বলিতে পারা যায়। মুড়ী মুড়কী প্রভৃতি ভৃষ্ট দ্রব্য গুলি বায়ুবর্দ্ধক, অর্থাৎ উক্তরূপ গুণযুক্ত, এজন্য ঐ সকল দ্রব্য বাত প্রকৃতির লোকে ভাল বাসে না। কিন্তু যদি এই ব্যক্তি এমত কোন দ্রব্য আহার করেন যদ্দ্বারা স্নায়ু মণ্ডলের পুষ্টি বৃদ্ধি ও বলাধিক্য হয়, স্নায়ুর অবয়ব সন্নিবেশটি রীতিমত ঘনিষ্ট ও উপচিত হয়, তাহা হইলে স্নায়ুগুলি আত্মার শক্তি পরিচালণ সম্বন্ধে আর একটু বেশী বাধক হয়। কেন না স্নায়ু প্রভৃতির অবয়ব গুলি অপেক্ষাকৃত অধিক শ্লথ ও ক্ষীণ ভাবে থাকিলে, স্বতঃশ্লথ—অল্পসংখ্যক পরমাণু রাশির সন্নিবেশ আলোড়ন করিয়া যাইতে হয়, আর, স্নায়বীয় অবয়ব গুলি ঘনীভূত ও পরিপুষ্ট থাকিলে আত্মার শক্তিকে যতই ঘনিষ্টীভূত অধিক সংখ্যক পরমাণু পুঞ্জের সমালোড়ন পূর্ব্বক আত্মার শক্তিকে প্রবাহিত হইতে হয়।

কিন্তু স্নায়ুমণ্ডলের হৃষ্টপুষ্টতানিবন্ধন যে; তাহাদের বাধকতা কিছু বৃদ্ধি পায় সে বাধকতা এমন বাধকতা নহে,—যদ্দ্বারা আত্মারশক্তি দুর্ব্বল কিম্বা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া ঠেকিয়া থাকে এবং দুঃখাবস্থার অনুভব করে; তবে এইরূপ বাধা হয়, যে তদ্দ্বারা আত্মারশক্তিগুলি যে পরিমাণ বেগে আত্মাতে পরিস্ফুরিত হয়, স্নায়ু সমূহের মধ্যে আসিয়াও স্নায়ু সমূহের সবলতানিবন্ধন উপযুক্ত বাধা পাইয়া ঠিক্ সেই পরিমাণেই চলিয়া আসিতে পারে। এবং স্নায়ুর দুর্ব্বলাবস্থার ন্যায় কথিত নিয়মানুসারে ( ) ফস্‌কিয়া না যায় সুতরাং ইহার নামও আত্মারশক্তির অবাধিত ও অনর্গলভাবে পরিচালিত হওয়া; অতএব স্নায়ু পোষক দ্রব্য আহারের পর আত্মার এইরূপ অনর্গল ভাবকেই সুখ বলিয়া অনুভূতি হয়। মৎস্য মাংসাদি দ্রব্যগুলি ঐরূপ গুণযুক্ত, অর্থাৎ ঐ সকল দ্রব্যের দ্বারা স্নায়ুমণ্ডল ও মস্তিকের অধিক পরিমাণে পুষ্টি সাধন হয়, এ নিমিত্ত বায়ু প্রকৃতির লোকের মৎস্য মাংসাদি বিশেষ কিছু সুখজনক বোধ হইতে পারে।

(পিত্তাধিক প্রকৃতির দ্রব্যবিশেষে সুখ দুঃখ হয় কেন ?)

যাঁহার পিত্তাধিক প্রকৃতি (পৈত্তিক ধাত) তাঁহার শরীরে সর্ব্বদাই তাপাধিক্য থাকে,—সাধারণতঃ-শারীর-তাপের যেরূপ নিয়মিত মাত্রা আছে তাহার পূর্ণ মাত্রায় থাকে, অর্থাৎ, মনুষ্য দেহে যে ৯৮ রেখা অবধি ৯৮॥ রেখা পর্য্যন্ত তাপ থাকার সাধরণ নিয়ম আছে, তন্মধ্যে শ্লৈষ্মিক প্রকৃতিতে সচরাচর ৯৮ রেখার তাপ থাকে, বায়ু প্রকৃতি-দেহে সচরাচর ৯৮। রেখা এবং পৈত্তিক প্রকৃতিতে প্রায়শঃ ৯৮॥= রেখার তাপ থাকে। তাপের এই সামান্য মাত্রার আধিক্য ও ন্যূনতা, বহির্দৃষ্টিতে অতি কম বোধ হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক ইহা বড় কম নহে, ইহা খুব অতিরিক্ত বলিয়াই দেহ মধ্যে অনুভূত হয়। এমন কি স্বভাবতঃ যাহার দেহে যতটুকু তাপ আছে তাহা হইতে যদি এক রেখা কি অর্দ্ধ রেখা মাত্রও কখন কমি বেশী হয়, তবে দেহের মধ্যে একরূপ হুলুস্থুল ব্যাপার উপস্থিত হয়। একজনের ॥ রেখা তাপ কম হইলে শরীর ঠাণ্ডা হইয়া অবসন্ন হয়, সেই টুক পূরণের নিমিত্ত আবার উক্ত প্রক্রিয়া করিতে

হয়, আবার কাহারও দেহে যদি অর্দ্ধ রেখা তাপ বৃদ্ধি পায় তখন জর হয় রক্ত রাশি উষ্ণতায় উত্তেজিত হইয়া মস্তকে উঠে, তখন শৈত্য ক্রিয়ারও প্রয়োজন হইয়া থাকে।

পৈত্তিক প্রকৃতি লোকের দেহে ঐরূপ প্রায় অর্দ্ধ রেখা পরিমিত তাপাধিক্য থাকে, সুতরাং তাহাদের দেহ সর্ব্বদাই কিছু উষ্ণবীর্য্য ও উত্তেজিত থাকে অগত্যা স্নায়ু সমূহও ঐ রূপই থাকে।

কোন বস্তু উষ্ণতা গুণ যুক্ত হইলে তাহার সূক্ষ্ম অবয়ব গুলি—(পরমাণু পুঞ্জ) বিশ্লিষ্ট হয়; কিন্তু উষ্ণতার মাত্রানুসারে ইহার তারতম্য আছে, উষ্ণতা যতই অধিক, ততই তাহার পরমাণু পুঞ্জের বিশ্লেষণ হইতে থাকে, এমনকি অত্যন্ত উত্তপ্ত হইলে সেই বস্তুর অবয়ব গুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া ক্রমে দ্রব, তরল, বাস্প, ও বিকীর্ণ হইয়া উড্ডীয়মান হয়, এবং তাপ যতই কম হয় ততই সেই বস্তুর পরমাণুরাশি ক্রমে পরস্পরে সংশ্লিষ্ট, ঘনীভূত ও সুদৃঢ় হইয়া থাকে; যেমন জলের বাস্পাবস্থা আর বরফ অবস্থা; জলে অতিশয় তাপ হইলে উহা বাস্পাকারে পরিণত হইয়া উড়ীয়া যায়, অবার তাপের অত্যন্ত হ্রাস হইলে ক্রমে বরফ বা শিলাবস্থায় পরিণত হয়। এইরূপ সর্ব্বত্রই জানিবে।

দেহ এবং দেহা-বয়ব-স্নায়ুমস্তিষ্কাদি সম্বন্ধেও ঐ রূপই বুঝিতে হইবে। দেহের মধ্যে যতই তাপাধিক্য, ততই স্নায়ু প্রভৃতির অবয়ব গুলি কিছু বিশ্লিষ্ট হইবে, আর যতই তাপের হ্রাস হইবে, ততই ঘনীভূত হইবে।

পিত্তাধিক-প্রকৃতির দেহে তাপাধিক্য প্রযুক্ত অবশ্যই স্নায়ু মস্তিষ্কাদির অবয়ব গুলি উত্তেজিত হইয়া তাহার পরমাণু-রাশি পরস্পরের সহিত অপেক্ষা কৃত একটু বিশ্লিষ্টভাবে থাকে। অবয়ব গুলি কিছু একটু বিশ্লিষ্ট হইলেই তাহারা আত্মারশক্তি-পরিচালনসম্বন্ধে আবশ্যক অপেক্ষায় কিছু অল্প পরিমাণে বাধা জন্মায়। অর্থাৎ আত্মার শক্তি উদ্রিক্ত হইয়া মস্তিষ্ক ও স্নায়ু প্রভৃতিতে আসিলে পর যে পরিমাণে বাধক বল পাইলে সেই বলটুকু রক্ষা করিয়া সে সম্মুখ পানে যাইতে পারে,—উপযুক্তমত বাধকশক্তির অভাবে (পূর্ব্বনিয়মানুসারে) ফস্‌কিয়া গিয়া দুর্ব্বল হইয়া না যায়,

পিত্তাধিক লোকের স্নায়ুসমূহ, ততটুক বাধা জন্মায় না। সুতরাং আত্মশক্তি ঐ রূপ বিশ্লিষ্টাবয়ব-মস্তিষ্ক ও স্নায়ুসমূহে সংক্রান্ত হইয়া উপযুক্ত বাধকতার অভাবে ক্ষীণবীর্য্য হইয়া যেন ফস্‌কিয়া যায়, কিন্তু খুব দ্রুত দ্রুত কার্য্য করে বটে;—ইহার ক্রোধ হইতেও অনেক কাল লাগে না, দয়া হইতেও অনেক কাল লাগে না, এইরূপ লোক যে কোন কার্য্য করে, তাহাই অতি চঞ্চলভাবে অতি শীঘ্র শীঘ্র করিয়া ফেলে। এইত গেল পৈত্তিক প্রকৃতির লোকের আভ্যন্তরিক তত্ত্ব।

পিত্তপ্রকৃতির লোক যদি পিত্তবর্দ্ধক কোন দ্রব্য আহার করে * অর্থাৎ যে বস্তুর দ্বারা শরীরে অধিক পরিমাণে উত্তাপ জন্মে এমত কোন দ্রব্য আহার করে, (লঙ্কা, গুড়, লবণ ইত্যাদি) তাহা হইলে তাহার পূর্ব্বাবস্থার আর একটু বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ স্বভাবাবস্থায় যে তাহার দেহে তাপাধিক্য থাকাতে আত্মার শক্তিগুলি উপর্যুক্ত মত বাধার অভাবে যেন একটু ফস্‌কিয়া গিয়া কিছু দুর্ব্বল ও ক্ষীণবীর্য্য হইতেছিল, সেই অবস্থাটি, গুড় লবণাদি উষ্ণবীর্য্য বস্তু আহার করা মাত্র ঐ সকল বস্তু শরীরের দ্বারা পরিগৃহীত হইয়া আরও অধিক তাপ সঞ্চয় হওয়ায় আরও বৃদ্ধি পায়, তখন তাহাই এক প্রকার দুঃখ বলিয়া অনুভূত হয়। তাই পিত্তাধিক প্রকৃতির লোকে অধিক গুড়, অধিক ঝাল, অধিক লবণাদি ভাল বাসে না ঐ সকল দ্রব্য উহাদের সুখপ্রদ হয় না।

---

* বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা বলিলে, শরীরের মধ্যগত এই বহিস্থ বায়ু পদার্থ, বা কেবল যকৃৎ হইতে ক্ষরিত তিক্ত রস বিশেষ, কিম্বা বাহিরের জল বুঝায় না। কিন্তু বাহিরের বায়ু জলাদির সাদৃশ্য লইয়াই ইহাদিগকে 'বায়ু' 'পিত্ত' 'কফ' বলা হয়। বাহ্যবায়ুর সাহায্যে বস্তুসকলের জলীয়াংশ-সমূহ বিশোষিত হইয়া উড়ীয়া যায়, এবং সেই বস্তুটা শুষ্ক হইয়া পড়ে, আর বায়ুর গতিদ্বারাই সচরাচর জলাগ্নি প্রভৃতির পরিচালনা দৃষ্ট হয়, এনিমিত্ত, ভুক্ত পীত দ্রব্য হইতে সমুৎপন্ন শরীরের যে জাতীয় পদার্থটি ঐরূপ গুণযুক্ত হয় তাহাকেই 'বায়ু' বলা হয়, অর্থাৎ শরীরে যে পদার্থ উৎপন্ন হইয়া দেহের জলাংশ বিশোষিত হয় দেহটা শুষ্ক বা রুক্ষ হয়, যে পদার্থ উৎপন্ন হইলে দেহের অপেক্ষাকৃত লঘুত্ব (হালকা ভাব) হইয়া দেহের পরিচালন শক্তি বাড়ে, এবং অন্যান্য রসধাত্বাদির বিপরীত মত পরিচালন ও হয় তাহার নাম 'বায়ু' এবং দেহস্থিত তাপক-

কিন্তু পিত্তাধিক প্রকৃতির লোকে যদি এমত কোন দ্রব্য আহার করে যদ্দারা মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলাদির অন্তর্নিহিত উত্তাপ একটু কম জন্মে একটু শীতবীর্য্য হয় তবে তাহার বিলক্ষণ সুখানুভব হয়।

দধি, কলায়ের দাইল প্রভৃতি দ্রব্যের মধ্যে ঐ জাতীয় পদার্থ অধিকমাত্রায় আছে। সুতরাং পিত্তাধিক প্রকৃতির লোক ঐ সকল দ্রব্য আহার করিবামাত্রেই স্নায়ু প্রভৃতি সমস্ত অবয়ব শীতবীর্য্য হয়, শীতবীর্য্য হইলেই, তাহাদের পরমাণুগুলি পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিক সংশ্লিষ্ট বা ঘনিষ্ঠ হয়, এবং উপযুক্ত মত ঘনিষ্ট হইলেই আত্মার শক্তি পরিচালায় উপযুক্ত বাধক হয়, এবং আত্মার শক্তি ও মস্তিষ্ক ও স্নায়ুসমূহাদিতে সংক্রান্ত হইয়া উপযুক্ত বাধক পাওয়া নিবন্ধন পূর্ব্বকার মত ফস্‌কিয়া বা ক্ষীণবীর্য্য, হইয়া নাগিয়া একটু অচঞ্চল ও বীর্য্যবত্তর অবস্থায় প্রবাহিত হইতে থাকে, ইহাও আত্মার শক্তির অনর্গলভাবে, অবাধে প্রতাহিত হওয়া; সুতরাং এই অবস্থাকেই সুখ বলা যায়; তাই পিত্তাধিকপ্রকৃতির লোকে দধি ও কলায়ের দাইল প্রভৃতি দ্রব্য আহার করিতে সুখানুভব করে।

(শ্লেষ্মাধিক প্রকৃতির দ্রব্য বিশেষের দ্বারা সুখ দুঃখ হয় কেন?)

যাহাদের শ্লেষ্মাধিক প্রকৃতি তাহাদের আবার আর এক রকম অবস্থা, তাহাদের শরীরটা সর্ব্বদাই শীতবীর্য্য থাকে, শারীরতাপ কিছু কম থাকে

পদার্থ বিশেষকেই 'পিত্ত' বলা যায়, যাহা হইতে পাকস্থলী—নিস্যন্দিত রস, যকৃৎ নিস্যন্দিত রস, চক্ষুর মধ্যগত তেজঃ-পদার্থ-বিশেষাদি উৎপন্ন হয়। শ্লেষ্মা বলিলেও দেহস্থিত এক প্রকার রস বিশেষ বুঝায়, তাহার বর্ণ স্ফটিকের মত এবং আকৃতি একটু বিজিল-বিজিল মত অথচ দ্রবাকার। ইহাই শাস্ত্রে লিখিত আছে। "রজোগুণময়ঃ সূক্ষ্মঃ শীতোরুক্ষো লঘুশ্চলঃ" (বায়ু) শার্ঙ্গধর সংহিতা। "নখলু পিত্ত ব্যতিরেকাদন্যো অগ্নিরিতি" (পিত্ত) শুশ্রুত। "কফঃস্নিগ্ধো গুরুঃ শ্বেতঃ পিচ্ছিলঃ শীতল স্তস" (কফ) শার্ঙ্গধর সংহিতা।"

অর্থাৎ প্রায় ১৮ শ্লেথার পরিমাণ থাকে। এ জন্তই পৈত্তিক প্রকৃতি অপেক্ষায় ইহাদের স্নায়ু মণ্ডলের অবয়বগুলি কিছু অধিক সংশ্লিষ্ট থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া যে ইহাদের স্নায়ু মণ্ডল অধিক পরিপুষ্ট থাকে তাহা কদাচ নহে, স্নায়ুর যেরূপ সঙ্গঠন আছে তন্মধ্যেই শীতবীর্য্যতা নিবন্ধন কিছু অধিক সংশ্লিষ্ট থাকে। এবং ঐ স্নায়ু প্রভৃতি শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শ্লেষ্মাকার-রস বিশেষের দ্বারা আপ্লুত ও জড়ীকৃত থাকে; এজন্ত এতদবস্থার লোকের স্বভাবতই আত্মার শক্তিগুলি পরিচালিত হইতে একটু বেশী বাধা পায়, কিন্তু সেবাধা এমন বাধানয় যে তদ্দারা আত্মার শক্তি বাধিত হইয়া উপযুক্ত মত পরিচালিত হইতে পারিতেছে না,—দুঃখাবস্থা হইতেছে; তবে এই বাধকতায় কেবল এইটুকমাত্র হইতেছে যে আত্মার শক্তিগুলি একটু ধীর-গম্ভীরভাবে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে এবং প্রায় উপযুক্ত মত উত্তেজনা ও হইতেছে।

এতদবস্থায় যদি এমত কোন দ্রব্য আহার করা হয়। যদ্দারা শরীরটা আরও অধিকতর শীতবীর্য্য হয়, আরও অধিক ফ্,র্ত্তি বিহীন হয়। এবং শ্লেষ্মানামক রস বিশেষ আরও অধিক মাত্রায় সঞ্চিত হইয়া সর্ব্ব দেহকে আরও অধিকতর আপ্লুত করে, আর ঐ সকল রসের স্বস্বন্ধাধীন স্নায়ু মণ্ডল আর ও জড়িত হইয়া পড়ে, তাহা হইলেই আত্মার শক্তিগুলি উপযুক্ত মত চলিয়া যাইতে পারেনা কারণ উপযুক্ত অপেক্ষায় অধিক পরিমাণের বাধা পায় সেই বাধিত ভাবাপন্ন আত্মার শক্তিকেই একরূপ দুঃখ বলা যাইতে পারে তাই দুঃখ ভাবেও অনুভব হয়, এবং সুখভাবের অনুভব ও হয় না।

এই জাতীয় দ্রব্য,—কলায়ের দাইল, দধি ইত্যাদি। এই জাতীয় দ্রব্য দ্বারা শরীরের মধ্যে মুখ্য কল্পে শ্লেষ্মানামক পদার্থই উৎপন্ন হইয়া শরীরটাকে অধিক শীতবীর্য্য করিয়া ফেলে, সর্ব্বশরীরকে যেন সেই রসদ্বারা প্লাবিত করে, স্নায়ুমণ্ডল জড়িত হইয়া যায়; অধিক পরিমাণে শীতল হয়; সুতরাং আত্মার শক্তির গতায়াতে অধিক পরিমাণ বাধা উপস্থিত হয়,—যেরূপ বাধা হইলে আত্মার শক্তির পীড়ন হয়; সুতরাং ঐ সকল দ্রব্য আহার মাত্রেই ঐরূপ প্রক্রিয়া হওয়াতে

সেই বাধাবস্থাপন্ন শক্তিকেই আত্মা একরূপ দুঃখ বলিয়া অনুভব করে, কেননা তাহার শক্তিগুলি অনর্গলভাবে চলিয়া যাইতে পারিতেছে না।

কিন্তু যদি ঐরূপ অবস্থার লোক এমত কোন দ্রব্য আহার করে যেদ্রব্য হইতে শরীর অধিক পরিমাণে উত্তাপ গ্রহণ করিতে পারে, তাহা হইলে আত্মার সুখাবস্থায়ই পরিণতি হয়। ইহা বিশেষ করিয়া বুঝান যাইতেছে,—লবণ, গুড়, ঝাল প্রভৃতি দ্রব্যগুলি অত্যন্ত উত্তেজক, ঐ সকল দ্রব্য আহার করা মাত্রেই স্নায়ুমণ্ডলের উত্তেজনা হইয়া জড়তা এবং গুরুত্ব বিনষ্ট হয়, সুতরাং স্নায়ু ও মস্তিষ্কাদি অংশগুলি পুর্ব্বের মত জড়ত্ব দূরিত হইয়া আত্মার শক্তির উত্তম পরিচালক হয়, আর তৎক্ষণাৎ আত্মার শক্তি সমূহ অনর্গলভাবে ইতস্ততঃ বিচলিত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে, এই অনর্গলভাবাপন্ন আত্মার নামই 'সুখ'। তাই শ্লৈষ্মিক প্রকৃতির লোকে অধিক মিষ্ট, অধিক লবণ ও অধিক ঝাল ভালবাসে।

কিন্তু বাতিক ও পিত্ত প্রকৃতি লোকেরও লবণ গুড়াদি পদার্থের অল্প মাত্রায় আবশ্যক আছে, এজন্য তাহারাও ঐ সকল দ্রব্য যতক্ষণ সেই সামান্য মাত্রায় খায়, ততক্ষণ সুখানুভব, আর তাহার অধিক হইলেই বিলক্ষণ দুঃখের অনুভব করিয়া থাকে, কিন্তু শ্লেষ্মাধিক প্রকৃতির লোকের আরও অধিক পরিমাণে লবণ গুড়াদির আবশ্যক আছে, এজন্য তাহারা পিত্তাধিক ও বাতাধিক প্রকৃতির লোক অপেক্ষায় অনেক অধিক পরিমাণে ঐ সকল দ্রব্য আহার করিতে ভালবাসে,—সুখী হয়, কিন্তু উপযুক্ত তাপের পরিপুরণ হইয়া গেলে আর সেই সকল দ্রব্য সুখকর মনে করে না,—দুঃখপ্রদ বলিয়াই অনুভব করে।

অতএব এখন নিশ্চয় জানা গেল যে আহার দ্বারা যে আমাদের এক এক প্রকার সুখানুভব বা দুঃখানুভব হইয়া থাকে তাহা, তাপাদি সংযোগে যেমন এক এক বস্তুর মধ্যে এক এক প্রকার গুণ বা শক্তি উৎপন্ন হয়;—যেরূপ তণ্ডুলের মাদকতা, কিম্বা দুগ্ধের অম্লতা, বা পুষ্প বস্ত্রাদির নীল পীতাদি রঙ্গ হয়, সেইরূপ কোন গুণ বা শক্তি নহে, কিন্তু আত্মারই একটু অনর্গল বা অবাধভাবে স্ফুরণাবস্থা আর বাধিতভাবা-রূ-ঠেকাঠেকা ভাবাপন্ন স্ফুরণাবস্থা মাত্র।

(প্রকৃতিভেদে আহার্য্য দ্রব্যের রসজনিত সুখ দুঃখের তারতম্য কারণ নির্ণয়।)

আহারের দ্রব্যের ভৌতিক অংশটী দ্বারা যে সুখ দুঃখ অনুভূত হয় তাহার অবস্থা অল্প বিস্তর দেখান গেল, এখন সেই আহার্য্য দ্রব্যের গুণ বা শক্তি অম্ল মধুরাদি রসের দ্বারা যে এক২ প্রকার সুখ দুঃখাদির অনুভূতি হয়, তাহাও যে আত্মারই অনর্গল অবস্থা আর বাধিত অবস্থা বিশেষ মাত্র, ইহাও সংক্ষেপে প্রতিপাদন করিতেছি শুন;—প্রথম রসটি কাহাকে বলে তাহা বলা আবশ্যক;—আমরা যে সকল বস্তু পান ভোজন করিয়া থাকি সেই সকল বস্তুর এক প্রকার শক্তি বিশেষের নাম 'রস'। ইহার বিশেষ বিবরণ উপাসনা পর্ব্বেই হইবে, অতএব এখন এ কথাটা স্বীকার করিয়াই লও। এই রস নামক শক্তি বিশেষের নানা প্রকার অবস্থা আছে,—অতিতীব্র অবস্থা, অতিমৃদু অবস্থা, ও মধ্যমাবস্থা ইত্যাদি। কোন রসশক্তি অতিশয় তীব্র কোন রসশক্তি অতিশয় মৃদু, আর কোন রসশক্তি মধ্যম। ইহার ও অবান্তরে আবার আরও অনেক প্রকার ভিন্নভেদ আছে। লবণ-রসশক্তি, আর কটু-রসশক্তি (ঝোল) অতিশয় তীব্র; তিক্ত, আর কষায় রসশক্তি অতিশয় মৃদু এবং মিষ্ট আর অম্লরস-শক্তি মধ্যম। ইহাদের ও বিমিশ্রণে আবার নানা প্রকার ভেদ হইয়া থাকে।

যে রসশক্তিটি অতিশয় তীব্র তদ্দ্বারা রাসনিক স্নায়ু-সমূহের মধ্যে তীব্র আঘাত লাগে, যে রসশক্তি অতিশয় মৃদু তাহার দ্বারা মৃদু আঘাত, আর যে রসশক্তি মধ্যম, তদ্দ্বারা মধ্যম-পরিমাণের আঘাত লাগে। আর যাহাদের স্নায়ু-সমূহ অধিক শীতবীর্য্য বা জড়িত বা গুরুত্ব বিশিষ্ট, তাহাদের স্নায়ু সমূহ অপেক্ষাকৃত কিছু তীব্র আঘাত পাইলে বিলক্ষণ উত্তেজিত এবং স্ফূর্ত্তি বিশিষ্ট হয়, সুতরাং আত্মার শক্তি পরিচালনের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়, কিন্তু ঐরূপ স্নায়ু সমূহে অতি মৃদু বা মধ্যম আঘাত লাগিলে তদ্দ্বারা না স্নায়ুরই উত্তেজনা হয়, না আত্মারই পরিচালনার সুবিধা হয়। আর যাহাদের

স্নায়ু সমূহ স্বভাবতঃই অত্যন্ত উষ্ণবীর্য্য বা উত্তেজিত, তাহাদের স্নায়ু সমূহে অতিশয় মৃদু আঘাত লাগিলে, তাহার উত্তেজনা বা উদ্রিক্ততা একটু কমে; স্নায়ুর উত্তেজনা একটু কমিলে আত্মার শক্তি পূর্ব্বের মত ফস্‌কিয়া না গিয়া সবল ভাবে বিসর্পিত হইতে পারে, (পৃ প) কিন্তু এতদবস্থায় যদি আরও অধিক তীব্র আঘাত লাগে। তবে যতই তীব্র আঘাত লাগিবে ততই অধিক উত্তেজিত হইবে। এবং আরও অধিক উত্তেজিত বা উষ্ণবীর্য্য হইলে স্নায়ুমণ্ডলের দ্বারা আত্মার শক্তি প্রবাহের বিশেষ ব্যাঘাত, তাহা হইলে, আত্মার শক্তি রীতিমত বিজৃম্ভিত হইয়া স্নায়ু সমূহের মধ্যে আসিয়া বলহীন হইয়া অতি চঞ্চলভাবে যেন ফস্‌কিয়া যায়। (পৃ প) আর যাহার স্নায়ু সমূহ স্বভাবতঃই কিছু দুর্ব্বল (মধ্যমবল) অর্থাৎ না অধিক উত্তেজিত বা উষ্ণবীর্য্য, এবং না অধিক শীতবীর্য্য বা জড়দশাপন্ন। তাহার স্নায়ু সমূহে যদি মধ্যম পরিমাণে বা মৃদু পরিমাণে আঘাত লাগে তবেই তাহার স্নায়ু সমূহ আর একটু বেশী শীতবীর্য্য হয়, আত্মার শক্তি পরিচালণায়ও সুবিধা হয় (পৃ প) আর যদি ঐ অবস্থার লোকের স্নায়ুসমূহের মধ্যে আরও অধিক গুরুতর আঘাত লাগে তবে আরও অধিক উত্তেজিত হইলে, তদ্দারা আত্মার প্রবাহে আরও অসুবিধা, অর্থাৎ ফস্‌কিয়া যায়, ক্ষীণবীর্য্য হইয়া যায়, (পৃ প)। এই কথা গুলি বেশ স্মরণ রাখিয়া এখন রসের বিষয় শুন ;—

(শ্লেষ্মাধিক প্রকৃতির রসবিশেষে সুখ দুঃখের কারণ নির্ণয়।)

শ্লেষ্মপ্রধান প্রকৃতির স্নায়ুগুলি স্বভাবতঃ কিছু অধিক পরিমাণে শীতবীর্য্য, জড়িত ও গুরুত্বভাবাপন্ন থাকে (পৃ প) এই অবস্থার যদি তাহার রসনাদি বিসর্পিত ঝাল কিম্বা লবণ রসের সেই তীব্র আঘাত লাগে তবে স্নায়ুর মধ্যে পূর্ব্বাপেক্ষায় আর একটু চেতিয়া উঠে, একটু উষ্ণবীর্য্য এবং উত্তেজিত ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়, সুতরাং তখন আত্মার গতায়াতে অতিরিক্ত বাধা কাটিয়া গিয়া উপযুক্ত মত বাধক হয়, অর্থাৎ আত্মার উত্তম পরিচালক হয়। তখন আত্মা

উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি ও বলের সহিত ঐরূপ স্নায়ুমণ্ডলের দ্বারা অনর্গল ভাবে চলিতে থাকে; সেই অবস্থার নামই রসজনিত সুখ, সুতরাং শ্লেষ্মাধিক প্রকৃতির লোকে ঝাল ও লবণ রসের আস্বাদের আত্মাকেই সুখ বলিয়া অনুভব করে। কিন্তু ঝাল লবণাদি রসের দ্বারা যদি এত অধিক উত্তেজনা হয় যাহাতে আত্মার শক্তিপরিচালনার উপযুক্ততা ছাড়াইয়া যায়, তাহা হইলে আবার আত্মা বাধা পায়, এ নিমিত্ত তখন দুঃখ বলিয়াই আত্মার অনুভূতি হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মাধিক প্রকৃতির লোক যদি মধুর বা অম্ল রস খায়, তাহা হইলেও ঐ পূর্ব্বোক্ত মত ক্রিয়াই হয়; ইহার—কারণ এই যে, অম্ল ও মধুর রসের আঘাত, লবণরসও কটু অপেক্ষায় কিছু মৃদু হইলেও, শ্লেষ্মাধিক প্রকৃতির লোকের স্নায়ুর উত্তেজনা করিতে পারে; কারণ উহারা মধ্যম পরিমাণের আঘাতপ্রদ রস; এইজন্য মধুর ও অম্ল রসও শ্লেষ্মাধিক প্রকৃতির সুখপ্রদ বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু তিক্ত বা কষায়রস নিতান্ত মৃদু আঘাতজনক, এজন্য তদ্দ্বারাশ্লেষ্মাধিক প্রকৃতির স্নায়ুর বিশেষ উত্তেজনা হয় না, আত্মার শক্তিও বেশ অনর্গলরূপে চলিবার মত উপায় উৎপন্ন হয় না; তাই সুখানুভব বড় হয় না। সুতরাং শ্লেষ্মাধিক প্রকৃতির লোক তিক্তরস বড় পছন্দ করে না। ইহার মধ্যে আরও বহুতর কথা আছে, তাহা "অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে" শুনিতে পারিবে। এখন পিত্তাধিক প্রকৃতির কথা শুন।

(পিত্তাধিক প্রকৃতির রসবিশেষে সুখ দুঃখের কারণ নির্ণয়।)

পিত্তাধিক প্রকৃতির লোকের স্নায়ু সমূহ যখন স্বভাবতঃই অধিক উত্তেজিত বা উষ্ণবীর্য্যতাপন্ন থাকে, আবার তিক্ত ও কষায় রসের দ্বারাও মৃদু মৃদু আঘাত হয়; সুতরাং পিত্তাধিক প্রকৃতির লোক তিক্ত কষায় রস গ্রহণ করা মাত্র স্নায়ুমণ্ডলে অতিশয় মৃদু আঘাত লাগিয়া, ফোঁড়ার উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইলে যেরূপ হাত বুলানর সেই মৃদু আঘাতের দ্বারা অতিস্বল্পকালের জন্য যে সেইখানকার স্নায়ু-রাশির উত্তেজনা একটু কম বোধ হয়, সেইরূপ রসনাবিসর্পিত স্নায়ু-সমূহের উত্তেজনা একটু কমে; তখন সহজ অবস্থায় আইসে, অর্থাৎ স্নায়ুসমূহ যতটুকু উত্তেজিত

থাকিলে আত্মা বিলক্ষণ মত চলিয়া যাইতে পারে, পূর্ব্বোক্তমতে ক্ষস্কিয়া না যায় ততটুকু উত্তেজনা হয়। অতএব আত্মার সেই অবস্থাকেই সুখ বলিয়া অনুভব করা হয়। কিন্তু যদি ঝাল বা লবণ রসের আঘাত পায়, তবে পিত্তপ্রকৃতির রাসনিকস্নায়ুসমূহ আরও অধিক উত্তেজিত হইয়া উঠে; কারণ ঐ রসদ্বয় অতিশয় তীব্র, সুতরাং পূর্ব্ব নিয়মানুসারে (পৃ প) আত্মার পরিচালনায় আরও ব্যাঘাত হয়, তাই তখন সেই ব্যাঘাতপ্রাপ্ত আত্মাকেই একরূপ দুঃখ বলিয়া অনুভব করা হয়। তাই পিত্তপ্রকৃতির লোক ঝাল লবণরস পছন্দ করে না। পিত্তাধিক প্রকৃতির সম্বন্ধে অম্ল ও মধুর রস দ্বারাও প্রায় ঐরূপ ক্রিয়াই হয়, কারণ তাহারা মধ্যম মাত্রায় আঘাতপ্রদ শক্তি, এনিমিত্ত ঐ রসও তাহারা বড় ভাল বাসে না। তবে অতি সামান্য মাত্রায় সকলেই সকল রস ভাল বাসিতে পারে, কারণ তীব্র আঘাতপ্রদ শক্তিও অতিঅল্প মাত্রায় প্রযুক্ত হইলে অতিঅল্প পরিমাণেই আঘাত প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

(বাতাধিক প্রকৃতির রসবিশেষে সুখ দুঃখের কারণ নির্ণয়।)

এইরূপ, বায়ু প্রকৃতির লোকের স্নায়ুসমূহ স্বভাবতঃই কিছু ক্ষীণবীর্য্য ও শ্লথভাবাপন্ন থাকা নিবন্ধন আত্মার পরিচালন করিতে উপযুক্ত মত সমর্থ হয় না, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি (পৃ—প) এই অবস্থায় মধ্যম আঘাতপ্রদ মধুর আর অম্লরস গ্রহণ করিলে রাসনিক স্নায়ুর মধ্যম উত্তেজনাবস্থা হয়; সুতরাং আত্মার গতির পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। ইহাই একপ্রকার অনর্গলতা হওয়া—ইহাই একপ্রকার সুখ হওয়া। কিন্তু বাতিক প্রকৃতির লোক কটুরস বা লবণরস গ্রহণ করিলে তদ্দারা তাহার রাসনিক স্নায়ুসমূহ অধিক পরিমাণ আঘাতপ্রাপ্ত হইল, সুতরাং অধিক উত্তেজিত হয়, অতএব আত্মশক্তির পরিচালনায় পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে (পৃ—প) আরও উহাদ্বারা অধিক অসমর্থ হয়, আত্মা উপযুক্ত বেগের সহিত পরিচালিত হইতে পারে না; তাহাই আত্মার একরূপ বাধিত অবস্থা, একরূপ দুঃখাবস্থা বলিয়া অনুভূত হয়; তাই বাতাধিক প্রকৃতির লোক ঝালও

লবণরস বড় ভালবাসে না। আর যদি কষায় বা তিক্তরস গ্রহণ করে, তাহা হইলেও উহার মৃদু আঘাতের দ্বারা উহার উত্তেজনা কিছুই বৃদ্ধি পায় না, সুতরাং তদ্দ্বারাও আত্মার পরিচালনায় বিশেষ কোনই সুবিধা হয় না, অতএব তিক্ত কষায়রসও বড় একটা পছন্দ করে না।

এখনও বুঝা উচিত যে তীব্র মাত্রায় আঘাত জনক রসশক্তি হইলে ও তাহার আবার অতি স্বল্প মাত্রায় গ্রহণ করিলে আর তীব্র আঘাত পাওয়া যায় না, সুতরাং তদ্দ্বারা আত্মার বাধিত ভাব হয় না, সুতরাং দুঃখও হইবে না।

অতএব রসজনিত সুখ দুঃখও আত্মার মধ্যে কোন গুণ বা শক্তি বিশেষ জন্মে না, উহা আত্মার অনর্গলভাবে এবং বাধিতভাবে স্ফূরণাবস্থা মাত্র ইহা নিশ্চয় জানা গেল।

অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে এ সকল বিষয় আরও পরিষ্কার করিয়া দেখানর ইচ্ছা থাকিল।

(ব্যক্তিভেদে গন্ধাদিজনিত সুখ দুঃখের ভিন্নতার কারণ নির্দ্দেশ।)

রসজনিত সুখদুঃখের ন্যায়ই গন্ধাদি জনিত সুখদুঃখাদি বিষয়ে ও বুঝিতে হইবে। গন্ধাদিও নানা প্রকার আছে, এবং সকল প্রকার গন্ধাদিতেও সকল ব্যক্তির দুঃখানুভব বা সুখানুভব হয় না। আবার কতকগুলি গন্ধ আছে, যাহাতে সকলেরই সুখানুভব হয়, আর কতকগুলি গন্ধ আছে, যাহাতে সকলেরই দুঃখানুভব হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য নিম্নে বিবৃত করিতেছি।—বাস্তবিক, গন্ধদ্বারা ও আত্মার মধ্যে কোন প্রকার গুণ বিশেষ বা শক্তি বিশেষ উৎপন্ন হয় না,—যাহাকে আমরা গন্ধাদিজনিত সুখ বা দুঃখ বলিয়া অনুভব করিয়া থাকি, কিন্তু এক এক গন্ধাদিদ্বারা আত্মার এক এক প্রকার অনর্গল বা অবাধিত অবস্থা, আর বাধিত অবস্থা বা ঠেকা ঠেকা অবস্থা মাত্র হয়, তাহাই সুখ ও দুঃখ বলিয়া আমরা অনুভব করিয়া থাকি। আবার অনেক প্রকার গন্ধ আছে যাহা এক এক ব্যক্তির পক্ষে এক এক রকম অনুভূত

হইয়া থাকে। ইহার নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝিবার পূর্ব্বে প্রথম গন্ধ পদার্থটি বুঝিয়া লও ;—প্রায় সমস্ত বস্তুরই অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসংখ্য অণুরাশি সর্ব্বদা চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া উড়ীয়া বেড়াইতেছে ; ঐ সকল দ্রব্যের সন্নিধানে থাকিলে উহাদের সেই পরম সূক্ষ্ম অণুরাশি,—যাহা চক্ষুর দ্বারাও লক্ষ্য করা যায় না, সেইগুলি উড়ীয়া গিয়া, যেরূপ আমাদের সর্ব্বাঙ্গে সংলগ্ন হইয়া থাকে, তেমন নাসিকা বিবরেও প্রবেশ করে, তৎপর সেই অণুরাশি হইতে এক প্রকার শক্তি গিয়া প্রথম আমাদের নাসিক্য স্নায়ুকে আঘাত করে, তৎপর তাহার জ্ঞানের ক্রিয়া হয়। এইরূপ শক্তি বিশেষের নাম 'গন্ধ'।

এই গন্ধাত্মক শক্তির ও তীব্রত্ব, মৃদুত্ব ও মধ্যমত্ব আছে,—কোন গন্ধ অতীব তীব্র, কোন গন্ধ নিতান্ত মৃদু, আর কোন গন্ধ শক্তি মধ্যম। যে গন্ধশক্তি স্নায়ুর মধ্যে তীব্র আঘাত করে তাহাই তীব্র, যে গন্ধশক্তি মৃদু আঘাত করে তাহা মৃদু, আর যাহা মধ্যম আঘাত করে তাহা মধ্যম। গোলাপ ও যাতি পুষ্পাদির গন্ধ অতিশয় মৃদু আঘাত করে, হিঙ্গ পলাণ্ডু, ও চম্পকাদির গন্ধ অতিশয় তীব্র আঘাত করে, এবং বকুল ও আম্র মুকুলাদির গন্ধ মধ্যম আঘাত করে।

অতএব পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে পিত্তাধিক প্রকৃতি লোকের পক্ষে গোলাপাদির গন্ধ সুখ জনক অর্থাৎ তাহার আত্মার অনর্গলভাবে গতিজনক ; তাই ঐ জাতীয় গন্ধ পিত্তাধিক লোকে ভাল বাসে। আর পলাণ্ডু প্রভৃতির গন্ধ তাহার পক্ষে একরূপ দুঃখ জনক; অর্থাৎ নাসিক্য স্নায়ুর দ্বারা আত্মার শক্তি প্রবাহের বাধা জনক, চম্পকাদির গন্ধ ও কতক পরিমাণে ঐ রূপ বটে, তাই ঐ সকল গন্ধ সে বড় ভাল বাসে না।

এইরূপ শ্লেষ্মাধিক লোকের পক্ষে চম্পকাদির গন্ধ সুখ জনক, অর্থাৎ তাহাদের নাসিক্য স্নায়ুর দ্বারা আত্মার গতি বিধির অনর্গলতাজনক ; আর বকুলাদির গন্ধও কতক পরিমাণে বটে, কারণ তাহাদের ও গন্ধ শক্তি মধ্যম আঘাত করে। কিন্তু গোলপাদির গন্ধ তাহার পক্ষে এক হিসাবে দুঃখজনক, অর্থাৎ আত্মার শক্তির, নাসিকা-স্নায়ুর দ্বারা, গতি বিধি করিতে কিছুই উপকারকতা জন্মায় না, তাই শ্লেষ্মাধিক প্রকৃতির লোক

চম্পকাদির গন্ধ ভাল বাসে, এবং গোলাপাদির গন্ধটা বড় বিশেষ পছন্দ করে না ; যে হেতু ঐরূপ মৃদু গন্ধ তাহাদের শানায় না।

এবং বাতাধিক প্রকৃতির লোকের পক্ষে বকুলাদির গন্ধ সুখ জনক অর্থাৎ ঐ জাতীয় গন্ধ দ্বারা তাহাদের শক্তি নাসিকা-স্নায়ুপথে অনর্গল ভাবে যাইতে পারে, আর চম্পকাদির গন্ধ একরূপ দুঃখ জনক, অর্থাৎ আত্মপ্রবাহের একরূপ বাধাজনক, আর গোলাপাদির গন্ধ না বাধাজনক, না বিশেষ উপকারক, এ নিমিত্ত বাতাধিক প্রকৃতির লোক চম্পকাদির গন্ধ ভাল বাসে না, গোলাপাদির গন্ধও তত গ্রাহ্য করে না, কিন্তু বকুলাদির গন্ধই বিশেষ পছন্দ করে।

তীব্র মধ্যম ও মৃদু গন্ধের ও আবার মাত্রার তারতম্য আছে, অর্থাৎ তীব্র গন্ধ ও অতি অল্প হইলে অতি মৃদু হইতে পারে, মৃদু গন্ধও অতিশয় হইলে আতীব তীব্র হইতে পারে, আবার মধ্যম গন্ধ ও অতিশয় বা অল্পমাত্রায় হইলে তীব্র বা মৃদু হইতে পারে, সেই জন্য মাত্রার তারতম্যে সকল প্রকার গন্ধই সকল সময় সকলেরই স্পৃহণীয় বা অস্পৃহণীয় হইতে পারে। ইহার বিস্তার অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে হইবে। ফলতঃ ইহা দ্বারাই বোধ হয় তুমি বুঝিতে পারিলে যে, গন্ধদ্বারা যে সুখ দুঃখানুভূতি হইয়া থাকে তাহা কোন গুণ বিশেষ বা শক্তি বিশেষ নহে, কিন্তু আত্মারই অনর্গল অবস্থা আর বাধিত অবস্থা মাত্র।

শিষ্য।—একটি কথা না জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিতে পারিলাম না, আপনি বলিলেন শ্লেষ্মাধিক প্রকৃতির লোকের স্নায়ু-মণ্ডল স্বভাবতঃই শীতবীর্য্য ও জড়িত এবং গুরুত্ব ভাবাপন্ন থাকে, এতদাবস্থায় তীব্র গন্ধ শক্তির আঘাত দ্বারা তাহার উত্তেজনা হইয়া আত্মার পরিচালনার বিশেষ সুবিধা হয়, এজন্য শ্লেষ্মাধিক প্রকৃতির লোকের পক্ষে তীব্র গন্ধ সুখজনক গন্ধ বলা হয়, যদি তাহাই হয় তবে মলমূত্রাদির গন্ধ অবশ্যই অতিশয় তীব্র বটে, ঐ গন্ধ শ্লেষ্মাধিক প্রকৃতির পক্ষে স্নায়ুর উত্তেজক হইয়া আত্মার অনর্গল পরিচালক হয় না কেন? অর্থাৎ আপনার মতের সুখজনক হয় না কেন?

আচার্য্য।—প্রাসঙ্গিক সকল কথার মীমাংসা করিতে হইলে মুখ্য বিষয়

সুদূর পরাহত হয়। যাহা হউক তথাপি তোমাদের অনুরোধে কিছু কিছু বলিতে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যে সকল বস্তুর গন্ধ আমরা পাই, ঐ সকল বস্তুর অতি সূক্ষ্ম অণুরাশি আমাদের নাসিকা রন্ধ্রে প্রবেশ করে। মল মূত্রাদি অত্যন্ত বিষাক্ত পদার্থ, উহার অণুরাশি নাসিকা বিবরে প্রবেশ পূর্ব্বক স্নায়ুর মুখগুলি অবসন্ন করিয়া ফেলে সুতরাং তাহাতেই তীব্র দুঃখের অনুভূতি হয়, কারণ বিষ আত্মার শক্তি পরিচালনার তীব্রতর বাধাপ্রদান করে। অতএব আর সুখ হইবে কোথা হইতে?

রসও গন্ধের ন্যায় রূপ, স্পর্শ ও শব্দজনিত সুখ দুঃখ বিষয় ও জানিবে। রূপ, স্পর্শ এবং গন্ধ ও এক একটি শক্তি বিশেষ ইহাদের ও তীব্রত্ব, মৃদুত্ব ও মধ্যমত্ব আছে, ইহারা ও স্নায়ু সমূহে সংস্পৃষ্ট হইলে তীব্র আঘাত, মৃদু আঘাত ও মধ্যম আঘাত করিয়া থাকে, সেই আঘাতের দ্বারাও স্নায়ুসমূহের উত্তেজনাদি হইয়া থাকে, এবং শ্লৈষ্মিকাদি এক এক প্রকৃতি অনুসারে এক এক প্রকার রূপস্পর্শাদি আমাদের সুখজনক হয়, অর্থাৎ আত্মার অনর্গলভাবে পরিচালক হয়, আর এক এক প্রকার প্রকৃতি অনুসারে আমাদের দুঃখজনক হয়, অর্থাৎ আত্মার বাধাদায়ক হয়।

অতএব ইহা নিশ্চয় হইল যে, সুখ নামে বা দুঃখ নামে কোন একটা গুণ বা শক্তিবিশেষ নাই, আত্মারই অনর্গল বা অবাধিত অবস্থার নাম 'সুখ,' আর আত্মারই বাধিত অবস্থা বা ঠেকাঠেকা অবস্থাটার নাম 'দুঃখ'। সুখদুঃখ যদি বাহিরের বস্তু দ্বারা নূতন কোন একটা গুণ বা শক্তিবিশেষ আত্মাতে উৎপন্ন হইত, তবে সকল প্রকার বস্তু দ্বারাই সকলের সমান সুখ দুঃখ হইত, এবং যে বস্তুদ্বারা সুখ হয় সেই বস্তু, আর পুরাতন না হইয়া সর্ব্বদাই সুখপ্রদ হইত, যে শয্যাসনাদি ব্যবহারে আজ সুখ বা দুঃখবোধ হইল, ঠিক সেই শয্যাসনাদি ব্যবহারে ঠিক সেই একইরূপ সুখ দুঃখ সর্ব্বদাই হইত, কিছুদিন সুখবোধ বা দুঃখবোধ হইয়া আর তাহাতে অরুচির কোনও কারণ ছিল না, ইত্যাদি আরও অনেক কথা আছে। *

---

* সুখ দুঃখাদি বিষয় যাহা কিছু বলিতেছি ও বলিব কেবল যতটুকু প্রসঙ্গ ক্রমে ধর্ম্মব্যাখ্যায় প্রয়োজনে আসিবে তাহাই। আমার "অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে"

(সুখদুঃখ সর্ব্বদা থাকেনা কেন ?)

শিষ্য।—সুখদুঃখ যদি আত্মারই অনর্গল অবস্থা আর বাধিত অবস্থা মাত্র হইল, অর্থাৎ আত্মা হইতে বিভিন্ন কোন গুণ বা শক্তিবিশেষ না হইল, তবে আত্মা যেরূপ সর্ব্বদাই থাকে, তেমন সুখদুঃখাদিও সর্ব্বদা থাকিবে না কেন।

আচার্য্য।—এ প্রশ্ন নিতান্ত ভ্রান্তিদৃষ্টি হইতে প্রসূত হইল, আত্মার শক্তি যখন বাধিত ভাবে চলিতে থাকে কিম্বা একবারেই ঠেকিয়া থাকে, সেই অবস্থার নাম 'দুঃখ' ইহা সর্ব্বদা চিরস্থায়ী হইবে কেন? আত্মার সেই বাধাটা বিদূরিত হইলেই ত সেই বাধাবস্থা বা ঠেকা ঠেকা অবস্থাটা গেল, সুতরাং দুঃখও গেল। এবং আত্মার অনর্গল অবস্থার নাম যখন 'সুখ' তখন তাহাই বা চিরস্থায়ী হইবে কেন? আত্মার সেই অনর্গল অবস্থাটি বিদূরিত হইয়া আত্মার কোন প্রকার সার্গল অবস্থা, অর্থাৎ বাধিত অবস্থা হইলেই সেই সুখাবস্থা অতীত হইল। আবার, কি সুখাবস্থা কি দুঃখাবস্থা, কিছুকাল থাকিয়া যখন তাহার নূতনত্ব বিনষ্ট হইলে সেই অবস্থাটি একবার অভ্যস্ত হইয়া গেল, তখন সেই অবস্থাই আত্মার স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে গণ্য হয়; সুতরাং অন্য সময়ের স্বাভাবিক অবস্থায় যেমন আমাদের আত্মা—'আমি'—গ্রাহে আসে না, তেমন ঐ অবস্থাও আর গ্রাহে আইসে না, তাই সেই সুখদুঃখ আর বুঝিতে পারা যায় না, তাই সুখদুঃখ ক্ষণস্থায়ী হইয়া থাকে। সুখদুঃখ নামে যদি কোন গুণ আত্মাতে জন্মিত, তবে কদাচ ঐরূপ ক্ষণ-ভঙ্গুর হইতে পারিত না, উহা আত্মার জীবন পর্যন্তই থাকিত।

যাহা ধর্ম্মব্যাখ্যা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস হইবে তাহাতে অতি বিস্তৃত ভাবে যাবতীয় সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া নূন্যাধিক এইরূপ আট দশ খণ্ডে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিব। এখন মঙ্গলময় ভগবানের কৃপা থাকিলেই সমস্ত আশা পূর্ণ হয়।

(ধর্ম্মব্যাখ্যার প্রত্যেক কথায়-শাস্ত্রীয় বচন দেওয়া হয় না কেন ?)

শিষ্য।—এখন আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব, অনুগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন, আপনি মুখে বলেন "শাস্ত্রার্থের ব্যাখ্যা করিতেছি" কিন্তু কার্য্যে তো তাহার বড় কিছু দেখি না। কারণ আপনার প্রতি কথায় শাস্ত্র প্রমাণ দেখান হয় নাই, আর সঙ্গে২ শাস্ত্রপ্রমাণ নাথাকিলেইবা কেবল কপোলকল্পিত হইলে এতগুলি কথা বিশ্বাস করা যায় কিরূপে? আপনি সুখদুঃখাদি সম্বন্ধে এত কথা বলিলেন, কৈ, ইহাতে তো শাস্ত্রের প্রমাণ একটিও দিলেন না; কেবল এখানে নয়; ধর্ম্মব্যাখ্যায় সর্ব্বত্রই এইরূপ দেখিতেছি।

আচার্য্য।—কেন? সুখদুঃখের স্বরূপ নির্ণয়ে দুটি প্রমাণ তো দেখাইয়াছি? "বাধনা লক্ষণং দুঃখম্" "প্রতিকূলবেদনীয়ং সুখম্"। পূর্ব্বেও প্রত্যেক সিদ্ধান্তের মূলেতো শাস্ত্রীয় প্রমাণ বলিয়াছি। কোন কথারই মূলটাতো আমার কল্পিত নহে, কেবল বিস্তার আকৃতিটি মাত্রই আমাদের কৃত।

শিষ্য।—তাহা হইলে চলিবে না, প্রত্যেক কথায় শাস্ত্রীয় প্রমাণ সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধৃত করিলে তবে তাহা শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য করিব।

আচার্য্য।—এবার আমাকে নিরুত্তর করার গতিক করিয়াছ, কারণ এ অভাব মোচনের আর কোন উপায়ই দেখিতে পাই না। উপায় কেন দেখি না তাহা বলিতেছি শুন,—পূর্ব্বকার লোক গুলিকে তোমরা বুদ্ধিমান্ই বল আর নির্ব্বোধই বল, কিন্তু এই একটি ক্ষমতা ছিল যে তাঁহারা অল্প কথায়ই এক একটি বিষয় বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেন; তৎপর যখন লোক সকল ক্রমে ক্রমে, বেশী বুদ্ধিমান্ই বল আর কম বুদ্ধিমান্ই বল, ফলতঃ অন্য রকম হইতে লাগিল, তখন সেই মূল কথা গুলিরই আর একটু বিস্তৃতি করার প্রয়োজন হইল। তৎপর যখন আর একটু অন্য রকম হইল, তখন আরও বিস্তৃতির প্রয়োজন হয়, এইরূপ

ক্রমে শিষ্যদিগের বুদ্ধির, বৃদ্ধি বল আর ক্ষয়ই বল, অবস্থান্তর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই মূল কথাটিরই প্রকাণ্ড বিস্তৃতি হইয়া পড়ে। মনে কর, ভগবান্ পতঞ্জলি দেব প্রথম কিঞ্চিৎ ন্যূন ২০০ শত সূত্রের দ্বারা একখানি পাতঞ্জল দর্শন প্রণয়ন করেন,—যাহা লিখিতে গেলে দুই পৃষ্ঠাতেই সমাপ্ত হয়, এখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে পতঞ্জলি দেব, যখন ঐ দুপাতায় একখানি দর্শন শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া ছিলেন, তখন শিষ্যগণ তদ্দ্বারাই তাঁহার সমস্ত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বুঝিতে না পারিলে পতঞ্জলি দেব উন্মত্ত প্রলাপের সদৃশ কতকগুলি বর্ণমালা লিখিবেন, বা বলিবেন কেন? অন্যকে বুঝানর নিমিত্তই সকলে গ্রন্থ করিয়া থাকে, কেহই না বুঝিলে তবে অদ্যাপি সেই গ্রন্থ থাকিবেই বা কেন, আর বেদব্যাসাদি গুরুদেবগণ উঁহার ভাষ্যই বা কি প্রকার করিলেন।

তৎপর বহুদিন পর যখন পাঠকদের ও শিষ্যদের বুদ্ধি অন্য রূপ হইয়া গেল, তখন ঐ পাতঞ্জল দর্শনের কথা সর্পের মন্ত্রের ন্যায় হইয়া উঠিল, কেহ আর তাহাতে দন্তস্ফুট করিতে পারে না, সুতরাং পরম কারুণিক ভগবান্ বেদব্যাস দেব তাহার (সেই মূলের) বিস্তৃতি করিয়া, নূতন কোন কথা বলিয়া নহে—যাঁহা সেই মূলে আছে তাহারই একটু দীর্ঘাকার করিয়া, বুঝাইয়া দিলেন তাহারই নাম ‘পাতঞ্জল ভাষ্য’ যাহার আয়তন ঐ প্রকার পত্রের ১৫০ পৃষ্ঠা হইবে! তৎপর কালক্রমে শিষ্য পাঠকদের বুদ্ধি আরও পরিবর্ত্তিত হইল, তখন সেই ভাষ্যও দন্ত বেধের অযোগ্য হইয়া পড়িল, তখন গুরুদেব বাচস্পতি মিশ্র আবার সেই ভাষ্যেরই একটু দীর্ঘাকার করিলেন, একটু বিস্তৃতি করিলেন, কিন্তু নূতন একটি কথাও বলিলেন না। ইহার নাম্ পাতঞ্জল ভাষ্য টীকা, ইহার আয়তন ভাষ্যের দ্বিগুণ হইবে।

এখন আবার বুদ্ধির উন্নতিই বল, আর অবনতিই বল, এতই পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, সেই টীকাতেও প্রায় লোকেরই প্রবেশ করার ক্ষমতা নাই; দর্শনের টীকাতো দূরের কথা কাব্যালঙ্কারাদি গ্রন্থ,—যাহা বোধ হয় কেবল এক মাত্র নিদ্রাদেবীরে সাহায্যের নিমিত্তই, অর্থাৎ যাহাদের সর্ব্বদা বুদ্ধি

পরিচালনা করিতে করিতে উগ্রতাপ্রযুক্ত নিদ্রা আইসে না, কেবল তাহাদের সুনিদ্রাকর্ষণের নিমিত্তই, প্রণীত হইয়াছে, সেই কাব্যালঙ্কারাদিরই আবার টীকার টীকা তস্য টীকা ও অনুবাদের অনুবাদাদি নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে, নচেৎ তাহাতেও সাধারণের প্রবেশ করা অসাধ্য ; সুতরাং আমরা আবার সেই মূল, ভাষ্য ও টীকাদির এক একটি পংক্তিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক এক গ্রন্থাকারে বিস্তৃত ও দীর্ঘাকৃতি করিয়া তোমাদিগকে বুঝানের চেষ্টা করিতেছি, এখন যদি আপত্তি কর যে এই বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রত্যেক কথার পৃষ্ঠে এক একটি শাস্ত্রীয় বচন দিতে হইবে, তবে আমি তাহা কোথায় পাইব ? ঋষিগণের সময়ে যদি এখনকার মত বুদ্ধি হইত, তাহা হইলে ঋষিগণ এখনকার বুঝিবার উপযুক্ত মত এক এক কথাকেই অতি সুদীর্ঘ করিয়া বুঝাইয়া দিতেন, আমিও এখন তোমাদিগকে বুঝানর সময় কথায় কথায় বচন তুলিয়া বুঝাইতে পারিতাম। কিন্তু তখনকার কালেরই এরূপ নিয়ম ছিল যে, তখন এক একটি কথার মধ্যেই অনেকগুলি কথা পূরিত থাকিত। এই জন্য আমরা সুখদুঃখ সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যতগুলি কথা বলিলাম এই সমস্তগুলি কথা পূরিয়া রাখিয়াই ঋষিগণ "বাধনালক্ষণন্দুঃখম্" "প্রতিকূল বেদনীয়ং সুখম্" এই দুটি কথা বলিয়াছেন, এখন আমাদের কথারদ্বারা সেই সূক্ষ্ম কথাগুলিই, জলসেকাদি প্রক্রিয়াদ্বারা যেরূপ অতি ক্ষুদ্র চারাবৃক্ষ হইতে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষাদি উৎপন্ন হয়, এবং ঐ প্রকাণ্ড বৃক্ষের প্রত্যেক অবয়বগুলি যেমন চারা বটবৃক্ষের অবয়ব হইতে অতিরিক্ত কিছুই না, কেবল তাহারই বিস্তৃতিমাত্র তেমন, অতিবিস্তৃতাকারে পরিণতমাত্র হইতেছে। অতএব আমার এই বিস্তৃতাবয়ব কথার প্রত্যেক কথায় বচন তোলা এককালে অসম্ভব। কিন্তু আমরা মূল কথার প্রত্যেক কথারই প্রমাণ তুলিয়াছি এবং ভবিষ্যতেও তুলিব।

মানসিক প্রত্যক্ষই অধ্যাত্ম বস্তুর মুখ্য প্রমাণ।

শিষ্য। মহাশয় যাহা বলিলেন তাহা বেশ বুঝিলাম, তৃপ্তিলাভও করিলাম। পরন্তু, কেবল বিচার তর্কের দ্বারা, যে বিষয় মীমাংসা করা হয়; তাহাতে সর্ব্বদাই একটা গুরুতর সন্দেহ আছে। আমার মনে হয়, যে, আপনি যে সকল বিষয় মীমাংসা করিয়া আমাকে বুঝাইলেন, হয়ত, কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার সুতীক্ষ্ণ ধীশক্তি প্রভাবে এই সকল সিদ্ধান্তগুলি খণ্ডিত করিয়া আর এক মতের সংস্থাপন করিতে পারেন, আবার হয়ত তাঁহা হইতে বিচক্ষণ আর এক ব্যক্তি ঐ মতেরও খণ্ডন পূর্ব্বক নূতন মত সংস্থাপন করিতে পারেন, অতএব কেবল বিচার তর্কজনিত মীমাংসায় নির্ভর করিয়া কিরূপে চলা যায়। তাই শাস্ত্রীয় প্রমাণ চাহিয়াছিলাম। অবশ্যই, শাস্ত্রের প্রতিও যে আমাদের তর্ক-নিরপেক্ষ বিশ্বাস আছে তাহা নহে; তবে কি না, নূতন মনুষ্যের কথা অপেক্ষায় উহাতে একটু অধিকতর ভরসা পাওয়া যায়। অতএব মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, এই সকল অধ্যাত্ম বিষয়ে কেবল বিচার তর্ক বা শাস্ত্রীয় বচন ভিন্ন আর কোন প্রমাণ বা পরীক্ষা আছে কি না; পরীক্ষিত বিষয় সকলকেই অবনত শিরে গ্রহণ করিতে হয়।

আচার্য্য। স্বীকার করি, অন্য বিচক্ষণ ব্যক্তির কুতর্ক জালের দ্বারা কেবল আমার কেন, আপাততঃ শাস্ত্রীয় মীমাংসাও ভ্রান্তিমূলক বলিয়া অনেকের নিকট প্রদর্শিত হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া, বাস্তবিক পক্ষেই ঐ সকল সিদ্ধান্ত উড়িয়া যাইতে পারে না; উহা বহুদিন হইতে সহস্র সহস্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। ফল কথা, আর্য্যদিগের নির্ণীত কোন প্রকার অধ্যাত্ম পদার্থই কেবল তর্ক দ্বারা নিরূপিত হয় নাই, কিন্তু আন্তরিক উপলব্ধি বা মানসিক প্রত্যক্ষ দ্বারা। বহিশ্চক্ষু দ্বারা যেরূপ বহিঃস্থ দ্রব্য সকল প্রত্যক্ষ করা যায়, অন্তশ্চক্ষু দ্বারাও তদ্রূপ অধ্যাত্মতত্ত্ব সমূহের প্রত্যক্ষ করা যায়। তদ্রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াই মহর্ষিগণ এক একটী অধ্যাত্মতত্ত্বের নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহারা বহিশ্চক্ষু নিমীলিত করিয়া অন্তর্জগতে প্রবেশ পূর্ব্বক জাজ্জল্যমান প্রত্যক্ষ করিয়া, এক একটী অধ্যাত্মতত্ত্বের নির্ণয়

করিয়াছেন, সেই প্রত্যক্ষই অধ্যাত্ম তত্ত্বের মুখ্যতম প্রমাণ এবং পরীক্ষা। পূর্ব্বতন অসংখ্য মহর্ষিগণই সমস্ত অধ্যাত্ম তত্ত্বের এইরূপ প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন (বেদের অভ্রান্ততা প্রমাণ করা কালে ইহা বুঝাইয়া দিব)। অতএব বাহিরের বিচার তর্ক দ্বারা সেই প্রত্যক্ষীকৃত বিষয়ের সত্যতা বিনষ্ট হইবে কেন?

বিশেষতঃ, আজ কালও যাঁহারা অনুভবশীল, অন্তর্জগতে প্রবেশে যাঁহাদের ক্ষমতা আছে, যাঁহারা আন্তরিক অস্তিত্ব বা অন্তঃসারবান্ পুরুষ তাঁহারাও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সমস্ত অধ্যাত্মতত্ত্বই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। সুতরাং, এখনও পরীক্ষার উপায় আছে, কিন্তু তোমাদের আন্তরিক অস্তিত্বই নাই, এজন্য অন্তর্জগতে প্রবেশের ক্ষমতাও নাই, আন্তরিক অনুভবও নাই। তোমরা ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে সর্ব্বদাই বহির্জ্জগতে বিচরণ করিতেছ, অন্তর্জ্জগতের কোন তত্ত্বই রাখ না; অতএব তোমাদের উহা প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করার ক্ষমতা নাই। এজন্য যতদিন সেই ক্ষমতা না হয় ততদিন শাস্ত্রকেই বিশ্বাস করিতে হইবে, এবং অনুভব বিহীন ব্যক্তির কুতর্কে অনাস্থা করিয়া শাস্ত্রানুমোদিত বিচারেই নির্ভর করা উচিত।

শিষ্য। বিচার তর্কের দ্বারা যদি হিন্দুদের অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রমাণ করা না হইয়া থাকে, তবে ন্যায়াদি দর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টি হইল কেন? উহাতে তো মানসিক প্রত্যক্ষের কোন কথাই শুনা যায় না, উহাতে কেবল ঘোরতর তর্ক বিচারের দ্বারাই তত্ত্বনির্ণয় করা হইয়াছে।

আচার্য্য। ন্যায়াদি কোন দর্শনেরই এরূপ মত নহে যে, বিচারই অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রমাণ, প্রত্যুত প্রত্যেক দর্শনেই প্রত্যক্ষমূলক বেদকে সকল প্রকার অধ্যাত্ম বিষয়ের একমাত্র প্রমাণ বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা ঐ সকল তত্ত্ব অনুভব করিতেছেন না, কেবল বেদ বাক্য দ্বারাই অধ্যাত্ম তত্ত্বের জ্ঞান শিক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদের মনে যদি কোন প্রকার সন্দেহ হয়, কিম্বা কোন নাস্তিক আসিয়া যদি কুতর্ক জালের দ্বারা উহার বিশ্বাস বিচলিত করে, তাহা নিরসনের নিমিত্তই দর্শন শাস্ত্রের অবতারণা। তদ্ব্যতীত কোন দর্শনেই নূতন কোন অধ্যাত্মতত্ত্বের আবি-

কার করেন নাই, ঐ সকল পুরাতন সত্য, দর্শন-প্রণেতৃগণের উৎপত্তির, বহু লক্ষ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই প্রকাশিত ছিল। এজন্যই বৃহস্পতি সংহিতায় লিখিত আছে 'শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্য শ্চোপপত্তিভিঃ। মত্বাচ সততং ধ্যেয় এতে দর্শন হেতবঃ"। শ্রুতি বাক্য হইতে অধ্যাত্ম তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া তাহাতে কোন সংশয় হইলে যুক্তি বিচারের দ্বারা তাহা নিরাস করিবে, তৎপর যোগানুষ্ঠান দ্বারা তাহার ধ্যান করিবে"। ত্রিকাল দর্শিনী শ্রুতিও বলিয়াছেন,— "আত্মা বা অরে! দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ সাক্ষাৎ কর্ত্তব্যশ্চৈতদেব খল্বমৃতত্বম" ইহার অর্থও পূর্ব্বশ্লোকের ন্যায়। অতএব বিচার তর্ক আমাদের অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ে কোন প্রমাণ মধ্যে গণ্যই নহে; শ্রুতিই উহার মুখ্যতম প্রমাণ। আমি যেসকল তর্ক বিচারের অবতারণা করিতেছি তাহাও শাস্ত্র সঙ্গত এবং শাস্ত্রেরই অনুকূল। অতএব অন্যের অমূলক তর্কের দ্বারা তাহাতে অনাস্থা করা উচিত মনে করি না।

ভক্তি বিবেক সুখ দুঃখাদি থাকে কোথা?

শিষ্য। এই সুখ দুঃখও, ভক্তি বিবেকাদি বিষয়ে আপনি যাহা বলিলেন তাহাতে শাস্ত্রেরও বিরোধ পরিলক্ষিত হয়, তবে আর কিরূপে উহা বিশ্বাস করা যায়। শাস্ত্র বলেন "অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ, ধর্ম্মোজ্ঞানং বিরাগ ঐশ্বর্য্যম্। সাত্ত্বিক মেতদ্রূপম্ তামসমস্মাদ্বিপরীতম্" (সাঙ্খ্য কারিকা) আবার সাঙ্খ্য দর্শনে বলেন, "নিগুর্ণত্বাত্তদসম্ভবাদহঙ্কার ধর্ম্মাহ্যেতে" এই সূত্র এবং শ্লোকের অর্থ এই যে, জ্ঞান, বৈরাগ্য বিবেক ও সুখদুঃখ ক্রোধাদি সমস্তই বুদ্ধি বা জীবের ধর্ম্ম। অন্যান্য শাস্ত্রেও এইরূপ লিখিত আছে। ব্যবহারেও আমরা ইহাদিগকে "আমার সুখ আমার দুঃখ, আমার ভক্তি" ইত্যাদ রূপে, আত্মার গুণ বিশেষ বলিয়াই অনুভব করি। কিন্তু আপনি বলিলেন;—"সুখ দুঃখ ও ভক্ত্যাদি জীবাত্মার কোন গুণ নহে, উহা জীবাত্মারই এক একটি অবস্থা বিশেষ মাত্র। সুতরাং স্বয়ং জীবাত্মাই সুখ দুঃখ ও ভক্ত্যাদি

স্বরূপে অবস্থিত।” এই কথা সত্য হইলে “আমার সুখ আমার দুঃখ” ইত্যাদি ব্যবহার না হইয়া সকলেরই “আমি নিজেই সুখ, নিজেই দুঃখ, নিজেই ভক্তি” ইত্যাদি ব্যবহার করিত। কিন্তু তাহা এ সংসারে কেহই করে না, তবে আপনার কথা কিরূপে বিশ্বাস করিব?

আচার্য্য। এ আপত্তি পূর্ব্বেই মীমাংসিতপ্রায় হইয়াছে, কিন্তু তুমি যখন ধারণা করিতে পার নাই, সুতরাং, তাহা বিশদ করিয়া বলা আবশ্যক। প্রথম একটা দৃষ্টান্ত বুঝিয়া লও, এই হস্ত, পদ ও মস্তকাদি সকলগুলি অবয়ব একত্রিত হইয়া যে একটি “দেহ” নাম গ্রহণ করে তাহা অবশ্যই অবগত আছ। আর ঐ হস্ত পদাদি প্রত্যেক অবয়ব গুলি বাদ দিলে যে এ দেহের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না—‘দেহ” বলিবার আর কিছুই থাকে না, তাহাও অবিদিত নও। কিন্তু এই হস্তপদাদি অবয়ব গুলি যদি পৃথক্ পৃথক্ এক এক খানি করিয়া মনে করা যায় তবে “দেহের মস্তক, দেহের হস্ত, দেহের পদ” এইরূপ ব্যবহারই হইয়া থাকে। এখন মনে রাখিও, যে এইরূপ ব্যবহারে, দেহকেই মস্তক ও হস্ত পদাদির আশ্রয় বা “আধার” বলিয়া গণ্য করা হইল, আর মস্তক ও হস্ত পদাদিকে দেহের অধেয় বা আশ্রিত বলিয়া গণ্য করা হইল। অর্থাৎ হস্ত পদ মস্তকাদি অঙ্গগুলি যেন দেহেতেই অবস্থিতি করিতেছে এইরূপ মনে করা হইল। আবার মস্তকাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ এক এক খানি লক্ষ্য না করিয়া, যখন সকল গুলিকেই একত্র সমষ্টি ভাবে মনে করা হয়, তখন মস্তক-হস্ত-পদাদির সমষ্টি আর দেহকে এক বা অভিন্ন ভাবেই মনে করা হয়। কারণ হস্ত পদাদির সমষ্টি ব্যতীত পৃথক্ ভাবে আর দেহের অস্তিত্ব নাই। কিন্তু ঐ হস্ত পদাদির সমষ্টি আর পৃথক্ পৃথক্ এক এক খানি হস্ত পদাদি ইহা একই পদার্থ উহা ভিন্ন ভিন্ন নহে। অতএব এই ব্যবহারে হস্ত পদাদি আর দেহের আধারাধেয় ভাব, গণ্য করা না হইয়া দেহের অভিন্ন ভাবেই হস্ত পদাদির ব্যবহার হইল। কিন্তু উক্ত উভয়বিধ ব্যবহারের কোনটিই ভ্রান্তিমূলক বা মিথ্যা নহে। দুইটিই সত্য। অথচ একই বস্তুতে একবার ভিন্ন ভাব, আর একবার অভিন্ন ভাবে ব্যবহার করা হইল। এইরূপ আরও অনেক স্থানেই ঘটিয়া থাকে

সুখ দুঃখ ভক্তি বিবেকাদি আর জীবাত্মারও ঠিক ঐ নিয়মেই ভেদাভেদ ও ধর্ম্ম-ধর্ম্মি-ভাবে দুই প্রকার ব্যবহার হইয়া থাকে। কখনও বা "আমার সুখ, আমার ভক্তি" ইত্যাদি ভিন্ন ভাবের ব্যবহার, আর কখনও বা "আমিই সুখ আমিই ভক্তি" ইত্যাদি অভিন্ন ভাবে ব্যবহার হইয়া থাকে। এস্থানেও এই দুই প্রকার ব্যবহারই সঙ্গত, এবং দুটিই সত্য। ইহা শাস্ত্রেই লিখিত আছে,—

"এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্ম্ম লক্ষণাবস্থা পরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ"

(পাতঞ্জল দর্শন ৩ পা ১৩ সূ)

"এতেন পূর্ব্বোক্তেন চিত্তপরিণামেন ধর্ম্মলক্ষণাবস্থা রূপেণ ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্ম্মপরিণামো লক্ষণপরিণামশ্চাবস্থা পরিণাম শ্চোক্তো বেদিতব্যঃ। তত্র ব্যুত্থান নিরোধয়োর্দ্ধর্ম্ময়ো রভিভব প্রাদুর্ভাবৌ ধর্ম্মিণি ধর্ম্ম পরিণামো; লক্ষণ পরিণামশ্চ—নিরোধস্ত্রিলক্ষণঃ—ত্রিভিরধ্বভির্যুক্তঃ স খল্বনাগতলক্ষণ মধ্বানং প্রথমং হিত্বা ধর্ম্মত্বমনতিক্রান্তো বর্ত্তমানং লক্ষণং প্রতিপন্নঃ যত্রাস্য স্বরূপেণা ভিব্যক্তি রেষোস্য দ্বিতীয়োধ্বা ন চাতীতানা গতাভ্যাং বিযুক্তঃ। তথা ব্যুত্থানং ত্রিলক্ষণং—ত্রিভিরধ্বভির্যুক্তং বর্ত্তমানং লক্ষণং হিত্বা ধর্ম্মত্ব-মনতিক্রান্ত মতীত লক্ষণং প্রতিপন্ন মেষোস্য তৃতীয়োধ্বা, নচানাগত বর্ত্ত-মানাভ্যাং লক্ষণাভ্যাং বিযুক্তঃ। এবং পুন ব্যুত্থানমুপসম্পদ্যমান মনাগত লক্ষণং হিত্বা ধর্ম্মত্বমনতিক্রান্তং বর্ত্তমানং লক্ষণং প্রতিপন্নং যত্রাস্য স্বরূপা-ভিব্যক্তৌ সত্যাং ব্যাপারঃ এষোস্য দ্বিতীয়োধ্বা, ন চাতীতানাগতাভ্যাং লক্ষণাভ্যাং বিযুক্তমিতি। এবং পুন নিরোধ এবং পুনর্ব্যুত্থানমিতি। তথাঽবস্থা পরিণামো,—নিরোধক্ষণেষু নিরোধ সংস্কারা বলবন্তো ভবন্তি দুর্ব্বলা ব্যুত্থান সংস্কারা ইত্যেষ ধর্ম্মাণামবস্থা পরিণামঃ। তত্রানুভবানুসা-রাৎ ধর্ম্মিণো ধর্ম্মৈঃ পরিণামো ধর্ম্মাণাং লক্ষণৈঃ পরিণামো লক্ষণানামপ্য বস্থাভিঃ পরিণাম ইতি। এবং ধর্ম্মলক্ষণাবস্থা পরিণামৈঃ শূন্যং ন ক্ষণমপি গুণ বৃত্তমবতিষ্ঠতে। চলঞ্চ গুণবৃত্তং গুণস্বাভাব্যন্তু প্রবৃত্তি কারণ মুক্তং গুণানামিতি। এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্ম্মধর্ম্মিভেদাৎ ত্রিবিধপরিণামো বেদি-তব্যঃ। পরমার্থত স্ত্বেক এব পরিণামো, ধর্ম্মিস্বরূপমাত্রোহি ধর্ম্মো, ধর্ম্মি-বিক্রিয়ৈবৈষা ধর্ম্মদ্বারা, প্রপঞ্চ্যতে ইতি। তত্র ধর্ম্মস্য ধর্ম্মিণি বর্ত্তমানস্যৈ

বাধ্বস্বতীতানাগতবর্ত্তমানেষু ভাবান্যথাত্বং ভবতি ন দ্রব্যান্যথাত্বং যথা সুবর্ণভাজনস্ত ভিন্নান্তথা ক্রিয়মাণস্য ভাবান্যথাত্বমিতি। * * * (পা, দ, ৩ পা ১৩সূ বেদব্যাসভাষ্য) অর্থ,—চিত্ত বা অন্তঃকরণের (যাহাকে চৈতন্যের বিমিশ্রণে জীবাত্মা বলিয়া আসিয়াছি তাহার) তিন প্রকার পরিণাম হইয়া থাকে। এক,—ধর্ম্ম পরিণাম, দ্বিতীয়,—লক্ষণ পরিণাম, তৃতীয়,—অবস্থা পরিণাম। নিরোধ (সংযমশক্তি,) যাহা হইতে ভক্তি প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মবৃত্তির বিকাশ—যাহা পূর্ব্বে (৬৫ পৃ ২৬ পং) অতি বিস্তার ক্রমে বলিয়াছি, তাহা; আর ব্যুত্থান শক্তি,—যাহা হইতে পরিচালন শক্তি এবং পোষণ শক্তি আর তদন্তর্গত সমস্ত শক্তির বিকাশ হয়, তাহা; অর্থাৎ পরিচালন ও পোষণাদির অন্তর্গত সকল প্রকার শক্তি আর সংযমের অন্তর্গত সকল প্রকার শক্তি ইহারা সকলেই জীবাত্মার ধর্ম্ম, ইহাদের যে সময় সময় এক এক বার পরিস্ফূর্ত্তি হওয়া আর নিতান্ত ক্ষীণতা হওয়া, তাহার নাম "ধর্ম্ম পরিণাম"। তন্মধ্যে যখন নিরোধ বা সংযম ধর্ম্মের পরিস্ফূর্ত্তি হয় তখন আত্মার নিরোধ ধর্ম্মের পরিণাম হইল, আর যখন কোন প্রকার পরিচালন বা পোষণাদি ধর্ম্মের পরিস্ফূর্ত্তি হয়, তখন আত্মার ব্যুত্থান ধর্ম্মের পরিণাম হইল। এই গেল ধর্ম্মের পরিণাম, তৎপরে লক্ষণ পরিণাম।

আত্মার ঐ সকল ধর্ম্মবিকাশের পূর্ব্বকালীন অবস্থা, বর্ত্তমান ভাব, এবং অতীত কালের ভাবকে "লক্ষণ" বলে। ঐ সকল লক্ষণ প্রাপ্তিকে "লক্ষণ পরিণাম" বলে। ইহাও আত্মার উভয়বিধ ধর্ম্ম সম্বন্ধেই আছে। সংযম এবং তদন্তর্গত শক্তিও অনাগত, বর্ত্তমান এবং অতীত ভাব প্রাপ্ত হয়। আবার ব্যুত্থান এবং তদন্তর্গত পরিচালনাদি শক্তিও অনাগত, বর্ত্তমান এবং অতীতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। যখন সংযম শক্তির পরিস্ফুরণ হয়, তখন উহা পূর্ব্বকার অনাগত লক্ষণ বা অপ্রকাশিত ভাব পরিত্যাগ করিয়া উহা বর্ত্তমান লক্ষণ বা অভিব্যক্ত ভাব গ্রহণ করে। ইহাই উহার দ্বিতীয় "লক্ষণ।"

কিন্তু এই বর্ত্তমান ভাব প্রাপ্ত হইলেও যে উহা সেই পূর্ব্বাবস্থা বা ভবিতব্য অবস্থা হইতে পৃথক্ একটি জিনিষ হইতেছে তাহা নহে। উহা অতীত এবং

ভবিতব্য অবস্থারই একটু ভাবান্তর মাত্র। এই সময়ে ব্যুত্থান বা পরিচালনাদি-শক্তির অতীত ভাব হয়, কিন্তু সেও অতীতভাবে থাকে বলিয়াই, যে অনাগত ও বর্ত্তমান ভাব হইতে পৃথগ্‌ভূত কিছু একটী হয়, তাহা নহে; কিন্তু তাহারাই একটী রূপান্তর মাত্র। ইহা ব্যুত্থান শক্তির তৃতীয় লক্ষণ। তৎপর আবার সংযম বা নিরোধে অতীত লক্ষণ হইয়া পরিচালনাদি শক্তি অনাগত ও বর্ত্তমান ভাবাদি হইয়া থাকে। তৎপর আবার নিরোধ, আবার ব্যুত্থান ইত্যাদি সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। এই হইল "লক্ষণ পরিণাম।" তৎপর অবস্থা পরিণাম।

সংযম শক্তির যখন পরিস্ফূর্ত্তি হয়, তখন পরিচালনাদি শক্তির সংস্কার গুলি দুর্ব্বল হয়, উহা উদ্রিক্ত হইতে পারে না, এবং সংযমের সংস্কার গুলিই বলবন্ত হয়। আবার পরিচালনাদির পরিস্ফূর্ত্তি কালেও সংযম শক্তির সংস্কার অতিদুর্ব্বলাবস্থায় থাকে, এবং পরিচালন সংস্কার সবলাবস্থায় থাকে। ইহাই আত্মার সংযমাদি ধর্ম্মের "অবস্থা পরিণাম।" এই তিন প্রকার পরিণামের কথা বলা হইল।

এখন যুক্তি অনুভব অনুসারে বুঝিতে হইবে যে উক্ত তিন প্রকার পরিণামের মধ্যে যেটা প্রথম পরিণাম অর্থাৎ "ধর্ম্ম পরিণাম" সেইটাই এখানে আত্মার; (অন্যত্র যে যখন ধর্ম্মী হয় তাহার) আর দ্বিতীয় পরিণাম অর্থাৎ "লক্ষণ পরিণাম" এখানে ঐ পরিচালনাদি শক্তিরই বলিতে হইবে, (অন্যত্র যে যখন ধর্ম্ম হয় তাহার) তৎপর তৃতীয় পরিণাম অর্থাৎ "অবস্থা পরিণাম" এখানে ঐ বর্ত্তমানাদি লক্ষণেরই বলিতে হইবে। কারণ দেখিতে পাওয়া যায় যে আত্মারই সংযম ও পরিচালনাদি শক্তি বা ধর্ম্মের বিকাশ হইল, এবং ঐ শক্তিগুলিরই বর্ত্তমানাদি দশা প্রাপ্তি হইল; উহা আত্মার নহে, কেননা জীবাত্মা সর্ব্বদাই আছে; অতীত, বর্ত্তমান, বা অনাগত হইতেছে না। আর দুর্ব্বলতা বা সবলতাও ঐ বর্ত্তমান অবস্থা-দিরই হইতেছে, উহাও আর কাহারও নহে।

এই তিন প্রকার পরিণাম সকল বস্তুরই আছে, ইহা হইতে বিমুক্ত হইয়া ক্ষণকালের নিমিত্তও সত্বাদি কোন গুণ অর্থাৎ কোন বস্তু থাকিতে পারে না। কারণ সত্ব রজঃ প্রভৃতি গুণ অতি চঞ্চলাবস্থাবিশিষ্ট। গুণ-স্বভাবতা নিবন্ধনই উহাদের ঐরূপ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ভূত ভৌতিক

পদার্থাদির মধ্যেও এই ত্রিবিধ পরিণাম জানিবে, তাহা ও এই ব্যাখ্যাতেই ব্যাখ্যাত হইল।

এই যে তিন প্রকার পরিণামের কথা বলা হইল, ইহা আত্মা আর তাহার ধর্ম্মাদির ভেদ কল্পনা করিয়া। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কেবলমাত্র ধর্ম্মের পরিণাম বলিলেই হয়; কারণ কোন ধর্ম্মই ধর্ম্মী হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে, ধর্ম্মী ও যাহা ধর্ম্মও তাহাই। একমাত্র ধর্ম্মীরই বিকৃতি ধর্ম্মদ্বারা নানামতে ব্যাখ্যা করা হয়। সুবর্ণ ভাজনাদি বিচূর্ণিত হইলে যেমন সুবর্ণত্ব কোন মতেই বিনষ্ট হয় না, কিন্তু উহা যে কোন পাত্রের আকারে ছিল সেই আকারটীরই অন্যথা মাত্র হয়। (আত্মার বৃত্তি বা গুণ বা শক্তি সম্বন্ধেও এইরূপ যোজনা করিতে হইবে। জীবাত্মা আর সংযম শক্তি বা পরিচালনাদি শক্তি বা গুণ, কিছুই জীবাত্মা হইতে বিভিন্ন নহে, জীবাত্মাও যাহা নিরোধ, ভক্তি, বিবেক, দয়া, ক্রোধ, সুখ, দুঃখ বা পরিচালন শক্তিও তাহাই। জীবাত্মারই যে নিরোধ বা পরিচালনাদিরূপ একএকটু অবস্থান্তর হয় তাহাকেই, ধর্ম্ম, লক্ষণ, ও অবস্থা ভেদে তিন বিভাগ করা হয়! কিন্তু ঐরূপে জীবের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলেও তাহার জীবত্বের পরিবর্ত্তন হয় না)।” এই গেল ভাষ্যের অর্থ, কিন্তু এইরূপ কথা সকল শাস্ত্রেই আছে।

এই ভাষ্যার্থটি বোধ হয় কিছু খটমট বোধ হইতে পারে, এজন্য পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তের সঙ্গে যোজনা করিয়া এখন বুঝাইয়া দিই; তবেই কথাটি ভাল রূপে বুঝিতে পারিবে! আমাদের সর্ব্বদেহ ব্যাপক চৈতন্য আর তাঁহার সহিত বিমিশ্রিত জ্ঞান পরিচালন আর পোষণশক্তির সমষ্টি—যাহা হইতে বুদ্ধি, অভিমান, মন, ইন্দ্রিয়, ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিবেক, বৈরাগ্য, চিন্তা, দয়া, ক্রোধ, ঈর্ষা, সুখদুঃখ ও প্রাণাদি সমস্ত অবস্থার বিকাশ হইয়াছে, তাহাই জীবাত্মা বা আমাদের “আমি”, একথা অনেকবার আবেদিত হইয়াছে। তাহা হইলে স্থূলদেহের মস্তকাদি অঙ্গের ন্যায়; ভক্তি বিবেকাদি শক্তি গুলিও যে জীবাত্মার এক একটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইল, এবং ইহাদের সকলগুলি একত্র করিয়াই একটি জীবাত্মা তাহাও বুঝা গেল। উক্ত শক্তিগুলির মধ্যে, যখন পৃথক্‌ভাবে একএকটিকে মনে করা হয়, তখন “ দেহের হস্তের ” ন্যায়

"আত্মার ভক্তি, আত্মার সুখ আত্মার দুঃখ" ইত্যাদি রূপে ভিন্ন ব্যবহার করা হয়। এই ব্যবহারে ভক্তিবিবেকাদিকে আত্মার আশ্রিত বা আধেয় ভাবে, এবং আত্মাকে উহাদের আশ্রয় বা আধার ভাবে গণ্য করা হয়। আর যখন ঐসকল শক্তির সমষ্টি ভাবটি লক্ষ্য করা হয়, তখন আধারাধেয় ভাব বা বিভিন্নতাভাব মনে করা হয় না, তখন হস্তপদাদির সমষ্টি আর দেহের ন্যায়, ঐ সকল শক্তির সমষ্টি আর আত্মার একতাই মনে হইয়া থাকে। সুতরাং তখন ভক্তি প্রভৃতি শক্তিকেই জীবাত্মা বলা যাইতে পারে। তখন "আমিই ভক্তি, আমিই সুখ," ইত্যাদি ব্যবহার হইতে পারে। অতএব এইরূপ ভিন্নভিন্ন ভাবে ভিন্নভিন্ন মতে উক্ত দুই প্রকার ব্যবহারই সঙ্গত; সুতরাং শাস্ত্রের সহিত আমাদের কোনই বিরোধ হইল না। কেননা? শাস্ত্রে যে "আত্মার ভক্তি, আত্মার সুখ" ইত্যাদি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা "দেহের হস্ত দেহের পদ" ইত্যাদি ব্যবহারের ন্যায় আধারাধেয় ভাব কল্পনা করিয়া, এবং আমরা যে "আত্মাই ভক্তি, আত্মাই সুখ" ইত্যাদি ব্যবহার করি, তাহাও দেহ ও হস্তপদাদির ন্যায় বাস্তবিক অভিন্নতা মনে করিয়া; সুতরাং দুই কথাই সঙ্গত।

ভক্তি প্রভৃতির আধারাধেয়ং যোজনা।

শিষ্য। আপনার পূর্ব্বকথানুসারে বুঝিয়াছি যে, আত্মার একএকটি শক্তির উত্তেজনা কালে, উত্তেজনার পরিমাণানুসারে, অপর শক্তিগুলি পরাভূত বা অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকে। তাহা হইলে দেহ আর হস্ত পদাদির দৃষ্টান্ত কিরূপে সংযোজিত হইবে তাহা বুঝিলাম না। কারণ দেহের মস্তক এবং হস্তপদাদি সমস্তগুলি অবয়ব সর্ব্বদাই থাকে বলিয়া মস্তকাদি অবয়বের একএকটিকে পৃথক্ ভাবে মনে করিলে "দেহের মস্তক, দেহের হস্ত" ইত্যাদি আধারাধেয় ভাবে ব্যবহার করা সম্ভবে। তখন কেবল ঐ হস্ত খানি বাদে, দেহের মস্তকাদি সমস্তগুলি অবয়বের সমষ্টিকেই হস্তের আশ্রয় বা আধার ভাবে, এবং কেবল হস্তখানিকে ঐ সমষ্টির আধেয়ভাবে ব্যবহার করা হয়। আবার হস্তাদি সমস্ত অবয়বের সমষ্টি ভাবনা

মনে করিলে, হস্তাদিকেই "দেহ" বলিয়া অভিন্ন ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু আত্মার একটি শক্তির পূর্ণ উত্তেজনাসময়ে, যখন অন্যান্য শক্তিগুলি অপ্রকাশিত হইয়া যায়, কেবল ঐ উত্তেজিত শক্তিটি মাত্রই থাকে, তখন সেই সময়ের জন্য, আপনার মতে, আত্মা কেবল ঐ একটি মাত্র শক্তিময়ই হইয়া দাঁড়ায়। যখন ভক্তি-শক্তির পূর্ণমাত্রায় বিকাশ হয় তখন আত্মা কেবলই ভক্তিময়, যখন ক্রোধ শক্তির পূর্ণমাত্রায় বিকাশ, তখন কেবলই ক্রোধময়। তদ্ব্যতীত আত্মার আর কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গই বিদ্যমান থাকে না। অতএব তখন দেহের সাদৃশ্যে কোন্ কোন্ অঙ্গের সমষ্টি ধরিয়া তাহাকে ঐ ভক্তি বা ক্রোধাদির আশ্রয় বা আধার কল্পনা করিয়া "আত্মার ক্রোধ, আত্মার ভক্তি" ইত্যাদি আধারাধেয় ভাবে ব্যবহার হইবে?। পৃথিবীতে যদি এমন কোন প্রাণী সম্ভবে—যাহার কেবল একটি মস্তক ব্যতীত আর কোন অঙ্গই নাই, তবে যেমন তাহার পক্ষে "দেহের মস্তক" এইরূপ আধারাধেয় ভাবে ব্যবহার হইতে পারে না, কিন্তু তখন কেবল "মস্তকই দেহ, বা দেহই মস্তক" এইরূপ অভিন্ন ব্যবহার হওয়াই উচিত্; সেইরূপ, আত্মারও যদি এক শক্তির উত্তেজনাকালে অপরাপর শক্তিগুলির প্রকাশ না থাকিল, তবে তখনকার নিমিত্ত, আত্মা কেবল সেই এক শক্তিময়ই হইয়া পড়ে। অতএব ভক্ত্যাদি কোনপ্রকার শক্তির উত্তেজনা কালেই "আত্মার ভক্তি, আত্মার ক্রোধ" ইত্যাদি আধারাধেয় ভাবে ব্যবহার হইতে পারে না। কিন্তু তখন 'আত্মাই ভক্তি, আত্মাই ক্রোধ" এইরূপ ব্যবহার হওয়াই উচিত। বাস্তবিক কিন্তু সকল অবস্থায়ই "আত্মার ভক্তি হইয়াছে, আত্মার ক্রোধ হইয়াছে" ইত্যাদি আশ্রয়াশ্রয়িভাবে ব্যবহার হইয়া থাকে। সুতরাং আপনার মীমাংসা অসঙ্গত বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে।

আচার্য্য। দিন দিনই, অধিকতর চিন্তা শক্তি-প্রসূত এক একটি প্রশ্ন করিয়া ক্রমেই তুমি আমার আশীর্ব্বাদ ও প্রীতি আকর্ষণ করিতেছ, ভগবান্-সদাশিব তোমার হৃদয় নির্ম্মল করুন।

তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসিয়াছ; তাহা অল্প একটু চিন্তা করিলেই মীমাংসা করিতে পারিবে। আত্মার একটি শক্তির উত্তেজনা কালে যে

অন্য শক্তি গুলির অপ্রকাশ অবস্থা হয় তাহা অবশ্যই সত্য, কিন্তু একবারে বিনষ্ট বা অভাবাবস্থা হয় না; তবে কি না, একটি শক্তির পূর্ণ উত্তেজনা হইলে অপর শক্তি গুলির নিতান্ত ক্ষীণ-মৃদু-অবস্থা হইয়া পড়ে সুতরাং তাহাদের কিছু মাত্র ক্রিয়ার উপলব্ধি হয় না। অতএব তাহাকে অপ্রকাশ অবস্থাই বলা হয়, সুতরাং সেই ক্ষীণাবস্থাপন্ন শক্তির সমষ্টিকেই তখন আধার ভাবে লক্ষ্য করিয়া ঐ প্রবল শক্তিটিকে তাহার আশ্রিত বা আধেয় ভাবে ব্যবহার করা হইতে পারে। আর যখন, অতি অল্প কিম্বা মধ্যমাদি পরিমাণে কোন শক্তির বিকাশ হয়, তখন তো অন্যান্য শক্তির বিলক্ষণ পরিস্ফুরণ অবস্থাই থাকে, সুতরাং কোন আপত্তিই নাই। পরন্তু ইহাও মনে রাখা উচিত যে,' যদি অন্যান্য শক্তির এককালে বিলুপ্ত অবস্থা হইয়া আত্মা কেবল একমাত্র-শক্তিময়ই হইয়া পড়ে, তথাপি উক্ত ব্যবহারে কোন দোষ হইতে পারে না। কারণ অনেক সময় এক ব্যক্তিতেই আধার ও আধেয় ভাব কল্পনা করিয়া ব্যবহার হয়। ভাবিয়া দেখ, ভিত্তি আর তাহার গাত্র কিছু বিভিন্ন কোন জিনিষ নহে, ভিত্তিও যাহা তাহার গাত্রও তাহাই বটে, কিন্তু তথাপি "ভিতের গা" "ভিত্তির গাত্র" এইরূপ আশ্রয়াশ্রয়িরূপে ভিন্নবৎ ভাবে ব্যবহার হইয়া থাকে। তদ্রূপ, এক শক্তির পূর্ণ উত্তেজনা কালে অন্য শক্তির বিলোপ হইয়া আত্মা যদি কেবল এক শক্তিময়ই হইয়া যায়, তথাপি সেই একেতেই আশ্রয়াশ্রয়ি-ভাব কল্পনা পূর্ব্বক "আত্মার শক্তি, আত্মার ভক্তি" ইত্যাদি ভিন্নভাবে ব্যবহার হইতে পারে। অতএব শাস্ত্র বা ব্যবহারাদির সহিত আমাদের সিদ্ধান্তের কোনই বিরোধ বা বিবাদ নাই।

সুখ দুঃখ থাকে কোথা ?

শিষ্য। ভক্তি, বিবেক ও ক্রোধাদি বিষয়ে যেরূপ ব্যবস্থা করিলেন তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু সুখ দুঃখাদি বিষয়ের সন্দেহ এখনও নিরাসিত হয় নাই। কারণ সুখ দুঃখ আর ভক্তি প্রভৃতি ঠিক এক প্রকার

পদার্থ নহে। কেন না, আত্মার শক্তিগুলির অনর্গলভাবে স্ফুরিত অবস্থাকে "সুখ" আর বাধিতভাবে স্ফুরিত অবস্থাকে "দুঃখ" বলিয়াছেন। অতএব উহা, দেহের হস্ত, পদ, মস্তকাদির ন্যায়, আত্মার এক একটী অঙ্গ হইতে পারে না। কিন্তু দেহের কৌমারাবস্থা, বাল্যাবস্থা ও যৌবনাদি অবস্থার ন্যায় আত্মার এক একটী অবস্থা বিশেষ হইতে পারে। ক্রোধাদি শক্তি গুলি, দেহের হস্ত পদাদির ন্যায় আত্মার এক একটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশেষ, অতএব ভক্তি প্রভৃতি কোন একটি শক্তি পরিস্ফুরিত হইলে, অন্য যে সকল প্রকাশিত কিম্বা অপ্রকাশিত শক্তি থাকে তাহার সমষ্টিকেই আশ্রয় ভাবে ধরিয়া, উহাকে আশ্রিত ভাবে গণ্য করা যায়। কিন্তু সুখ দুঃখ যখন আত্মার অনর্গল ও বাধিত ভাবের অবস্থা বিশেষ মাত্র, তখন ঐরূপ কল্পনা কি প্রকারে সম্ভবে?

আচার্য্য। ভক্তি প্রভৃতি শক্তিকে, আত্মার গুণ বলিয়া ব্যবহার সম্বন্ধে যে মীমাংসা করিয়াছি, তদ্দ্বারাই সুখ দুঃখের আপত্তি মীমাংসিত হইয়াছে; কিন্তু তুমি লক্ষ্য করিতে পার নাই। ভাবিয়া দেখ, চৈতন্যে উজ্জ্বলিত সকল গুলি শক্তির সমষ্টিই যখন "জীবাত্মা" নামে অভিহিত হয়, তখন আমাদের এই দেহের মধ্যে যেযে শক্তি গুলি সর্ব্বদা কার্য্য করিতেছে, তাহার সকল গুলিকেই যদি এক একটি করিয়া বাদ দেওয়া যায়—একটিও অবশিষ্ট না থাকে, তবে আর জীবের জীবত্বই থাকেনা। অতএব আত্মার অনর্গলভাব আর বাধিত ভাবকে যে সুখ দুঃখ বলা হইয়াছে তাহাও ঐ সকল শক্তিগুলি লইয়া, অর্থাৎ ঐসকল শক্তিগুলিরই অনর্গল-ভাবে প্রস্ফুরিত অবস্থার নাম "সুখ," আর বাধিত ভাবে প্রস্ফুরিত অবস্থার নাম "দুঃখ" ইহাই বুঝিতে হইবে। কারণ এইসকল শক্তি ব্যতীত আর কিছুই জীবাত্মার মধ্যে নাই, যাহার অনর্গল অবস্থা ও বাধিত অবস্থাকে সুখ দুঃখ বলা যাইতে পারে। সেই শক্তিগুলি কিছু উপর অবস্থা হইতে ধরিলে, জ্ঞান শক্তি, পরিচালন শক্তি, এবং পোষণ শক্তি এই তিনটি মাত্র বলিতে হয়, আর বিশেষ করিয়া বলিলে, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, কাম, ক্রোধ, দ্বেষাদি বলিয়া ব্যবহার করা হয়। কারণ ঐ মূল ত্রিশক্তিই পরিণামে, এই সকল শক্তি রূপে পরিণত হইয়াছে। অতএব

"সুখ" "দুঃখ" বলিলে এখন বুঝিতে হইবে যে, জ্ঞান শক্তি, পরিচালন শক্তি, পোষণ শক্তি, আর তাহাদের অন্তর্গত ভক্তি, ক্রোধ বিবেকাদি শক্তি, ইহাদেরই অনর্গল ভাবে প্রবাহিত অবস্থা হইতেছে এবং ইহাদেরই বাধিত ভাবে প্রবাহিত অবস্থা হইতেছে, তদ্ব্যতীত আর কিছুর বাধিত বা অনর্গল অবস্থার সম্ভাবনা নাই। আবার এই কথাই একটু উলটাইয়া বলিলে, বলিতে হয় যে, অবস্থা বিশেষে (অনর্গল অবস্থায়) জ্ঞান, পরিচালন, পোষণ শক্তি আর তদন্তর্গত ভক্তি প্রভৃতি শক্তিগুলিই "সুখ", আবার অবস্থা বিশেষে (বাধিত অবস্থায়) ঐ সকল শক্তি গুলিই "দুঃখ"। সুতরাং ভক্তি, দয়া, ও ক্রোধাদিকে, আত্মার গুণ বলিয়া ব্যবহারের কারণ ব্যখ্যা করাতেই সুখ দুঃখেরও তাদৃশ ব্যবহারের কারণ ব্যাখ্যাত হয়। তথাপি তোমার বোধের সুবিধার নিমিত্ত আরও বিস্তার পূর্ব্বক ইহা বলা যাইতেছে।

প্রত্যেক শক্তির সুখ দুঃখ স্বরূপতা নির্ণয়।

শক্তিময় জীবের যত গুলি শক্তি আছে; তাহার প্রতেকেই অবস্থা ভেদে (অনর্গল ও বাধিত অবস্থা ভেদে) সুখ ও দুঃখ এতদুভয়াবস্থাই গ্রহণ করে, কখনও বা সুখাবস্থা, কখনও বা দুঃখাবস্থায় পরিণত হয়। অনর্গল ভাবাপন্ন হইলে, জ্ঞানশক্তি পরিচালন শক্তি, পোষণ শক্তি এবং ইহাদের অন্তর্গত ভক্তি, দয়া, শান্তি, সন্তোষ, ঈর্ষ্যা, ক্রোধ, হিংসা, প্রভৃতি সকল প্রকার শক্তিই সুখাবস্থা গ্রহণ করিল। আবার বাধিত ভাবাপন্ন হইলে উক্ত ভক্তি সন্তোষাদি শক্তি এবং অনুক্ত ও যাহা কিছু আছে তৎসমস্তই দুঃখাবস্থা গ্রহণ করে; এই হইল সার সিদ্ধান্ত বাক্য। অবশ্যই; ইহা শুনিলে প্রথম অতি বিস্ময় জনক মনে হইতে পারে। কারণ "ভক্তি, শান্তি, সন্তোষাদি সাক্ষাৎ সুখময় শক্তিও দুঃখাবস্থা গ্রহণ করে" ইহা সাধারণ জ্ঞানের অতীত বিষয়, কিন্তু বাস্তবিক ইহা নিতান্ত সত্য। আমি এক একটি ধরিয়া ইহার কতক গুলি তোমাকে দর্শন করাইতেছি।

পরিচালন শক্তির সুখ দুঃখ অবস্থা

প্রথম পরিচাল শক্তির অবস্থাদ্বয় বলি,—

মনে কর, তুমি যেন পদ দ্বারা গমন করিতেছ, এই গমন ক্রিয়াটি তোমার পরিচালন শক্তির কার্য্য, পরিচালন শক্তিই উত্তেজিত হইয়া মস্তিষ্ক হইতে বিসর্পণ পূর্ব্বক স্নায়ু মণ্ডলীর দ্বারা পদদেশ পর্য্যন্ত আসিতেছে, তাই পদদ্বয় পরিচালিত হইতেছে। এখন যদি এই শক্তিটি অনর্গলভাবে আসিয়া তোমার পদ পরিচালন করিতে পারে, তবে যতক্ষণ উহার নূতনত্ব থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত, উহাই সুখাবস্থা হইল। আর যদি ঐ শক্তি পরিস্ফুরিত হইয়াও প্রবাহ কালে, পথে কোন প্রকার বাধা পায়, গমন যন্ত্র এবং পাদীয় স্নায়ুর বিকৃতি বশতঃ ঠেকিয়া-ঠেকিয়া চলে, তাহা হইলে ঐ শক্তিই দুঃখাবস্থা হইল। হস্তাদির উপর ক্রিয়া কারক অন্যান্য পরিচালন শক্তি সম্বন্ধেও এইরূপই জানিবে।

পোষণ শক্তির সুখ দুঃখ অবস্থা।

তোমার যে পাকস্থলীর ক্রিয়া হইতেছে ইহা পোষণ শক্তির কার্য্য, পোষণ শক্তিই বিকসিত হইয়া মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুর দ্বারা অবসর্পণপূর্ব্বক পাকস্থলীতে সমুপস্থিত হয়, এবং পাকস্থলীর দ্বারা অম্ল নিঃসারণ আর রসের গ্রহণ করিয়া থাকে; ইহা পূর্ব্বেই বিস্তারক্রমে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই শক্তি যখন অনর্গলভাবে প্রবাহিত হইয়া আপন কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে থাকে, তখনই সুখস্বরূপ হইল; আর যদি স্নায়ু ও অন্য কোন যন্ত্রের দোষে, পথে কোন বাধা হইয়া ঠেকাঠেকাভাবে প্রবাহিত হয়,—রীতিমত কার্য্য করিতে না পারে, তবে ঐ শক্তিই দুঃখস্বরূপ হইল। ফুস্‌ফুসাদি বিসর্পিত অন্যান্য প্রকার পোষণ শক্তি সম্বন্ধেও এইরূপই বুঝিতে হইবে।

জ্ঞান শক্তির সুখ দুঃখ অবস্থা।

আমরা যে, কোন বস্তুর দর্শন ও শ্রবণাদি করি তাহা জ্ঞান শক্তির কার্য্য। জ্ঞান শক্তিই বিকসিত হইয়া মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর দ্বারা চক্ষু কর্ণাদির শেষ সীমা পর্য্যন্ত প্রসারণপূর্ব্বক দর্শন শ্রবণাদি কার্য্য সাধন করে; ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। দর্শন শ্রবণাদিকালে যদি এই শক্তি অনর্গলভাবে প্রবাহিত হইতে পারে, তবেই সুখস্বরূপ হইল, আর যদি চাক্ষুষ বা শ্রাবণিক স্নায়ুর দোষে, উহার প্রসারণের কোন প্রকার বাধা বা ঠেকা ভাব হয়,—রীতিমত কার্য্য করিতে না পারে তবে ঐ শক্তিই আবার দুঃখস্বরূপ হইল। স্পর্শন ঘ্রাণাদি জনক অন্যান্য জ্ঞান শক্তি সম্বন্ধেও এইরূপই বুঝিবে। এখন এই ত্রিশক্তির অন্তর্গত ভক্তি প্রভৃতির সুখ দুঃখ অবস্থা বলা যাইতেছে।

ভক্তির সুখ দুঃখ অবস্থা।

ভক্তি বিবেকাদি শক্তিগুলি স্নায়ুমণ্ডলের দিকে প্রবাহিত হইয়া আইসে না, কারণ উহা ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনী শক্তি কিন্তু উহা ব্যায়ত হওয়ার নিমিত্ত মস্তিষ্কের মধ্যে বিশেষ বিশেষ যন্ত্র আছে। উহা প্রথম পরিস্ফুরিত হয় তৎপর মস্তিষ্কের অংশবিশেষের সাহায্যে উহা উদ্দীপ্ত বা বিস্তৃতিভাব গ্রহণ করিয়া থাকে। তখন যদি সেই যন্ত্রটি অনুপযুক্ত হয়, অর্থাৎ যে ভাবে যে পদার্থের দ্বারা হৃষ্টপুষ্ট থাকিলে উহা ভক্তি শক্তির বিস্তৃতির সাহায্য করিতে পারে, সেইরূপ না হয়, তবে ভক্তি শক্তি স্বীয় যন্ত্রে (সেই মস্তিষ্কের অংশবিশেষে) আসিয়াই যেন চুপ্‌সিয়া যায়, অনুপযুক্ততা নিবন্ধন সেই যন্ত্রই যেন তাহাকে বিস্তৃত হইতে দেয় না। তাহাই ভক্তির বাধিত অবস্থা, সেই সময় বড় দুঃখের অনুভব হয়, তখন ভক্তিই দুঃখ স্বরূপে পরিণত হইল। আর যদি সেই যন্ত্র উপযুক্ত থাকিয়া অনায়াসে ঐ কার্য নিষ্পন্ন হয়, তবে উহাই ভক্তির অনর্গল অবস্থা হইল, তখন অতীব আনন্দ অনুভূত হয়, তখন ভক্তিই সুখস্বরূপে পরিণত হইল। মনে কর, তুমি প্রচুর পুষ্প বিল্বপত্রাদির আহরণ পূর্ব্বক ভগবান্ দেব দেবের অর্চ্চনা করিতে বসিলে, এখন যদি তোমার বিশেষ ইচ্ছা থাকে যে, বিশেষ ভক্তি ও আনন্দ সহকারে তাঁহার ধ্যান করিবে; আর তখন

যদি ভক্তির অঙ্কুর মাত্র হইয়াই চুপ্‌সিয়া যায়,—তুমি শত চেষ্টায়ও ভক্তি-ভাবের আবিষ্কার করিতে না পার, তবে তোমার অতিশয় দুঃখ বোধ হওয়ার সম্ভব নয় কি? অতএব সুখময়ী ভক্তি ও বাধিত ভাব প্রাপ্ত হইলে দুঃখস্বরূপে পরিণত হয়। বিবেক, বৈরাগ্যাদি শক্তি বিষয়েও এইরূপই চিন্তা করিয়া দেখিবে। এখন ক্রোধাদির কথা বলিতেছি।

ক্রোধের সুখ দুঃখ অবস্থা

তোমার নিজের কখনও ক্রোধাদি শক্তি উত্তেজিত হয় নাই কি?

শিষ্য।—"কখনও" কেন আজও তিনবার প্রচণ্ড ক্রোধ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

আচার্য্য।—ক্রোধ হইলে, যদি কোন বাধা ক্রমে উহা চরিতার্থ হয় তবে কিরূপ অনুভূতি হয়, আর চরিতার্থ করিতে না পারিলেই বা কিরূপ অনুভব হয় বলদেখি?

শিষ্য।—ক্রোধ চরিতার্থ না হইলে অত্যন্ত কষ্টানুভব হয়, আর চরিতার্থ করিতে পারিলে বড় আরামের ভাব অনুভূত হয়।

আচার্য্য। ক্রোধই সেই সুখ এবং সেই কষ্ট বা দুঃখ স্বরূপে পরিণত হয়। ক্রোধ যে অপসারণ শক্তি বিশেষ তাহা পূর্ব্বেই (   ) বলিয়াছি, সেই ক্রোধশক্তি বিজৃম্ভিত হইয়া যদি মস্তিষ্ক এবং স্নায়ু মণ্ডলের দ্বারা অনর্গলভা যে প্রবাহিত হইয়া রামদাসের গাত্রে (যাহার উপর ক্রোধ করিয়াছ) গিয়া সরিয়া পড়ে, তবে ঐ ক্রোধই সুখাবস্থা হইল, আর যদি কোন কারণে ক্রোধ প্রবাহের বাধা উৎপন্ন হয়, তবে ঐ ক্রোধই দুঃখ স্বরূপে পরিগণিত হইল। ঈর্ষ্যা, অসূয়া, কামাদি সম্বন্ধেও এইরূপ যোজনা করিয়া লইবে। অন্যান্য যত প্রকার শক্তি আছে সকলেরই এই রূপ সুখ দুঃখ অবস্থাদ্বয় হইয়া থাকে। কেবল এক মাত্র শোক সম্বন্ধে এ নিয়ম সংলগ্ন হয় না; কারণ—শোক নিজেই সমস্ত শক্তি প্রবাহের বাধাজনক শক্তি বিশেষ; সুতরাং প্রবল দুঃখের আবিষ্কারক। অতএব উহা যতক্ষণ অনর্গল ভাবে থাকিয়া কার্য্য করে, ততক্ষণই দুঃখাবস্থা

আর যখন বাধিত ভাবাপন্ন হয়, তখন অন্যান্য সকল শক্তিই অনর্গল ভাবে কার্য্য করিতে পারে; সুতরাং সুখাবস্থার পরিস্ফুরণ হয়। অতএব একমাত্র শোকশক্তি ব্যতীত সর্ব্বত্রই পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা অব্যাহত থাকিবে।

সাত্বিক সুখের অর্থ কি ?

শিষ্য। সুখ দুঃখের স্বরূপাদি যাহা বলিলেন তাহা একরূপ বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু আর এক কথায় অতি গুরুতর সংশয় হইল। আপনি পূর্ব্বে, সত্ত্বগুণ ও রজোগুণাদির বর্ণনায়, সত্বকে সুখ স্বরূপ, আর রজোকে দুঃখ স্বরূপ এবং তমকে মোহস্বরূপ বলিয়া আসিয়াছেন। তাহাতে "সত্বং লঘুসুখাত্মকং" ইত্যাদি বচন প্রমাণও প্রদর্শিত আছে। তদ্দ্বারা আমরা বুঝিয়াছিলাম যে, সত্ত্বগুণ হইতে সুখ, রজোগুণ হইতে দুঃখ এবং তমোগুণ হইতে মোহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং সত্ত্বগুণ-প্রভব যে সকল ভক্ত্যাদি শক্তি আছে, তাহারই অন্তর্গত সুখ আছে, এবং রজোগুণ-প্রভব শক্তির মধ্যেই দুঃখ, আর তমোগুণ-সমুৎপন্নশক্তির মধ্যেই মোহ আছে। কিন্তু এখনকার কথায় সে সব উল্‌ট পাল্‌ট হইয়া গেল। এইক্ষণে বলিলেন "আত্মার সত্ত্বগুণ-সম্ভূত শক্তিই হউক, আর রজোগুণ-সমুৎপন্ন শক্তিই হউক, কিম্বা তমোগুণ-সমুদ্ভব শক্তিই হউক, সকলেরই অনর্গল ভাবে প্রবাহিত হইলে সুখ অবস্থা, আর বাধিত-ভাবাপন্ন হইলে দুঃখাবস্থা এবং অত্যন্ত প্রবল অবস্থা হইলে মোহাবস্থা হয়, সুতরাং সত্ত্বগুণও দুঃখ, ও মোহ স্বরূপ হইল, এবং রজোগুণ ও সুখ ও মোহ-স্বরূপ হইল, আবার তমোগুণও সুখ এবং দুঃখ স্বরূপ হইল। এইরূপ বিপরীত বাক্যের কোনটাই শ্রদ্ধাকর্ষক হইতে পরে না। অথবা যদি আমারই ভ্রান্তি হইয়া থাকে তাহাও নির্দ্দেশ করুন।

আচার্য্য। তোমার প্রগাঢ় চিন্তা প্রসূত প্রশ্নের দ্বারা, দিন দিনই আনন্দানুভব করিতেছি! এখানে তোমার কোনই ভ্রান্তি হয় নাই, এ বিষয় এখানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। কিন্তু ইহার উত্তরটি, প্রশ্ন অপেক্ষায় অধিক-তর চিন্তা করিয়া বুঝিতে হইবে।

বাস্তবিকপক্ষে, উভয় কথাই সত্য। পূর্ব্বে যে সত্ত্বগুণ ও সত্ত্বগুণ-সমুৎপন্ন শক্তিকে সুখস্বরূপ, আর রজোগুণ এবং রজোগুণ-সমুৎপন্ন শক্তিকে দুঃখ স্বরূপ, আর তমোগুণ এবং তমোগুণ-সমুৎপন্ন শক্তিকে মোহস্বরূপ বলা হইয়াছে তাহাও সত্য। আবার এখন যে অবস্থা-ভেদে সত্ত্বাদি প্রত্যেক শক্তিকেই সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক বলিলাম, তাহাতেও মিথ্যার আশঙ্কা নাই। কিন্তু বিষয়ের বিলক্ষণ পার্থক্য আছে; তাহা বুঝিতে পারিলে কোনই বিরোধ দেখিবে না। পূর্ব্বে যে সত্ত্বগুণাদিকেই যথাক্রমে সুখ দুঃখ মোহস্বরূপ বলা হইয়াছে, সেই সুখ দুঃখ, মোহ, আর এখনকার কথিত সুখ দুঃখ মোহ, এতদুভয় এক পদার্থ নহে—উহারা নিতান্ত বিভিন্ন জাতীয়। সূক্ষ্ম বিবেচনার দ্বারা সুখ দুঃখকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। ১ম,—লৌকিক সুখ দুঃখ মোহ, ২য়,—অলৌকিক সুখ দুঃখ মোহ। যে সুখ দুঃখ মোহ, সচরাচর সকলেই অনুভব করিতে পারে, তাহার নাম লৌকিক সুখ, আর যাহা কেবল হৃদয়বান্ ব্যক্তিই হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে পারেন, তাহা অলৌকিক সুখ দুঃখ মোহ। আমরা জ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয়ের অন্তর্গত যে সুখ দুঃখাদির স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছি, তাহা লৌকিক সুখ দুঃখ মোহ। লোকে সচরাচর উহাকেই সুখ দুঃখ এবং মোহ বলিয়া জানে। পূর্ব্বে যে সত্ত্বগুণাদিকেই সুখ দুঃখ ও মোহ স্বরূপ বলিয়াছি তাহা অলৌকিক সুখ দুঃখ মোহ। সাধারণ লোকে উহাকে সুখ দুঃখ মোহ বলিয়া অনুভব বা ধারণা করিতে পারে না। এই জন্যই সেই অসাধারণ বা অলৌকিক সুখ দুঃখাদির লক্ষণ এখানে নির্দ্দেশ করা যায় নাই। এইরূপে বিষয়ের পার্থক্য থাকানিবন্ধন, আমাদের পূর্ব্বাপর কথার কোনই বিরোধ নাই। এখন সেই অলৌকিক সুখ দুঃখাদির লক্ষণ ও বলিতেছি, তবেই উভয়ের পার্থক্য অনুভব করিতে পারিবে। পরন্তু, লৌকিক সুখ দুঃখাদির ন্যায় দৃষ্টান্ত ও তর্ক যুক্তি দ্বারা, সেই অলৌকিক সুখ দুঃখাদির অবস্থা বুঝানের কোন উপায় নাই। উহাতে কেবল মাত্র নিজের অনুভবই মুখ্যতম প্রমাণ। নিজের অনুভূতিবলে যতদূর ধারণা করিতে পার, ততই পরিষ্কার রূপে উহা বুঝিতে পারিবে।

অলৌকিক সুখের বিবরণ।

বৈরাগ্য, বিবেক, ভক্তি, শান্তি প্রভৃতি যে কোন প্রকার সত্ত্ব শক্তি, আমাদের আত্মাতে বিকসিত হয়, তাহাদের অনর্গলভাবে পরিস্ফুরণ হইলেই লৌকিক সুখাবস্থা হইল, এবং বাধিতভাবে পরিস্ফুরণে লৌকিক দুঃখাবস্থা হইবে, আর অতি প্রবল রূপে পরিস্ফুরণেই লৌকিক মোহাবস্থা হইবে, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। কিন্তু উহাদের নিজের মধ্যে যে এক প্রকার স্বাভাবিক প্রশান্তভাব বা মধুরতা বিমিশ্রিত আছে, তাহা উহাদের কোন অবস্থায়ই বিযুক্ত হয় না। ভক্তিটি বিকসিত হইলেই, মনে মনে যেন কি এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় মধুর রসের আস্বাদ হইতে থাকে, যেন কি এক প্রকার লঘু লঘু—হাল্‌কা হাল্‌কা ভাব মনের মধ্যে সমুদিত হয়, তাহা মুখে ব্যক্ত করা যায় না। সেই মধুরতা বা লঘু লঘু ভাবটি যেন ভক্ত্যাদি শক্তির মধ্যেই মাখান আছে, তাহা কোন অবস্থায়ই বিযুক্ত হয় না। ভক্ত্যাদি শক্তি বাধিত ভাবে প্রবাহিত হইয়া লৌকিক দুঃখাবস্থায় পরিণত হইলেও উহাদের ঐ অনুপম মধুরতা বা লঘুতার কিছুমাত্র অভাব হয় না। সুতরাং অবস্থা দ্বারা উহা দুঃখরূপে পরিগণিত হইলেও, ও স্বরূপতঃ মধুরও স্পৃহণীয় রূপেই অনুভূত হয়। আবার, যখন অপরিমিত ভক্তি শক্তি উদ্বেলিত হয়, তখন তো আনন্দের পরিসীমাই থাকে না। তখন অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদির বৃত্তি নিস্তব্ধ হইয়া উহা লৌকিক মোহাবস্থায় পরিণত হইলেও স্বরূপতঃ অমৃত সমুদ্রে পরিণত হয়। উহা কিরূপ মধুর, তাহা যে মহাত্মার ঐ অবস্থা হয় তিনিই বলিতে পারেন। বিবেকাদি সম্বন্ধেও এইরূপই হইয়া থাকে। অতএব কোন অবস্থায়ই ভক্ত্যাদির ঐ মধুরতাদি ভাবটি পরিমুক্ত হয় না। এই স্বাভাবিক মাধুর্য্য, লঘুতা ও স্পৃহণীয়তাকেই "অলৌকিক সুখ" বলে। তাই সত্ত্বগুণকে সুখস্বরূপ বলা গিয়া থাকে। তবে বিশেষ এই যে, ঐ ভক্ত্যাদির স্রোতটা যদি অনর্গল ভাবে প্রবাহিত হইতে পারে, তবে অপরিমিত মধুরতার আস্বাদ হইয়া থাকে, তাই তাহাকে লৌকিক সুখ, আর বাধিত ভাবে প্রবাহিত হইলে তাহার মাধুর্য্যের ততদূর আস্বাদ

হয় না, আত্মার পরিপূরণ হয় না, তাই তাহাকে লৌকিক দুঃখ বলা গিয়া থাকে। অতএব এই অলৌকিক সুখাবস্থা, লৌকিক সুখ, দুঃখ ও মোহ এই তিনের মধ্যেই অন্তর্ব্বর্ত্তি-ভাবে অবস্থিতি করে। সুতরাং পূর্ব্ব কথার সহিত আমাদের পরকথার কিছুমাত্র বিরোধ হইল না।

শিষ্য। এই অদ্ভুত রহস্য বুঝিতে পারিয়া অতুল আনন্দ লাভ করিলাম। কিন্তু এইরূপ স্বাভাবিক সুখাবস্থার সহিত লৌকিক সুখাবস্থার কি সাদৃশ্য আছে,—যদ্দ্বারা উভয়কেই এক " সুখ " নামে ব্যবহার করা যায়?

আচার্য্য। ইহাদের দুই প্রকার সাদৃশ্য আছে, সেই জন্য উভয় অবস্থাকেই সুখ নামে অভিহিত করা হয়। ১ম, স্পৃহণীয়তা, ২য়, লঘুতা। কোন শক্তি অনর্গলভাবে প্রবাহিত হইয়া সুখাবস্থা হইলে, তাহা যেমন স্পৃহণীয়ভাবে অনুভূত হয়,—সত্ত্বশক্তিটা স্বভাবতঃই সেইরূপ অতিস্পৃহণীয়ভাবে অনুভূত হয়। এবং অনর্গলভাবে কোন শক্তি প্রবাহিত হইয়া সুখাবস্থাপন্ন হইলে, তাহাতে যেমন একটা হাল্‌কাহাল্‌কা—লঘুলঘু—ভাব অনুভূত হয়, সত্ত্বশক্তির মধ্যেও স্বভাবতঃই সেইরূপ এক প্রকার লঘু লঘুভাব অনুভূত হয়। এজন্য উভয়াবস্থাকেই " সুখ " নামে অভিহিত করা গিয়া থাকে। এখন অলৌকিক দুঃখের বিবরণ শুন।

অলৌকিক দুঃখের বিবরণ।

একএকটি ইন্দ্রিয় বা অন্য কোন প্রকার রাজসিকশক্তি যখন অনর্গল ভাবে প্রবাহিত হইয়া আপনাপন কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকে, তখন অবশ্যই তাহাকে লৌকিক সুখাবস্থা বলিতে হইবে। কিন্তু সেই সুখাবস্থার মধ্যেও যেন কি একপ্রকার অসহনীয়ভাব—যেন একটা তীব্রতীব্র ভাব অনুভূত হয়। ঐ অসহনীয়তা বা তীব্রতা ভাবটি যেন ঐ ক্রোধাদি শক্তিগুলির মধ্যেই নিহিত আছে বলিয়া মনে হয়। সাত্ত্বিকশক্তিগুলি যেমন সুশীতল, নিতান্ত মধুর, কোমল, কমনীয় ও লঘুলঘুভাবে অনুভূত হয়, উহারা সেইরূপ নহে। ক্রোধাদি শক্তির সঙ্গেই যেন কিরূপ একটা উষ্ণতা, কিরূপ একটা কটুতা, কঠিনতা ও গুরুত্বাদির উপলব্ধি হয়। সেই ভাবটুকু

উহা হইতে পৃথক্ করা যায় না, অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় যেন ক্রোধাদির মজ্জা মধ্যেই ঐ সকল গুণ নিহিত আছে, এবং উহাদের বাধিত অবাধিত সকল অবস্থায়ই উহা অনুভূত হয়। শাস্ত্রও বলেন * * "তাপকস্য রজসঃ সত্ত্বমেব তপ্যম্" * * (পা, দ, ২ পা ১৭ সূ ভাঃ)। অতএব সেই অবস্থার নামই অলৌকিক দুঃখ। তাই শাস্ত্রে রজোগুণ মাত্রকেই দুঃখ স্বরূপ বলিয়াছেন; রজোগুণপ্রভবশক্তিগুলি অনর্গলাদি অবস্থানুসারে সুখ, দুঃখ ও মোহ-স্বরূপ হইলেও, সত্ত্বগুণের তুলনায় কেবলই দুঃখ। কিন্তু ইহাও অন্তঃসার-সম্পন্ন ব্যক্তিরই অনুভব গোচর হয়। যাহাদের অন্তঃসার কিছুমাত্র নাই তাহারা এই দুঃখ অনুমান করিতেও পারে না।

এখানেও লৌকিক দুঃখের পাঁচটি সাদৃশ্য লইয়া ইহাকে দুঃখ বলিয়া ব্যবহার করা হয়। (১ম) অসহনীয়তা, (২য়) তীক্ষ্ণতা, (৩য়) খরতা, (৪র্থ) কঠিনতা, এবং (৫ম) গুরুতা। ইন্দ্রিয় প্রাণাদি কোন শক্তি বাধিত-ভাবাপন্ন হইয়া যখন দুঃখাবস্থায় পরিণত হয়, তখন যেন কেমন একটা অসহনীয়তা, তীক্ষ্ণতা, খরতা, কঠিনতা এবং গুরুত্বভাবের অনুভূতি হইতে থাকে আবার কাম ক্রোধাদি রজঃশক্তিগুলিরও যখন বিকাশ হয়, তখন উহা অনর্গল বা বাধিত, যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন তাহাতেই, ঐ সকল ভাবগুলি অনুভূত হয়। ভক্তি, বিবেকাদি সত্ত্বশক্তির তুলনায় উহা যেন অত্যন্ত অসহনীয়, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, খর, কঠিন ও গুরু গুরু—ভারীভারী বলিয়া উপলব্ধ হয়। এই সাদৃশ্য নিবন্ধন, রজঃশক্তিকেই দুঃখস্বরূপ বলিয়াছেন, সুতরাং কোনই বিরোধ নাই। এখন তমঃশক্তিকে মোহ বলেন কেন তাহাও শ্রবণ কর।

তমোগুণকে মোহস্বরূপ বলেন কেন?

সুখদুঃখের ন্যায় মোহ ও লৌকিক, অলৌকিক, এই দুই ভাগে বিভক্ত। কোন শক্তির পূর্ণমাত্রায় উত্তেজনা হইলে সমস্ত প্রকার জ্ঞানাদি বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং অন্তরেঅন্তরে কেবল সেই শক্তিটিরই অনুভূতিটি থাকে—যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি (১৯১ পৃঃ ২৪ পং)। তাহাই লৌকিক মোহ অবস্থা। আর

দেহাভ্যন্তরবর্ত্তী চিৎস্বরূপ আত্মাকে মলিনভাবে দর্শন করার অবস্থাকে অলৌকিক মোহাবস্থা বলে।

তমঃশক্তিটা অত্যন্ত মলীমসা, আত্মার মধ্যে তাহার উত্তেজনা হইলে চিৎস্বরূপ পরমাত্মা অতি মলিন অবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকেন। এমন কি তমোগুণের পূর্ণ প্রাদুর্ভাবে, আত্মা একবারেই পরিলক্ষিত হয়েন না। সুতরাং তখন অলৌকিক মোহাবস্থা হয়। এনিমিত্ত তমোগুণকে মোহস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তমোগুণ হইতে সমুৎপন্ন যে সকল শক্তি তাহাদের ও আপন প্রকৃতি-তমোগুণের ধর্ম্ম বিলক্ষণ আছে, তাহারাও নিতান্ত মলীমসী এবং তাহাদের উত্তেজনা হইলেও স্বপ্রকাশস্বরূপ পরমাত্মা কিছুমাত্র পরিলক্ষিত হয়েন না। অতএব তাহারাও অলৌকিক মোহস্বরূপ।

এইরূপে সত্ব, রজঃ, ও তমোগুণকে, সুখ, দুঃখ, মোহ স্বরূপ বলা হইয়া থাকে। অতএব পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের সহিত, আমার পরবর্ত্তি-কথার কিছুমাত্র বিরোধ নাই।

এতাবৎ বিচারের ফল।

একটি বিষয় সুস্পষ্ট রূপে বুঝানের অনুরোধে, প্রসঙ্গোত্থিত নানা বিষয়ের মীমাংসা করিতে গিয়া, প্রকৃত বিষয় হইতে অতি দূরে আসা গিয়াছে, এজন্য উপসংহারের দ্বারা এতাবৎ ব্যাখ্যাবলীর ফলটা স্মরণ করিয়া দিয়া প্রকৃত বিষয় অনুসরণ করা যাউক।

জ্ঞান স্বরূপ নির্ণয়ের প্রসঙ্গে, এই সুবিস্তীর্ণ বিচার, ও মীমাংসা দ্বারা এই পর্য্যন্ত নির্ণীত হইয়াছে যে, আমাদের দেহের মধ্যে যে কোন শক্তির বিকাশাবস্থা বা ক্রিয়া আমরা অনুভব করিয়া থাকি, তৎসমস্তই নিজের আত্মার এক একটি অবস্থাবিশেষমাত্র। ভক্তি, দয়া, শান্তি, সন্তোষ, বিবেক, বৈরাগ্য, ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, হর্ষ, শোক, আশা, ভয়, ইচ্ছা, যত্ন, চেষ্টা প্রভৃতি সমস্ত শক্তি, কিম্বা সুখ, দুঃখ, মোহ, প্রভৃতি কিছুই আমাদের জীবাত্মা হইতে অতিরিক্ত কোন পদার্থ নহে কিম্বা নূতন করিয়া উৎপন্ন আত্ম-সংলগ্ন কোন প্রকার গুণ বা শক্তিবিশেষও

নহে, অবস্থাভেদে জীবাত্মা নিজেই ভক্তি, নিজেই দয়া, নিজেই শান্তি, নিজেই সন্তোষ. নিজেই বিবেক, নিজেই বৈরাগ্য, নিজেই ক্রোধ, নিজেই ঈর্ষ্যা, নিজেই শোক, নিজেই সুখ, নিজেই দুঃখ, এবং মোহ ইত্যাদি সমস্তই আত্মা নিজে। এইগুলি সমস্তই জাহ্নবীর জোয়ার ভাঁটার অবস্থার স্থায় জীবাত্মার এক একটু উল্‌ট পাল্‌ট বা পরিবর্ত্তন অবস্থা মাত্র। নির্ণয় করা হইয়াছে যে, সুখ, দুঃখ, শোক, হর্ষ, ভক্তি বিবেকাদি সকল প্রকার শক্তিই যখন জীবাত্মা নিজে, তখন ঐ সকল শক্তির আভ্যন্তরিক অনুভব করা, আর আমাদের "আমির" (জীবাত্মার) অনুভব করা ইহা এক কথা। নির্ণয় করা হইয়াছে যে, জ্ঞান বাঅনুভবাদি নামে কোন প্রকার শক্তি বা গুণ বিশেষ নাই, চৈতন্যের সহিত আমাদের শক্তিগুলির বিমিশ্রণ থাকাতে অন্তরে অন্তরে যে সর্ব্বদা একটা প্রকাশ ভাব বিদ্যমান আছে, তাহারই নাম জ্ঞান বা অনুভূতি। নির্ণয় করা হইযাছে যে দেহের মধ্যে যত্ত প্রকার শক্তি, গুণ, ও ভাবের অনুভব হয়, তৎসমস্তই যখন "আমি" নিজে, এবং তাহাদের অনুভব আর "আমির" অনুভব যখন একই কথা, তখন আমরা সর্ব্বদা যে সকল শক্তি, গুণ বা ভাবের অন্তরেঅন্তরে প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহা আমার নিজকেই অনুভব করিতেছি, অতিরিক্ত কিছুই অনুভব করিতেছি না। ইত্যাদি আরও কত কত বিষয় নিরূপিত হইরাছে। এতৎ সমস্ত বাক্যাবলীর দ্বারা বিশেষরূপে কেবল ইহাই নির্ণয় হইয়াছে যে, আমাদের কোন প্রকার জ্ঞান বা অনুভূতি কখনই উৎপন্ন বা বিনষ্ট বা পরিবর্ত্তিত, বা হ্রাস প্রাপ্ত, বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, জীবের জন্মাবধি যে সেই চিরন্তন প্রকাশাত্মক অনুভব আছে, সেই অনুভবই আমাদের সুখ, দুঃখ, শোকাদি রূপে আত্মার এক একটু অবস্থান্তর হইলে, একএকবার গ্রাহ্য হইয়া থাকে, তদ্ব্যতীত সর্ব্বদার জন্য তাহা গ্রাহ্যে আইসে না, তাই ঐ সুখ দুঃখাদির জ্ঞানকে জন্য এবং বিনষ্ট বলা হইয়া থাকে, এবং সেই যে সহজাত জ্ঞান তাহাও কোন প্রকার গুণ বা শক্তি বা ক্রিয়াদি কিছুই নহে, কেবল একটা প্রকাশভাব মাত্র, সুতরাং উহার আধারাধেয়াদিও কিছুই নাই। এই বিষয় প্রমাণীকৃত করার নিমিত্তই

এত কথার বিস্তার। এই যে জ্ঞানের কথা বলা হইল ইহাকে সাংসিদ্ধিক জ্ঞান বলিতে পারা যায়। এই সাংসিদ্ধিক জ্ঞানেরই নামান্তর মানসিক প্রত্যক্ষ ইহা মনে রাখিবে। কিন্তু আর একপ্রকার মানসিক প্রত্যক্ষও আছে তাহা পরে বলিব। ওঁ শ্রীসদাশিবঃ ওঁ ॥

ইতি শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি কৃতায়াং ধর্ম্মব্যাখ্যায়াং ধর্ম্ম সাধনে ধর্ম্ম নিমিত্তকারণ-সমাধিবর্ণনে সাংসিদ্ধিক জ্ঞান-স্বরূপ নিরূপণং নাম তৃতীয়খণ্ডং সম্পূর্ণম্।

তৃতীয় খণ্ডে একটি মহা ভ্রম আছে, ২।৩ স্থানে "অনুকূল বেদনীয়ং সুখম্" এই স্থলে "প্রতিকূল বেদনীয়ং সুখম" লিখিত আছে।

ওঁ

শ্রীসদাশিবঃ

শরণম্।

ধর্ম্মব্যাখ্যা

চতুর্থ খণ্ড।

বাহ্যজ্ঞান-স্বরূপনির্ণয়ের প্রশ্ন।

শিষ্য। আমাদের অভ্যন্তরস্থিত সুখ, দুঃখ, শোক, তাপাদি যাহা কিছু অনুভূত হইয়া থাকে, তাহার কিছুই আত্মা হইতে অতিরিক্ত কোন গুণ বা শক্তি বিশেষ নহে; উহা জীবেরই একএকটী অবস্থাবিশেষমাত্র, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। এবং সেই অনুভব বা জ্ঞানও, আত্মাতে সমুৎপন্ন বা আত্ম-সংলগ্ন কোন প্রকার গুণ বা শক্তি বা ক্রিয়া বিশেষ নহে, উহা জীবাত্মারই বিদ্যমানতার নামান্তর মাত্র। চৈতন্য বা প্রকাশ বা সত্তাস্বরূপ-পদার্থের সহিত অভিন্নভাবে সম্বদ্ধ হইয়া আমাদের মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদিও সেই স্বপ্রকাশ চৈতন্যের ন্যায়ই অন্ধতা-পরিশূন্যভাবে বা জাগ্রৎ-ভাবে সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেছে, তাহারই নাম জ্ঞান; এই জাগ্রৎভাবস্বরূপ-জ্ঞান কখন উৎপন্নও হয় না, বিনষ্টও হয় না, পরিবর্ত্তিতও হয় না; ইহাও সবিশেষ অবগত হইলাম। কিন্তু ইহা কেবল অধ্যাত্ম বিষয়ের জ্ঞান-সম্বন্ধেই বুঝিলাম জীবাত্মা এবং তাহার সুখ, দুঃখ, মোহাদি-অবস্থাসমূহের যে জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহার বিষয়ই ঐরূপ বুঝিলাম। কিন্তু বাহ্যজ্ঞান কিরূপ পদার্থ তাহা বুঝিতে পারি নাই; আমাদের যে বাহিরে ঘটপটাদির জ্ঞান হইয়া থাকে তাহা সর্ব্বদাই উৎপন্ন এবং বিনষ্ট হইতেছে, এবং উহা একটি ক্রিয়া বিশেষ অথবা আত্মার

গুণ বিশেষ মাত্র, এইরূপই আমাদের ধারণা। এ বিষয়ে শাস্ত্রের এবং আপনার কি মত তাহা জানিতে ইচ্ছা।

আচার্য্য। বাহিরের কোন বস্তুর দর্শন বা স্পর্শনাদি কালে কিরূপ ঘটনা হয় তাহা অবগত আছ কি?

শিষ্য। তাহা একপ্রকার জানি।

আচার্য্য। কিরূপ জান বল দেখি?

শিষ্য কর্ত্তৃক বাহ্য জ্ঞানের প্রণালী কথন।

শিষ্য। প্রথমে দর্শনের প্রণালী বিষয়ে যাহা জানি তাহা নিবেদন করিতেছি। চক্ষুর মধ্যে পরস্পর বিভিন্নরূপ সাতটি দ্বার বা অবস্থা আছে, তাহার পর একটি বড়মত স্নায়ু আছে,—যাহাকে শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণ "চাক্ষুষ স্নায়ু" বলিয়া থাকেন; সেই স্নায়ুটি চক্ষুর তলা হইতে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত সংলগ্ন আছে।

উক্ত সাতটি দ্বারের একএকটি একএক আকৃতির; উহাদের সকলের উপরের দ্বারটি, একটি শাদাবর্ণ পরদা—যাহা চক্ষুর দিকে দৃষ্টি করিলে শ্বেতপদ্মের দলের মত দৃষ্ট হয়। তাহার নীচে বড় গোলাকার একটি কালবর্ণ পরদা আছে, তাহার নীচে ক্ষুদ্র—নীলবর্ণ একটি পরদা; তাহার নীচে কতটুক তরলাকার, ডিয়লের আঁটার মত, পদার্থ আছে; তাহার নীচে তদপেক্ষায় কিছু সরু মত আর একটি ঐরূপ পদার্থ আছে, তাহার নীচে দর্শকস্নায়ু বা চাক্ষুষস্নায়ুর মুখে আর একটি পরদা আছে, তৎপর দর্শকস্নায়ুর মুখ। এই দ্বারগুলির প্রত্যেকটিই, পৃথক্ পৃথক্-প্রকারে পৃথক্‌পৃথক্-পদার্থ দ্বারা গঠিত এবং নানাবিধ ভঙ্গীতে অবস্থিত। ইহাদের প্রত্যেকের ক্রিয়া-প্রণালীও বিলক্ষণ পৃথক্ এবং অদ্ভুত, তাহা বলিতে হইলে অনেক সময় যায়।

যখন কোন দৃশ্যবস্তু আমাদের সম্মুখবর্ত্তী হয়, তখন সেই বস্তুর বর্ণটি মাত্র বিকীর্ণ হইয়া আসিয়া, প্রথমে আমাদের চক্ষুর উপরের শাদা পরদাটিতে পতিত হয়। তৎপর ঐ বর্ণটি ক্রমে একএকটি দ্বার ভেদ করিয়া মস্তিষ্কের দিকে যাইতে থাকে, আর একএক-দ্বারের দ্বারা এক একপ্রকার অবস্থায় পরিণত

হইতে থাকে; এই প্রকারে ক্রমে অন্যান্য দ্বার ভেদ পূর্ব্বক, নানাপ্রকার অবস্থায় পরিণত হইয়া অবশেষে দর্শকস্নায়ু দ্বারা মস্তিষ্কে উঠিয়া মনের উদ্বোধন করে। মনের উদ্বোধন হইলে পুনর্ব্বার অপর চক্ষুর দ্বারা ঐ বস্তুটি দর্শনের নিমিত্ত চেষ্টা হয়। তখন অপর চক্ষুর দ্বারাও সেই পূর্ব্বকার মতই, ঐ আলোক বা বর্ণ শক্তিটি প্রবিষ্ট হইয়া চাক্ষুষ-স্নায়ুর দ্বারা মস্তিষ্কে যায় এবং মনের উদ্বোধন করে, পরে ঐ বর্ণটির জ্ঞান হয়। ইহাই দর্শনজ্ঞানের সাধারণ ও সঙ্ক্ষিপ্ত প্রণালী। শ্রবণেন্দ্রিয়াদিজনিত জ্ঞানেও, এইরূপেই বাহির হইতে শব্দাদিবিষয়গুলি কর্ণাদির দ্বারা প্রবিষ্ট হয় এবং সেই সেই স্থানের স্নায়ুর দ্বারা মস্তিষ্ক মধ্যে উত্থিত হয়, পরে মনের উদ্বোধন করে, তৎপর আবার অপর কর্ণাদির দ্বারা শ্রবণাদি করার চেষ্টা হইলে, শব্দাদি শক্তি অপর কর্ণাদি দ্বারা পূর্ব্ববৎ মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হইয়া মনের উদ্বোধন করে, তখন শব্দাদির জ্ঞান জন্মায়; ইহাই শ্রবণাদি জ্ঞানের সঙ্ক্ষিপ্ত ও সাধারণ নিয়ম।

আচার্য্য। যে টুকু বলিলে তাহা অবশ্যই মিথ্যা নহে; কিন্তু বল দেখি, তুমি যখন বিশেষ আগ্রহ-সহকারে একমনে—একদৃষ্টে কোন একটি বস্তু দেখিতে থাক, তখন তোমার নিকটে সহস্র সহস্র কথা হইলেও, তুমি কিছুই শুনিতে পাওনা, ইহার কারণ কি? কিন্তু ঐ সকল কথা যে, তখন তোমার কর্ণ-কুহরে গিয়া নিপতিত হয় না, তাহাও নহে; কারণ শব্দের গতি অনিবার্য্য; তবে তুমি শুনিতে পাওনা কেন? অথবা; যখন অতুল আগ্রহের সহিত একচিত্তে কোন বক্তৃতা কিম্বা গান শ্রবণ করিতে থাক, তখন অন্যান্য কথাবার্ত্তা শুনিতে পাওনা কেন?

শিষ্য। মনোযোগ দিই না, তাই শুনিতে পাই না, মনোযোগ না দিলে তাহার জ্ঞান হইতে পারে না।

আচার্য্য। তোমাকে যদি সবেগে একটি ধাক্কা দেওয়া যায়, তবে তোমার মনোযোগ না থাকিলে, সেই ধাক্কা তোমার দেহের উপর কার্য্য করিতে পারে না কি? তুমি কি তখন ভূমিসাৎ হও না?।

শিষ্য। তা অবশ্যই হইতে হয়।

আচার্য্য। তবে তোমার জ্ঞানের সময় মনোযোগ আর অমনোযোগে কি করিবে? তখনও ত বাহিরের বস্তুর নীল পীতাদি বর্ণ; অথবা শব্দাদি শক্তি

তোমার চক্ষু বা কর্ণ মধ্যে গিয়া আঘাত করিয়া, ক্রমে স্নায়ুমণ্ডলের দ্বারা মস্তিষ্কে প্রবেশ পূর্ব্বক মনের উদ্বোধন করিবে এবং জ্ঞান জন্মাইবে, তাহাতে তোমার মনোযোগ অমনোযোগে বিশেষ ফল হইবে কেন ?।

শিষ্য। আপনি কি উদ্দেশ্যে কোথায় আনীয়া ফেলেন, তাহা বুঝা যায় না, আপনিই এ বিষয়ের প্রকৃত সিদ্ধান্ত করুন।

দর্শনাদি বাহ্যজ্ঞানের প্রণালী।

আচার্য্য। জ্ঞান হওয়া সম্বন্ধে কএকটি মুখ্য বিষয় আছে, তাহাই জান না, সুতরাং উহা বলিতে পার নাই; তাহা একটু ধীরভাবে শুন।—নয়নাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সকল জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহার দুই প্রকার প্রণালী আছে। কোন বস্তু দর্শন বা শ্রবণ করার অব্যবহিত পূর্ব্বসময়, যদি মন অন্য কোন বিষয়ে আসক্ত থাকে, তবে জ্ঞানের একপ্রকার প্রণালী হয়। আর যদি সেই সময়ে মন অন্য কোন বিষয়ে সমাসক্ত না থাকিয়া, সেই বস্তুটিই (যাহা তুমি দেখিবে বা শুনিবে, সেই বস্তুটিরই) দর্শন বা শ্রবণের নিমিত্ত প্রস্তুত থাকে তাহা হইলে, আর একপ্রকার প্রণালীতে জ্ঞান হইয়া থাকে।

প্রথমে, প্রথম প্রণালীটি বলিতেছি।—কোন দৃশ্যবস্তু সম্মুখবর্ত্তী হইলে, তাহার ইতস্ততঃ-বিসর্পন্ত-আলোক শক্তি বা নীল পীতাদি বর্ণ শক্তি, চলিয়া গিয়া প্রথম চক্ষুর বাহিরের পরদায় সংযুক্ত হইবে, তৎপর তোমার কথিতরীতি অনুসারেই মস্তিষ্কস্থ-মনকে উদ্বোধন করিবে, তৎপর বুদ্ধির স্থানে (৬৯পৃ ২পৃ) উপস্থিত হইয়া বুদ্ধির উদ্বোধন করিবে। তৎপর, নিজ-গাত্রে মশকে দংশন করিলে যেরূপ, ঐ দংশনের ঘটনা মস্তিষ্কবাসী-আত্মাতে উপস্থিত হইলে, তৎক্ষণাৎ ঐ দংশন ক্রিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী আর একটি শক্তি প্রাদুর্ভূত হয় এবং মশকের দংশনজনিত বাধা পরিমোচনের নিমিত্ত হস্তের স্নায়ুর দ্বারা প্রবাহিত হয়, তৎপর করের অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং হস্তও সেই শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া মশকটা বিতাড়িত করে; সেইরূপ, বাহিরের আলোক বা বর্ণ শক্তি গিয়া আত্মার উদ্বোধন করা মাত্রেই তৎক্ষণাৎ আলোক শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী একটি শক্তিপরিস্ফুরিত হইয়া আলোক শক্তিকে উপশান্ত

করার নিমিত্ত বাহিরের দিকে বিসর্পিত হয়, ক্রমে মস্তিষ্ক পরিত্যাগ পূর্ব্বক দর্শক স্নায়ু ছাড়াইয়া চক্ষুর শেষপরদা পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়, এমনকি ঐ শক্তির প্রভাব বাহিরেও অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া থাকে। এই শক্তির নামই "ইন্দ্রিয় শক্তি" ইন্দ্রিয় শক্তি, এইরূপ বিসর্পিত হইয়া আসিলে, এদিকে বাহিরের আলোক বা বর্ণ শক্তির স্রোত ও ঐ চক্ষুতে পড়িয়া ঐ প্রসারিত ইন্দ্রিয় শক্তির সহিত মিলিত হয়। তখন উভয়েরই পরস্পর ভবাভিভবের চেষ্টা হইয়া থাকে, এবং উভয়ের এক প্রকার সঙঘর্ষণ উপস্থিত হয়; সঙঘর্ষণে আলোক শক্তি আর ইন্দ্রিয় শক্তি উভয়ই যেন এক হইয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ, নয়নেন্দ্রিয় প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়-মাত্রেই স্বচ্ছতাগুণ-সম্পন্ন, কারণ ইন্দ্রিয়মাত্রেই, আত্মার রজোগুণ বিকার বিশেষ হইলেও, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে সত্বাংশও বিশেষরূপে আছে। সত্বগুণ যে প্রকাশক এবং অতীব স্বচ্ছতাগুণ-সম্পন্ন, তাহা পূর্ব্বেই (১৭১ পৃঃ) বলিয়াছি; সুতরাং তাহা হইতে সমুৎপন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও স্বচ্ছতাগুণ-বিশিষ্ট। এজন্যকাচ ও স্ফটিকাদির ন্যায়, উহা যে বস্তুর সহিত অভিসম্বদ্ধ হয়, তাহার আকৃতিই গ্রহণ করে। অতএব তোমার নয়নেন্দ্রিয়, পূর্ব্বোক্ত মতে, ঐ নীল পীতাদি বর্ণ শক্তিটির সহিত সম্মিলিত হওয়া মাত্রে, ইতদাকার গ্রহণ করিবে, এবং তৎক্ষণাৎ ঐ চক্ষুর মধ্যেই বিদ্যুচ্চমকের ন্যায় অত্যল্পক্ষণ-স্থায়ী এক প্রকার জ্ঞান হইবে। এই জ্ঞান এত অপরিস্ফুট যে ইহাতে, ঐ দৃশ্যমান বস্তুটি নীল কি পীত তাহা কিছুই নির্দ্দেশ করা যায় না। ইহাকে "অনির্ব্বচনীয় জ্ঞান" বা "আলোচন জ্ঞান" বলে। "শব্দাদিষু পঞ্চানামালোচন মাত্র মিষ্যতে বৃত্তিঃ।" "সাঙ্খ্যকারিকা") অন্যত্রচ "অস্তি হ্যালোচনং জ্ঞানং প্রথমং নির্ব্বিকল্পকম্। বালমূকাদি বিজ্ঞান সদৃশং মুগ্ধ বস্তুজম্।" "জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকের সহিত শব্দাদি বাহ্য বিষয়ের যথানিয়মিত সম্বন্ধ হইলেই তৎক্ষণাৎ এক প্রকার জ্ঞান জন্মিয়া থাকে তাহার নাম "আলোচন জ্ঞান" এই জ্ঞান নিতান্ত অপরিস্ফুট, ইহাতে "এটি এই বস্তু" এরূপ ভাব প্রকাশ পায়না, ইহা সদ্যোজাত বালকের জ্ঞানের ন্যায় নির্ব্বিকল্পক।"

তৎপর ঐরূপ জ্ঞান সঙ্ঘর্ষণ ব্যাপার মনের স্থান পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় এবং মনও নিজ স্বচ্ছতা গুণে ঐ আলোক বা বর্ণের তন্ময় হইয়া যায়, তখন ঐ নির্ব্বি-

কল্পক বা আলোচন জ্ঞানই পূর্ব্বাপেক্ষায় আর একটু পরিস্ফুট হয়। তৎপর উহা কি বস্তু দেখিলে, তাহা নিশ্চয় করার নিমিত্ত তোমার মনের মধ্যে চেষ্টা হইবে। এবং তখন ঐআলোক পরিত্যাগ করিয়া, সেই পূর্ব্ব দৃষ্ট আলোকের সম্পূর্ণ ভাবটি তোমার মনে উপস্থিত হইবে (ইহার নাম স্মরণ)। তৎপর ঐ পূর্ব্ব দৃষ্ট আলোকের সহিত শেষেকার দৃষ্ট বস্তুটির (আলোকের) সহিত তুলনা করার নিমিত্ত প্রবৃত্তি হইবে। সুতরাং আবার তোমার মন, ইন্দ্রিয় শক্তিরূপে পরিণত হইয়া, পূর্ব্ববৎ চাক্ষুষ স্নায়ুর দ্বারা বিসর্পিত হইয়া সম্মুখস্থ-আলোক শক্তির সহিত মিলিত হয়; এবং পূর্ব্ববৎ আলোকাকারে পরিণত হয়। এবং তখন ও ঐ ব্যাপার পুনর্ব্বার গিয়া মনের স্থানে উপস্থিত হইলে পূর্ব্বদৃষ্ট আলোকের সহিত উহার তুলনায়, উভয়ই এক হইয়া যায়, তখন "এটিও আলোক" এইরূপ স্থির করা হয়। তথাচ,—"উভয়াত্মকমনঃ সঙ্কল্পকমিন্দ্রিয়ঞ্চ সামর্থ্যাৎ." (সাঙ্খ্য-কারিকা) অন্যত্রচ " ততঃ পরং পুনর্ব্বস্তু ধর্ম্মৈর্জ্জাত্যাদিভির্যয়া। বুদ্ধ্যাবসীয়তে সাহি প্রত্যক্ষত্বেন সম্মতা।" তৎপর অভ্যন্তরে বুদ্ধিস্থানপর্য্যন্ত ঐ সঙ্ঘর্ষণ ব্যাপার উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে বুদ্ধিও, ঐ আলোক বা বর্ণের তন্ময় হইয়া তদাকারে আকারিত হয়। তখন "আমি এই পীত বর্ণ বস্তুটি দেখিলাম" এইরূপ অধ্যবসায়ের ভাব প্রকাশিত হয়। তথাচ,—"অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ * * *" (সাঙ্খ্য)। এই পর্য্যন্ত হইলেই আলোক প্রত্যক্ষের শেষ হইল। ইহাও শাস্ত্রেই আছে, "প্রতি বিষয়াধ্যবসায়োদৃষ্টং" (সাঙ্খ্য কারিকা) "যৎ সম্বদ্ধং সৎ তদাকারোল্লেখি বিজ্ঞানং তৎপ্রত্যক্ষম্" (সাঙ্খ্যদর্শন)। প্রত্যেক বস্তুর দর্শন কালেই উক্ত সকল গুলি ঘটনা ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ইহা এত শীঘ্রই হইয়া যায় যে সাধারণ জ্ঞানে তাহা কোন মতেই উপলব্ধি করা যায় না, ইহা প্রায় এক অনুপল কালের মধ্যেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এই গেল প্রথম প্রণালী, অতঃপর দ্বিতীয় প্রণালী বলা যাইতেছে।

জ্ঞানোৎ পত্তির দ্বিতীয় প্রকার-প্রণালীতে আর আর সমস্তই সমান, কেবল বিশেষ এই যে, ইহাতে প্রথমেই কোন কারণে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থিত বুদ্ধি শক্তির উদ্বোধন ও পরিস্ফুরণ হইয়া, সম্মুখস্থিত বস্তুটি দর্শনের নিমিত্ত উহা চাক্ষুষ স্নায়ুর দ্বারা অগ্রসর হইতে থাকে, তৎপর ঐ

দৃশ্যবস্তুকে লক্ষ্য করিয়া চক্ষুকে বিন্যস্ত বা নিযুক্ত করে, তৎপর পূর্ব্ব-নিয়মেই চক্ষুসংলগ্ন-বর্ণশক্তি বা আলোকের সহিত মিলিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত মতেই আলোকের জ্ঞান উৎপন্ন করে; এইটিই দ্বিতীয় প্রণালী। শ্রবণ ও স্পর্শন প্রভৃতি সকল প্রকার ঐন্দ্রিয়িক প্রত্যক্ষেই উক্ত দ্বিবিধ প্রণালীর কোন একটি হইবে, এতদ্ব্যতীত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আর কোন প্রণালী নাই।

ইহাই দার্শনিকগণ বলিয়াছেন। "প্রাপ্তার্থ প্রকাশ লিঙ্গাদ্বৃত্তিসিদ্ধিঃ" (সাঙ্খ্যদঃ অঃ ১৬ সূ) "বাহ্য বিষয় জ্ঞানের নিমিত্ত আমাদের ৫টি ইন্দ্রিয় আছে, পাঁচ প্রকার বিষয়ের সম্বন্ধও প্রায় সকল সময়ই আছে, অথচ সকল সময়ই সকল বিষয়ের জ্ঞান হইতেছে না। নয়নেন্দ্রিয়ের দ্বারা নীল, পীত, হরিতাদি বর্ণ সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু তাহাদের কোন না কোন একটির সহিত সর্ব্বদাই চক্ষুর সম্বন্ধও রহিয়াছে, আবার কর্ণের সহিতও সর্ব্বদাই কোন না কোন এক প্রকার শব্দের সহিত সম্বন্ধ আছে। কিন্তু সর্ব্বদাই দর্শন জ্ঞান বা সর্ব্বদাই শ্রবণের জ্ঞান হইতেছেনা, কখনও শ্রবণ জ্ঞান কখনও বা দর্শন জ্ঞান হইয়া থাকে। এ নিমিত্ত জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ে কেবল মাত্র বাহ্য বিষয়ের শক্তি ব্যতীত আত্মার শক্তিও স্বীকার করিতে হইবে। আত্মার শক্তি বিশেষের (ইন্দ্রিয়বৃত্তির) বিকাশ ও উদ্বোধন না হইলে জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং সর্ব্বদাই চক্ষু কর্ণাদি-যন্ত্রের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ থাকিলেও চক্ষু কর্ণাদি নানাযন্ত্রের মধ্যে, (যটির দ্বারা) ইন্দ্রিয় বৃত্তি বিকসিত হইয়া অগ্রসর ও প্রস্তুত হয় তাহার দ্বারা সেই একটি বিষয়েরই জ্ঞান হয়। আত্মার শক্তি যদি চক্ষুর স্নায়ুর দ্বারা বিসর্পিত হয়, তবে চাক্ষুষ জ্ঞান হয়, এবং শ্রবণের দ্বারা বিসর্পিত হইয়া আসিলে শব্দের জ্ঞান, রসনার স্নায়ুর দ্বারা প্রবাহিত হইয়া আসিলে রসের জ্ঞান, হয়। আর যে যে দিকে আত্মার ইন্দ্রিয়শক্তি প্রবাহিত হইয়া আসেনা, ততক্ষণ সেই সেই দ্বারের দ্বারা কোন জ্ঞান হয় না।" আরও বলিয়াছেন "ভাগ-গুণাভ্যাংতত্বান্তরং বৃত্তিঃ সম্বন্ধার্থংসর্পতি।" (ঐ) * * * "আত্মার শক্তি গুলি বাহিরের বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইবার নিমিত্ত মস্তিষ্ক হইতে প্রসারিত হইয়া এক এক স্নায়ু-প্রণালীর দ্বারা সম্মুখে অগ্রসর হইয়া

থাকে।" আরও "যৎ সম্বন্ধং সং তদাকারোল্লেখিবিজ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষম্" (ঐ) বাহ্য বিষয় গ্রহণের নিমিত্ত আত্মার শক্তি স্নায়ু পথ দ্বারা অগ্রসর হইয়া আসিলে বাহ্যশক্তির সহিত তাহার মিলন হইয়া মন পর্য্যন্ত সেই বাহ্য বিষয়ের তন্ময় হইয়া যাওয়ার নাম প্রত্যক্ষ জ্ঞান।"

বাহ্য জ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয়।

ইন্দ্রিয়-জনিত জ্ঞানের প্রণালী বুঝিতে পারিলে, এখন তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয় পর্য্যালোচনা করা যাইতে পারে। তোমার জিজ্ঞাসাছিল, "চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সকল জ্ঞান উৎপন্ন হয়, উহা কি পদার্থ। উহা কি জীবাত্মা হইতে অতিরিক্ত কোন গুণ বা ক্রিয়াবিশেষের মধ্যে পরিগণিত হইবে, অথবা সুখ দুঃখাদির অনুভূতির ন্যায় উহাও সেই জীবাত্মা বা "আমির" অনুভবের মধ্যেই গণ্য হইবে।" ইহার চরম সিদ্ধান্ত এই যে, ইন্দ্রিয় দ্বারা, কিম্বা যে কোন প্রকারে যে কোন জ্ঞান হইয়া থাকে তৎসমস্তই, সুখ দুঃখাদি অনুভবের ন্যায়, আত্মার সেই চিরন্তন অনুভবেরই একএকবার গ্রহণ হওয়া মাত্র, তদ্ব্যতীত নূতন আর কিছুই জন্মিতেছেনা। এবং উহা কোন গুণ বা ক্রিয়া বিশেষও নহে, কিম্বা জীবাত্মা হইতে অতিরিক্তও কিছু নহে, উহা জীবের বিদ্যমানতা বা প্রকাশ অবস্থা মাত্র। ইহা বিশেষরূপে বুঝান যাইতেছে,—

মনে কর পুর্ব্বোক্ত মতে, (১৭৮ হইতে ১৮৫ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত) চৈতন্যের সাহায্যে তোমার নিজের অস্তিত্বটি মাত্র অন্তরে অন্তরে প্রকাশ পাইতেছে, অর্থাৎ তোমার সেই চিরন্তন "আমির" অনুভব হইতেছে। এখন একটি ঘট, তোমার সম্মুখস্থ হইলে, জ্ঞানের প্রণালী অনুসারে (২৬৮পৃ ৭প) প্রথমে তোমার চক্ষুরিন্দ্রিয় ঐ ঘটাকার গ্রহণ করিল, তখন "আলোচন-জ্ঞান" (২৬৯ পৃ ১০ প) হইল, তৎপর মনও ঐ আকার গ্রহণ করিল, তখন "এইটি ঘট" এইরূপ কল্পনা জ্ঞান হইল (২৬৯ পৃ ২৭প) তৎপর বুদ্ধিও ঐ আকারে আকারিত হইলে "আমি একটি ঘট দেখিতে পাইলাম" এইরূপ অধ্যবসায়াত্মক জ্ঞান হইল, ইহারইত নাম "বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান হওয়া? তবে এখন ভাবিয়া দেখ,

এই জ্ঞানও তোমার সেই পূর্ব্বকার "আমির" জ্ঞানের মধ্যেই পড়িল; কারণ বুদ্ধি, মন, ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি কিছুই তোমার "আমি" হইতে বিভিন্ন বা পৃথক্ কোন পদার্থ নহে। তোমার "আমিই" ঐ ঘটদর্শনের বুদ্ধিরূপে পরিণত হইয়া তৎপর অভিমান, তৎপর মন, অবশেষে চক্ষুরিন্দ্রিয়রূপে পরিণত হইয়াছে, ইহা অতি বিস্তারক্রমে পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি (১৫৮ পৃঃ হইতে ৩য় খণ্ডশেষ পর্য্যন্ত)। তবেই বুঝিতে হইবে যে, বুদ্ধির একটু পরিবর্ত্তনাবস্থা হইলেই তোমার "আমির" (জীবাত্মার) পরিবর্ত্তনাবস্থা হইল। এবং অভিমানের, মনের বা ইন্দ্রিয়ের পরিবর্ত্তন হইলেও তোমার "আমিরই" অবস্থান্তর হইল। এ কথা কোন মতেও অস্বীকারের উপায় নাই। অতএব ঘটপটাদি দর্শন বা স্পর্শনাদি কালে প্রথমে যখন পূর্ব্বোক্ত (২৬৮ পৃ ১৫ প) নিয়মানুসারে তোমার চক্ষুরিন্দ্রিয় বা স্পর্শেন্দ্রিয় আপন অবস্থায় অপ্রকাশিত হইয়া ঐ ঘটপটাদির আকারে পরিণত হইল, তখন তোমার আত্মারই অবস্থান্তর হইল। তৎপর মনের ও বুদ্ধির নিজাবস্থা অপ্রকাশিত হইয়া ঘপপটাদি আকার হওয়াও তোমার "আমিরই" অবস্থান্তর হওয়া। সুতরাং তোমার অভ্যন্তরে সুখ দুঃখ ও ভক্তি প্রভৃতি অবস্থা হইলে উহা যেমন তোমার "আমির" একটা পরিবর্ত্তন অবস্থামাত্র, ইহাও ঠিক সেইরূপ একটা পরিবর্ত্তন অবস্থা। অতএব তোমার আভ্যন্তরিক সুখ দুঃখ বা ভক্তি প্রভৃতির জ্ঞান যেমন নূতন করিয়া জন্মিতেছে না, কিন্তু তোমার জীবাত্মার উৎপত্তি হওয়া অবধি, যে সেই পূর্ব্বোক্ত (১৮১পৃ ৪) একটা "আমির" অনুভব ছিল, যাহা চিরদিন পর্য্যন্ত আছে বলিয়া তোমার গ্রাহ্যে আসিতেছিল না, তাহাই তখন তোমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়া নিবন্ধন, গ্রাহ্য হইল; ঘটপটাদির দর্শন কালেও তাহাই হইল। তখন তোমার "আমির" পরিবর্ত্তন অবস্থা হওয়ায় সেই চিরন্তন "আমির" অনুভবটাই গ্রাহ্য হইল। তাই "ঘটজ্ঞান জন্মিল" "পটজ্ঞান জন্মিল" এইরূপ বলা হইয়া থাকে। ঘট দর্শনের পূর্ব্বে তুমি তোমার নিজের অস্তিত্বমাত্র অনুভব করিতে ছিলে; কিন্তু ঐ অনুভূতি আজন্ম আছে বলিয়া তোমার গ্রাহ্যে আসিতেছিলনা। এখন প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রণালী অনুসারে ঘটের রূপটি গিয়া চক্ষু-প্রসারিত-ইন্দ্রিয়শক্তির সহিত মিশাইয়া গেলে, ইন্দ্রিয় শক্তিটি

ঘটাকার হইয়া গেল। কিন্তু ইন্দ্রিয় তোমাহইতে ব্যতিরিক্ত কোন বস্তু নহে, তুমিই ইন্দ্রিয়াবস্থা গ্রহণ করিয়া, চক্ষু পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছ। অতএব ইন্দ্রিয়ের ঘটাকারে আকারিত হওয়াই, তোমার নিজের ঘটাকার হওয়া; ইহাই তোমার "আমির" পরিবর্ত্তন অবস্থা। কারণ ঐ ঘটনার পূর্ব্বে তুমি ঘটাকারে আকারিত ছিলেনা, তখন অন্যাকারে ছিলে; এখন ঘটের সান্নিধ্য নিবন্ধন ঘটাকারে পরিণত হইলে। অতএব এখন তোমার সেই পূর্ব্বকার "আমির" অনুভব বা জ্ঞানটা গ্রাহ্যে আসিল। কিন্তু তোমার "আমি" যখন সেই সময়ে ঘটাকারেই পরিণত হইয়া গিয়াছে, তখন ঘটাকারেই তোমার "আমির" অনুভবটি গ্রাহ্যে আসিল। ইহারই নাম "ঘটের জ্ঞান হওয়া" তাই তুমি বুঝিলে যে "এই আমার ঘটের জ্ঞান জন্মিল।" আবার যখন ক্ষণকাল পরে অন্যকোন বস্তুর সান্নিধ্যাধীন, প্রত্যক্ষপ্রণালী অনুসারে, তোমার "আমি" টা অন্যাকারে আকারিত হইয়া গেল; তখন আর ঘটাকারে আকারিত থাকিল না। সুতরাং তখন তুমি বুঝিলে "আমার ঘটজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, এখন পটের জ্ঞান হইতেছে" কিন্তু বাস্তবিক ঘটের জ্ঞান জন্মেও নাই বিনষ্ট ও হয় নাই। কিন্তু তোমার ঘটাকারে আকারিত হওয়াটা নূতন করিয়া জন্মিয়াছিল বটে, এবং অন্য বস্তুর সান্নিধ্যাদি হইয়া তাহাই বিনষ্ট বা লুক্কিত হইয়া গেল।

তৎপর মন আর বুদ্ধিও তোমার "আমির"ই স্বরূপ, উহা অতিরিক্ত কিছুই না। অতএব প্রত্যক্ষ প্রণালী অনুসারে মন এবং বুদ্ধি যখন ঐ ঘটাকারে আকারিত হইল, তখন তুমিই ঘটাকারে আকারিত হইলে। অতএব তাহাও তোমারই "আমির" পরিবর্ত্তন অবস্থা; পরিবর্ত্তন অবস্থা বলিয়াই তোমার সেই চিরন্তন "আমির" অনুভবটা গ্রাহ্যে আসিল; তৎপর অন্যান্য সমস্তও সমান। অতএব "ঘটপটাদির জ্ঞান" নামে কোন একটা গুণ বা ক্রিয়া জীবাত্মাতে জন্মে না, বা বিনষ্টও হয় না; কিন্তু তত্তৎকালে জীবাত্মার অবস্থার পরিবর্ত্তন নিবন্ধন আমাদের সেই চিরন্তন "আমির" অনুভবটাই গ্রাহ্য হইয়া থাকে। স্পর্শন শ্রবণাদি জ্ঞানেও এইরূপই বুঝিবে।

সুখদুঃখাদি বিকাশকালে এবং ঘটাদি জ্ঞানকালে আত্মার অবস্থার তারতম্য।

শিষ্য। আপনি যেরূপ গুরুতর ভাবে এবিষয়ের আলোচনা করিতেছেন, তাহা ঠিক ঠিক মত ধারণা করাই আমার কষ্টকর হইতেছে, এবং উহার মর্ম্ম অবিকৃত ভাবে গ্রহণ করিতেছি কি না তাহাও সন্দেহ। এ নিমিত্ত ইহার উপর কোন প্রশ্ন করিতে আশঙ্কা হয়।

আচার্য্য। আমি দিন দিনই তোমার ধীশক্তির শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া পরমসুখী এবং স্নেহবান্ হইতেছি; জগদম্বা করুন, তোমার অতুল ধীশক্তি হউক। কল্যাণীয়! তুমি এখন যে কথাটি বলিলে, তাহাও তোমার ধীশক্তিমত্তার পরিচায়ক। আমার ধারণা হইয়াছে, তুমি আমার সমস্ত কথাই বুঝিতেছ। কারণ এই সকল সুতীক্ষ্ণ অধ্যাত্ম বিষয় যাঁহারা বুঝিতে-পারেন তাঁহারাই ইহাকে অতি গুরুতর বলিয়া মনে করেন, এবং "প্রবেশ করিতে পারিলাম কি না, ঠিক ঠিক বুঝিলাম কি না" এইরূপ আশঙ্কিত হয়েন। আর যাহারা ইহাতে প্রবেশ করিতে পারেনা, বুঝিতেও পারেনা, তাহারা ইহাকে গুরুতর বিষয় বলিয়া মনে করেনা। তাহারা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য বোধে, হুট্ হাট্ করিয়াই উড়াইয়া দেয়। অতএব তুমি অসঙ্কোচিত চিত্তে আমার নিকট প্রশ্ন কর, আমি সাধ্যানুসারে উত্তরের চেষ্টা করিব।

শিষ্য। আপনি বলিলেন "সুখ, দুঃখ ও ভক্তি প্রভৃতির বিকাশকালে আত্মাই সেই সুখদুঃখাদি আকারে পরিণত হয়; সুতরাং সুখ দুঃখাদির জ্ঞানও, আত্মার সেই চিরন্তন "আমির" জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত কিছুই না। ঘট পটাদির জ্ঞান কালেও সেইরূপ আমাদের "আমি"ই সেই ঘটপটাদি আকারে পরিণত হয়। সুতরাং তাহাদের জ্ঞানও আত্মার সেই পুরাতন 'আমির' জ্ঞান মাত্র"। কিন্তু আমি এ উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখিতেছি। আমার মনে হইতেছে যে, যখন আভ্যন্তরিক সুখ দুঃখও ভক্তি প্রভৃতির অনুভব হয়, তখন উহা যেন বাস্তবিকই নিজের (আত্মার) স্বরূপ বলিয়া জ্ঞান হয়, উহা যেন একবারে আত্মার মজ্জাগত, উহাকে আত্মা হইতে পৃথক্ করা যায় না, তাদৃশ অনুভব করাও যায়

না। কিন্তু বাহিরের ঘটপটাদি বিষয়ের যখন জ্ঞান হয়, তখন এইরূপ বোধ হয় যে, উহা যেন আমার নিজের অস্তিত্ব হইতে অনেকটা পৃথক্ ভাবে অবস্থিতি করিতেছে, তখন উহাই যে ঠিক 'আমি' এরূপ যেন অনুভবে আইসে না। ইহাই সুখ দুঃখাদির জ্ঞান, আর ঘট পটাদিজ্ঞানের পার্থক্য। যদি আমার এই অনুভব ঠিক হয়, তবে ঘটপটাদির দর্শন কালে যে, আত্মা তদাকারে পরিণত হইয়া যায়, তাহা কিরূপে বিশ্বাস করিব। যদি তাহা না হইল, তবে ঘটপটাদির জ্ঞানকে, সুখ দুঃখাদি জ্ঞানের ন্যায়, আমাদের সেই চিরন্তর "আমির" অনুভবের মধ্যে গণ্য করা হইতে পারে না। তবেই তাহাকে পৃথক্ আর একটা কিছু বলিতে হইবে।

আচার্য্য। এপ্রশ্নটি অতি মনোরম বটে; কিন্তু পূর্ব্বের কথাটিতে, তুমি ভালরূপে অভিনিবেশ করিতে পারিলে; এপ্রশ্ন উত্থাপিত হইত না; যাহা হউক আবার একটু বিস্তার করিলেই বেশ বুঝিতে পারিবে। ঘটপটাদি বিষয়ের দর্শন স্পর্শনাদি কালে যে, পূর্ব্বোক্ত রূপে (২৭৩পৃ) আত্মা তদাকার প্রাপ্ত হয়, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। তথাপি উহাদিগকে, আত্মা হইতে পৃথক্ ভাবে অনুভব করার বিশেষ কারণ আছে। সুখ দুঃখও ভক্তি বিবেকাদি-বিকাশের সময়ে তোমার "আমির" তদাকার হওয়া, আর ঘটপটাদি দর্শন কালে তদাকারে আকারিত হওয়া, এতদুভয়ের একটু ইতর বিশেষ আছে,—তাহা বলা যাইতেছে। চৈতন্য বিমিশ্রিত জ্ঞানশক্তি, পরিচালন শক্তি, আর পোষণ শক্তির সমষ্টিই যখন তুমি (জীবাত্মা), তখন ঐ শক্তিত্রয় হইতে সমুদ্ভূত-ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য এবং ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, অসূয়াদি সমস্ত শক্তিরই সমষ্টি স্বরূপ তুমি (জীবাত্মা); উহার কোন শক্তিই তোমার নিজ হইতে পৃথগ্‌ভূত কিছু নহে। অতএব ভক্তি প্রভৃতিবৃত্তির উত্তেজনা হইয়া যখন তোমার অবস্থান্তর হয়, তখন তোমার "আমির" মধ্যে; সত্ব শক্তিটার একটা সর্ব্বাঙ্গীণ পরিবর্ত্তন অবস্থা হয়। তখন ভক্তি অবস্থা ব্যতীত আর তোমার সত্বশক্তির অস্তিত্বই থাকে না। আবার যখন অতি প্রবলভাবে ঐ ভক্তির বিকাশ হয়, তখন রজঃ-শক্তিজনিত-ক্রিয়াশক্তি এবং ক্রোধাদি অন্যান্য প্রবৃত্তি, আর তমঃশক্তিজনিত-পোষণশক্তি এবং অন্যান্য প্রবৃত্তি, সকলেই এককালে বিলুপ্তপ্রায় অবস্থায় পরিণত হয়। তখন

কেবল মাত্র ভক্তি শক্তিই বিরাজমানা থাকে এবং তোমার অস্তিত্বটিও কেবল ভক্তিশক্তির মধ্যেই থাকে। তখন তোমার "আমি" একবারেই ভক্তিময় হইয়া যায়; ভক্তি হইতে পৃথগ্‌ভাবে তোমার অস্তিত্ব থাকে না; তখন ভক্তিও যাহা তুমিও তাহাই। কিন্তু যখন ঘটপটাদি দর্শন কর, তখন এইরূপ ঘটনা হয় না। ঘটপটাদি দর্শন করা কালেও তোমার "আমি" ঐ ঘটাদি আকারে পরিণত হয় বটে, কিন্তু তোমার নিজের অস্তিত্ব তাহা হইতে পৃথগ্‌ভাবেই থাকে। ইহা বুঝাইয়া দিতেছি শুন। তোমার জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে রজঃ-শক্তির সংস্রব থাকিলেও, সত্ব শক্তি যে তাহাতে বিলক্ষণ আছে, আর সেই সত্বশক্তি অতীব স্বচ্ছতাগুণ সম্পন্ন ইহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। সেই সত্বশক্তিই তোমার ঘট জ্ঞানের কারণ; কেননা পূর্ব্বোক্ত প্রণালী (২৬৮ পৃ ১৫ পং) অনুসারে ঘটের বর্ণটি নয়নসাৎ হইয়া তোমার ইন্দ্রিয়সাৎ হইলে, ইন্দ্রিয়ান্তর্গত সত্ব শক্তিই, স্বচ্ছতানিবন্ধন ঐ ঘটের বর্ণাকারে পরিণত হইল; তখন তোমার ঘটজ্ঞান হইল। এই যে সত্বশক্তির ঘটাকার হওয়া, ইহা সত্ব-শক্তির নিজের অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া নহে। পুষ্পসন্নিহিত স্ফটিক যেমন, আপন অস্তিত্বে অবস্থিতি করিয়াই ঐ পুষ্পাকার গ্রহণ করে, জলরাশি যেমন আপন অস্তিত্বে থাকিয়াই তীরবর্ত্তি-বৃক্ষ বা সূর্য্যাদির আকার গ্রহণ করে, তোমার সত্বশক্তিও তেমন আপন অস্তিত্বে অব-স্থিতি করিয়াই ঐ ঘটীয়বর্ণের আকার গ্রহণ করে, কারণ উহা স্বচ্ছতা গুণযুক্ত। সুতরাং তোমার এই অবস্থা হওয়াটি সর্ব্বাঙ্গীণ পরিবর্ত্তন অবস্থা হইল না, তোমার সমস্ত অস্তিত্বটি ঘটের প্রতিবিম্বের মধ্যে আসিল না। আবার তোমার "আমিত্ব"টি ও ঐ সত্বশক্তির মধ্যেই থাকিল; কারণ ঐ সত্বশক্তিটিই তুমি; ঘটীয়বর্ণের যে প্রতিবিম্ব বিশেষ তোমাতে পড়িয়াছে; তাহা তুমি নও। অতএব ঐ ঘটাকারের সহিত তোমার "আমিত্বের" কোনই সম্বন্ধ নাই, ঘটের আকারটি তোমার "অমি" হইতে পৃথক্ ভাবেই থাকিল; অথচ তুমি ঘটাকারও হইলে, তোমার পরিবর্ত্তন অবস্থাও হইল। জীবাত্মার কোন প্রকার পরিবর্ত্তন অবস্থা হইলেই তাহার সেই চিরন্তন "আমির" অনুভবটা এক একবার গ্রাহে আইসে। সুতরাং তোমার এখন

পরিবর্ত্তনাবস্থায় সেই চিরন্তন "আমির" অনুভবটি জাগিয়া উঠিল,—তাহাই গ্রাহ্যে আসিল। কিন্তু এখন তোমার ঐ ইন্দ্রিয়ান্তর্গত সত্বশক্তি, যাহাতে আমিত্ব নির্ভর করিয়া আছে, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ঘটীয়বর্ণের আকারটি, এতদুভয়ই প্রকাশ পাইবে। এবং ঐ ঘটের আকার টিযে তুমি হইতে পৃথক্ বস্তু তাহাও প্রকাশ পাইবে। ভক্তি বিবেকাদির বিকাশ কালে যেমন "আমির" সহিত উহাদের কিছুই পার্থক্য প্রকাশ পায় না, সেইরূপ এখানে হইবে না। এজন্য বাহিরের জ্ঞেয় বস্তু সকল, যে আমা হইতে পৃথক্ বস্তু এবং উহাদের যে পৃথক্ অস্তিত্ব আছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি।

এক দল বিকৃত বৌদ্ধ আছেন, তাঁহারা এই সূক্ষ্মতত্ত্ব অনুভব করিতে না পারিয়াই ভক্তি প্রভৃতির দৃষ্টান্তে বাহ্য জ্ঞানের ঘটনাও ঘটাইয়া থাকেন। এবং বাহ্য বস্তুর জ্ঞানকেও ঠিক সেইরূপ বলিয়া, বাহ্য বস্তুর অস্তিত্বই অস্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে কেবল মন বা জ্ঞানেরই অস্তিত্ব আছে। এজন্য তাঁহাদিগকে "বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ" বলিয়া থাকে। কিন্তু ইহা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক মত, এবং সর্ব্বশাস্ত্র বিরুদ্ধ। অতএব ঘট পটাদির জ্ঞান কালেও জীবাত্মা তদাকারে আকারিত হয় তাহা সত্য। সুতরাং ঐ ঘট পটাদির জ্ঞানও আত্মার সেই পুরাতন "আমি" জ্ঞানের জাগ্রদবস্থা, উহা অতিরিক্ত কোন গুণ বা ক্রিয়া বা অন্য কিছুই নহে। এবং উহা তখন জন্মেও না, পরে আবার বিনষ্টও হয় না, ইহা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত।

বাস্তবিক পক্ষে, বিষয় আর ইন্দ্রিয় উভয়ই সত্য, এবং উক্তরূপেই ইন্দ্রিয়ের তদাকারতা হইয়া, বিষয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে। তৎপর মনের এবং বুদ্ধির তদাকারতা হইয়া যে যথাক্রমে "সঙ্কল্প" ও "অধ্যবসায়" নামক জ্ঞান হয় সেখানেও এইরূপই জানিবে।

বুদ্ধি মন প্রভৃতির বিশেষরূপের বর্ণনা।

শিষ্য। মহাশয়! আর একটি সন্দেহ উপস্থিত হইল। আপনি

পূর্ব্বে বুদ্ধি, মন, অভিমান ও ইন্দ্রিয়কে একই পদার্থ বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন (৩য়, খণ্ডে)। তখন বলিয়াছেন, "ঘটদর্শন করার শক্তি যখন আত্মাতে পরিস্ফুরিত হইয়া মস্তিষ্কের অভ্যন্তর প্রদেশে ক্রিয়া করে, তখন তাহাকে ঘটদর্শনের বুদ্ধি বলে। আর যখন ঐ শক্তিটিই আর একটু বাহিরের দিকে মস্তিষ্কের মধ্যেই ক্রিয়া করে, তখন ঘটদর্শনের অভিমান হইলে; পর যখন মস্তিষ্কের শেষ সীমা আর চাক্ষুষস্নায়ুর মূল প্রদেশে আইসে তখন ঘটদর্শনের মন, এবং যখন চাক্ষুষস্নায়ুর মধ্যে আসিয়া ক্রিয়া করে তখন চক্ষুরিন্দ্রিয় বলিয়া ব্যবহৃত হয়। এইরূপ অবস্থা ও ক্রিয়াভেদে একই শক্তি নানা নামে অভিহিত হয়"। কিন্তু এইক্ষণে আবার বলিলেন "ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আলোচনজ্ঞান, মনের দ্বারা সঙ্কল্পজ্ঞান এবং বুদ্ধি দ্বারা অধ্যবসায় জ্ঞান হইয়া থাকে, এবং ঘটাকারে আকারিত হওয়া ঘটনাও প্রথম ইন্দ্রিয়ের, তৎপর মনের, তৎপর বুদ্ধির হইয়া থাকে"। সুতরাং এই কথাদ্বারা যেন ইন্দ্রিয় এবং মন প্রভৃতির পার্থক্য অঙ্গীকার করা হইল। অতএব ইহার তাৎপর্য্য কি তাহা বলুন।

আচার্য্য। এখানেও উহাদের বিভিন্নতা অঙ্গীকার হয় নাই; একই শক্তি বুদ্ধ্যাদি পৃথক্ পৃথক্ নামে অভিহিত হয় তাহাই সত্য। তবে কি না, আধার এবং যন্ত্রের পার্থক্য থাকাতে একই শক্তি স্থূল, সূক্ষ্ম, এবং নির্ম্মল ও মলিনাদি বিভিন্নরূপে পরিণত হইয়া বিভিন্নরূপ ক্রিয়া করিয়া থাকে; সেই ক্রিয়াই এখানে প্রদর্শিত হইল। এজন্য এই সকল ক্রিয়া দ্বারাই শাস্ত্রে উহাদের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ করিয়াছেন। শাস্ত্রের কোন কোন স্থানে বলিয়াছেন যে, যাহা দ্বারা আলোচন জ্ঞান হয় তাহার নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়, যাহার দ্বারা সঙ্কল্প জ্ঞান হয় তাহার নাম মন, যাহার দ্বারা অধ্যবসায় জ্ঞান হয় তাহার নাম বুদ্ধি"। আবার পূর্ব্বে যে লক্ষণের কথা বলিয়াছি তাহাও কোন কোন স্থানে লিখিত আছে। অতএব কোনই বিরোধ নাই। এখন ইহার আর অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই, এখন আর একটা কথা শুন।

"সত্বগুণ প্রকাশক পদার্থ এই কথার অর্থ—"

এই যে ঘট পটাদি জ্ঞান কালে তোমার ইন্দ্রিয়ান্তর্গত সত্ব শক্তির, স্বচ্ছতাদি নিবন্ধন, তদাকারে আকারিত হওয়ার বিষয় প্রদর্শিত হইল, ইহাকেও "প্রকাশন ক্ষমতা" বলে। এই কারণে সত্বগুণকে প্রকাশক বলিয়া থাকেন। জ্ঞান সম্বন্ধে, কেবল এই ক্ষমতা টুক ব্যতীত অর্থাৎ স্বচ্ছতাদি নিবন্ধন অন্যবস্তুর আকার গ্রহণ করা ব্যতীত, আর কোন ক্ষমতাই সত্বগুণের নাই। অন্তরে অন্তরে যে তোমার অস্তিত্ব প্র ।শ পাইতেছে, সেই যে চিরদিন অবধি, তোমার "আমির" অনুভূতি রহিয়াছে তাহা, অথবা এই যে সুখ, দুঃখ, শোক, মোহ ও ভক্তি, বিবেকাদির অনুভূতি বা প্রকাশ হইতেছে তাহা, কিম্বা এই যে ঘট পটাদির দর্শনাদি কালে তোমার ইন্দ্রিয় এবং মন প্রভৃতি তদাকারে আকারিত হইয়া প্রকাশিত হই-তেছে, ইহার কিছুই সত্বগুণের কার্য্য নহে। কারণ চৈতন্যের সহিত বিমিশ্রণে সত্ব, রজঃ আর তমঃ এই তিন শক্তিরই উক্তরূপ প্রকাশ হইয়া থাকে। মনে করিয়া দেখ, তোমার অন্তরে অন্তরে যখন বিশুদ্ধ ভক্তি শক্তির বিকাশ হয়—যাহাতে রজঃ বা তমো গুণের লেশ মাত্রও নাই—তখন সেই ভক্তি শক্তির বিলক্ষণ প্রকাশ বা জ্ঞান বা অনুভূতি হইয়া থাকে; তুমি তখন ও অন্তরে অন্তরে বুঝিতে পার যে, তোমার ভক্তি শক্তি বিকসিত হইয়াছে। আবার যখন প্রবলতর ক্রোধের বিকাশ হয়—যাহাতে সত্বগুণ আর তমোগুণের কিছুমাত্র সংশ্লেষ নাই—যাহা কেবলই রজোগুণের বিকৃতি, তাহাও বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে; অন্তরে অন্তরে, ক্রোধকেও অতি পরিষ্কার অনুভব করা যায়। কিম্বা যখন কেবলমাত্র তমঃ শক্তি-জনিত আলস্যাদি ভাব বিকসিত হয়, তাহারও অতি বিশদ অনুভূতি হয়। তৎপর দেহের মধ্যবর্ত্তি অন্যান্যপ্রকার পরিচালন শক্তি, এবং পোষণ শক্তিরও সর্ব্বদা অনুভব হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকাশ বা অনুভূতি-সমুৎপাদনের ক্ষমতা, যদি কেবল মাত্র সত্বগুণেরই হইত, তবে কেবল মাত্র সত্ব শক্তি আর সত্বশক্তি-জনিত ভক্তি প্রভৃতি শক্তি গুলিরই অনুভূতি হইত। আর ঐ সকল ক্রোধাদি ভাব গুলি—

যাহাতে অণুমাত্রও সত্বগুণের সংস্রব নাই—তাহার অনুভূতিও হইত না ; ঐ সকল বৃত্তি আত্মাতে বিকসিত হইয়াও অন্ধকারেই থাকিত,—উহা যে বিকসিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিতেম না। অতএব অনুভূতি বা উপলব্ধি বা জ্ঞানের নামান্তর যে 'প্রকাশ', তাহা সত্বগুণের দ্বারা সম্পাদিত হয় না। আর কেবল মাত্র সত্বগুণ বা তজ্জনিত শক্তিই যে অনুভূত হয়, তাহাও নহে।

দ্বিতীয়তঃ, কোন প্রকার জ্ঞানই যখন নূতন করিয়া জন্মিতেছে না, উহা কেবল আমাদের সেই চিরন্তন "আমি' অনুভবের একটু জাগ্রৎ হওয়া বা গ্রাহ্য হওয়া অবস্থা মাত্র, আমাদের ঘট জ্ঞানও তাহাই, পটজ্ঞান ও তাহাই, রস স্পর্শাদি শক্তির জ্ঞান তাহাই ; অতএব উহার আর কারণ হইবে কে ? যাহা কার্য্য, যাহা জন্মে, তাহারই কারণ থাকে, আর যাহা সর্ব্বদাই আছে, যাহা জন্মিতেছে না, তাহার আর 'কারণ' কিরূপে সম্ভবে ? সুতরাং সত্বগুণ উহার কারণ হইতে পারে না। তবে কিনা, চৈতন্যের বিমিশ্রণে যে সকলেরই, সত্ব-রজ-স্তমোময়-"আমিটি" সর্ব্বদা অন্তরে অন্তরে প্রকাশ পাইতেছে, তন্মধ্যে সত্বগুণটিই অতিশয় স্বচ্ছতাদিগুণযুক্ত, তাই ঘট পটাদি কোন বস্তু সন্নিহিত হইলে, উহাই তাহাদের রূপাদি শক্তিটি গ্রহণ করিয়া তদাকারে পরিণত হয় ; সুতরাং ঐ আকারটিও সেই "আমির" সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ পাইতে থাকে। এই তদাকারে আকারিত হওয়ার ক্ষমতাটী, কেবল সত্ব শক্তিরই আছে। রজোগুণ আর তমোগুণ নিতান্ত অস্বচ্ছ ও মলিন, সুতরাং তাহারা অন্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হইলেও তাহা গ্রহণ করিয়া তদাকারে আকারিত হইতে পারে না। মনে কর, চক্ষুরিন্দ্রিয়ও তোমার ইন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়, আবার গ্রহণশক্তি বা হস্তেন্দ্রিয় ও তোমার ইন্দ্রিয়। কিন্তু তুমি যখন কোন বস্তু হস্তদ্বারা গ্রহণ কর, তখন অবশ্যই তোমার গ্রহণেন্দ্রিয় এবং স্পর্শেন্দ্রিয়, এতদুভয়ের সহিতই ঐ বস্তুটির সম্বন্ধ বা সম্মীলন হইল, কিন্তু এখন তোমার গ্রহণেন্দ্রিয়ের দ্বারা কেবল ঐ বস্তুটির গ্রহণ করা মাত্রই হইবে, তদ্দ্বারা উহার উপলব্ধি হইবে না, উহার উপলব্ধি তোমার স্পর্শশক্তি দ্বারাই হইবে। ইহার কারণ এই যে তোমার গ্রহণশক্তি বা গ্রহণেন্দ্রিয়টি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের

অন্তর্গত, উহা কেবলমাত্র রজোগুণের বিকৃতি, উহাতে অন্যান্য গুণ এত সামান্য যে তাহা অনুভবেও আইসে না। অতএব উহার স্বচ্ছতাদি গুণও নাই, এবং ঐ গৃহীত-বস্তুর গুণগ্রহণ করিয়া তদাকারে আকারিত হইতেও পারে না; সুতরাং উহার প্রকাশ হইল না। কিন্তু স্পর্শেন্দ্রিয় শক্তিটি সত্বগুণ-সমুৎপন্ন, তাহার স্বচ্ছতাদিগুণ আছে, তাই সে ঐ গৃহীত-বস্তুটির শীতলোষ্ণাদি শক্তিটি গ্রহণ করিয়া, তদাকারে আকারিত হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল।

আবার একটা তমোগুণের ক্রিয়াও লক্ষ্য করিয়া দেখ। তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, আমাদের কেশের সহিত যদি কোন বস্তুর স্পর্শ হয়, তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না, কেশ দগ্ধ হইয়া গেলেও তাহা জানিতে পাই না। কিন্তু কেশের পুষ্টি ক্রিয়া হয়, তাহা অস্বীকারের উপায় নাই। তবেই, বলিতে হইল যে, কেশের মধ্যে পোষণশক্তি আছে, কিন্তু স্পর্শন বা অন্য কোন জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তি সেখানে নাই। ঐ পোষণশক্তি থাকিয়াও বস্তুর অনুভবের কিছুমাত্র সাহায্য করিতে পারিল না। কারণ পোষণ শক্তি তমোগুণের রূপান্তর মাত্র; তমোগুণের স্বচ্ছতাদি গুণ নাই,—অন্য বস্তুর কোন শক্তি গ্রহণ করিয়া তদাকারে আকারিত হয় না। যদি রজঃ আর তমঃ-শক্তির স্বচ্ছতাদি গুণ থাকিত এবং অন্যাকারে আকারিত হইতে পারিত, তাহা হইলে গ্রহণ শক্তি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা এবং পোষণ শক্তি প্রভৃতি তমঃশক্তির দ্বারা ও বাহ্যবস্তুর স্পর্শাদির অনুভব করা হইত। অতএব জানা গেল, কেবল মাত্র সত্বশক্তিরই বিষয়ের আকারে আকারিত হওয়ার ক্ষমতা আছে! এবং স্ফটিকের পুষ্পাকার বর্ণটি গ্রহণ করা, বা জলের সূর্য্যবিম্বাদি গ্রহণ করার ক্ষমতাকে যেমন "প্রকাশক ক্ষমতা" বলিয়া লোকে ব্যবহার করে, সেইরূপ সত্বশক্তিরও ঐ প্রকারে অন্য বস্তুর আকার গ্রহণ করাকে "প্রকাশক ক্ষমতা" বলা গিয়া থাকে। এইরূপ প্রকাশক ক্ষমতার নামই "জ্ঞান শক্তি।" এই ক্রিয়াটি কেবল সত্বগুণ হইতেই হয়, এজন্য "জ্ঞান শক্তিকে" সত্বগুণ-সমুৎপন্ন বলা হইয়াছে।

অনুভূতি কি পদার্থ?

শিষ্য। এ কথা একরূপ বুঝিলাম, কিন্তু আমাদের চিরন্তন "আমির" অনুভূতি বা অস্তিত্বের অনুভূতিটি যে কখনও উৎপন্ন বা বিনষ্ট হয় না, আবার পরিবর্ত্তিতও হয় না, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। আর ঐ অনুভূতি বা প্রকাশ অবস্থাটি, যদি কোন প্রকার গুণ বা শক্তি বা ক্রিয়াপদার্থ বিশেষ না হইল, তবে উহা কোন্ পদার্থ বলিয়া গণ্য হইবে, তাহাও বুঝিতে পারিলাম না।

আচার্য্য। এ বিষয়ে শাস্ত্র যাহা বলিয়াছেন তাহাই প্রথমে বলি, তৎপর আবশ্যক হইলে বিশেষ বিস্তার পূর্ব্বক বুঝানের চেষ্টা করিব। পাতঞ্জল-দর্শন বলিতেছেন,—"দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোপি প্রত্যয়ানু পশ্যঃ" (২ পং ২০ সূ) ভগবান্ বেদব্যাস ইহার অর্থ করিয়াছেন,—'দৃশি মাত্রইতি দৃক্ শক্তি-রেব বিশেষণাহ পরামৃষ্টেত্যর্থঃ। সপুরুষো বুদ্ধেঃ প্রতি সম্বেদী। সবুদ্ধের্ন সরূপো নাত্যন্তং বিরূপ ইতি। নতাবৎ সরূপঃ; তস্মাশ্চ বিষয়ো গবাদি র্ঘটাদির্জ্ঞাতশ্চাজ্ঞাতশ্চ ইতি পরিণামিত্বং দর্শয়তি। সদাজ্ঞাত বিষয়ত্বস্তু পুরুষস্যাপরিণামিত্বং পরিদীপয়তি। কস্মাৎ? নহি বুদ্ধিশ্চনাম পুরুষ বিষয়শ্চস্যা দগৃহীতা চেতি সিদ্ধং পুরুষস্য সদাজ্ঞাত বিষয়ত্বং; ততশ্চা-পরিণামিত্ব মিতি। কিঞ্চ পরার্থা বুদ্ধিঃ সংহত্য কারিত্বাৎ, স্বার্থঃ পুরুষ ইতি। তথা সর্ব্বার্থাধ্যবসায়কত্বাৎ ত্রিগুণা বুদ্ধিঃ, ত্রিগুণত্বাৎ অচেত-নেতি। গুণানাম্তুপদ্রষ্টা-পুরুষ ইত্যতো নসরূপঃ। অস্ত তর্হিবিরূপ ইতি? নাত্যন্তঃ বিরূপঃ। কাস্মাৎ? শুদ্ধোপ্যসৌ প্রত্যয়মনুপশ্যন্তদাত্মাপি তদাত্মক ইব প্রত্যব ভাসতে। তথাচোক্তম্, "অপরিণামিনীহি ভোক্তৃশক্তির প্রতি সঙ্ক-মাচ, পরিণামিন্যর্থে প্রতি সঙ্ক্রান্তেব তদ্বৃত্তিমনু পততি। তস্যাশ্চ প্রাপ্ত চৈত-ন্যোপগ্রহকপায়া বুদ্ধি বৃত্তেরনুকার মাত্রতয়া বুদ্ধি বৃত্ত্য বিশিষ্টাহি জ্ঞান বৃত্তি রিত্যাখ্যায়তে। (ঐ ২১ সূ, ভাঃ) "তদর্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা" (ঐ ২২ সূ) "দৃশিরূপস্য পুরুষস্য কর্ম্ম বিষয়তামাপন্নং দৃশ্যমিতি তদর্থ এব দৃশ্য-স্যাত্মা স্বভাবতহৈতি স্বরূপং ভবতীত্যর্থঃ * * (ঐ ভাষ্য) এই সূত্র দুটি আর ভাষ্য দুটির বোধ সৌকার্য্যের নিমিত্ত পূর্ব্বে কএকটি কথা বলিয়া লই। যখন সর্ব্বদাই সকলের অন্তরে অন্তরে আপনাপন অস্তিত্বের বা "আমিত্বের"

এক প্রকার প্রকাশ অবস্থা জাগ্রত রহিয়াছে (যাহাকে আপন অস্তিত্বের বা "আমির" অনুভূতি, অনুভব, উপলব্ধি, ও জ্ঞান ইত্যাদি বলিয়া ব্যবহার করা হয়) তখন উহা আছে কি, না, তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। কেন না? ঐরূপ একটা প্রকাশ ভাব যে অন্তরে অন্তরে আছে, তাহা সকলেই সর্ব্বদা উপলব্ধি করিতেছেন। অতএব উহার অস্তিত্ব আছে কি না, তদ্বিষয় আলোচনার কোনই প্রয়োজন নাই। আর আমাদের অস্তিত্বের অনুভূতি বা উপলব্ধিই যে আন্তরিক সুখ দুঃখ ও ভক্তি ক্রোধাদির অনুভূতি এবং উহাই যে আমাদের বহিঃস্থিত ঘটপটাদি বিষয়ের অনুভূতি তাহাও প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। কারণ সুখ দুঃখাদি কিছুই আমাদের "আমি" হইতে অতিরিক্ত কোন পদার্থ নহে, এবং (জ্ঞানকালে) ঘটপটাদি বিষয়ও আমাদের "আমি" হইতে বিভিন্ন ভাবে থাকে না, কেন না, আমাদের "আমি," তখন তদাকারে আকারিত হইয়া যায়। অতএব তখন "আমির" একটু পরিবর্ত্তন অবস্থা হওয়া নিবন্ধন সেই পূর্ব্বতন "আমির" অনুভবটাই কেবল এক একবার গ্রাহ্যে আসিয়া থাকে, ইহাও অতি বিস্তার মতেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং ইহাও উত্তম রূপেই বুঝিয়াছ যে আভ্যন্তরিক সুখ দুঃখাদি বা বাহ্য ঘটপটাদির উপলব্ধি বা জ্ঞান কালে আর আমাদের নূতন করিয়া কোন উপলব্ধি জন্মে না, এবং পূর্ব্বকার যে সেই চিরন্তন উপলব্ধিটি ছিল তাহার পরিবর্ত্তনও হয় না; কিন্তু তখন আমাদের "আমির"ই অবস্থা পরিবর্ত্তন হয়, তাই ভ্রান্তিবশতঃ আমরা "জ্ঞানের পরিবর্ত্তন হইল" এই কথা বলিয়া থাকি। অতএব প্রতি ক্ষণে ক্ষণে সুখ, দুঃখাদির জ্ঞান কালে যে আমাদের ঐ উপলব্ধির উৎপত্তি বা পরিবর্ত্তন হয় না তাহাও আলোচনার প্রয়োজন নাই। এখন, ঐ প্রকাশ ভাব বা উপলব্ধি বা জ্ঞান পদার্থটি কোন্ পদার্থের মধ্যে গণ্য হইবে,—উহা কি আমাদের "আমির"ই কোন গুণ বা ক্রিয়া বা শক্তি বিশেষ, না অন্য রকম কিছু, আর উহা কি এক বারেই কখনও জন্মে নাই কিম্বা পরিবর্ত্তিতও হয় না, এই দুইটি বিষয় মাত্র বিশেষ করিয়া পর্য্যালোচনা করিতে অবশিষ্ট আছে। সুতরাং তাহাই এখানে চিন্তা করিয়া দেখিব।

উল্লিখিত প্রশ্নের চরম সিদ্ধান্ত এই যে, আমাদের অন্তরে অন্তরে যে আমাদের অস্তিত্ব বা "আমির" প্রকাশ ভাবটি রহিয়াছে, তাহা কোন বস্তুর কোন প্রকার গুণ বা ক্রিয়া বা শক্তি বিশেষ নহে, এবং কদাপি উৎপন্ন, বিনষ্ট, পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত, হ্রাস প্রাপ্ত, বা অপ্রকাশিত হয় না। উহা সর্ব্বদাই সমভাবে আছে শাস্ত্রে ঐ পদার্থটিকেই পুরুষ, চৈতন্য, ব্রহ্ম এবং সত্তাদি নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহাই এই অমূল্য পাতঞ্জলীয় সূত্র ও ভাষ্যের মর্ম্মার্থ।

এই কথাটি বিশেষরূপে বুঝিতে হইলে প্রথমে একটি কথা বুঝিয়া লও, নচেৎ ঐ ভাবার্থ গ্রহণ করিতে পারিবে না। সেই কথাটি এই,—সংসারে সর্ব্বত্রই "বিশেষ্য" আর "বিশেষণ" এই দুইটি বিষয়ের ব্যবহার হইয়া থাকে। যাহার সময় সময়ে এক এক রূপ বিশেষ বিশেষ অবস্থা হইয়া থাকে, তাহাকেই "বিশেষ্য" আর ঐ অবস্থাগুলিকেই "বিশেষণ" বলিয়া লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে। ঘট পটাদি দ্রব্যের সময়-সময়ে, পোড়া, কাঁচা, নীল, পীত ইত্যাদি নানা প্রকার অবস্থা হইয়া থাকে, অতএব ঘট পটাদি দ্রব্যগুলিই "বিশেষ্য" আর ঐ সকল অবস্থাগুলিকে ঘট পটাদির "বিশেষণ" বলা গিয়া থাকে। এ জন্য যে যে কথা গুলি এই বিশেষ্য আর বিশেষণের প্রকাশক, তাহাদিগকেও বিশেষ্য আর বিশেষণ বলা গিয়া থাকে। বিশেষ্যের বোধক কথাটিকে বিশেষ্য, আর বিশেষণের বোধক কথাটিকে বিশেষণ বলা গিয়া থাকে। "ঘট" এই কথাটি ঘট বস্তুটির (বিশেষ্যের) বোধক, এ জন্য উহাকে বিশেষ্য বলিয়া থাকে, এবং "সুন্দর" "কুৎসিত" ও "নীল" "পীতাদি" কথাগুলি উহার অবস্থার (বিশেষণের) বোধক, এজন্য উহাদিগকে উহার বিশেষণ বলিয়া ব্যবহার হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, দ্রব্যগুলিই বিশেষ্য আর বিশেষণ হইয়া থাকে।

এই বিশেষণ প্রথমে দুইপ্রকারে বিভক্ত হইতে পারে, এক,—"তাদাত্মিক," দ্বিতীয়,—"সাংস্রবিক" যে কোনরূপ বিশেষ অবস্থাকে, বিশেষ্য দ্রব্য হইতে পৃথক্ বা বিভক্ত বা বিশ্লিষ্ট করিয়া দেওয়া যায় না, তাহাই তাহার "তাদাত্মিক বিশেষণ", আর যে অবস্থা বিশেষের সহিত, বিশেষ্যদ্রব্যের কথঞ্চিৎ সম্বন্ধ মাত্র থাকে; সুতরাং উহা বিশ্লিষ্ট বা বিভক্তও হইতে পারে,

তাহাকে "সাংস্রবিক বিশেষণ" বলা যাইতে পারে। ঘট পটদাদির পোড়া কাঁচা ও সুন্দর কুৎসিতাদি অবস্থা, উহার তাদাত্মিক বিশেষণ। কারণ ঐ সকল অবস্থাগুলি ঘটপটাদি হইতে বিভক্ত বা বিশ্লিষ্ট করিয়া রাখা যায় না। আবার সাংস্রবিক বিশেষণেরও একটা উদাহরণ লও, -ব্রহ্মাণ্ডে অনেকগুলি সূর্য্য আছেন, অন্ততঃ দ্বাদশ সূর্য্যের অস্তিত্ব বিষয় হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন। ঐসকল সূর্য্যের প্রত্যেকেই, কতকগুলি করিয়া গ্রহ উপ-গ্রহকে আপন রশ্মিরাশি দ্বারা প্রকাশিত করিতেছেন। এখন যদি এই সূর্য্যমণ্ডল গুলির, পৃথক্ পৃথক্ করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করা যায়, তবে বলিতে হইবে যে, "যিনি এই চন্দ্রও এই পৃথিবী প্রভৃতির প্রকাশ করিতেছেন, তিনি এক সূর্য্য, এবং যিনি অন্য চন্দ্র ও অন্য পৃথিব্যাদি গ্রহের সহিত অভিসম্বদ্ধ আছেন, তিনি অন্য সূর্য্য"। এইরূপ পৃথিবী ও চন্দ্রাদির গ্রহের দ্বারা সূর্য্যের মধ্যে পরস্পরের ভেদ নির্ণয় করা যাইতে পারে। তাহা হইলে এই সকল পৃথিবী চন্দ্রাদি লইয়াই ভিন্ন ভিন্ন সূর্য্যের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা গণ্য হইতেছে। অতএব বাক্যান্তরে আমাদের এই পৃথিবী চন্দ্রাদিকেই আমাদের এই সৌর জগতের এক একটি অবস্থা বলা যাইতে পারে। সুতরাং এই পৃথিব্যাদিকে সূর্য্যের বিশেষণ, এবং সূর্য্যকে ইহার বিশেষ্য বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই পৃথিবী বা চন্দ্র, সূর্য্যের অবি-যোজ্য বা অবিশ্লেষ্য বস্তু নহে। কিম্বা সূর্য্য আর ইহা এক পদার্থও নহে, কিন্তু ইহা সূর্য্য হইতে ভিন্ন, বিশ্লিষ্ট ও বিভক্ত জিনিষ। অতএব ইহাদিগকে সূর্য্যের সাংস্রবিক বিশেষণ বলা যাইতে পারে। এইরূপ প্রত্যেক বস্তুরই দুই প্রকার বিশেষণ আছে।

এই 'দুই প্রকার বিশেষণের মধ্যে' তাদাত্মিক বিশেষণের পরিবর্ত্তন হইলে, বিশেষ্যেরও অস্তিত্বটা পরিবর্ত্তিত হয়; ইহার দৃষ্টান্ত,—ঘট এবং ঘটের কাঁচা পোড়া অবস্থা। কাঁচা ঘট পুড়িলে ঘটের কাঁচা অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া পোড়া অবস্থা হয়, তৎসঙ্গে ঘটেরও আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন হয়, ঘটের প্রত্যেক অণু-পরমাণুর পরিচালনা হইয়া নূতন আর এক প্রকারে অবস্থিত হয়। কিন্তু সাংস্রবিক বিশেষণের পরিবর্ত্তনে বিশেষ্যের দেহটির কিছুই পরিবর্ত্তন বা অন্যথা হয় না, উহা যেমন

ছিল তেমনই থাকে, ইহার দৃষ্টান্ত সূর্য্য এবং এই পৃথিব্যাদি গ্রহ। ভাবিয়া দেখ; এই পৃথিবীর সর্ব্বদাই অবস্থা পরিবর্ত্তন হইতেছে। বর্ষাকালে জল বৃষ্ট্যাদি এবং ধান্য, লতা, পত্রাদি দ্বারা ইহা এক অবস্থায় পরিণত হয়, আবার শীতকালে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থায় পরিণত হয়। কিন্তু এই বিশেষণের পরিবর্ত্তনের দ্বারা বিশেষ্য-সূর্য্যদেবের কিছুই পরিবর্ত্তন হয় না। সূর্য্য বর্ষাকালেও যেমন ছিলেন শীতকালেও তেমনই আছেন। তিনি, কেবল এই পৃথিবীকে প্রকাশ করিয়া থাকেন, এইমাত্র সম্বন্ধ, তাহাও সর্ব্বদাই সমভাবে আছে। তিনি বর্ষাকালেও পৃথিবীকে প্রকাশ করিতেছিলেন শীতকালেও করিতেছেন তাহার কোন তারতম্য, বা উৎপত্তি বিনাশ হইতেছে না। পৃথিবীরই অবস্থা পরিবর্ত্তন হইতেছে এবং পৃথিবী যখন যে অবস্থায় পরিণত হইতেছেন, তখন সেই ভাবেই প্রকাশ পাইতেছেন। এ কথাটি বেশ বুঝিলে?

শিষ্য। আজ্ঞা হ্যাঁ, এখন অন্য কথা বলুন।

আচার্য্য। এখন ঐ সূত্র আর ভাষ্যের ভাবার্থটি শ্রবণ কর। "অন্তরে অন্তরে যে সর্ব্বদাই আমাদের অস্তিত্বের উপলব্ধি হইতেছে—একটা অনন্ত প্রকাশভাব রহিয়াছে—যাহার জন্য, প্রত্যেক মনুষ্যই সর্ব্বদা "আমি আছি" এরূপ বিশ্বাস করিতেছে, যাহার জন্য আপনাকে কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদি হইতে বিভিন্নরূপে, অর্থাৎ "আমি কাষ্ঠলোষ্ট্রাদির ন্যায় অন্ধ নহি, আমি চেতন, উহা অচেতন" এই রূপে নির্ণয় করিতেছে, সেই প্রকাশভাবটি বা উপলব্ধিটির নামই 'পুরুষ,' 'ব্রহ্ম,' 'পরমাত্মা,' এবং 'দ্রষ্টা'। এই যে আমাদের "আমির" উপলব্ধি বা প্রকাশ ভাবটি, ইহার কোন প্রকার "তাদাত্মিক বিশেষণ' নাই; অর্থাৎ ঘটের পাকা কাঁচা, নীল, পীতাদি অবস্থার ন্যায় ইহার কোন প্রকার অবস্থাই নাই—যাহার পরিবর্ত্তন বা বিনাশ হইতে পারে। ইহা খাটি, নিছক, কেবল প্রকাশ ভাবটি মাত্র। কিন্তু ইহার অতাদাত্মিক বা "সাংসর্গিক বিশেষণ" আছে। সূর্য্য যেমন আমাদের পৃথিব্যাদির সহিত যথা কথঞ্চিৎরূপে অভিসম্বদ্ধ হইয়া, ইহাদিগকে প্রকাশিত করিতেছেন, এই প্রকাশ পদার্থটিও তেমন, আমাদের অভ্যন্তর বর্ত্তি-বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত (যাহা লইয়া আমার "আমিত্ব,

বা আমার আমিভাবের অস্তিত্ব তাহার সহিত) মাখামাখিভাবে থাকিয়া আমাদের জড়-অন্ধ "আমিকে" বা বুদ্ধি, অভিমান, মন ও ইন্দ্রিয়াদিকে, প্রকাশ যুক্ত বা প্রকাশিত করিতেছেন। তাই আমাদের অস্তিত্ব— আমাদের "আমিত্ব" সর্ব্বদা জাগ্রৎ ভাবে রহিয়াছে; আমরা আছি, আমাদের অস্তিত্ব আছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি; এবং আমাদের যখন যে অবস্থা হইতেছে তৎক্ষণাৎ তাহা অন্তরেং প্রকাশ পাইতেছে, আবার ঘট পটাদি বাহ্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হইয়া যে আমাদের "আমির" অবস্থান্তর হইতেছে তাহাও প্রকাশ পাইতেছে। এই প্রকাশ পদার্থটি, আমাদের বুদ্ধি, অভিমান, মন প্রভৃতি যে সকল অন্ধ বা জড় পদার্থ আছে, তাহার সমধর্ম্মী নহেন; আবার কোন অংশে যে কিছু মাত্র সাদৃশ্য নাই, তাহাও নহে। সমধর্ম্মী নহেন কেন? আমাদের বুদ্ধি প্রভৃতি জড় বা অন্ধ পদার্থগুলি পরিণামী দ্রব্য; প্রতিক্ষণেই উহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু প্রকাশ পদার্থটির কখনই পরিবর্ত্তন বা অবস্থান্তর হয় না, উহা সর্ব্বদাই এক প্রকারে এক ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। বুদ্ধি প্রভৃতি জড়-অন্ধ পদার্থের যে পরিবর্ত্তন হয় তাহার প্রমাণ কি? আমাদের যে একবার ভক্তি, একবার দয়া, একবার ক্রোধ, হইতেছে, এবং একবার ঘটজ্ঞান, একবার পটজ্ঞান হইতেছে ইহাই তাহার জলন্ত প্রমাণ। ভক্তি প্রভৃতি শক্তি আমাদের 'আমি" বা বুদ্ধি, মন হইতে অতিরিক্ত কিছুই নহে; উহারা অন্তঃকরণের বা "আমির"ই একএকটি অবস্থা বিশেষ মাত্র। আবার ঐ সকল বৃত্তি যে অধিক কাল থাকেনা তাহাও সকলেই জানেন। অতএব অন্তঃকরণের যখন ভক্তি অবস্থাগিয়া ক্রোধাবস্থা, বা ক্রোধাদি অবস্থাগিয়া দয়াবস্থাদি হয়, তখনই তাহার পরিণাম, পরিবর্ত্তন বা অন্যাবস্থা হইল। এবং ঘটপটাদির জ্ঞানও যে আমাদের সর্ব্বদা থাকেনা, তাহাও সকলেইজানেন। ঐ ঘটপটাদি জ্ঞানের কালে আমাদের অন্তঃকরণ তদাকারে আকারিত হইয়া থাকে সুতরাং তৎকালে তাহাই. অন্তঃকরণের এক একটি অবস্থা বলিয়া গণ্য হয়; আবার যখন ঘটপটাদির জ্ঞান থাকে না, তখন অন্তঃকরণও তদাকারে আকারিত থাকে না। এই সকল কারণেই জানা যায়, "আমাদের অন্তঃকরণ বা বুদ্ধি, অভিমান, মন ও ইন্দ্রিয়াদি পরিণামশীল, বা পরিবর্ত্তনশীল।

সেই প্রকাশ পদার্থটি বা পরমাত্মার যে ঐরূপ পরিণাম বা পরিবর্ত্তন নাই, তাহার অখণ্ডিত প্রমাণ কি? আমরা যে সর্ব্বদাই বুদ্ধি, মন প্রভৃতি অন্তঃকরণ বা আমাদের অস্তিত্ব বা "আমির" অনুভব করিতেছি তাহাই ইহার অব্যর্থ প্রমাণ। ভাবিয়া দেখ, সংসারে এমন কোন ব্যক্তিই নাই, যে, অন্তরে অন্তরে আপনাপন অস্তিত্ব বা "আমির" অনুভব করিতেছে না; কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি মনুষ্য, কি পশু সকলেই আপনাপন অস্তিত্বের উপলব্ধি করিতেছে, সকলেরই "আমি"টি অন্তরে অন্তরে প্রকাশ পাইতেছে। এই উপলব্ধিটি যে সর্ব্বদাই আছে, তাহাও একটু বিবেচনা করিলেই বুঝা যাইতে পারে। এই উপলব্ধি বা চৈতন্য* যদি ক্ষণকালের নিমিত্তও না থাকিত, তবে তৎক্ষণাৎ এই মনুষ্যদেহ কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় অন্ধ, অচেতন হইত। কিন্তু সেইরূপ অবস্থা কখনই পরিলক্ষিত হয় না; নিদ্রাবস্থা বা মূর্চ্ছাবস্থায়ও এই উপলব্ধির কিছুমাত্র হ্রাস বা অভাব দেখিতে পাই না। নিদ্রাদি অবস্থায় যদি আমাদের অস্তিত্বের উপলব্ধি বা চৈতন্য না থাকিত, তবে কেহই নিদ্রার প্রার্থনা করিত না, কিম্বা নিদ্রা না হইলে অসুখ মনে করিত না। বাস্তবিক নিদ্রাবস্থাতেও আমাদের আমিত্বের অনুভূতি বিলক্ষণ থাকে। কিন্তু সে সময়ে অন্তঃকরণের সহিত কোন প্রকার বিষয়ের সম্বন্ধ থাকে না, এ নিমিত্ত অন্তঃকরণ তখন কোন বিষয়াকারে আকারিত হইতে পারে না, সুতরাং তখন নিজের স্বরূপেই প্রকাশিত হইতে থাকে, নিজের স্বরূপেরই জ্ঞান হয়। কিন্তু আমাদের অন্তঃকরণ কিছু বাহিরের দ্রব্য নহে, সুতরাং বাহিরের কোন দ্রব্যের ভাবেও উহার জ্ঞান হয় না। এজন্য তখন কি দেখিয়াছিলাম, তাহা নিজেরও পরিস্ফুট ধারণা হয় না, অন্যকেও বর্ণনা করিয়া বুঝান যায় না। ফল পক্ষে, জাগ্রত্ অবস্থা, আর নিদ্রাবস্থার কেবল এই মাত্রই তারতম্য যে, জাগ্রত অবস্থাতে চিত্ত বিষয়াকারে আকারিত থাকে, আর নিদ্রাবস্থায় কেবল মাত্র নিজের স্বরূপেই অবস্থিতি করে। চিত্তের বিষয়াকারের বৃত্তিগুলি এক একটি করিয়া নিস্তেজ হইতে হইতে ক্রমে অন্তঃকরণ একবারে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িলে, আর কোন প্রকার ক্রিয়াই থাকে না, বিষয়াকারে আকার বা বৃত্তিও থাকে না, তাহারই নাম 'নিদ্রা'। ইহাই শাস্ত্রও বলিয়াছেন, "অভাব প্রত্যয়া লম্বনাবৃত্তি নিদ্রা" (পা,

দ, ১ পা ১০ সূ) "অন্তঃকরণের নিষ্ক্রিয়তা নিবন্ধন বিষয়াকার বৃত্তি সকল নিরুদ্ধ হইয়া গেলে, কেবলমাত্র নিজের স্বরূপের আলম্বনেই যে অন্তঃকরণের অবস্থিতি তাহার নাম নিদ্রা।" এই জন্যই নিদ্রা ভঙ্গের পরে জাগ্রত্ হইয়া নানাবিধ প্রত্যভিজ্ঞান হইয়া থাকে। যাঁহাদের সাত্ত্বিক নিদ্রা, অর্থাৎ নিদ্রাবস্থায় সত্ত্বগুণের আতিশয্য হয় যাঁহারা "আজ বড় সুখনিদ্রা হইয়াছিল, মনটি যেন প্রসন্ন-প্রসন্ন বোধ হইতেছে"—এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান করিয়া থাকেন। যাহাদের নিদ্রায় রজোগুণের প্রবলতা হয়, তাহারা "আজ নিদ্রাতে সুখ পাই নাই, আজ অশান্তি বা দুঃখের ভাবে নিদ্রা গিয়াছিলাম, এখন মনটা যেন অকর্ম্মণ্য এবং অতিশয় চঞ্চল বোধ হইতেছে, মনটা যেন ঘুরিতেছে"—ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞান করে। আর যাহাদের নিদ্রায় তমোগুণের আধিক্য হয়, তাহারা মোহ এবং গুরুত্বাদি-তমোগুণধর্ম্মের প্রত্যভিজ্ঞান করে। নিদ্রায় কোন উপলব্ধি না থাকিলে; কদাচ এরূপ হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, নিদ্রায় অচেতনতা হইলে নিদ্রাকেও সকলে মৃত্যুর ন্যায় ভয় করিত। মূর্চ্ছাবস্থায়ও আপনাপন অস্তিত্বের উপলব্ধি থাকে, তাই মূর্চ্ছার পরেও "আমি বিমুগ্ধ হইয়া ছিলাম" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান হয়; কিন্তু তখন "আমি ছিলাম না" এইরূপ কাহারই মনে হয় না। তবে কিনা, মূর্চ্ছাটা কেবল তমোগুণ হইতেই হয়, এজন্য মূর্চ্ছার পরেও শরীর ও মনের গ্লানি, গুরুত্ব ও অলসতাদি থাকে; সুতরাং কাহারও প্রার্থনীয় হয় না। নিদ্রা ও মূর্চ্ছাদিকে যে অচেতন অবস্থা বলিয়া ব্যবহার করা হয়, তাহা পারিভাষিক। অর্থাৎ সচরাচর বাহ্যজ্ঞান থাকার অবস্থাকেই আমরা "চেতনাবস্থা" ব্যবহার করি, এবং নিদ্রামূর্চ্ছাদিতে বাহ্যজ্ঞান থাকে না বলিয়াই তাহাকে অচেতনাবস্থা বলিয়া ব্যবহার করি; বাস্তবিক তাহা অচেতনাবস্থা নহে।

তৎপর জাগ্রৎ অবস্থায়ও কখনই জীবের "আমিত্ব" উপলব্ধি বা চৈতন্যের অভাব হওয়া পরিদৃষ্ট হয় না। কারণ, যদি ক্ষণকালের জন্যও "আমিত্বের" উপলব্ধি বা চৈতন্য না থাকে, তবে তৎক্ষণাৎ জীব অচেতন হইয়া মৃৎপিণ্ডের ন্যায় ভূমিসাৎ হইবে; এবং পুনঃপ্রাপ্ত-চৈতন্য হইলে, "আমি ছিলাম না" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান করিবে। তাহা কিন্তু কাহারও হইতে দেখা যায় না। অতএব চৈতন্য বা "আমির" উপলব্ধির অভাব

কখনই হয় না। প্রত্যেক জীবেরই অন্তরে অন্তরে "আমিটি" সর্ব্বদা প্রকাশ পাইতেছে, উহা উৎপন্নও হইতেছে না, বিনষ্টও হইতেছে না। আবার এই প্রকার ভাবটির কোনরূপ পরিবর্ত্তনও অনুভূত হয় না, কিন্তু কেবল প্রকাশ্য বিষয়েরই পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইয়া থাকে। সূর্য্যের প্রকাশ্য যেমন এই পৃথিবী, এই প্রকাশ বা চৈতন্যেরও প্রকাশ্য তেমন, আমাদের অন্তঃকরণ। ভিন্ন ভিন্ন শক্তি বা ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির উত্তেজনা দ্বারা, অন্তঃকরণের পরিবর্ত্তন অবস্থা সর্ব্বদাই পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু তৎসঙ্গে উপলব্ধি বা প্রকাশ বা চৈতন্যটুকুর পরিবর্ত্তন হয় না। মনে করিয়া দেখ, এখন তোমার অন্তঃকরণে সুখাবস্থা আছে, কিছুকাল পরেই আবার দুঃখাবস্থা হইল, কিম্বা ক্রোধের অবস্থা আছে, তাহা গিয়া আবার দয়ার অবস্থায় পরিবর্ত্তন হইল, ইহা সচরাচর ঘটে, কিন্তু তৎসঙ্গে কি তোমার ঐ অস্তিত্বের প্রকাশটি বা উপলব্ধিটি, অর্থাৎ ঐ বুঝনাটিরও পরিবর্ত্তন হইল? উহা কি, পূর্ব্বে এক রকম ছিল, এখন আর এক রকম হইল? তাহা কদাচ নহে। সূর্য্যের প্রকাশের ন্যায় তোমার "আমির" প্রকাশ ভাবটি ঠিক একই রকমে আছে, কিন্তু তোমার অন্তঃকরণ বা "আমিই" ভিন্নভিন্নবৃত্তির উত্তেজনায়, সূর্য্য-প্রকাশ্য-পৃথিবীর ন্যায়, অসংখ্য আকারে পরিণত হইয়া, সেই একই প্রকাশের সহিত অভিসম্বন্ধ হইয়া অসংখ্যাকারে প্রকাশ পাইতেছে। ভক্তিরূপে পরিণত হইয়াও যে প্রকাশ বা উপলব্ধির দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে, দয়া বৃত্তিরূপে পরিণত হইয়াও সেই প্রকাশেই প্রকাশ পাইতেছে, ক্রোধরূপে পরিণত হইয়াও সেই "আলোকেই" প্রকাশ পাইতেছে, সুখরূপে পরিণত হইয়াও সেই "জ্যোতিতে"ই প্রকাশ পাইতেছে, দুঃখরূপে পরিণত হইয়াও সেই প্রকাশেই প্রকাশ পাইতেছে। তোমার "আমির" জড়াংশটা বা অন্তঃকরণ ঐ "প্রকাশের" অতাদাত্মিক বা "সাংশ্রবিক বিশেষণ" ইহার অবস্থা পরিবর্ত্তনে বিশেষ্যস্বরূপ "প্রকাশ"-পদার্থের পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। তবে যতক্ষণ এই প্রকাশ আর প্রকাশ্যের পার্থক্য বুঝিতে পারা যায় না, তত দিন প্রকাশ্যের পরিবর্ত্তনকেই প্রকাশের পরিবর্ত্তন বলিয়া ভ্রান্তি হইয়া থাকে; প্রকাশ্যের পরিবর্ত্তনকেই প্রকাশের বা জ্ঞানের পরিবর্ত্তন বলিয়া মনে করিয়া থাকে, বাস্তবিক ইহা নিতান্ত মিথ্যা সংস্কার।

এজন্যই এই প্রকাশ ভাবটিকে, অন্তঃকরণের কোন গুণ, বা শক্তি, বা ক্রিয়া বিশেষ বলিতে পারা যায় না। কারণ, উহা অন্তঃকরণের কোন গুণ বা শক্তি, বা ক্রিয়া বিশেষ হইলে, শীতলতাগুণের, আধার জলের ন্যায়; অন্তঃকরণকেও উহার সমবায়ী আধার বলিতে হইবে; কিন্তু সমবায়ী আধারের অন্যথা হইলে সমবেত আধেয় কখনই অক্ষত থাকিতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। ধর, যেমন জল শৈত্যের সমবায়ী আধার, এবং শৈত্য-গুণ বা শক্তি, তাহার সমবেত আধেয়। এই জলকে যদি 'জলজ্ঞান' ও 'অম্লজ্ঞানে' পরিণত করিয়া অন্যথা করিয়া দেওয়া যায়,—তবে কি শৈত্যগুণ বা শৈত্য শক্তি অক্ষত থাকিতে পারে? কিম্বা উহার কোন চিহ্নও পাওয়া যায়? কখনই না, শৈত্যগুণও উহারই সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হইয়া যায়। সেইরূপ আমাদের এই আভ্যন্তরিক প্রকাশ ভাব, বা উপলব্ধি বা চৈতন্যও, যদি অন্তঃকরণের কোন প্রকার গুণ বা শক্তি বিশেষ হইত, তবে ভিন্ন ভিন্ন এক একটি বৃত্তির উত্তেজনা হইয়া, যখন অন্তঃকরণের মধ্যে এক একটা বিপ্লব অবস্থা হইয়া যাইতেছে, তখন এই প্রকাশেরও অন্যথা হইত; কিন্তু তাহা কখনই হয় না।

মনের ক্রিয়াকেই যাঁহারা এই প্রকাশ বা চৈতন্য বলিতে চাহেন, তাঁহাদের অনুভব শক্তি আরও ধন্য। তাঁহারা মনের একটু বিকম্পন বা নড়াচড়াকেই এই প্রকাশ বা অনুভূতি বলিয়া বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন!। ফলতঃ ক্রিয়া হইলেও তাহার উৎপত্তি বিনাশ ও পরিবর্ত্তন আছে, কিন্তু "ঐ প্রকাশের" তাহা কিছুই নাই। দ্বিতীয়তঃ,—আলোক ও অন্ধকার যেমন ভিন্ন প্রকার পদার্থ, আমাদের জড় ও অন্ধ অন্তঃকরণ আর ঐ "প্রকাশ" ও তেমন নিতান্ত বিভিন্ন প্রকার পদার্থ। অতএব ঐ "প্রকাশ' ভাবটি, কখনই জড় অন্ধ অন্তঃকরণের গুণ বা শক্ত্যাদি হইতে পারে না। অতএব উহা সমস্ত জড়পদার্থের অতীত বস্তু, সুতরাং উহাকে, 'গুণ', 'ক্রিয়া', 'শক্তি', 'দ্রব্য' ইত্যাদি কোন নামই দান করা যায় না। কারণ ঐ সকল নামগুলি আমাদের জড় বস্তুর ভাবেই অভ্যস্ত। আর আমাদের জীবনের মধ্যেও যাহার একবার পরিবর্ত্তন হওয়া বা উৎপত্তি বিনাশাদি পরিলক্ষিত হয় না, তাহা যে অন্য কখনও জন্মিয়াছে বা বিনষ্ট

হইবে, তাহাও বলা যায় না; অতএব তাঁহাকে নিত্য, অবিনাশী, অজর, অক্ষয় বলিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, যাহা আমাদের অন্তঃকরণ বা "আমির" কোন প্রকার গুণ, শক্তি বা ক্রিয়াবিশেষ নহে, তাহা আমাদের উৎপত্তিকালেই যে জন্মিয়াছে, আর বিনাশ কালে বিনষ্ট হইবে, তাহা কোন মতেই বলা যায় না। কারণ অন্তঃকরণের গুণ বা শক্তি প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, তাহাই উহার সঙ্গেসঙ্গে জন্মিবে ও সঙ্গে সঙ্গে মরিবে। কিন্তু প্রকাশ বা চৈতন্য বা উপলব্ধির সঙ্গে অন্তঃকরণের সেইরূপ কোন সম্বন্ধ নাই; সুতরাং উহা নিত্য বিদ্যমান বস্তু। অতএব জানা গেল যে, চৈতন্য বা প্রকাশ পদার্থটি অপরিণামী। আর অন্তঃকরণ পরিণামী পদার্থ, সুতরাং এতদুভয়ের সমধর্ম্মিতা নাই।

আবার একবারে কোন অংশেই যে কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই, তাহাও নহে,— কোন্ অংশে তবে কিছু সাদৃশ্য আছে? বিষয়-প্রকাশকত্ব-অংশে। অন্তঃকরণ, কোন বাহ্য বিষয়াদির সহিত সম্বন্ধ হইলে, আপন-সাত্ত্বিকাংশের দ্বারা তদাকারে আকারিত হইয়া তাহাদিগকে প্রকাশিত করে। অবশ্যই, ইহা জড় ভাবের প্রকাশ বটে, জলে সূর্য্যের বিম্ব পড়িলে যেমন জলকে সূর্য্যের প্রকাশক, কিম্বা স্ফটিকে পুষ্পের বিম্ব পতিত হইলে যেমন স্ফটিককে পুষ্পের প্রকাশক বলা যায়, এই সত্ত্বগুণও সেইরূপ প্রকাশক। এদিকে, চৈতন্যও অন্তঃকরণের সহিত মাখামাখিসম্বন্ধ থাকাতে, অন্ধ-জড় অন্তঃকরণকে প্রকাশিত করিতেছেন। অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবী যেমন সূর্য্যকিরণের সহিত অভিসম্বদ্ধ হইয়া সূর্য্যাশ্রয়ে সূর্য্যেতেই প্রকাশ পাইতেছে; যদি অন্য কোন ভুবনের লোক এই সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে, তবে দেখিতে পাইবে যে, এই সূর্য্যেতেই পৃথিব্যাদি গ্রহ গুলি প্রকাশিত হইতেছে; আমাদের অন্তঃকরণও সেইরূপ স্বপ্রকাশস্বরূপ-চৈতন্যের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া তাঁহাতেই প্রকাশ পাইতেছে। অবশ্যই, এই উভয় প্রকার প্রকাশই যে একরূপ তাহা নহে, তথাপি অন্তঃকরণ যেমন ঘটপটাদি বিষয়ের আকারটি আত্মসাৎ করিয়া উহাদের একাকার হইয়া যায়, চৈতন্যও তেমন আপন প্রকাশ অবস্থার মধ্যে অন্তঃকরণকে সম্মিলিত করিয়া, অন্তঃকরণের সহিত যেন এক হইয়া যায়। সুতরাং অন্তঃকরণও প্রকাশ প্রাপ্ত হয়; আবার যে সকল বিষয়ের বিম্ব গ্রহণ করিয়া অন্তঃকরণ তদাকারে আকারিত

হয়, তাহাও সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। এইরূপে কথঞ্চিৎ কিছু সাদৃশ্য আছে। * * * ” [এইরূপ প্রকাশপ্রাপ্ত হওয়ার ভাবটিকেও উপলব্ধি বলে, আবার প্রকাশটিকেও উপলব্ধি বলে। পূর্ব্বে যে উপলব্ধির কথা বলা হইয়াছে (১৮০পৃ ২৪ প) তাহা এই প্রকাশ পাওয়ার ভাবটি লক্ষ্য করিয়া জানিবে,কিন্তু বাস্তবিক এই উভয়ই অভিন্ন পদার্থ।] অতএব এখন জানা গেল যে আমাদের অন্তরেঅন্তরে যে চৈতন্য, উপলব্ধি বা প্রকাশ বা জ্ঞান আছে তাহা কখনই উৎপন্ন, বিনষ্ট ও পরিবর্ত্তিত হয় না। তাহা নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব। ইহাও মনে রাখা উচিত যে, এই চৈতন্য পদার্থই অনন্ত, অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডব্যাপক, এক ও অদ্বিতীয় বস্তু। এবং ইহারই নাম, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, পুরুষ ইত্যাদি।

আজকাল অনেক রকম নূতন মত আছে, তাহাতে জ্ঞান বিষয়ে নানাপ্রকার সিদ্ধান্ত আছে। কেহ স্নায়ুর ক্রিয়াবিশেষকেই ‘জ্ঞান’ বলিয়া থাকেন, কেহ বা মস্তিষ্কের ক্রিয়াবিশেষকেই জ্ঞান বলেন, আর যিনি একটু অধিক দূর অগ্রসর, তিনি মনের বা অন্তঃকরণের ক্রিয়াবিশেষকে জ্ঞান বলিয়া থাকেন। ঐ সকল মত যদিও অন্ধদৃষ্টি-প্রসূতই বটে, তথাপি সম্পূর্ণ অমূলক নহে। অর্থাৎ আমরা যে পদার্থটীকে জ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া আসিলাম, উহাঁরা তাহাকে ‘জ্ঞান’ বলেন না, তাহা হৃদয়ঙ্গম বা অনুভব করিতেও পারেন না, তাহার অস্তিত্বও বুঝেন না। কিন্তু বাহ্য বা আন্তরিক বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইয়া যে আমাদের ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ বা তদাকারাকারিত্ব হয়, তাহাকেই জ্ঞান বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। অবশ্যই, তাহাতে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া, স্নায়ুর ক্রিয়া, মস্তিষ্কের ক্রিয়া এবং অন্তঃকরণের ক্রিয়া, এতৎ সমস্তই আবশ্যক হয়, সুতরাং তাহাই জ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইন্দ্রিয়ও অন্ধ, স্নায়ুর ক্রিয়াও অন্ধ, মস্তিষ্কের ক্রিয়াও অন্ধ এবং অন্তঃকরণও অন্ধ, তাহার ক্রিয়াও অন্ধ, সুতরাং উহার কিছুই জ্ঞান নহে। প্রকাশ পদার্থের সহিত সম্বন্ধ হইয়া যে অন্তঃকরণ প্রকাশ প্রাপ্ত হইতেছে, সেই প্রকাশের নামই ‘জ্ঞান,’ উপলব্ধি বা চৈতন্য ইহাই জ্ঞানের স্বরূপ। জ্ঞানের স্বরূপ বুঝিলে এখন আর কি জিজ্ঞাস্য আছে বল।

শিষ্য। চিন্তা, স্মৃতি এবং স্বপ্ন কি প্রকারে হয়, তদ্বিষয়টি অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

আচার্য্য। কোন বস্তু প্রত্যক্ষানুভব করার কালেও আমাদের অন্তঃকরণের যে যেরূপ ক্রিয়া হইয়া থাকে, চিন্তা, স্মৃতি ও স্বপ্নেও সেইরূপ ঘটনাই হয়, কেবল ইন্দ্রিয় এবং স্নায়ুর মধ্যে যে যে রূপ ক্রিয়ার কথা বলা হইয়াছে, তাহাই হয় না, এবং জ্ঞেয় বিষয়ের সহিতও কোন প্রকার সম্বন্ধ হয় না, এই মাত্র বিশেষ, তদ্ব্যতীত আর সমস্তই সমান।

আমাদের অন্তঃকরণাদির মধ্যে যে কোন প্রকার ক্রিয়া হয়, তাহাই সংস্কারাবস্থায় থাকে এবং কোন কারণে উত্তেজিত হইয়া আবার পূর্ব্বের মত ক্রিয়া করে, ইহা সকলেই নির্ব্বিরোধে স্বীকার করেন। আমাদের চিন্তা স্মৃতি প্রভৃতিও ঐরূপ ঘটনা বিশেষ মাত্র ;—কোন বস্তু দর্শন স্পর্শনাদি কালে যে ক্রিয়া হয় তাহা সংস্কারাবস্থায় থাকে, পরে আবার সময় সময় কোন কারণের সাহায্যে সেই ক্রিয়ার উত্তেজনা হয়, সুতরাং ঐ সকল বস্তুর জ্ঞান হইয়া থাকে। ইহাই চিন্তা, স্মৃতি, এবং স্বপ্ন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকের কিছু কিছু ভেদও আছে, তাহা বিস্তারের আবশ্যক নাই। কি কি কারণে ঐ সকল সংস্কারের পুনঃ পুনঃ বিকাশ হয় তাহাও বলার প্রয়োজন নাই। কোন বস্তুর মানসিক প্রত্যক্ষ করাকেও চিন্তা বলা যায়। পূর্ব্বে যে একরূপ মানসিক প্রত্যক্ষ (২৮২পৃ ৩প) বলিয়াছি তাহাও চিন্তা, আবার আর একরূপ মানসিক প্রত্যক্ষ আছে তাহাকে চিন্তা বলিতে পারা যায়।

অন্যরূপ মানসিক প্রত্যক্ষ।

শিষ্য। আর একরূপ মানসিক প্রত্যক্ষ কিরূপ তাহা অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

আচার্য্য। বাহ্যবিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইয়া যেরূপ তদাকারতা হয়, তৎপর জ্ঞান হয়। দেহের অভ্যন্তরেও কত কত জিনিষ আছে, দেহের ভৌতিক পদার্থ আছে, তাহাদের আবার নানাপ্রকার গুণ, শক্তি ও

ধর্ম্ম আছে, তাহারসহিত মনের সম্বন্ধ হইয়া তদাকারে অকারিত হয়, তৎপর তাহার জ্ঞান হয়। তাহার নামও মানসিক প্রত্যক্ষ। এই মানসিক প্রত্যক্ষও আমাদের সর্ব্বদাই হইতেছে, কারণ দেহীয় ভূত ভৌতিক পদার্থ বা তাহাদের গুণাদির সহিত সর্ব্বদাই আমাদের সম্বন্ধ আছে, সম্বন্ধ থাকিলেই মনের তদাকারতা হইবে, তদাকারতা হইলেই তাহার জ্ঞান হইল। কিন্তু কোন বাহ্য বিষয়ের যখন জ্ঞান না হয়, তখনই এইরূপ মানসিক প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। আবার ঐ জ্ঞানও বিশেষ লক্ষ্য না করিলে গ্রাহে আইসে না। এবং বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়া শারীরিক ভূত ভৌতিক পদার্থও তাহার গুণের মানসিক প্রত্যক্ষ করাকেই চিন্তা বলে। ইহা কিন্তু সমাধি অবস্থায়ই হইয়া থাকে।

চৈতন্যের অনুভূতি কি পদার্থ?

শিষ্য। আমাদের আন্তরিক বুদ্ধি, মন ও সুখ দুঃখ ভক্ত্যাদির অনুভব কি তাহা পূর্ব্বে বুঝিয়াছি, এখন ঘটপটাদি বাহ্য বিষয়ের অনুভব কি তাহাও বুঝিলাম, কিন্তু আমাদের যে চৈতন্যের অনুভূতিটি সর্ব্বদাই হইতেছে, আমরা যে চেতন, তাহাতো সর্ব্বদাই অনুভব করিয়া থাকি, সেই অনুভবটি কি পদার্থ, অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

আচার্য্য। এত বলিয়াও যে চৈতন্যের অনুভূতিটি কি তাহা বলিতে হইবে, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই, তাই উহা বলিনাই। যাহা হউক, তুমিযখন বুঝিতে পার নাই তখন বলাই আবশ্যক। চৈতন্য নিজেই স্বপ্রকাশ পদার্থ সুতরাং তাঁহার সহিত মাখামাখী হয় বলিয়া বুদ্ধি, অভিমান মন, ও ইন্দ্রিয়াদি অন্ধ, জড় পদার্থগুলি প্রকাশ পাইতেছে; সেই প্রকাশ পাওয়া অবস্থাকেই উহাদের উপলব্ধি বা জ্ঞান বলা যায়, ইহা অতি বিস্তার মতেই বলা হইয়াছে, এখন সেই চৈতন্যের উপলব্ধি আর অতিরিক্ত কি পদার্থ হইবে? তাঁহার সেই প্রকাশ অবস্থার নামই চৈতন্যের উপলব্ধি বা চৈতন্যের জ্ঞান। অর্থাৎ ঐ চৈতন্যর এবং তাঁহার প্রকাশ বা উপলব্ধি ইহা একই পদার্থ এবং চৈতন্যের উপলব্ধি আর

অন্তঃকরণ বা অন্যান্য বিষয়ের উপলব্ধিও সেই একই পদার্থ; এক উপলব্ধিরই প্রকাশ্য বিষয়ের কেবল তারতম্য মাত্র। স্বপ্রকাশ সূর্য্যের সহিত সম্বন্ধ হইয়া যখন পৃথিবী প্রকাশ পাইতে থাকে, তখন যেমন সূর্য্যালোকের প্রকাশ আর পৃথিবীর প্রকাশ এতদুভয়ের ভিন্নতা করা যায় না, একই প্রকাশ পদার্থ, আলোকেরও প্রকাশ, পৃথিবীরও প্রকাশ। কিন্তু প্রকাশ্য বস্তু—আলোক, আর পৃথিবী, উভয়েই সম্পূর্ণ ভিন্ন। তখন আলোক যে প্রকাশিত হইতেছে না, তাহা বলা যায় না; আবার পৃথিবীও যে প্রকাশ পাইতেছে না, তাহাও বলা যায় না; সুতরাং আলোক এবং পৃথিবী উভয়েই প্রকাশ্য। কিন্তু বিশেষ এই যে আলোক নিজেই প্রকাশস্বরূপ, সুতরাং সে নিজ হইতেই প্রকাশ পাইতেছে. অতএব সে নিজেই নিজের প্রকাশ্য। আর অন্ধকারময়ী পৃথিবী আলোকের অধীনে প্রকাশ পাইতেছে, সুতরাং পৃথিবীর প্রকাশক আলোক, এবং পৃথিবী তাহার প্রকাশ্য। এজন্য বাহ্য জগতে 'প্রকাশ্য' বলিলে, পৃথিব্যাদি বস্তুই বুঝায়, আর 'প্রকাশক' বলিলে আলোকই বুঝায়। আবার আরও এক প্রকার ভেদ আছে,—আলোকের অধীনেই পৃথিবীর প্রকাশ হয় বলিয়া, এবং আলোক আর পৃথিবীর সম্বন্ধাধীন, স্বপ্রকাশক আলোকের প্রকাশই পৃথিবীর প্রকাশ স্বরূপে গ্রাহ্য হয় বলিয়া, সূর্য্যকেই দুই প্রকাশের আশ্রয় বলিতে হইবে; "পৃথিবী সূর্য্যে প্রকাশ পাইতেছেন" এইরূপই বলিতে হইবে; এবং "সূর্য্য পৃথিবীকে সঙ্গে করিয়া প্রকাশিত আছেন" ইহাও বলিতে হইবে। তাহা হইলেই সূর্য্যকে, পৃথিবী এবং তদীয় প্রকাশের আধার বা অধিকরণ বলিয়া গণ্য করা হইল; আর পৃথিবী ও তদীয় প্রকাশকে, সূর্য্যের আশ্রিত বা আধেয় বলিয়া ব্যবহার করা হইল। সেইরূপ চৈতন্য আর অন্তঃকরণাদি বিষয়েও জানিবে। স্বপ্রকাশ চৈতন্যের সহিত মাখামাখী সম্বন্ধ হইয়া যে আমাদের বুদ্ধি প্রভৃতি প্রকাশ পাইতেছে সেই প্রকাশ, আর চৈতন্যের প্রকাশকে ভিন্ন করা যায় না। চৈতন্যের প্রকাশও যাহা বুদ্ধি প্রভৃতির প্রকাশও তাহাই। একই প্রকাশ পদার্থ, চৈতন্যেরও প্রকাশ, বুদ্ধিরও প্রকাশ,—"বুদ্ধিবৃত্ত্যবিশিষ্টাহি জ্ঞান বৃত্তিঃ"। কিন্তু প্রকাশ্য বস্তু—চৈতন্য আর বুদ্ধ্যাদি জড় পদার্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন। যদিও চৈতন্যেরও প্রকাশ হইতেছে,

বুদ্ধ্যাদি জড় "আমির" ও প্রকাশ হইতেছে, সুতরাং এই দৃষ্টিতে উভয়েই প্রকাশ্য সত্য। কিন্তু তথাপি তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, চৈতন্য নাকি নিজেই স্বপ্রকাশ স্বরূপ, তাই নিজ হইতেই নিজে প্রকাশ পাইতেছেন, সুতরাং নিজেই নিজের প্রকাশ্য ও প্রকাশক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। আর বুদ্ধি প্রভৃতি অন্ধ জড় পদার্থগুলি চৈতন্যের অধীনে প্রকাশ পাইতেছে, সুতরাং বুদ্ধ্যাদি অন্ধ পদার্থগুলি কেবলই প্রকাশ্য, উহারা চৈতন্যের প্রকাশ্য; এবং চৈতন্য উহাদের প্রকাশক। এজন্য জ্ঞানের ভাবে, 'প্রকাশ' কথা বলিলে বুদ্ধ্যাদি অন্ধ পদার্থকেই সর্ব্বদা প্রকাশ্য বা জ্ঞেয় বলিয়া ব্যবহার করা হয়, আর চৈতন্যকে প্রকাশক বা জ্ঞাতা বলিয়া ব্যবহার হইয়া থাকে। চৈতন্যের অধীনতায়ই বুদ্ধ্যাদির প্রকাশ হয় বলিয়া, এবং চৈতন্য ও বুদ্ধ্যাদির সম্বন্ধাধীন, স্বপ্রকাশ চৈতন্যের প্রকাশই বুদ্ধ্যাদির প্রকাশরূপে পরিগণিত হয় বলিয়া, চৈতন্যকেই এই প্রকাশের আশ্রয় বলিতে হইবে। 'বুদ্ধ্যাদি জড়পদার্থগুলি চৈতন্যে প্রকাশ পাইতেছেন' এইরূপ বলিতে হয়. কেবল বলা নয়, আমাদের অভ্যন্তরে যে সর্ব্বদা একরূপ প্রকাশ হইতেছে, তাহা সত্যসত্যই এইরূপ আধারাধেয় ভাবে অনুভূত হয়, আমাদের বুদ্ধ্যাদি সকল প্রকার জড় বস্তুর উপলব্ধিটা যেন চৈতন্যের আশ্রয়ে রহিয়াছে, চৈতন্যে গিয়াই উহার পর্য্যবসান হইতেছে এইরূপ অনুভূতি হয়। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা" দর্শন বলিতেছেন "দ্রষ্টা দৃশি মাত্র" * *। এই কারণেই 'বুদ্ধ্যাদি সমস্তকে সঙ্গে করিয়া আমাদের চৈতন্য প্রকাশ পাইতেছেন' এইরূপ ব্যবহার হয়, অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদিকে তাহার আশ্রিত বা আধেয় ভাবে উপলব্ধি ও ব্যবহার হইয়া থাকে। এভাবেতে চৈতন্যই আমাদের মুখ্যতম "আমি" আর বুদ্ধ্যাদি অন্য জড় পদার্থগুলি গৌণ "আমি" হইতে পারে। অর্থাৎ আমাদের "আমির" মধ্যে চৈতন্যই বিশেষ্য (পৃ২৮৫ প ৮) এবং বুদ্ধ্যাদি জড় পদার্থগুলি বিশেষণাংশে (২৮৫ পৃ) প্রতীত হইয়া থাকে। তাই চৈতন্যই (আত্মাই) জ্ঞানবান্, চৈতন্যই বুদ্ধিমান্, চৈতন্যই অভিমানী, চৈতন্যই মনস্বী, চৈতন্যই প্রাণী ইত্যাদি ব্যবহার হয়। আবার বুদ্ধ্যাদিই যখন বিশেষণ ভাবে প্রতীত হইল তখন, উহারা সুখ দুঃখ বা বাহ্য ঘট পটাদির যে যে আকারে যখন পরিণত

হয়, তাহাও ঐ চৈতন্যের উপরেই ভাসে, চৈতন্যই সুখী, চৈতন্যই দুঃখী, চৈতন্যই ভক্তিমান্ ইত্যাদি প্রতীতি ও ব্যবহার হয়। "তস্মাৎ তৎসংযোগাদ চেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গং গুণকর্তৃত্বেপি তথা কর্ত্তেবভবত্যুদাসীনঃ" (সাঙ্খ্য) ভাবার্থ—চৈতন্য এবং বুদ্ধি প্রভৃতির সংযোগ হইয়া পরস্পরের ধর্ম্ম পরস্পরে আরোপিত হইয়া উভয়েই যেন এক হইয়া যায় কারণ চৈতন্যের প্রকাশ বা উপলব্ধি আর বুদ্ধ্যাদি অন্তঃকরণের প্রকাশ বা উপলব্ধি যখন একই পদার্থ হইল, তখন বাস্তবিক পক্ষে চৈতন্য আর অন্তঃকরণ বিভিন্ন বস্তু হইলেও উহা পৃথক্ করা যায় না। কেননা, পৃথক্ পৃথক্ উপলব্ধি না হইলে কোন প্রকার বস্তুই পৃথক্ করা যায় না, পৃথক্ উপলব্ধিই বিষয়ের পৃথক্ করার কারণ হইয়া থাকে। তোমার সুখানুভূতি আর দুঃখানুভূতি, যদি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে না হইয়া এক ভাবেই হইত, তবে সুখ দুঃখের ভেদ করিতে পারিতে না। কিন্তু তোমার সুখ যখন প্রকাশ পায়, তখন দুঃখ প্রকাশ পায় না, দুঃখ যখন প্রকাশ পায়, তখন সুখ প্রকাশ পায় না, উহারা পরস্পর পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পাইয়া থাকে। তাই তুমি সুখানুভব আর দুঃখানুভবকে ভিন্ন করিয়া লইয়া, সুখ দুঃখেরও পার্থক্য ধারণা করিয়া থাক। কিন্তু সুখ আর দুঃখ ঠিক এক ক্ষণেই পরিস্ফুরিত হইয়া অনুভূত হইলে, তবে আর তাহাদের পার্থক্য অনুভূতি হইত না। কারণ পৃথক পৃথক বা এক একটী করিয়া উপলব্ধি, আর পার্থক্যে অনুভূতি, ইহা একই কথা। কিন্তু তোমার যখন ঠিক এক সময়ই উহাদের উভয়ের বিকাশ হইয়া অনুভূতি হইবে তখন আর পৃথক পৃথক্ করিয়া হইল কৈ? অতএব ওরূপ হইলে, অম্ল-মিষ্ট রসানুভূতির ন্যায় অভিন্ন ভাবেই একটা উপলব্ধি হইবে। এখানে মনে করিও না যে অম্ল মিষ্ট রসও তোমার ভিন্ন ভিন্ন করিয়াই অনুভূত হয়। কিন্তু অন্য সময়ে তুমি কেবল অম্ল রস আর কেবল মিষ্টরস পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অনুভূতি করিয়াছ বলিয়াই অম্ল-মিষ্ট রসের আস্বাদ কালে তুমি বুঝিতে পার যে "ইহাতে, অম্ল রস আর মিষ্ট রস এইদুইই আছে।" যদি তুমি ঐরূপ পৃথক্ ভাবে কখনও অনুভূতি না করিতে, তবে অম্ল-মিষ্ট রসকে একটি মাত্র রস বলিয়াই বুঝিতে হইত। সুখ দুঃখেরও বিমিশ্রণানুভব

কালে ঐরূপ হইয়া থাকে। তোমার অন্তঃকরণের মধ্যে পরিমাণের ন্যূন্যাধিক্যানুসারে সুখ দুঃখ মোহ এই তিনটি সর্ব্বদাই আছে, কারণ উহা সত্ব, রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক পদার্থ (ইহা অনেকবার বলিয়াছি) কিন্তু তাহা কি তুমি ভিন্ন ভিন্ন করিয়া অনুভব করিতেছ? সর্ব্বদা যে তোমার "আমির" অনুভব হইতেছে তাহার মধ্যে কি তুমি সুখ, দুঃখ বা মোহ কিছু গণ্য করিতে পার? তাহা কখনই না। উহা তিনের বিমিশ্রণে একটা কিম্ভূত কিমাকার অনুভূতি হইতেছে। কিন্তু বাস্তবিক তোমার "আমির" জড়াংশটার মধ্যে ত্রিগুণও আছে, সুখ দুঃখ মোহও আছে। সেইরূপ, তোমার "আমির" জড়াংশ (বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণ) আর চৈতন্যাংশেরও বিমিশ্রণ হইয়া, সর্ব্বদাএক সময়ে এক অনুভূতি বা প্রকাশ হইতেছে বলিয়া উহাদের পার্থক্য বুঝিবার জো নাই। প্রকাশ-স্বরূপ চৈতন্য আর অন্ধ জড় বুদ্ধি প্রভৃতির একভাবে একতায়ই প্রকাশ হইতেছে; চৈতন্যও যে পদার্থ এবং বুদ্ধি প্রভৃতি জড়পদার্থও সেই একই পদার্থ বলিয়া অনুভব করিতেছ। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—"যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেব নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপং। যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথ নু মীমাংস্যমেব তে মন্যে বিদিতম্" (তলবকার উপনিষৎ) 'তুমি যদি মনে কর যে "আমি বিশুদ্ধ স্বপ্রকাশ স্বরূপ চৈতন্য পদার্থের উপলব্ধি করি" তবে তাহা তোমারি ভ্রম, কারণ তুমি যাহা অনুভব করিতেছ তাহা বিশুদ্ধ ব্রহ্মের রূপ নহে, উহা তাঁহার বিকৃত রূপ। তুমি যে সর্ব্বদা তোমার বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়াদির সহিত বিমিশ্রিত ভাবে চৈতন্যের উপলব্ধি করিতেছ তাহা বুদ্ধ্যাদি জড়পদার্থের সহিত অভিন্ন ভাবে উপলব্ধ হয় অতএব উহা চৈতন্যের প্রকৃত অবস্থা নহে। অতএব আমি মনে করি, প্রকৃত চৈতন্য বা ব্রহ্ম বা স্বপ্রকাশপদার্থ বিষয়ে তোমার অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য।"* *

এই যে আমাদের "আমির" জড়াংশের সহিত (বুদ্ধি মন প্রভৃতির সহিত) মাখাইয়া চৈতন্যের অনুভূতি বা প্রকাশভাবটি হইতেছে ইহারই নাম "মলিনাত্মজ্ঞান" যাহা পূর্ব্বে (৮৮পৃ ২৩প) অতি বিস্তার মতে বুঝাইয়াছি; কারণ ইহাতে চৈতন্যপদার্থ, আপনস্বরূপে প্রকাশিত না হইয়া, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে বিমিশ্রিত হইয়া, তাহাদের সহিত অভিন্নভাবে, সুতরাং

মলিনবেশে, প্রকাশিত হয়েন। যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের বুদ্ধি, মন প্রভৃতির অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিনই চৈতন্যের সহিত ঐরূপ বিমিশ্রণও থাকিবে, সুতরাং ততদিনই আমরা মলিন চৈতন্যের অর্থাৎ জড়পদার্থের সহিত অভিন্নভাবাপন্ন চৈতন্যেরই অনুভব করিব। যখন কোন বাহিরের বিষয়ের জ্ঞান হইবে তখনও এই মলিনচৈতন্যের উপলব্ধি, আবার যখন বাহ্যজ্ঞান বিদূরিত হইয়া অন্তরে অন্তরে মন, বুদ্ধ্যাদির অনুভূতি হইবে, তখনও জড় অন্তঃকরণের সঙ্গে সঙ্গে মলিনচৈতন্যেরই প্রকাশ হইবে। তবে যখন প্রগাঢ় সমাধি সাধনের দ্বারা ইন্দ্রিয়, মন, অভিমান, বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্তের বিনাশ বা বিলয় হইবে অর্থাৎ এইক্ষণে আমাদের যেরূপ "আমিত্ব" আছে তাহা বিনষ্ট হইয়া যাইবে, তখন, সুতরাং আমার চৈতন্যাংশের সহিত জড়াংশের বিমিশ্রণ থাকিল না, অতএব তখন কেবল চৈতন্যেরই প্রকাশ হইতে থাকিবে। তাহাই "কেবলাত্মজ্ঞান" তখন জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, এই তিনই এক হইয়া যাইবে, তখন আমিত্ব, তুমিত্ব থাকিবে না। এখন বলা বাহুল্য যে যাঁহারা কথায় কথায় চক্ষু মুদিয়াই ব্রহ্ম দেখিতে পান, তাহা কেবল তাঁহাদের ব্রহ্মের বিদ্রূপ করা বা ক্রীড়াবিশেষ মাত্র। সুবুদ্ধি লোকের পক্ষে উহা বালকক্রীড়াবৎ হাস্যাস্পদ বিষয়। জ্ঞানের প্রণালী শুনিলে, এখন আর একটি কথা শুন। এ কথাগুলি শুনিলে কেবল তোমার এখনকার উপকার হইবে তাহা নহে, এ কথা শত শত স্থানে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইবে; এ নিমিত্ত এত বিস্তার করা যাইতেছে।—

ইন্দ্রিয়শক্তি একই পদার্থ।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা, এবং ত্বক্ এই পাঁচটি দ্বারের দ্বারা আমরা বাহ্য বিষয়ের অনুভব করিয়া থাকি, এই পাঁচ স্থানের স্নায়ুর দ্বারা আত্মার শক্তি প্রবাহিত হইয়া আসিয়া একএক বিষয়ের উপলব্ধি জন্মায়, অর্থাৎ আত্মার শক্তি চাক্ষুষস্নায়ুর দ্বারা আসিয়া নীল পীতাদি বর্ণের জ্ঞান জন্মায়, কর্ণের স্নায়ুর দ্বারা প্রবাহিত হইয়া আসিয়া শব্দের

জ্ঞান, রসনার স্নায়ুর দ্বারা আসিয়া রসের জ্ঞান, নাসিকার স্নায়ুর দ্বারা আসিয়া গন্ধের জ্ঞান এবং সর্ব্বদেহব্যাপক স্নায়ুর দ্বারা আসিয়া শীতোষ্ণাদিস্পর্শের জ্ঞান জন্মায়; ইহা সবিশেষ জানা গেল; কিন্তু এই যে পাঁচপ্রকার স্নায়ু-দ্বার দিয়া ইন্দ্রিয়শক্তি আইসে, ইহা কি পৃথক্ পৃথক্ পাঁচটি শক্তি, অথবা একটিমাত্র শক্তি, তাহা জানা আবশ্যক।

আত্মার জ্ঞানের শক্তি যাহা স্নায়ুপথে প্রবাহিত হইয়া আসিয়া জ্ঞানকার্য্য নিষ্পন্ন করে, তাহা বাস্তবিক পাঁচপ্রকার নহে, তাহা একটিমাত্র শক্তি, একই শক্তি নানা স্নায়ুর দ্বারা প্রবাহিত হইয়া, নানা বিষয়ের জ্ঞান সম্পাদন করে, একই শক্তি চক্ষুর স্নায়ুর দ্বারা প্রবাহিত হইয়া আসিলে চাক্ষুষ জ্ঞান জন্মায়, কর্ণের স্নায়ুর দ্বারা প্রবাহিত হইয়া আসিলে শব্দের জ্ঞান, রসনার স্নায়ুর দ্বারা প্রবাহিত হইয়া আসিলে রসের জ্ঞান, ঘ্রাণের স্নায়ুর দ্বারা প্রবাহিত হইয়া আসিলে গন্ধের জ্ঞান, সর্ব্বশরীরের চর্ম্মান্তব্যাপক স্নায়ুমণ্ডলের দ্বারা প্রবাহিত হইয়া আসিলে স্পর্শের জ্ঞান জন্মায়। উত্তপ্তজলীয়বাষ্পের (ষ্টীমের) শক্তি যেমন এক হইয়াও নানাবিধ যন্ত্রের দ্বারা বিনিযুক্ত হইয়া নানাপ্রকার কার্য্যসাধন করে; এই জ্ঞানের শক্তিও সেইরূপই বুঝিবে। এই নিমিত্ত ঠিক এক সময়ে দুটি বিষয় জ্ঞান করা হয় না।

এক সময়ে দুটি জ্ঞান না হওয়ার কারণ।

শিষ্য। কি কারণে এক সময়ে দুটি বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে না, ইহা আরও বিশদ করিয়া বলুন।

আচার্য্য। মনে কর, তুমি বিশেষ আগ্রহ সহকারে এক দৃষ্টে কোন একটি বস্তু দর্শন করিতেছ, তোমার জ্ঞানশক্তি চাক্ষুষস্নায়ুর দ্বারা প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে এবং চক্ষু যন্ত্রে নিপতিত—ঐ দৃশ্য বস্তুর আকৃতিটির জ্ঞান জন্মাইয়াদিতেছে। যতক্ষণ তোমার জ্ঞানশক্তি চক্ষুর স্নায়ুর দ্বারা আসিতেছে; ততক্ষণ কর্ণাদির স্নায়ুর দ্বারা অবশ্যই যাইতেছেন না; একই ব্যক্তি ঠিক একই সময়ে দুই পথে যাইতে

পারে না, ইহা স্বতঃ সিদ্ধ। সুতরাং এই সময়ে সন্নিহিত লোক জনের কথাবার্ত্তা তোমার কর্ণকুহরে প্রবেশ পূর্ব্বক আঘাত করিলেও তুমি তাহা শুনিতেছনা। কারণ তোমার শক্তি সে দিকে নাই, সুতরাং তোমাকে ঐ কথাবার্ত্তার শব্দ গ্রহণ করিয়া দিতেছে না। পরে যখন ঐ কথবার্ত্তার প্রবল তাড়নায় তোমার জ্ঞানশক্তি চাক্ষুষ স্নায়ু পরিত্যাগ করিয়া কর্ণের স্নায়ুর দ্বারা অগ্রসর হইবে, তখন আবার এই দর্শন কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তোমার ঐ শব্দের জ্ঞানই হইতে থাকিবে। অতএব এক সময়ে দুটি বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে না।

শিষ্য। অনেক সময় বোধ হয় যেন ঠিক একই সময়ে দুই তিনটি বিষয়ের জ্ঞান হইতেছে; যখন গান শুনিতে বসা যায়, তখন, গান শুনা এবং গায়কের আকৃতি দর্শন করা এতদুভয় এক সময়েই হইয়া থাকে। আবার নিজের গায়ে জল সংলগ্ন হইলে, ঐ জলের দর্শন আর তাহার শীতল স্পর্শের অনুভবও একসময়েই হইয়া থাকে; এইরূপ আরও শত সহস্র দৃষ্টান্ত আছে; - ইহা কিরূপে হয়?।

আচার্য্য। তোমার ভ্রান্তি হইয়াছে, বস্তুবিক ওখানেও ঠিক একই সময়ে গান শ্রবণ ও গায়কের দর্শন ক্রিয়া হয় না, ওখানেও একটি জ্ঞানের পরেই আর একটি হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা বুঝা কিছু কষ্টকর। আত্মার শক্তির গতি অত্যন্ত দ্রুত, তড়িৎ ও আলোক শক্তির অপেক্ষায় ও দ্রুত; কেবল গতিই দ্রুত নহে, ইহা অত্যন্ত অস্থিরও বটে। আত্মার শক্তি প্রতিক্ষণে সহস্র সহস্রবার গতায়াত করিয়া থাকে, ইহা অতি সূক্ষ্ম সময়ের মধ্যেও চক্ষুর স্নায়ুর দ্বারা সহস্র বার আসিতে যাইতে পারে, আবার কর্ণের স্নায়ুর দ্বারাও সহস্র বার গতায়াত করিতে পারে, এক বস্তু দেখিতে দেখিতেই সহস্রবার অন্যদিকে অন্য দ্বারে গমনাগমন করে, কিন্তু সেই সময়টি অতীব দুর্লক্ষ; এজন্য বোধ হয় যেন একই সময়ে দুই তিন বিষয়ের জ্ঞান করিতেছি। গান শ্রবণ করিতে বসিয়াছ, এখন প্রতি সূক্ষ্ম ক্ষণের মধ্যে তোমার জ্ঞানশক্তি একবার গানের দিকে আসিতেছে, একবার গায়কের আকৃতির দিকে যাইতেছে; ইহার বিচ্ছেদ

স্থল নিতান্ত সূক্ষ্ম; সুতরাং বোধ হইতেছে, যেন ধারাবাহী-ক্রমে একই সময়ে গানও শুনিতেছ গায়ককেও দেখিতেছ, বাস্তবিক তাহা নিতান্ত অসম্ভব—নিতান্ত মিথ্যা।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের অবস্থাগত ভেদ।

এই যে পঞ্চেন্দ্রিয়ের একতা বিষয় বলিলাম, তাহা ইহাদের স্বরূপগত; অর্থাৎ ইহাদের পাঁচেরই যে স্বরূপের একতা আছে, তাহাই লক্ষ্য করিয়া এইরূপ অভেদ নির্দ্দেশ করা হইল। কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকেরই অবস্থা-গত বিলক্ষণ পার্থক্য বা ভেদ আছে। মনে কর, স্থূল জলের মধ্যে যে যে পদার্থ আছে, স্থূল বায়ুর মধ্যেও প্রায় সেই সেই পদার্থ আছে; কিন্তু ঐ মূল পদার্থের বিমিশ্রণে, ভাগের তারতম্য আছে; তথাপি ঐ মূল পদার্থগুলি ধরিয়া জল এবং বায়ুকে স্বরূপতঃ এক জিনিষ বলিতে পারা যায়। আবার ঐ মূল পদার্থের ভাগের তারতম্য ক্রমে একটি জলাবস্থা গ্রহণ করিয়াছে, আর একটি বায়ু অবস্থা গ্রহণ করিয়াছে, সুতরাং এই অব-স্থার দিকে দৃষ্টি করিলে জল আর বায়ু অত্যন্ত ভিন্ন। ইন্দ্রিয় পঞ্চক সম্বন্ধেও এইরূপই বুঝিবে, ইন্দ্রিয় পঞ্চকও স্বরূপতঃ এক, আবার অবস্থা দ্বারা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চকও এইরূপ স্বরূপতঃ এক, আবার অবস্থাতঃ, পরস্পরে সম্পূর্ণ পৃথক্। এবং পূর্ব্বে যে ইন্দ্রিয়, প্রাণ, ও মন, অভিমান বুদ্ধি প্রভৃতিকে এক বলিয়া আসিয়াছি, তাহাও এইরূপ স্বরূপগত একতা লক্ষ্য করিয়া। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, অভিমান, এবং বুদ্ধি প্রভৃতি সকলেই এক, আবার নিজ নিজ অবস্থা দ্বারা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য। মূল সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিশক্তি বা ত্রিগুণ হইতেই বুদ্ধির বিকাশ, এবং অভিমান, মন ও ইন্দ্রিয়াদি সকলেই একমাত্র বুদ্ধির বিস্তৃতি অবস্থা মাত্র; এই হিসাবে সকলেই এক। কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আবার ঐ মূল উপাদান ত্রিগুণের ভাগ-তারতম্য থাকায়, ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ অবস্থা পৃথক্ পৃথক ব্যক্তি, বা আকৃতি এবং পৃথক্ পৃথক্ নাম। বুদ্ধিরই একটু বিস্তৃতি বা স্থূলাবস্থার নাম 'অভিমান' বটে,—কিন্তু মূল গুণত্রয়,

বুদ্ধিতে যেরূপ অংশ ক্রমে আছে, অভিমানে ঠিক সেইরূপে নাই। বুদ্ধিতে সত্ত্বগুণের অংশই কিছু অধিক, তদপেক্ষায় রজোগুণ কম, তদপেক্ষায় তমোগুণ কম, আবার অভিমানেতে এই তিনটাই প্রায় সমান-সমান। এইরূপ অভিমান ও মন, মন ও ইন্দ্রিয়, এবং ইন্দ্রিয়াদির মধ্যেও পরস্পর পার্থক্যের কারণ জানিবে। চক্ষুরিন্দ্রিয়ে যে গুণ যে অংশে আছে, শ্রবণেন্দ্রিয়ে সেই গুণ সেইরূপ ভাগে নাই, এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ে যে ভাবে আছে; রসনেন্দ্রিয়ে সে ভাবে নাই, সুতরাং অবস্থা দ্বারা সকলেই পৃথক্। দ্বিতীয়-পর্ব্বের প্রথমেই, সৃষ্টি-প্রকরণে এ বিষয় বিস্তার ও বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দিব। সমাধি প্রস্তাবের উপযোগী প্রসঙ্গাগতকথাগুলি এই খানেই সমাপ্ত করিলাম; ইতঃপর প্রস্তুত-বিষয়ে হস্তার্পণ করিব। ওঁ শ্রীসদাশিবঃ ওঁ॥

ইতি শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি কৃতায়াং ধর্ম্মব্যাখ্যায়াং ধর্ম্মসাধনে ধর্ম্মনিমিত্ত কারণ সমাধি-বর্ণনে বাহ্যজ্ঞান স্বরূপ নির্ণয়ং নাম চতুর্থ খণ্ডং সম্পূর্ণম্।

ওঁ

শ্রীসদাশিবঃ

শরণম্।

ধর্ম্মব্যাখ্যা

পঞ্চম খণ্ড।

সমাধি-প্রকরণ।

আত্ম-সমাধি।

সমাধির লক্ষণ।

আচার্য্য। এখন সমাধি সাধনের বিবরণ শ্রবণ কর। প্রথমে, সমাধি কাহাকে বলে, তদ্বিষয় জানা আবশ্যক। 'সমাধি' কথাটি যদিও, অষ্টাঙ্গ যোগ, বা যে কোন প্রকারে চিত্তবৃত্তির নিরোধঅর্থেই ব্যবহৃত হয়—"যোগঃ সমাধিঃ সচ সার্ব্বভৌমশ্চিত্তস্য ধর্ম্মঃ * *" (পা, দ, সূ ভাঃ) "যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ" (পা, দ, ২ সূ)। অতএব এই অর্থে সমাধি কথাটি বলিলে, যম, নিয়ম, আসন প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং বিশেষসমাধি, এই আটটিই বুঝিতে হয়। কিন্তু তথাপি ঐ বিশেষসমাধিই "সমাধি" শব্দের মুখ্যতম লক্ষ্য, আর যম নিয়মাদি, উহার গৌণ অর্থ। অনুষ্ঠান কালেও বিশেষ সমাধির উপকরণ বা সাহায্যকারক বলিয়াই অন্য সাতটিকে সমাধি মধ্যে ব্যবহার করা হইয়াছে। কারণ ক্রম-পরম্পরায় যম নিয়মাদির অনুষ্ঠান করিয়াই অবশেষে বিশেষ-সমাধির সাধন হইয়া থাকে।

অতএব প্রথম সেই বিশেষসমাধিরই লক্ষণাদি জানা উচিত; তৎপর, 'বিশেষসমাধি কি প্রকারে সাধন করিতে হয়' এই প্রকরণে যম নিয়মাদির বিবরণ করিব। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বিশেষসমাধির এই লক্ষণ করিয়াছেন,— "তদেবার্থ মাত্র নির্ভাসং স্বরূপ শূন্যমিব সমাধিঃ" "কোন বিষয় 'ধ্যান'

(১৫৬পৃ ১প) করিতে করিতে যখন এরূপ অবস্থা হয় যে, মনের নিজের অস্তিত্বটা যেন আর কিছুই অনুভূত হইতেছে না, কেবল সেই ধ্যেয় বিষয়েরই জ্ঞান হইতেছে; সেই প্রগাঢ়তম ধ্যানাবস্থার নামই সমাধি।” (পা, দ, ৩ পা, ৩ সূ)।

এখন জানা গেল যে পূর্ব্বে (১৪৩ পৃ ১৬ প অবধি) যে ধারণা, আর ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে, এই সমাধিও সেই জাতীয় জিনিষ; সেই জাতীয় কেন, ধারণা ধ্যান সমাধিকে এক পদার্থই বলা যাইতে পারে। এক চিন্তাই, এক অবস্থায় ধারণা, আর এক অবস্থায় ধ্যান, আর এক অবস্থায় সমাধি বলিয়া গণ্য। এজন্য, যোগ শাস্ত্রে এই তিনটিকেই এক সংজ্ঞায় ব্যবহার করেন; সেই সংজ্ঞাটিই “সংযম”। পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন “ত্রয়মেকত্র সংযমঃ” “একই বিষয়ে ক্রমপরম্পরা অনুষ্ঠিত ধারণা, ধ্যান, আর সমাধিকে একমাত্র ‘সংযম’ নামে ব্যবহার করা যায়। ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া যথাক্রমে ধারণা ধ্যান সমাধি করিলে ‘ঈশ্বরে সংযম করা বলা যায়।” (পা, দ, ৩ পা, ৪ সূ)। সংযম কথাটি আমরা ও বারম্বার ব্যবহার করিব; এই জন্য এই কথাটি বলিয়া রাখিলাম। আবার আর এক কথা,—ধ্যানেরই যদি প্রগাঢ়তম অবস্থা-বিশেষের নাম “সমাধি” হইল, এবং ধ্যানেরই পূর্ব্বতন অবস্থা “ধারণা” তবে ধারণা, ধ্যান বাদ দিয়া কেবল সমাধি কখনই হইতে পারে না। যেখানে সমাধি তাহারই পূর্ব্বে ধ্যান, ও ধারণা থাকিবে; প্রথম ধারণা হইবে, তৎপর ধ্যান, পরে আবার সেই ধ্যানই সমাধি অবস্থায় পরিণত হইবে। এজন্য শাস্ত্রে এই তিনকে একত্রিত করিয়াই ইহাদের ক্রিয়া প্রণালী প্রদর্শিত আছে, অর্থাৎ সর্ব্বত্রই “সংযমের” কার্য্য প্রণালী উপদিষ্ট আছে, কিন্তু কেবল সমাধির কার্য্যাদি কোনখানেই দর্শিত হয় নাই। তবে অবশ্যই, ঐ তিনের মধ্যে সমাধিই মুখ্যতম; কারণ সমাধিপর্য্যন্ত না হইলে, কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। অতএব সংযম কথাটিরও সমাধিই মুখ্যতম লক্ষ্য, এইজন্য এই প্রকরণে, সম্পূর্ণ সংযমের কথা থাকিলেও, ইহা ‘সমাধি প্রকরণ’ বলিয়া গণ্য।

সংযম বা ধারণা ধ্যান সমাধি, প্রথমে তিন প্রকারে বিভক্ত হইতে

পারে। (১) আত্ম-সংযম (২) ইতর-সংযম (৩) ঈশ্বর-সংযম। দেহের অভ্যন্তরে, অধ্যাত্ম জগতে যত প্রকার অবস্থাভেদ আছে, তাহাতে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি করার নাম "আত্ম-সংযম"। কোন বহিঃস্থিত বিষয়ে ধারণা, ধ্যান ও সমাধির নাম "ইতর-সংযম"। পরমেশ্বরে ধারণা, ধ্যান ও সমাধির নাম "ঈশ্বর-সংযম"। এই তিন প্রকার সংযমের দ্বারাই চিত্তের নিরোধ এবং নানাবিধ ধর্ম্মের বিকাশ হইতে পারে। কিন্তু পরম বিবেক, পরম বৈরাগ্য, পরম ঔদাসীন্য এবং আত্মজ্ঞানরূপ পরম ধর্ম্ম, কেবল আত্মসংযম আর ঈশ্বর-সংযমের দ্বারাই হয়; উহা ইতর সংযমের দ্বারা হয় না। অতএব ইতর সংযমের বিস্তৃত-ব্যাখ্যার তত আবশ্যক নাই, আমরা কেবল আত্মসংযম আর ঈশ্বর-সংযমেরই বিস্তৃত বিবরণ করিব। তন্মধ্যে আত্মসংযমসঙ্ক্ষিপ্ত, এজন্য তাহাই প্রথমে বলিব।

দেহ বিশিষ্ট জীবাত্মার, স্থূল ও সূক্ষ্মতা-ভেদে, অনেক প্রকার অবস্থা আছে। তাহার এক এক অবস্থায় এক এক ভাবে সংযম করিতে হয়। সুতরাং আলম্বনের ভেদে এক আত্ম-সংযমও নানা প্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকে।

শ্রুতি বলেন "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরম্মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্। সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতো ব্যক্ত মুত্তমম্।, অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষোব্যাপকো লিঙ্গ এবচ" "ইন্দ্রিয় অপেক্ষায় মন সূক্ষ্ম; মন অপেক্ষায় অভিমান সূক্ষ্ম, অভিমান অপেক্ষায় বুদ্ধি সূক্ষ্ম, বুদ্ধি অপেক্ষায় প্রকৃতি সূক্ষ্ম, এবং প্রকৃতি অপেক্ষায় সূক্ষ্মতর আত্মা, তিনি সর্ব্বব্যাপক এবং অলিঙ্গ, তাঁহার এমন কোন বিশেষণই নাই যদ্দ্বারা তাঁহাকে নির্দ্দেশ করা যায়।"

এই শ্রুতির দ্বারা দেহ বিশিষ্ট জীবের অবস্থা কএকটি জানা গেল, (অবশ্যই, ইহা মোটামুটী বিভাগ) এবং কোন্ অবস্থা হইতে কোন্ অবস্থা সূক্ষ্ম, বাহুল্যের তাহাও জানাগেল। এই সকল অবস্থা ভেদে সমাধিকে প্রথমে দুইভাগ করা হয় (১) সম্প্রজ্ঞাত, (২) অসম্প্রজ্ঞাত।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধির বিবরণ।

যে সমাধিতে কোনরূপ পদার্থের চিন্তা, বা অনুভূতি থাকে, তাহাকে 'সম্প্রজ্ঞাত সমাধি' বলে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, প্রথমে চারি ভাগে বিভক্ত, (১) সবিতর্ক (২) সবিচার (৩) সানন্দ (৪) অস্মিতামাত্র। "বিতর্ক বিচারানন্দাস্মিতানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ" (পা, দ, ১।১৭ সূ)।

সবিতর্কাদি সমাধির লক্ষণও এই সূত্রের ভাষ্যেই আছে—"বিতর্কঃ, চিত্তস্যালম্বনে স্থূলে আভোগঃ, সূক্ষ্মে বিচারঃ, আনন্দো হ্লাদঃ, ; একাত্মিকা সম্বিদস্মিতা"। তত্র প্রথম চতুষ্টয়ানুগতঃ সমাধিঃসবিতর্কঃ; দ্বিতীয়ো বিতর্ক বিকলঃ সবিচারঃ; তৃতীয়ো বিচার বিকলঃ সানন্দঃ; চতুর্থস্তদ্বিকলঃ অস্মিতামাত্র ইতি। সর্ব্বএতে সালম্বনাঃ সমাধয়ঃ।" "দেহ লক্ষ্য করিয়া সমাধি করিলে চিত্ত যখন দেহটি মাত্রই অনুভব করিতে থাকে, তাহার নাম 'বিতর্ক' অবস্থা। যে সমাধিতে এই বিতর্ক অবস্থা হয়, তাহার নাম "সবিতর্ক সমাধি।" তৎপর দেহের স্থূলাবস্থাটি বাদ দিয়া এই স্থূল ভূতেরই অতি সূক্ষ্মাবস্থা (পঞ্চতন্মাত্র) লক্ষ্য করিয়া সমাধি করিলে, যখন তাহার অনুভূতি হইতে থাকে, তখন 'বিচারাবস্থা' বলে, সেই অবস্থায় সমাধির নাম "সবিচার সমাধি।" তৎপর নানাবিধ ইন্দ্রিয়শক্তি এবং মনে সমাধি করিলে, তাহাদের অনুভূতি অবস্থাকে 'আনন্দ' অবস্থা বলে, সেই অবস্থায় সমাধির নাম "সানন্দ সমাধি"। পরে অভিমান ও বুদ্ধিতে সমাধি করিয়া, যখন অভিমান ও বুদ্ধির সহিত একত্বারূপে আত্মার অনুভূতি হয়, তাহার নাম 'অস্মিতাবস্থা' সেই অবস্থায় সমাধিকে "অস্মিতামাত্র সমাধি" কিম্বা "সাস্মিত সমাধি" বলে।

আবার আর এক কথা,—সমাধি কালে যখন এই স্থূল দেহটির অনুভব হইতে থাকে, তখন বহিঃস্থিত ঘট পটাদি কোন বস্তুরই কোন প্রকার জ্ঞান হয় না সত্য, কিন্তু দেহের অভ্যন্তরে বুদ্ধি অভিমান প্রভৃতি, জীবাত্মার যত প্রকার অবস্থা আছে, তৎসমস্তেরই অনুভূতি হয়, আবার দেহের সূক্ষ্মাবয়ব-পঞ্চতন্মাত্রাদিরও অনুভব হয়। কারণ, আমাদের "আমির" আকৃতিটি যখন যতটুকু বিস্তৃত হইবে, তখন ততটুকুই অনুভূত হইতে থাকিবে। কেননা, চৈতন্যের সহযোগে আমাদের "আমির"

প্রকাশাবস্থা বিশেষকেই জ্ঞান বা উপলব্ধি বা অনুভূতি বলা হইয়াছে। চৈতন্যের সহিতও ঐরূপ মাখামাখী ভাবটি সর্ব্বদাই আছে ও থাকিবে। সুতরাং 'আমির' আকৃতি যখন যতটুকু বিস্তৃত হইবে, তখন ততটুকুই প্রকাশ পাইবে—অনুভব গোচর হইবে।

দেহে সমাধি কালে যখন দেহের উপলব্ধি হইতে থাকে, তখন দেহ পর্য্যন্তই আমাদের "আমিত্বের" বিস্তৃতি হয়—দেহটাও "আমির" মধ্যে গণ্য হইয়া যায়, নচেৎ দেহের অনুভব হওয়া অসম্ভব। কিন্তু এই সময়ে "আমির" মধ্যে 'বুদ্ধি' অভিমান, মন ও ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই থাকে, কেহই বিনষ্ট হইয়া যায় না। বুদ্ধ্যাদি শক্তিই বিস্তৃত হইয়া, দেহের সহিত মিশিয়া দেহকে "আমির" মধ্যে গণ্য করিয়া ফেলে। অতএব দেহের অনুভবের সময়ে, বুদ্ধ্যাদি সকলেরই একত্র সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতি হয়। তাহা হইলে সবিতর্ক সমাধির মধ্যে বিচার, আনন্দ, ও অস্মিতা এই তিন অবস্থাই নিহিত থাকিল। দেহানুভূতির সঙ্গে, পঞ্চতন্মাত্রেরও অনুভব হয়, এজন্য বিচারাবস্থা নিহিত থাকিল; ইন্দ্রিয় ও মনের অনুভূতি হয় বলিয়া আনন্দাবস্থাও থাকিল, আবার অভিমান ও বুদ্ধির অনুভব হয় বলিয়া, অস্মিতাবস্থাও থাকিল; উক্ত চারি প্রকার অবস্থাই মিশাইয়া একটি সবিতর্ক সমাধি অবস্থা হইল। কিন্তু তন্মধ্যে দেহানুভূতিই অধিকতর জ্বলন্ত-ভাবে বিকসিত থাকে, অন্য গুলির প্রতি লক্ষ্য অনেক কম থাকে; এ নিমিত্ত ইহাকে 'সবিতর্ক' নামই দত্ত হইয়াছে।

সবিচার সমাধিতেও, স্থূল দেহ হইতে আত্মার সম্বন্ধ বিশ্লথ হইয়া, তখন দেহাভ্যন্তরবর্ত্তি-তন্মাত্র অবধি ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি সকলেরই অনুভব থাকে। সুতরাং সবিচার সমাধির মধ্যে কেবল বিতর্কাবস্থাই থাকেনা, তদ্ব্যতীত বিচার, আনন্দ, অস্মিতা; এই তিনটিই থাকে। তন্মাত্রের অনুভব হয় বলিয়া বিচারাবস্থা, ইন্দ্রিয় মনের অনুভব হয় বলিয়া আনন্দাবস্থা, আর অভিমান বুদ্ধ্যাদির অনুভব হয় বলিয়া অস্মিতাবস্থা নিহিত থাকিবে; অবশ্যই এখানেও বিচারাবস্থারই প্রবলতা; এজন্য ইহাকে 'সবিচার' সংজ্ঞাই দেওয়া হয়।

সানন্দ সমাধিতে তন্মাত্রাদির সহিত ও আত্মার সম্বন্ধ বিশ্লথ হয়,

কিন্তু ইন্দ্রিয় অবধি আর সকলেরই সম্বন্ধ থাকে। সুতরাং তখন দেহ ও তন্মাত্রাদির অনুভূতি হয় না, কিন্তু ইন্দ্রিয়াদি সকলেরই অনুভূতি হয়। অতএব সানন্দ সমাধিতে, আনন্দ, অস্মিতা এই দুই অবস্থামাত্র নিহিত থাকে। কিন্তু আনন্দাবস্থার প্রবলতা নিবন্ধন, উহা 'সানন্দ সমাধি' বলিয়াই কথিত হইয়া থাকে। অস্মিতামাত্র-সমাধিতে কেবল মাত্র অস্মিতাই থাকে, তাহাতে আর কিছুই থাকে না। কারণ, তখন দেহ, তন্মাত্র, ইন্দ্রিয় ও মন হইতে, যোগীর "আমির" সম্বন্ধটি বিশ্লথ হয়। ইন্দ্রিয় মনের তখন অস্তিত্বই থাকে না, উহা অভিমানে লীন হইয়া যায়।

এই চারিপ্রকার সমাধিতেই দেহাদি বিষয়ের জ্ঞান বা অনুভব থাকে, এ নিমিত্ত উহাদের নাম সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, ইহাই উক্ত ভাষ্যের অর্থ"। এখন বোধ হয় বলা বাহুল্য যে, এই চতুর্ব্বিধ সমাধিতেই যে কেবলমাত্র দেহ আর তন্মাত্রাদি-জড়পদার্থেরই অনুভূতি হয়, তাহা নহে, তৎসঙ্গে বিমিশ্রিত বা একত্রিত হইয়া চৈতন্যস্বরূপ আত্মাও মলিনভাবে অনুভূত বা প্রকাশিত হয়েন। কারণ সেই স্বপ্রকাশ বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট হয় বলিয়াই যখন, ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি প্রকাশ পাইতেছে, তখন ইহারাই কেবল প্রকাশিত হয়, আর যিনি প্রকাশিত করিতেছেন, তিনি প্রকাশিত হয়েন না, তাহা কদাচ সম্ভবে না। তবে অবশ্যই তিনি ইহাদের সহিত একভাবাপন্ন হয়েন বলিয়া, কর্দ্দমাক্তজলের ন্যায় মলিনভাবে অনুভূত বা প্রকাশিত হয়েন। ইহা পূর্ব্বেই বিস্তাররূপে বলিয়াছি।

অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধির বিবরণ।

যে সমাধিতে কোন প্রকার ধ্যান, জ্ঞান চিন্তা না থাকে, তাহার নাম "অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি"; ইহাই ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন "বিরাম প্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কার শেষোঽন্যঃ" (পা ১৮ সূ) "সর্ব্ববৃত্তি প্রত্যস্ত সময়ে সংস্কার শেষো নিরোধশ্চিত্তস্য সমাধিরসম্প্রজ্ঞাতঃ, তস্য পরং বৈরাগ্যমুপায়ঃ। সালম্বনো হ্যভ্যাসস্তৎ সাধনায় ন কল্পতে; ইতি নির্ব্বস্তুক বিরাম প্রত্যয়ো আলম্বনী ক্রিয়তে, সচার্থশূন্যঃ, তদভ্যাস পূর্ব্বকং হি চিত্তং নিরালম্বনমভাব প্রাপ্তমিব ভবতি ইত্যেষ নির্ব্বীজঃ সমাধি রসম্প্রজ্ঞাতঃ (ঐ ভাষ্য) "ইন্দ্রিয়

অবধি, বুদ্ধি ও প্রকৃতি পর্য্যন্তের সকল প্রকার ইতর বৃত্তি (৬৬ পৃ ২৪ প) এবং স্ববৃত্তি ও স্বরূপের (৬৭ পৃ ৩ প) অভাব হইয়া গেলে, যখন কেবলমাত্র প্রবল নিরোধের সংস্কারই অবশিষ্ট থাকে, অর্থাৎ যখন কোন বাহ্যবস্তু বা আন্তরিক বস্তুর কিছুমাত্র জ্ঞান না থাকে, যখন ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, অভিমান, ও বুদ্ধির উপলব্ধি ও (আমাদের "আমির" উপলব্ধিও) না থাকে, সেই অবস্থাকে "অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি" বলে। তাহার উপায় পরম বৈরাগ্য (১৩৩পৃ ১৩প)। তদ্ব্যতীত কেবল সালম্বন সমাধি বা সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অভ্যাস করিতে পারিলেও, সেই অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারে না। তখন কেবল সমস্ত বৃত্তির অভাবাবস্থাটিরই ধারাবাহী-ক্রমে লক্ষ্য করিতে হয়, তাহাতে কোনরূপ ধ্যেয় বিষয়ের বা জ্ঞেয় বিষয়ের পরিস্ফুরণ হইবে না। এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে, ক্রমে অন্তঃকরণ নিরালম্ব-বিষয় হইয়া গিয়া, যেন আপনিও বিনষ্ট প্রায় হয়, তখন বুদ্ধির নিজের অস্তিত্বও অনুভূত হইবে না, উহা বিলীন হইয়া যাইবে, কেবল সর্ব্বোপাধি পরিশূন্য আত্মা বা চৈতন্যমাত্রই অবশিষ্ট থাকিবেন। এইরূপ নির্ব্বীজ সমাধিকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে।

সমাধির পূর্ব্বাঙ্গ।

উক্ত উভয়বিধ সমাধিতে অধিকারী হওয়ার নিমিত্ত, পূর্ব্বে কতকগুলি নিয়মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে, পরে সমাধির অনুষ্ঠান করা যায়। "যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ" (পা, দ, ২ পা ২৮ সূ) "যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তের রজ-তমোভাগ বিদূরিত হয়। তখন অবিদ্যা, অস্মিতা, অনুরাগ, বিদ্বেষ, মৃত্যুভয় এই পাঁচ প্রকার অবিদ্যারই ক্ষয় হইয়া যায়। মানবগণ, যেমন-যেমন এক একটি অঙ্গের অনুষ্ঠানে সমর্থ হইবে ততই অবিদ্যাদি মল কাটিয়া যাইতে থাকিবে। অবশেষে সমাধির অনুষ্ঠানের দ্বারা যখন আত্মা, আর বুদ্ধ্যাদি জড় পদার্থ, এতদুভয়ের পার্থক্য অনুভূত হয়, তখনই চিত্তবিশুদ্ধির পরিসমাপ্তি হয়।"

সেই অনুষ্ঠেয় অঙ্গগুলি কি? ইহার উত্তরে দুই প্রকার মত আছে। কেহ, হঠ প্রক্রিয়াকেও যোগের পূর্ব্বাঙ্গ বলিয়া গণ্য করেন, কেহ ওগুলি বাদ দিয়া হঠের পরে অনুষ্ঠেয় যমনিয়মাদি হইতেই যোগাঙ্গের গণনা করেন। ঘেরণ্ড সংহিতা, এবং শিবসংহিতাদিরই ঐ পূর্ব্বোক্ত মত। আর পাতঞ্জলাদির এই দ্বিতীয় মত। ঘেরণ্ড বলেন"* * বিরাজতে প্রোন্নত রাজযোগমারোঢুমিচ্ছোর্ব্বিধিযোগএব।" আরও "অভ্যাসঃ কাদি বর্ণানাং যথা শাস্ত্রাণি বোধয়েৎ। তথা যোগং সমাসাদ্য তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ লভ্যতে॥" "যাঁহারা উন্নত রাজযোগে আরোহণে ইচ্ছু, তাঁহাদের পক্ষে প্রথম হট যোগ অনুষ্ঠেয়। ককারাদি বর্ণমালার অভ্যাস করিলে যেমন সকল শাস্ত্রই পড়া যাইতে পারে। হঠ যোগ করিতে পারিলেও তেমন ক্রমে রাজযোগ করা যাইতে পারে।" হঠ যোগের নামান্তর "ঘট শোধন" অর্থাৎ শরীরের শোধন করা। ইহাতে অদ্ভুত অদ্ভুত নানা প্রকার প্রক্রিয়া আছে, তাহা কেবল দেহের উপরেই করিতে হয়। তদ্দ্বারা দেহের শুদ্ধি, দৃঢ়তা এবং স্থৈর্য্য সম্পাদিত হয়। "ষট্‌ কর্ম্মণা শোধনঞ্চ আসনেন ভবেদ্দৃঢ়ম্। মুদ্রয়া স্থিরতা চৈব * * " (ঘেরণ্ড সংহিতাতে)। ইহা সিদ্ধি লাভ করিয়া, পরে অধ্যাত্ম যোগ বা রাজযোগের অঙ্গানুষ্ঠান করিতে হয়।" কিন্তু হঠ যোগের অনুষ্ঠান সকল অবস্থার লোকের পক্ষে অসম্ভব, বহুতর বিপদাশঙ্কাও আছে। যাঁহার ইহা করিতে ইচ্ছা হয়, তিনি ঘেরণ্ড সংহিতা পড়িবেন। উহা অনেক বিস্তীর্ণ, এখানে বলিতে গেলে অনেক সময় অতীত হয়। কিন্তু উপযুক্ত গুরুর নিকট, হাতে হাতে না শিখিয়া কেবল পুস্তক পাঠে উহা কখনও করিও না, করিলে মারা যাইবে।

বাস্তবিক পক্ষে হঠযোগ না করিলে যে অধ্যাত্ম যোগানুষ্ঠান হইতেই পারে না, তাহা নহে,যাঁহাদের দেহ এবং মন সমাধির উপযুক্ত,তিনি প্রথমেই অধ্যাত্মযোগের অনুষ্ঠান করিতে পারেন; এজন্য ভগবান্ পতঞ্জলি প্রভৃতি প্রথমেই অধ্যাত্ম যোগের উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং উভয় মতের কোন বিরোধ দৃষ্ট হয় না। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, "যমনিয়মাসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি।"

(১) যম, (২) নিয়ম, (৩) আসন, (৪) প্রাণায়াম, (৫) প্রত্যাহার, (৬) ধারণা, (৭) ধ্যান, (৮) সমাধি এই আট প্রকার যোগাঙ্গ আছে

ইহাদের অনুষ্ঠান করিলেই আত্ম-সাক্ষাৎকার স্বরূপ পরম ধর্ম্মের বিকাশ হইয়া থাকে।

যম।

"অহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ" (পা, দ, ২ পা, ৩০ সূ) অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, আর অপরিগ্রহ এই পাঁচটিকে "যম" বলে। অহিংসা ?—অনুমোদন, অনুমতি, বা নিজ হস্তের দ্বারা যে কোনরূপে যে কোন সময়ে, যে কোন কারণে কোন প্রাণীর প্রাণবিনাশ হয়, তাহাতেই সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্ত থাকার নাম "অহিংসা।"

সত্য ?—যে বাক্যের মধ্যে কোন প্রকার কপটতা বা বঞ্চনার লেশমাত্র না থাকে, যে বাক্যে কোনরূপ ভ্রান্তি না থাকে, অর্থাৎ যে বস্তুটি অন্যকে বুঝাইবার জন্য বাক্য প্রয়োগ করিতেছে, সেই বস্তুটিরমর্ম্ম বুঝা সম্বন্ধে বক্তা নিজের কোন ভ্রান্তি না থাকে; সেইখানে ভ্রান্তি হইলেই বাক্য-প্রয়োগেও ভ্রান্তি হইবে; আর ঐ বাক্যের ঐ অর্থ ঠিক কি না, তাহা যদি নিশ্চয় জানা না থাকে, তবে তাহাতেও ভ্রান্তি হইতে পারে, আবার সেই ভ্রান্তিমূলক বাক্য প্রয়োগেও ভ্রান্তি থাকে, তাহা না থাকা আবশ্যক, আর যেরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে শ্রোতার মনে ঠিক প্রকৃত অর্থটির বোধ হইতে পারে, যে বাক্য নিষ্প্রয়োজনে প্রযুক্ত না হয়, এবং যে বাক্য প্রয়োগে কাহারও কোন অপকার না হইয়া প্রত্যুত উপকার সাধন হয়, ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করাকে "সত্য প্রবৃত্তি" বলে

অস্তেয় ?—শাস্ত্রের বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া পর-বস্তু গ্রহণ করাকে স্তেয়" বা চোরী করা বলে, তাহা না করা, অর্থাৎ সেই প্রবৃত্তিকে দমন করার নাম অস্তেয়।

ব্রহ্মচর্য্য ?—উপস্থেন্দ্রিয় সংযত করার নাম ব্রহ্মচর্য্য।

অপ্রতিগ্রহ ?—শরীরযাত্রার উপযুক্ত ধনাদি ব্যতীত অতিরিক্ত ধনাদি গ্রহণ না করাকে "অপরিগ্রহ" বলে। এই পাঁচ প্রকার যমের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। এইগুলি যখন সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র সমভাবে পূর্ণমাত্রায় অনুষ্ঠিত হইবে তখনই যম-সিদ্ধি হইল। "জাতি দেশ কাল সময়া-

নবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌমা মহাব্রতম্” (পা, দ, ২ পা, ৩১ সূ)। এই গেল যম, এখন নিয়মের বিবরণ শুন।

নিয়ম।

“শৌচ সন্তোষ তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি নিয়মাঃ” (ঐ ঐ ঐ ৩২ সূ) শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রণিধানকে নিয়ম বলে। শৌচ? পবিত্র মৃত্তিকা, জল, গোময়াদি দ্বারা এবং পবিত্র আহারাদি দ্বারা দেহ শুদ্ধি করাকে দৈহিক বাহ্য শৌচ বলে; আর মনের মলিনতা দূরী করণকে আভ্যন্তর শৌচ বলে। সন্তোষ? আহার এবং শয়নাসনাদির নিমিত্ত যদৃচ্ছাক্রমে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তদ্দ্বারাই পরিতৃপ্ত থাকার নাম “সন্তোষ”। তপ? বুভুক্ষা, পিপাসা, শীত, উষ্ণ, এবং সকল প্রকার স্থান, সকল প্রকার আসন, সহ্য করা; আর চান্দ্রায়ণকৃচ্ছ্র, সান্তপনাদি ব্রতানুষ্ঠান করাকে “তপ” বলে। স্বাধ্যায়? অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং প্রণবের জপ করাকে স্বাধ্যায় বলে। ঈশ্বর প্রণিধান? অনুষ্ঠিত সমস্ত কার্য্যেই আপনার কর্তৃত্ব বোধ বা কর্তৃত্ব বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ভগবানেই ভাল মন্দ সমস্ত কর্ম্মের কর্তৃত্ব বিশ্বাস করিয়া; তাঁহাতেই সমস্ত কর্ম্মফল সংন্যাস করাকে ঈশ্বর প্রণিধান বলে। এই পাঁচ প্রকার নিয়মও যখন সর্ব্বাবস্থায় সকল সময় অব্যাহত থাকে, তখনই নিয়মের সিদ্ধি হইল।

উক্ত যম আর নিয়মের অভ্যাস কালে যদি তদ্বিপরীত বৃত্তির অর্থাৎ হিংসা, মিথ্যা, চৌর্য্য, বঞ্চনা, ও কামাদি প্রবৃত্তির, উদয় হইয়া নিতান্ত বাধা জন্মাইতে থাকে, তবে প্রতিপক্ষ চিন্তাই তাহার একমাত্র মহৌষধ। তখন মনে করিতে হয়, “এই ঘোর সংসারানলে লক্ষ লক্ষ বার দংদহ্যমান হইয়া আমি হিংসাদি কুপ্রবৃত্তির পরিত্যাগপূর্ব্বক যোগ ধর্ম্মের শরণ লইয়াছি, এখন যদি পুনর্ব্বার ঐ সকল কুপ্রবৃত্তি দ্বারা অভিভূত হই, তবে আর আমার গতি নাই,—তবে আর সংসারানল নির্ব্বাপিত হইল না, আবার অনন্ত কালের জন্য দগ্ধ হইতেই চলিলাম” ইত্যাদি চিন্তা এবং হিংসাদির তত্ত্ব বিষয় চিন্তা করিলেই উহার নিবৃত্তি হইতে পারে; ইহাই তখন ঔষধ। “বিতর্ক বাধনে প্রতিপক্ষ ভাবনম্।” (পা, দ, ২ পা, ৩৩ সূ)। উক্ত পাঁচ

প্রকার যম আর পাঁচ প্রকার নিয়মের মধ্যে কাহার দ্বারা কি প্রকারে কি ফল লাভ করা যায়, তদ্বিষয় "ঈশ্বর সংযমের" পরে বুঝাইয়া দিব। এখন আসনের বিবরণ শুন।

আসন।

পতঞ্জলিদেব বলেন, "স্থির সুখমাসনম্" (৩ পা, ৪৬ সূ) যে ভাবে বসিলে দেহের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা মনের কোনরূপ চাঞ্চল্যাদি না হয় অথচ তত্ত্বদ্বিষয় চিন্তা করার বিশেষ আনুকূল্য হয়, এবং অতীব সুখাবহ ভাব মনে হয়, তাহারই নাম "আসন"। এই আসন বা বসিবার প্রণালী-বিশেষ অনেক প্রকার আছে,—

"আসনানি সমস্তানি যাবন্তো জীব জন্তবঃ
চতুরশীতি লক্ষাণি শিবেন কথিতং পুরা॥
তেষাং মধ্যে বিশিষ্টানি ষোড়শানাং শতং স্মৃতম্।
তেষাং মধ্যে মর্ত্ত্যলোকে দ্বাত্রিংশদাসনম্ শুভম্॥" (ঘেরণ্ড সং)

সর্ব্ব সমেত চতুরশীতি লক্ষ প্রকার আসন হইতে পারে, তন্মধ্যে ১৬০০ আসন উৎকৃষ্ট, তন্মধ্যে পৃথিবীলোকে ৩২ প্রকার আসন মাত্র প্রশস্ত। (তন্মধ্যে আবার ৫টিই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়।) যথা সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, বীরাসন, ভদ্রাসন, এবং স্বস্তিকাসন। অতএব ইহাদেরই লক্ষণাদি বলিতেছি।

সিদ্ধাসন।

"যোনি স্থানকমঙ্ঘ্রি মূল ঘটিতং সংপীঢ্য গুল্‌ফেতরং
মেঢ্রে সংপ্রণিধায় চৈব চিবুকং কৃত্বা হৃদি স্থায়িনং।
স্থাণুঃ সংযমিতেন্দ্রিয়ো চলদৃশা পশ্যন্ ভ্রুবোরন্তরং
এবং মোক্ষ বিধায়কং ফলকরং সিদ্ধাসনং প্রোচ্যতে॥" (ঘেরণ্ড সং)

সর্ব্বেন্দ্রিয় সংযমন পূর্ব্বক এক গুল্‌ফের দ্বারা গুহ্যদেশ সম্পীড়িত করিবে, এবং অপর গুল্‌ফ লিঙ্গ স্থানে সন্নিবেশিত করিবে, চিবুকদেশ হৃদয়ে সংসক্ত করিবে, এবং স্থিরভাবে থাকিয়া চক্ষুদ্বয়কে অচল ভাবে ভ্রূ দ্বয়ের মধ্যে সংস্থাপিত করিবে, ইহার নাম সর্ব্বফল সাধক সিদ্ধাসন।

পদ্মাসন।

"বামোরূপরি দক্ষিণং হি চরণং সংস্থাপ্য বামস্তথা,
দক্ষোরূপরি পশ্চিমেন বিধিনা কৃত্বা করাভ্যাং দৃঢ়ং"
অঙ্গুষ্ঠে হৃদয়ে নিধায় চিবুকং নাসাগ্রমালোকয়েৎ
এতদ্ব্যাধি বিকাশ নাশান করং পদ্মাসনং প্রোচ্যতে॥ (ঘেরণ্ড)

বামোরূপরি দক্ষিণোরু এবং দক্ষিণোরুর উপরে বামউরু সংস্থাপন পূর্ব্বক হস্তদ্বয় পৃষ্ঠদেশ হইতে ঘুরাইয়া আনিয়া দক্ষিণ হস্তের দ্বারা দক্ষিণ পাদের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি, আর বাম হস্তের দ্বারা বাম পদের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলী সুদৃঢ়রূপে ধারণ করিবে, চিবুক ভাগ বক্ষ-প্রদেশে নিহিত করিবে, আর নয়নদ্বয় নাসাগ্রে বিন্যস্ত করিবে ইহার নাম পদ্মাসন, এতদ্দ্বারা সর্ব্বব্যাধি বিনাশ হইয়া থাকে।

বীরাসন।

"একপাদমথৈকস্মিন্ বিন্যসে দূরু সংস্থিতম্।
ইতরস্মিংস্তথা পশ্চাদ্বীরাসনমিতিস্মৃতম্॥" (ঘেরণ্ড সং)

এক পাদ অপর উরুর উপর রাখিয়া অপর পাদ অপর উরুর নীচে রাখিলেই বীরাসন হইবে।

ভদ্রাসন।

"গুল্ফৌচ বৃষণস্যাধো ব্যুৎক্রমেণ সমাহিতঃ।
পাদাঙ্গুষ্ঠে করাভ্যাঞ্চ ধৃত্বাচ পৃষ্ঠদেশতঃ॥
জালন্ধরং সমাসাদ্য নাসাগ্র মবলোকয়েৎ।
ভদ্রাসনং ভবেদেতৎ সর্ব্বব্যাধি বিনাশকম্॥" (ঘেরণ্ড সং)

গুল্ফদ্বয় উত্তান ভাব করিয়া বৃষণের (অণ্ডকোষের) নিম্নে সংস্থাপিত করিবে, হস্তদ্বয় পৃষ্ঠদেশ হইতে ঘুরাইয়া আনিয়া দক্ষিণ হস্তের দ্বারা দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ, এবং বাম হস্তের দ্বারা বাম পদাঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিবে, এবং জালন্ধর বন্ধ করিয়া নাসাগ্র দেশ অবলোকন করিবে। ইহার নাম ভদ্রাসন, ইহা দ্বারা সর্ব্ব ব্যাধি বিনাশ হইয়া থাকে।"

স্বস্তিকাসন।

জানূর্ব্বোরন্তরে কৃত্বা যোগী পাদতলে উভে।
ঋজুকায়ঃ সমাসীনঃ স্বস্তিকং তৎপ্রচক্ষতে॥" (ঘেরণ্ড সং)

জানুদ্বয় আর উরুদ্বয়ের সন্ধিদেশে পাদতলদ্বয় সংস্থাপন করিয়া সোজা ভাবে অবস্থিতি করিবে, ইহার নাম স্বস্তিকাসন।" এই পাঁচ প্রকার আসনের মধ্যে যাহার যাহাতে সুবিধা বোধ হয়, তিনি সেইটিই করিতে পারেন, সকল গুলি সকলের শিক্ষা করার বিশেষ প্রয়োজন নাই; বোধ হয় বীরাসন, আর স্বস্তিকাসনই সকলের পক্ষে অনায়াস কর হইবে।

আসন সিদ্ধির উপায়।

শিষ্য।—কোন আসন করিয়া কিছুকাল বসিলেই অত্যন্ত উদ্বেগ বোধ হইয়া থাকে, মাজা চড়্‌চড় করে, গা ঝিন্ ঝিন্ করে, পা ঝিঝিতে ধরে, আরও কত কিছু হয়, এই সকল উপদ্রব না হয় অথচ নির্ব্বিঘ্নে আসন সিদ্ধি হইতে পারে, এমন কোন উপায় আছে কি ?

আচার্য্য।—করিতে পারিলে বিশেষ উপায় আছে, ভগবান্ পতঞ্জলি-দেব বলিয়াছেন "প্রযত্ন শৈথিল্যানন্ত সমাপত্তিভ্যাম্" (২ পা ৪৭ সূ) আমাদের দেহের উপর আত্মার সর্ব্বদাই একটি যত্ন বিশেষ আছে, তদ্দ্বারা এই দেহটি কে আমরা "আমার বা আমি" বলিয়া ধারণ করিয়া রাখিয়াছি, সেই যত্ন বিশেষকে শিথিল করিতে পারিলেই এই দেহটি যেন আমার নয় এইরূপ প্রতীতি হয়, তখন যেন কি একরূপ, গা এড়িয়া দেওয়ায় ভাবটি উপস্থিত হয়। ঐ যত্ন বিশেষের অনুভব করিতে পারিয়া, তাহাকে শিথিল করিতে পারিলেই আসন সিদ্ধি হইতে পারে, আর কোন উদ্বেগই থাকে না। আর অনন্ত-শক্তিতে গা এড়িয়া দিলেও নির্ব্বিঘ্নে আসন সিদ্ধি হয়। আসন সিদ্ধি হইলে শীতোষ্ণাদি দ্বারা অভিভূত হয় না, প্রখরতর রৌদ্র মধ্যেও বসিয়া থাকিতে পারে, বৃষ্টি বর্ষা, হিমাদির মধ্যেও অনায়াসে থাকিতে পারে। "ততোদ্বন্দ্বানভিঘাতঃ" (২ পা, ৪৮ সূ)।

শিষ্য। নিয়মিত মতে আসন না করিয়া চেয়ার, কোচ প্রভৃতিতে, যে কোন রূপে বসিলে হয় না কি ?

আচার্য্য। না,—কখনই না, নিয়মিত আসন ব্যতীত কার্য্য সিদ্ধি হয় না।

শিষ্য। কেন হয় না ?

আচার্য্য। সকল অবস্থায় মনের সকল প্রকার শক্তি বা ভাব বিকসিত হয় না। দেহটিকে এক এক অবস্থায় রাখিলে, মনের এক এক প্রকার ক্রিয়া বিকাশ পাইয়া থাকে, এইরূপ নিয়ম আছে। সেই নিয়মের বিপরীত মতে দেহটিকে রাখিলে সেই সেই ক্রিয়া বা ভাবের উন্মেষ হইতে পারে না। আমাদের নিদ্রার সময় মনের মধ্যে যে অবস্থা হয়, তাহার বিকাশের নিমিত্ত এই দেহটিকে শয়িত করাই আবশ্যক। তাহা না করিয়া, তুমি যদি গমন করিতে থাক, কি দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট থাক, তবে নিদ্রার ভাব কদাচ আসিতে পারে না। আবার দেখ, তোমার যখন কোন রূপ দুশ্চিন্তা উপস্থিত হয়, তখন তুমি ইচ্ছা কর আর নাই কর, কিন্তু আপনিই তোমার গণ্ডদেশটি হস্তের উপরে বিন্যস্ত হয়, তদ্ব্যতীত বীরাসন করিয়া ঋজু ভাবে বসিয়া কখনও কেহকে দুশ্চিন্তা করিতে দেখি নাই। আবার বীর-ভাবোদ্দীপনা কালেও কেহকে মস্তক-ন্যস্তহস্ত হইয়া আকুঞ্চিত ভাবে বসিতে দেখি নাই, তখন দেহের ভাবভঙ্গী অন্যরূপই হয়। সেইরূপ অধ্যাত্মতত্ত্ব-চিন্তা কালেও তদুপযুক্ত অবস্থায় দেহটিকে রাখিতে হইবে। সেই অবস্থা বিশেষের নামই 'আসন' তাহাই শাস্ত্রে নিরূপিত করিয়াছেন। সেইরূপ অবস্থায় বসিলেই অধ্যাত্ম চিন্তার বিকাশ হইতে পারে। চেয়ার বেঞ্চেতে বিলম্বিত-পাদ হইয়া অর্দ্ধোপবিষ্ট ভাবে থাকিলে, তাহা কখনই হয় না। অধ্যাত্ম চিন্তাও আবার অনেক প্রকারের আছে, সুতরাং তাহার আসনও অনেক প্রকার বিহিত হইয়াছে ; তন্মধ্যে কথিত পাঁচটি আসন, সাধারণ অধ্যাত্ম চিন্তায়ই প্রযুক্ত হইতে পারে। অতএব আসনাভ্যাস করিতেই হইবে। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় থাকিলে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার বিকাশের কারণ 'অধ্যাত্ম বিজ্ঞানেই' বলিব।

আসন করার আধার।

শিষ্য। এই যাহা বলিলেন ইহাতো কেবল বসিবার প্রণালীর বিষয়, কিন্তু কিসের উপর বসিয়া ঐরূপ আসন করিতে হইবে তাহাতো বলিলেন না?

আচার্য্য। সমাধি বিষয়ে সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার আসন বিহিত আছে (১) কৃষ্ণাজিন কুশোত্তর (২) ব্যাঘ্রাজিন কুশোত্তর (৩) কম্বলাজিন কুশোত্তর (৪) রাঙ্কবাজিন কুশোত্তর (৫) কাশ কুশোত্তর। প্রথম কুশাসন পাড়িতে হয়, তৎপর বস্ত্র ও তৎপরে কৃষ্ণাজিনপাড়িতে হয়, ইহাই 'কৃষ্ণাজিন কুশোত্তর' আসন; এইরূপ ব্যাঘ্রাজিন কুশোত্তরাদি সম্বন্ধেও জানিবে। যদি নিতান্ত অভাব হয়, তবে অগত্যা কেবল কৃষ্ণাজিন দ্বারাও হইতে পারে, কিন্তু কেবল বস্ত্র আসনে হয় না। "উপবিশ্যাসনে রম্যে কৃষ্ণাজিন কুশোত্তরে। রাঙ্কবে কম্বলে বাপি কাশাদৌ ব্যাঘ্রচর্ম্মণি" (পদ্মপুরাণ)। উক্ত আসন দু হাতের অধিক দীর্ঘ হইবে না, এবং দেড় হাতের অধিক পরিসর হইবে না, আবার তিন অঙ্গুলী অপেক্ষায় উচ্চ হইবে না, দুই অঙ্গুলী অপেক্ষায় নীচও করিবে না। ইহাও ভগবদ্গীতায় লিখিত আছে।

শিষ্য। এইরূপ আসন নির্ণয়ের উদ্দেশ্য কি?

আচার্য্য। এইরূপ আসনের দ্বারা কি কারণে কি উপকার হয় তাহা আসনের পদার্থ বিভাগ করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে এই মাত্র বলা যায় যে, ঐ সকল আসন হইতে একপ্রকার শক্তি বিশেষ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্দ্বারা যোগীর মনঃ শুদ্ধি, দেহ শুদ্ধি, মনস্থিরতা, এবং চিত্তের বিবেক-বৈরাগ্য-প্রবণতাদিগুণ বিকসিত হয়। তাহা নিজে করিলেই অনুভূত হয়, নতুবা কথায় বুঝানের ক্ষমতা নাই। গুড়ের সহিত জিহ্বার সংস্পর্শ হইলে কিরূপ হয়, তাহা জিহ্বায় গুড় স্পর্শ করাইলেই বুঝা যাইতে পারে, কিন্তু তর্কে বুঝান যায় না।

প্রাণায়াম।

আসন সিদ্ধি যত দিন না হয়, তত দিন সহস্র যত্নেও প্রাণায়ামে কৃতকার্য্য

হওয়ার জো নাই। অতএব "তস্মিন্ সতি শ্বাস প্রশ্বাসয়োর্গতি বিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ" (২ পা, ৪৯ সূ) "আসন সিদ্ধি হইলে পর প্রাণায়াম করিবে। শ্বাস এবং প্রশ্বাসের গতি রোধ করাকে প্রাণায়াম বলে। অর্থাৎ যখন শ্বাস ও প্রশ্বাস কিছুমাত্র থাকিবে না, এককালে নিস্তব্ধ হইবে তখনই পূর্ণ প্রাণায়াম হইল"। কিন্তু স্মরণ রাখিও যে, এই প্রাণায়াম 'হঠ যোগের' প্রাণায়াম নহে, ইহাতে নাসারন্ধ্র অবরুদ্ধ করার কোন প্রয়োজন নাই। ইহা অন্তরে অন্তরেই করিতে হয়। প্রথমে, যে প্রাণ শক্তির দ্বারা ফুপ্‌ফুসের পরিচালনা হইয়া শ্বাসবায়ুর গতায়াত হইতেছে তাহাকে অভিনিবিষ্ট ভাবে লক্ষ্য করিতে হয়, লক্ষ্য করিয়া সেই স্থানেই তাহাকে নিরুদ্ধ বা সংযত করিতে হয়। তবেই ফুপ্‌ফুসের ক্রিয়াও হইল না, নিশ্বাস প্রশ্বাসও হইল না। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেহের উপর পূর্ণ মমতা বা অহংভাব থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত শারীর প্রযত্ন (৩১৮ পৃ) কার্য্য করিতে থাকিবে, অর্থাৎ তোমার আত্মা এই দেহটিকে " আমি, " "আমার" বলিয়া ধরিয়া রাখিবে, ততক্ষণ প্রাণ শক্তিও দেহের উপরে সবেগে কার্য্য করিবে। অতএব ততক্ষণ তাহাকে নিরুদ্ধ বা সংযত করা যায় না, সুতরাং ঐ শারীর প্রযত্ন শৈথিল্য করিয়া আসন সিদ্ধি হইলেই এই প্রাণায়াম করা বিহিত ও অনুষ্ঠেয়, কিন্তু ব্যাপারটি বড় কঠিন।

প্রাণায়াম বিভাগ।

এই প্রাণায়াম চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে,—"বাহ্যাভ্যন্তর স্তম্ভবৃত্তির্দ্দেশ কাল সংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘ সূক্ষ্মঃ। বাহ্যাভ্যন্তর বিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ।" (পা, দঃ, ২ পা ৫০-৫১ সূ) ইহার ভাষ্য, " যত্র প্রশ্বাস পূর্ব্বকোগত্যভাবঃ সবাহ্যঃ, যত্র শ্বাস পূর্ব্বকোগত্যভাবঃ সআভ্যন্তরঃ, তৃতীয়স্তম্ভ বৃত্তি র্যত্রোভয়া ভাবঃ সকৃৎ প্রযত্নাৎ ভবতি, যথাতপ্তেন্যস্তমুপলে জলং সর্ব্বতঃ সঙ্কোচ মাপদ্যতে তথাদ্বয়োর্যুগপদ্‌গত্যভাব ইতি। ত্রয়োপ্যেতে দেশেন পরিদৃষ্টাঃ,—ইয়ানস্য বিষয়োদেশ ইতি। কালেন পরিদৃষ্টাঃ ক্ষণানামিয়ত্তাবধারণেনেত্যর্থঃ। সংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টাঃ,—এতাবদ্ভিঃশ্বাস প্রশ্বাসৈঃ প্রথম উদ্ঘাতস্তদ্বন্নিগৃহীত স্যৈতাবদ্ভি র্দ্বিতীয় উদ্ঘাত এবং

তৃতীয়ঃ। এবং মৃদুরেবং মধ্য এবং তীব্র ইতি সঙ্খ্যা পরিদৃষ্টঃ। স খল্বয় মেবমভ্যস্তো দীর্ঘ সূক্ষ্মঃ।" ৫০ সূ, ভা)। "দেশকাল সঙ্খ্যাভির্ব্বাহ বিষয় পরিদৃষ্ট আক্ষিপ্তঃ, তথাঽভ্যন্তর বিষয়ঃ পরিদৃষ্ট আক্ষিপ্তঃ, উভয়থা দীর্ঘ সূক্ষ্মঃ, তৎ পূর্ব্বকো ভূমিজয়াৎ ক্রমেণোভয়োর্গত্যভাবশ্চতুর্থঃ প্রাণায়ামঃ। তৃতীয়স্তু বিষয়া নালোচিতো গত্যভাবঃ সকৃদারব্দ এব দেশ কাল সঙ্খ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ, চতুর্থস্তু শ্বাস প্রশ্বাসয়ো র্বিষয়াবধারণাৎ ক্রমেণ ভূমিজয়াৎ, উভয়াক্ষেপ পূর্ব্বকো গত্যভাব শ্চতুর্থঃ প্রাণায়াম ইত্যয়ং বিশেষ ইতি॥" (৫১ সূ, ভাঃ) ইহার অর্থঃ—আন্তরিক প্রণায়াম চতুর্ব্বিধ (১) বাহ্যবৃত্তি (২) অভ্যন্তরবৃত্তি (৩) স্তম্ভবৃত্তি (৪) এবং বাহ্যভ্যন্তর বিষয়াক্ষেপী। আভ্যন্তরিক যন্ত্রের দ্বারা প্রত্যাকর্ষণ পূর্ব্বক প্রশ্বাসের গতি খর্ব্ব করিতে করিতে ক্রমে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করিলে, যখন প্রশ্বাস নিঃশ্বাস উভয়ই বন্ধ হইয়া যায় তখন 'বাহ্যবৃত্তিপ্রাণায়াম' বা 'রেচকপ্রাণায়াম' বলে। আর বায়ু গ্রহণের বেগ খর্ব্ব করিতে করিতে, যখন শ্বাস প্রশ্বাস উভয়েই, এক বারেই বন্ধ হইয়া যায়, তখন 'অভ্যন্তরবৃত্তি', বা 'পূরক প্রাণায়াম' বলে। আর যখন একবার যত্ন করা মাত্রেই এক সময়ই শ্বাস প্রশ্বাসের গতির অভাব হয়, উষ্ণ মৃৎখণ্ডে জলবিন্দু নিঃক্ষিপ্ত করিলে তাহা যেমন একবারে সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয়, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বায়ুও সেইরূপ দেহের মধ্যেই যেন সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইয়া যায়, তাহাকে 'স্তম্ভবৃত্তি' বা 'কুম্ভক প্রণায়াম' বলে।

এই তিন প্রকার প্রাণায়ামই দেশ, কাল এবং সঙ্খ্যা দ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন হয়। অর্থাৎ (রেচক প্রাণায়ামে) প্রত্যাকর্ষণ কালে প্রশ্বাস বায়ু কতদূর পর্য্যন্ত বহির্গত হয়, এবং (পূরক প্রাণায়ামে) নিশ্বাস বায়ু দেহের অভ্যন্তরে কতদূর পর্য্যন্ত গতি বিধি করে, আর (কুম্ভক প্রাণায়ামে) অবরুদ্ধ বায়ু, দেহের কতদূর পর্য্যন্ত প্রসৃত হইতেছে, এইরূপ দৈশিক পরিমাণের অনুমান করিয়া, তিনেরই উন্নতি অবনতি বুঝা যাইতে পারে। আবার সময়ের ন্যূনাধিক্য দ্বারাও তিনেরই উন্নতি অবনতি জানা যায়। এবং কত শ্বাসের দ্বারা পূরক করিতে পারিলাম, কত শ্বাসের দ্বারা রেচক করিতে পারিলাম, আর কত শ্বাসের দ্বারাই বা কুম্ভক করিতে পারিলাম, এইরূপ শ্বাসসঙ্খ্যাদ্বারাও ব্যবচ্ছিন্ন করা যায়।

এইরূপ লক্ষ্য করিয়া অনুষ্ঠান করিতে করিতে, ক্রমে ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং সূক্ষ্মাবস্থায় পরিণত হয়, তখন নিশ্বাস প্রশ্বাস নিতান্ত ক্ষীণ ও অলক্ষ্য হইয়া পড়ে। প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রাণায়ামে অভ্যাস-পটুতা লাভ হইলে, তীব্রতর যত্ন সহকারে প্রাগুক্ত দেশ কাল সংখ্যার বিচার পূর্ব্বক শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি রোধ করাকে 'চতুর্থ প্রাণায়াম' বলে।

শিষ্য। এত কষ্ট করিয়া প্রাণায়াম করিলে কি ফল সংসাধিত হয়? ইহা না করিলে কার্য্য হয় না কি?

আচার্য্য। না, প্রাণায়াম না করিলে ধ্যানাদি কার্য্য হয় না। আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে সর্ব্বদা ফুস্ফুস ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া হইতেছে তাহার বেগ বাহির হইতে আমরা কিছুই অনুভব করিতে পারি না, কারণ আমরা সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক আছি। কিন্তু কোন বিষয় ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলে যখন বাহিরের বিষয় পরিত্যাগ করিয়া চিত্ত একটু একাগ্র হয়, তখন ঐ ফুস্ফুসও হৃৎপিণ্ডের বেগের প্রকৃত অবস্থা অনুভূত হয়। তখন উহা অতীব বাধাজনক উৎপাত বিশেষ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। ফুস্ফুসদ্বয়ের আকুঞ্চন প্রসারণে, সর্ব্বশরীরটা যেন বাত্যাবিঘূর্ণ্যমানবৃক্ষের ন্যায় বিকম্পিত ভাবে অনুভূত হয়, হৃৎপিণ্ড হইতে যে, ধমনী সহস্রের দ্বারা রুধির প্রবাহ চলিতেছে,তাহা যেন পিচকিরীর ক্রিয়ার ন্যায় অনুভূত হয়, মনে হয় সর্ব্বশরীরের মধ্যেই যেন কে পিচকিরী দ্বারা জলপ্রবাহ চালাইতেছে। তখন ঐ সকল ব্যাপারেই চিত্ত ব্যাসক্ত হইয়া পড়ে, ধ্যেয় বিষয়ে কোন রূপেও চিত্তকে সংস্থাপিত করা যায় না, সুতরাং ধ্যান হয় না। কিন্তু প্রাণায়াম করিলে ফুস্ফুস আর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার নিবৃত্তি হয়, সুতরাং ঐ উৎপাতেরও শান্তি হয়। অতএব একাগ্রভাবে ধ্যানাদি করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত আরও অনেকপ্রকার ফল আছে। পতঞ্জলিদেব বলেন "ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্" (পা ২ সূ৫২) প্রাণায়ামের দ্বারা চিত্তের রজঃ এবং তমঃশক্তি বিদূরিতহয় এবং প্রবলতরক্রিয়াসংস্কার বা অদৃষ্টও (১৫ পৃ ১৮প) শ্লথ হইয়া যায়, সুতরাং বিবেকের পরিদীপ্তি হয়। মনু প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই প্রাণায়ামের অতীব প্রশংসা আছে। অতএব প্রাণায়ামের নিতান্ত প্রয়োজন। এখন প্রত্যাহারের বিষয় শুন.—

প্রত্যাহার।

ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলেন "স্ববিষয়াসম্প্রযোগে চিত্তস্য স্বরূপানুকারইব প্রত্যাহারঃ" (২ পা ৫৩ সূ) কোন ইন্দ্রিয়ের যখন কোন বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ না থাকে, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্বই যেন মনের অবস্থায় পরিণত হয়, ঈদৃশ অবস্থাকে "প্রত্যাহার" বলে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বীয় স্বীয় বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধ বা গতি বিধি থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত একাগ্রচিত্তে কোন ধ্যান করা যায় না ; সুতরাং ধ্যান করিতে হইলেই প্রত্যাহারের আবশ্যক। প্রত্যাহার অভ্যস্ত করিতে পারিলে ইন্দ্রিয়গণ বশীকৃত হয় ; ইহাও পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন "ততঃপরম বশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্" (২ পা ৫৪ সূ) প্রত্যাহারে অভ্যাস হইলে সংযম অর্থাৎ যথাক্রমে "ধারণা" "ধ্যান" আর "সমাধি" অনুষ্ঠান করিতে হয়, তবেই যোগের অষ্টাঙ্গ পরিপূর্ণ হইল। তন্মধ্যে ধারণা আর ধ্যানের লক্ষণ ও কার্য্যপ্রণালী পূর্ব্বেই বলিয়াছি (১৪৩ পৃ অবধি) এখন সমাধির বিষয় বলিলেই হইবে। সমাধির ও লক্ষণ ও বিভাগাদি বলা হইয়াছে, এখন তাহার ক্রম বলা যাইতেছে।

সমাধির ক্রম।

পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন "তস্যভূমিষু বিনিয়োগঃ" (৩ পা ৬ সূ) "প্রথমেই অতি সূক্ষ্ম বিষয়ে ধারণা ধ্যান সমাধি বা সংযম করা সম্ভবে না। অতএব প্রথমে অপেক্ষাকৃত স্থূলাবস্থায় সংযম করিবে. তৎপর কৃতকার্য্য হইলে তদপেক্ষায় সূক্ষ্মাবস্থায় সংযম করিতে হয়। এইরূপ নিয়মে ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম বিষয়ে উন্নীত হইতে হয়।" যোগবাশিষ্টেও বলিয়াছেন "প্রথমংস্থূলমারভ্যশনৈঃ সূক্ষ্মংধিয়া নয়েৎ। স্থূলে নির্জ্জিতমাত্মানংক্রমাৎ সূক্ষ্মে নিবেশয়েৎ॥ (ইহার অর্থ সরল)।

শিষ্য।—প্রথম কিসে সংযম করিতে হয় ?

আচার্য্য।—যে নিয়মে সমাধির বিভাগ করা হইয়াছে (৩০৯ পৃ) সেই-রূপ পারম্পর্য্য ক্রমেই সমাধির অনুষ্ঠান করিতে হয়। অর্থাৎ প্রথম সবিতর্ক সমাধি, (৩০৯ পৃ ৯ প) তৎপর সবিচার সমাধি, (৩০৯ পৃ ১৫ প) তাহাতে কৃতকার্য্য হইলে সানন্দ সমাধি, (৩০৯ পৃ ১৭ প) তাহাতে কৃতকার্য্য

হইলে অস্মিতামাত্র সমাধি (৩০৯ পৃ ১৬ প) করিতে হয়। ইহারা ক্রমে ক্রমে পর পর সূক্ষ্ম ও উৎকৃষ্টতর। তীব্র যত্নের দ্বারা যখন এই চারিপ্রকার সমাধিতেই সিদ্ধি হয়, তখন নির্ব্বীজ বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি (৩১১ পৃ ২১ প) করিতে হয় ইহাই শ্রুতি বলিয়াছেন, "যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্‌যচ্ছেজ্‌জ্ঞান আত্মনি। জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্তআত্মনি।" (কঠ শ্রুতি) 'স্থূল দেহের সংযমে কৃতকার্য্য হইয়া ইন্দ্রিয়ে সংযম করিবে, তৎপর মনে সংযম করিবে, তৎপর অভিমানে সংযম করিবে, তৎপর বুদ্ধিতে সংযম করিবে তৎপর প্রকৃতিতে সমাধি করিবে; এই সময়ই নির্ব্বীজ সমাধি হয়। (এই অর্থটি এই মন্ত্রের ঠিক অনুবাদ নহে, কিন্তু তাৎপর্য্যার্থ)। এইরূপ ক্রমপরম্পরায় সমাধি বা সংযম করিতে হয়।

সমাধির প্রণালী।

শিষ্য।—সমাধির ক্রম বুঝিতে পারিলাম এখন কিরূপে সমাধি করিতে হয় তাহা বিশদ করিয়া বলুন।

আচার্য্য। প্রথমে যমনিয়মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে যখন এরূপ অবস্থা হইবে যে, সর্ব্বকালের নিমিত্তই তোমার চিত্ত অহিংসাদি ধর্ম্মে বিভূষিত থাকে, ঘটনা উপস্থিত হইলেও হিংসা, মিথ্যা, চৌর্য্য, রিরংষা, ও বিষয় তৃষ্ণা বৃত্তি কিছুমাত্র বিকসিত হয় না, এবং চিত্তটি নিতান্ত নির্ম্মল ও নিপুণাবস্থা পন্ন হইয়াছে, তখন আর উহার নিমিত্ত যত্ন না করিয়া কেবল আসনেরই অভ্যাস করিতে থাকিবে। আসনাভ্যাস করিতে করিতে যখন দেখিবে যে তুমি সিদ্ধাদি আসনের মধ্যে যেকোন আসনে যতক্ষণ থাকিতে ইচ্ছা কর ততক্ষণই স্থির থাকিতে পার,কোনরূপ উদ্বেগ বোধ হয় না, তখন আসনের জন্য যত্ন পরিত্যাগ করিয়া প্রাণায়ামেই যত্ন করিতে থাকিবে। পরে যখন প্রাণায়ামেও সিদ্ধি হইবে, তুমি যখন যে কোন সময়ে, যে কোনরূপে ইচ্ছা করিলেই শ্বাস প্রশ্বাস নিরুদ্ধ করিতে পারিবে, তখন আর যোগাসনে বসিয়া তোমার প্রাণ নিরোধের নিমিত্ত যত্ন করিতে হইবে না, তখন কেবল-মাত্র ধারণা বিষয়েই যত্ন করিতে হইবে। ধারণার সিদ্ধি হইলে, ধারণার

যত্ন পরিত্যাগ করিয়া ধ্যানেরই যত্ন করিতে হইবে, ধ্যানের পর সমাধি-অবস্থা স্থির রাখার চেষ্টা করিতে হয়।

মনে কর, তুমি ধারণা ও ধ্যান পর্য্যন্তে সিদ্ধ হইয়া সমাধি করিতে ইচ্ছু; এখন প্রথমে তোমাকে বিহিত আসনের গ্রহণ পূর্ব্বক (৩২০ পৃ ৪ প) সিদ্ধ, পদ্ম বা বীরাদি ভাবে (৩১৬ পৃ ২০ প) উত্তরাস্য হইয়া বসিতে হইবে, এবং প্রথমেই স্থূলদেহে সমাধি করিতে হইবে। কিন্তু এইক্ষণে যমনিয়মের জন্য কিম্বা আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ধারণা ও ধ্যানের নিমিত্ত কিছুমাত্র যত্ন করিতে হইবে না, তোমার সমস্ত যত্নই এখন কেবল স্থূলদেহে সমাধির উপরে থাকিবে। অমনি তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বাভ্যাস বশে আপনিই তোমার প্রাণশক্তি অবরুদ্ধ হইবে। কারণ প্রাণ শক্তির ক্রিয়া আর চিন্তা ক্রিয়া এক সময়ে হইতে পারে না, দুই ক্রিয়া এক সময়ে হয় না (১৫৪ পৃ)। আবার সমাধির যত্নেই ধারণা ধ্যান ও আপনিই আসিয়া পড়িবে, কারণ উহারা উভয়েই সমাধির মূল বা গোড়া, বস্ত্রের একাঞ্চল ধরিয়া টানিলে, অপরাঞ্চল আপনিই আসিয়া পড়ে। প্রত্যাহারের নিমিত্ত ও তখন কোন যত্নের প্রয়োজন নাই, চিত্ত স্থিরীকৃত হইলে, ইন্দ্রিয়গণ আপনিই ব্যাপারশূন্য হইয়া মনেতে বিলীন হয়। আসনের নিমিত্তও যত্নান্তরের আবশ্যক নাই, অভ্যাসবশাৎ যতক্ষণ ইচ্ছা নিরুদ্বেগে বসিয়া থাকা যায়। "যমের নিমিত্তও যত্ন পাওয়ার প্রয়োজন নাই। অভ্যাসের দ্বারা সংযম সিদ্ধি হইলে আপনা হইতেই মনের মধ্যে হিংসাদি বৃত্তি আসিতে পায় না। "নিয়মের" তো অবকাশই নাই; কারণ "নিয়মের" যাহা কিছু অনুষ্ঠেয়, সমস্তই বহির্জ্জগতে জাগ্রৎ অবস্থার কার্য্য (৩১৫পৃ ৩ প)। চিত্ত কখনই এক সময়ে নানা কার্য্য করিতে পারে না; অতএব সমাধি করিতে বসিয়া এক সময়েই আটটি যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান কিরূপে করিবে? সুতরাং সমাধি করিতে বসিয়া কেবলমাত্র সমাধিরই যত্ন করিতে হইবে।

এই নিয়মটি যে কেবল সমাধির সময়েই বিহিত তাহা নহে, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ও ধারণা ধ্যান কালেও এই নিয়মই জানিবে। তখনও এক একটির উপরেই যত্ন রাখিতে হয়, সকলদিকে চিত্তনিবেশের যত্ন করিতে হয় না। যখন ধ্যান করিতে হয় তখন কেবল ধ্যানেরই

উপরে যত্ন রাখিতে হয়; ধারণা, প্রত্যাহার, প্রাণায়াম, ও আসনাদির দিকে চিত্তনিবেশ করিতে হয় না। কারণ ঐ সকল বিষয়ে সিদ্ধ হইয়া ধ্যানানুষ্ঠানকালে আপনিই উহা সংসাধিত হয়। এইরূপ ধারণার সময় ও প্রত্যাহার, প্রাণায়াম এবং আসনের নিমিত্ত যত্ন রাখিতে হয় না, কেবল ধারণার-দিকেই লক্ষ্য করিতে হয়, তখন অভ্যাসসিদ্ধ আসন, প্রণায়াম ও প্রত্যাহার আপনিই আসিয়া বিরাজিত হয়। আবার প্রত্যাহারেরকালেও প্রাণায়ামে যত্ন করিবে না, প্রাণায়াম সময়েও আসনে যত্ন করিবে না, কেবল এক একটি বিষয়েই তীব্রতর যত্ন করিতে থাকিবে।

আবার নিয়স্থ এক একটি অঙ্গে সিদ্ধ না হইয়া উচ্চতর অঙ্গানুষ্ঠানের চেষ্টা করিলেও "ইতোভ্রষ্ট স্ততোনষ্টঃ" অবস্থা হইয়া থাকে, অতএব কদাচ তাহা করিবে না। উচ্চতর অঙ্গের সিদ্ধি হইলেও নিম্নাঙ্গের অনুষ্ঠানের দ্বারা সময় যাপন না করিয়া সেই উচ্চতর অঙ্গেরই যখন তখন অনুষ্ঠান করিবে।

অঙ্গানুষ্ঠানের ফল কি?

শিষ্য;—সমাধি করার সময়ে যদি আপনিই ধ্যান, ধারণা, ও প্রাণ নিরোধাদি হয়, তবে আর পূর্ব্বাঙ্গ সিদ্ধির নিমিত্ত প্রয়াস পাওয়ার কি ফল হইল?

আচার্য্য। পূর্ব্বাঙ্গ সাধনের কি ফল তাহা এক একটি যোগাঙ্গের বর্ণনা কালে তত্তৎ স্থানেই দর্শিত হইয়াছে, তাহাই সত্য। প্রথমে যদি পূর্ব্বাঙ্গ গুলিতে সিদ্ধ না হওয়া যায়, তবে আর সমাধি করিতে বসিলেই ধ্যান, ধারণা, বা প্রত্যাহার, প্রণানিরোধাদি আপনা হইতেই হইতে পারে না; সুতরাং সমাধিও সিদ্ধ হইল না। ভাব, তুমি সমাধি অবস্থাটি আনয়নের নিমিত্ত চেষ্টা করিতে বসিলে, এখন যদি, আসন সিদ্ধির অভাবে পাঁচ পল পরেই তোমার মাজা চর্চ্চড় করে, পা ঝিঝিতে ধরে; প্রাণায়াম সিদ্ধির অভাবে প্রবল বেগে ফুপ্‌ফুসাদির ক্রিয়া হইতে থাকে; প্রত্যাহারের সিদ্ধির অভাবে ইন্দ্রিয়গণ চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে থাকে, ধারণা সিদ্ধির অভাবে মনও একবার হৃদয়, একবার মস্তক, একবার হস্ত, এক-

বার পদ, ইত্যাদি নানা স্থানে বিচরণ করিতে থাকে; এবং ধ্যান সিদ্ধির অভাবে যদি ধ্যেয় বস্তুর আকৃতি প্রকৃতি ও ভাব হৃদয়-মধ্যে অঙ্কিত করায় ক্ষমতা না জন্মিয়া থাকে, তবে আর কি মাথা মুণ্ড সমাধি করিবে? কিন্তু ঐ গুলি অভ্যাস করিয়া সিদ্ধ হইলে ব্যুত্থান শক্তির বল একবারেই ক্ষীণ হইয়া যায়। অর্থাৎ পরিচালন শক্তি এবং পোষণ শক্তি একবারে নিমীলিত প্রায় হয়। সুতরাং তদন্তর্গত ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া এবং ফুপ্ফুসাদির ক্রিয়াও তদবস্থাপন্নই হয়। রজঃ ও তমঃ শক্তিজনিত ব্যুত্থান শক্তির ক্ষীণতা নিবন্ধন চিত্তের সত্ত্বশক্তি প্রকাশিত হইয়া চিত্তের শুদ্ধি সম্পাদন করে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এ অবস্থায় সমাধির চেষ্টা করিতে গিয়া, যেই চিত্ত নিরোধের চেষ্টা করা যায়, আর অমনি তৎক্ষণাৎ, তৈলাভাবে নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ যেমন সামান্য বায়ুর সংস্পর্শ মাত্রেই নির্ব্বাপিত হয়, সেইরূপ ব্যুত্থান শক্তির ক্রিয়াগুলিও নিবাইয়া যায়। আর পূর্ব্ব হইতে উহাদিগকে সংযত করিয়া না রাখিলে, কাহার সাধ্য যে উহাদিগকে সংযত করিয়া সমাধির ভাব হৃদয়ে আনয়ন করিবে? অতএব পূর্ব্বাঙ্গ গুলির তীব্রতর অভ্যাস রাখা নিতান্ত আবশ্যক। এইরূপ অভ্যাস করিয়া সমাধির অনুষ্ঠানের সময় কেবল সমাধির প্রতিই তীব্রতর প্রযত্ন রাখিবে। তবেই দেহেতে সমাধি (সবিতর্ক সমাধি) হইবে। সবিতর্ক সমাধিতে কৃতকার্য্য হইয়া সবিচারাদিতে (৩০৯ পৃ) উন্নীত হইবে।

সমাধির প্রক্রিয়া।

শিষ্য। আপনার কৃপায় সমাধির প্রণালী একরূপ বুঝিলাম; কিন্তু কিরূপে সমাধি করিতে হয় তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক না বলিলে আমার কিছুই হইল না।

আচার্য্য। প্রথমে একাগ্রভাবে দেহটার ধ্যান করিতে হয়, তবেই দেহে সবিতর্ক সমাধি হইল।

শিষ্য। ইহাতো পূর্ব্বেও বলিয়াছেন কিন্তু সেই ধ্যানটি কিরূপ, দর্পণে যেরূপ নিজের প্রতিমূর্ত্তিটা দেখা যায়, ঠিক সেই আকারটি ধ্যান করিতে

হয়, অথবা নিজের দেহের দৃষ্টি করিলে যেরূপ অসম্পূর্ণ আকৃতি দর্শন হয় সেইরূপটি চিন্তা করিতে হয়, অথবা দেহের অন্য কোন প্রকার ধ্যান আছে তাহা বুঝিতে পারি নাই।

আচার্য্য। ওঁ হরি! ঐরূপ ধ্যান তোমার দেহের ধ্যানই নহে, দেহের সহিত সূর্য্যাদির আলোক সংস্পৃষ্ট হইয়া একপ্রকার বর্ণ শক্তি বিকীর্ণ হয়, উহা সেই বর্ণটিরই ধ্যান। দেহ কিন্তু ঐ বর্ণটি হইতে বিভিন্নভাবেই পড়িয়া আছে, অতএব বর্ণটির চিন্তা করিলে দেহের ধ্যান করা হইবে কেন? কিন্তু একাগ্রচিত্ত হইয়া যখন তোমার দেহের প্রত্যেক অনুপরমাণুকে মানসিক প্রত্যক্ষানুভব করিবে তখনই দেহের চিন্তা হইবে। চিন্তা বা ধ্যান করার অর্থই এখানে মনে মনে প্রত্যক্ষ করা, কিন্তু পূর্ব্বদৃষ্টবিষয়ের স্মরণ করা নহে। তুমি যে চিন্তার কথা বলিয়াছ উহা স্মরণ করা, উহা প্রত্যক্ষ করা নহে। অন্য কোন বিষয়ের জ্ঞান না হইয়া যখন কেবল মাত্র "নির্ব্বৃত্তিক দেহাত্মজ্ঞান" (৯৪ পৃ ১৩ প) হইতে হইতে চিত্ত অস্তিত্ব হারার ন্যায় হইবে তখনই সবিতর্ক সমাধি হইল।

এই ভাবটি আনয়ন করার নিমিত্ত প্রথমে উপযুক্ত আসনাদি গ্রহণ করিয়া নাসাগ্রন্যস্ত-দৃষ্টি হইবে, এবং অন্তরে অন্তরে দেহব্যাপক নিজের "অস্মিত্ব" টির অনুভবের চেষ্টা করিতে হয়। যদিও অন্য বস্তুর দর্শন স্পর্শনাদি কালেও আমাদের "আমিত্ব" অনুভূতির কোন ব্যাঘাত নাই, কিন্তু উহা কেবল "আমির" অনুভূতি নহে, উহা ঘটপটাদির সহিত বিমিশ্রিত "আমির" অনুভব। অতএব ঘটপটাদির আকারের সম্পর্ক হইতে বিমুক্ত ভাবে "আমির" অনুভব করারই চেষ্টা করিতে হইবে। চিত্ত এক এক-বার বিষয়াভিমুখে ধাবিত হইবে, অমনি তৎক্ষণাৎ প্রত্যাহৃত করিয়া তাহাকে সঙ্কোচিত করিবে। এইরূপ করিতে করিতে যখন দেখিবে যে মন আর কোন বাহ্য বিষয়ের দিকে যাইতেছে না। ঘটপটাদির চিন্তা করিতেছে না তখন কেবল "আমিরই" অনুভব হইবে। কিন্তু ইহা হইলেও, তোমার "আমি" এই প্রথমাবস্থায়ই দেহের সম্বন্ধ হইতে একবারে বিমুক্ত হইবে না; দেহের প্রত্যেক অণু পরমাণুর সহিত "আমির" মাখামাখী সম্বন্ধ বা অভিন্ন সম্বন্ধ থাকিবে; সুতরাং দেহই তখন "আমি" বলিয়া অনু-

ভূত হইবে; তবেই দেহের প্রত্যেক অণুপরমাণুর মানসিক প্রত্যক্ষ "নির্ব্বৃত্তিক দেহাত্মজ্ঞান" হইল। এখন তীব্রযত্নসহকারে ঐ অনুভবেরই স্থায়িত্ব রাখিতে চেষ্টা করিবে। চিত্ত একএকবার স্খলিত হইয়া যখন বাহ্যবিষয়ের দিকে অগ্রসর হইবে, অমনি প্রতিনিবৃত্ত করিয়া ঐ দেহানুভবের উপরে সংস্থাপিত করিবে। এইরূপ করিতে করিতে যখন দেখিবে যে মনের অস্তিত্বটা যেন বিস্মৃত হইয়া কেবলমাত্র দেহটিই প্রত্যক্ষ করিতেছ, তখনই "সবিতর্ক সমাধি" হইল।

সবিতর্ক সমাধিতে কিরূপ অনুভূতি হয়?

শিষ্য। এই সমাধিতে কিরূপ অনুভূতি হইবে তাহাও একটু বিশদ করিয়া বলুন।

আচার্য্য। দেহের অনুভব করিতে করিতে যখন সমাধি অবস্থা হইবে, তখন প্রথমে এই দেহেরউপাদান-ভৌতিকপদার্থগুলির স্থূলাবস্থাটির মানসিক প্রত্যক্ষ হইবে। ভূতের স্থূলরূপ কাহাকে বলে তাহা ভগবান্ বেদব্যাস দেব বলিয়াছেন,—"তত্র পার্থিবাদ্যাঃ শব্দাদয়ো বিশেষাঃ সহকারাদিভির্ধর্ম্মৈ স্থূলশব্দেন পরিভাষিতা ভবন্তি, এতদ্ভূতানাং প্রথমং রূপম্" (পা, ব্য, ৩ পা, ৪৩ সূ) অর্থঃ—পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের যে গন্ধ রসাদি নিজ নিজ গুণ এবং তৎসহকারী ধর্ম্মগুলি আছে, তাহাই ভৌতিক দ্রব্যের স্থূল অবস্থা বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। অর্থাৎ গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ আর শব্দ এই পাঁচটি গুণ, আর অন্যান্য কএকটি সহকারী ধর্ম্ম ইহারা পৃথিবী বা পার্থিব দ্রব্যের স্থূলরূপ বলিয়া অভিহিত হয়। রস, রূপ, স্পর্শ, ও শব্দ এই চারিটি গুণ আর অন্যান্য কএকটি সহকারী ধর্ম্ম ইহারা জলের স্থূলরূপ বলিয়া অভিহিত হয়। রূপ, স্পর্শ, শব্দ, আর অন্য কয়েকটি সহকারী ধর্ম্ম ইহারা তেজের স্থূলরূপ বলিয়া গণ্য। স্পর্শ, আর শব্দ গুণ এবং অন্য কয়েকটি সহকারী ধর্ম্ম, বায়ুর স্থূলরূপ বলিয়া অভিহিত আছে। আর কেবলমাত্র শব্দগুণ এবং কয়েকটি সহকারী ধর্ম্ম, আকাশের স্থূলরূপ বলিয়া গণ্য। এই স্থূলরূপই পঞ্চভূতের প্রথম-দৃশ্য অবস্থা বা প্রথম-দৃশ্য আকৃতি।" অতএব দেহে সমাধি করিলে প্রথমে এই গুলিরই অনুভূতি হইতে থাকিবে। সহকারী ধর্ম্ম কাহাকে বলে, এ বিষয়ও শাস্ত্রেই আছে;—

"আকারো গৌরবং রৌক্ষ্যং বরণং স্থৈর্য্যমেব চ।
বৃত্তিভেদঃ ক্ষমা কাষ্ণ্যং কাঠিন্যং সর্ব্ব ভোগ্যতা ॥ (১)
স্নেহঃ সৌক্ষ্যং প্রভাশৌক্ল্যং মার্দ্দবং গৌরবঞ্চ যৎ;
শৈত্যং রক্ষা পবিত্রত্বং সন্ধানঞ্চৌদকা গুণাঃ ॥ (২)
ঊর্দ্ধভাক্ পাবকং দগ্ধৃ পাচকং লঘুভাস্বরং।
প্রধ্বংস্যোজস্বি বৈ তেজঃ পূর্ব্বাভ্যাং ভিন্ন লক্ষণম্ ॥ ৩ ॥
তির্য্যগ যানং পবিত্রত্বমাক্ষেপো নোদনং বলং।
চলত্বমচ্ছতা রৌক্ষ্যং বায়ো ধর্ম্মাঃ পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৪ ॥
সর্ব্বতোগতিরব্যূহো বিষ্টম্ভশ্চেতি তত্ত্রয়ঃ।
আকাশ ধর্ম্মব্যাখ্যাতা পূর্ব্বধর্ম্ম বিলক্ষণাঃ ॥ ৫ ॥"

অর্থ,—নির্ম্মিত দ্রব্যের যে ভিন্ন ভিন্ন এক একটি আকৃতি বিশেষ থাকে, যদ্দ্বারা একটির সহিত অপরটির তুলনা করিয়া দুইটিকেই এক জাতীয় দ্রব্য বলিয়া গণ্য করা যায়, যেমন ঘটত্ব, পটত্ব, ইত্যাদি; ইহাকে "আকার" বলে। এই আকার এবং অধিকতর গুরুত্ব, ক্ষমতা, আবরকতা, স্থিতি-শক্তি, সহিষ্ণুতা, মলিন প্রভা, কঠিনতা, এবং সর্ব্বভোগ্যতা এই কয়েকটি পার্থিব পদার্থের ধর্ম্ম। স্নেহ, সূক্ষ্মতা বা স্বচ্ছতা, আশুক্ল প্রভা,* মৃদুতা, গুরুত্ব, শীতলতা, ধারকতা, পবিত্রতা, এবং সম্মিলন-শীলতা—এই কয়েকটি স্থূল জলের ধর্ম্ম। ঊর্দ্ধ-প্রবণতা, পাচকতা, দাহকতা, (সম্বন্ধের বিশ্লেষকতা), পাবনতা, লঘুতা, ভাস্বরতা, উৎপন্ন-প্রধ্বংশিতা, এবং ওজস্বিতা এই কয়েকটি তেজের ধর্ম্ম। তির্য্যগ্‌গমন, পবিত্রতা, আক্ষেপ, সামর্থ্য, চলত্ব আর রুক্ষতা, এই কয়েকটি বায়ুর ধর্ম্ম। আর অণু প্রবেশের দ্বারা সর্ব্ব পরিব্যাপ্ত অব্যূহ ভাব, বিষ্টম্ভ, এই কয়েকটি আকাশের ধর্ম্ম।" আমাদের দেহের মধ্যেও পঞ্চ ভূত আছে, পাঁচ প্রকার ভৌতিক পদার্থের দ্বারাই আমা-

* সমুদ্র জলের নীলিমা দর্শন করা জলের নীলিমার প্রমাণ হইতে পারে না। নীলাভ গগনমণ্ডলের ছায়া পড়িয়া সমুদ্রাদির জল আনীল বর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আবার কুম্ভাদি হইতে আরক্ত জল সাদা দেখায় বলিয়াই জলের শুভ্রত্ব প্রমাণ হয়, তাহাও নহে, তখন আকাশের এ : সূর্য্য কিরণাদির ছায়া পড়িয়াই ঐরূপ দেখায়।

দের দেহ, অতএব ঐ সকল গুণ আর ধর্ম্মই আমাদের দেহের স্থূলরূপ বা স্থূলাবস্থা, সুতরাং সবিতর্ক সমাধির প্রথমাবস্থায়,—উক্ত সকল গুলি ধর্ম্ম আর গন্ধাদি পাঁচ প্রকার গুণই মানসিক প্রত্যক্ষ গোচর হইবে।

এখন বলা বাহুল্য যে তোমার এই স্থূল দেহ বিমিশ্রিত "আমির" মধ্যে দেহের ঐ "স্থূলাবস্থা" অবধি দেহীয় ভৌতিক পদার্থ গুলির সূক্ষ্মাবস্থা এবং ইন্দ্রিয় প্রাণাদি, মন, অভিমান, বুদ্ধি, এবং প্রকৃতি পর্য্যন্ত সমস্তই আছে; সুতরাং ইহাদেরও পূর্ব্বোক্ত নিয়মে (৩য় খণ্ড) প্রত্যক্ষ হইবে, আবার চৈতন্যও যখন সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যমানই আছেন, তখন তাঁহারও সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত নিয়মেই (২৯৬ পৃ অবধি) অনুভূতি হইবে।

আবার ইহাও মনে রাখা উচিত যে এই সময়ে প্রবল মাত্রায় জ্ঞান শক্তির (২৮২ পৃ ২৬ প) বিকাশ হইয়াছে, সুতরাং রজঃ শক্তি আর তমঃ শক্তি জনিত অন্যান্য সমস্ত শক্তিই নিস্তব্ধ হইয়াছে। ইহার কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, (১৭৪ পৃ অবধি) অতএব বুদ্ধি-অভিমানাদি-ভাবাপন্ন হইয়া কেবলমাত্র (সত্ত্বগুণই জ্ঞানশক্তিরূপে) বিরাজ করিতেছে। কিন্তু তাহাও, দেহীয় ভৌতিক পদার্থের সহিত সম্বন্ধ থাকা নিবন্ধন, পূর্ব্ব নিয়মানুসারে (২৯৫ পৃ ২৪ প) দেহীয় ভৌতিক পদার্থ গুলির ঐ "স্থূলাবস্থার" আকারে আকারিত হইয়াছে। অতএব বাহ্য ঘট পটাদি সন্দর্শন কালে, যেমন ঐ ঘট পটাদি এবং তৎসঙ্গে আমাদের ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতিরও অনুভব থাকে, (২৭৬ পৃ ১০ প) কিন্তু আমরা সেটি মুখ্য রূপে গ্রাহ্য করি না, ঘটের অনুভূতিকেই মুখ্য রূপে গণ্য করিয়া থাকি। ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতির যে অনুভূতি হয়, উহা যেন ঘট জ্ঞানের অন্তরালেই থাকে, সেই রূপ এখানেও বুঝিবে। অর্থাৎ "সবিতর্ক সমাধি" কালেও, বুদ্ধ্যভিমানাদি-ভাবাপন্ন যোগীরসত্ত্বশক্তি, দেহীয় ভৌতিক পদার্থের "স্থূল রূপের" আকারে আকারিত হইয়াছে বলিয়া ঐ স্থূল রূপের জ্ঞানই মুখ্য রূপে গণ্য হইবে, কিন্তু তৎসঙ্গে যে বুদ্ধ্যভিমানাদি ভাবাপন্ন সত্ত্বশক্তি আছে, তাহার অনুভূতিটা উহার অন্তরালে থাকিবে, সেটা যেন গ্রাহ্যে আসিবে না, কেবল ঐ স্থূল রূপটাই যেন

গ্রাহে আসিতে থাকিবে। চৈতন্যদেবের প্রকাশও মলিন বেশেই হইবে, কারণ তিনি তখন স্থূল দেহের সহিত বিমিশ্রিত অবস্থায় আছেন। ইহাই সবিতর্ক সমাধির প্রথমাবস্থার অনুভব; এখন আর জিজ্ঞাস্য কি আছে বল।

সবিতর্ক সমাধিতে অন্তঃকরণের কি অবস্থা হয়?

শিষ্য। সবিতর্ক সমাধি কালে অন্তঃকরণের কিরূপ অবস্থা হয় তাহাও অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলুন।

আচার্য্য। গুরুদেব পতঞ্জলিই এই প্রশ্নের উত্তর করিয়াছেন "ব্যুত্থান নিরোধ সংস্কারয়োঃ অভিভব প্রাদুর্ভাবৌ নিরোধ ক্ষণ চিত্তান্বয়ো নিরোধ পরিণামঃ" (৩পা, ৯সূ) অর্থঃ,—প্রগাঢ় সমাধিকালে ব্যুত্থান শক্তির (৬ পৃ ১প) অর্থাৎ পরিচালনও পোষণ শক্তির সংস্কার গুলি, পূর্ব্বনিয়মানুসারে (১৭৪পৃ অবধি) নিতান্ত অভিভূত বা ক্ষীণ ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে, যেন বিকাশের ক্ষমতাই থাকে না। আর নিরোধের সংস্কার গুলি (৬৫পৃ ২৬প) অত্যন্ত বলবান্ হয়, তখন উহারাই চিত্তের মধ্যে আধিপত্য করে। ইহার নাম নিরোধ পরিণাম; এই হইল প্রথমাবস্থা। তৎপর, "তস্য প্রশান্ত বাহিতা সংস্কারাৎ" (ঐ১০সূ) ঐ রূপ অভ্যাসের বলে, নিরোধ সংস্কার গুলিই ধারা বাহী ক্রমে বিকশিত হয় এবং অন্যনিরপেক্ষ হইয়া কেবল নিরোধেই অবস্থিতি করে। এই অবস্থায়, "সর্ব্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তস্য সমাধি পরিণামঃ" (ঐ১১সূ) চিত্তের সর্ব্বার্থতা বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ নানা বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইয়া নানা বিষয়ের জ্ঞান জন্মান তখন হয় না, তখন কেবল মাত্র সেই ধ্যেয় বিষয়টির প্রতিই একাগ্রতা হইতে থাকে। তৎপর, "ততঃ পুনঃ শান্তোদিতৌ তুল্য প্রত্যয়ৌ চিত্তস্যৈকাগ্রতা পরিণামঃ" (প ৩সূ১২) অন্যান্য জ্ঞানবৃত্তি একবারে উপশান্ত হইয়া যায়, এবং ধ্যেয় বিষয়ের বৃত্তিটীই চিত্ত মধ্যে প্রগাঢ় রূপে অঙ্কিত হইয়া থাকে। ইহারই নাম চিত্তের একাগ্রতা পরিণাম। তবেই এই হইল যে সবিতর্ক সমাধির প্রথম অবস্থায় (দৈহিক ভূতের স্থূলাবস্থায় সমাধিকালে) কেবল ঐ দৈহিক ভূতের স্থূলাবস্থাটী মাত্রই তোমার

অস্তিত্বের মধ্যে ভাসিতে থাকিবে আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। ইহাই চিত্তের তাৎকালিকী অবস্থা।

সবিতর্ক সমাধির ফল।

অতএব এখন জানা গেল যে "সবিতর্ক সমাধির" দ্বারা নির্ব্বৃত্তিক দেহাত্মজ্ঞান-স্বরূপধর্ম্ম (৯১ পৃ ১৩ প) এবং "ইন্দ্রিয়-প্রাণবৃত্তি নিরোধের (৬৬ পৃ) বিকাশ হয়। নিরোধের বিকাশ হইলেই ধৃতি ক্ষমা প্রভৃতি ধর্ম্মের বিকাশ হয় তাহা পূর্ব্বেই (২য় খণ্ডে) বলিয়াছি। এতদ্ব্যতীত আত্মার যত প্রকার গুহ্য শক্তি আছে, সকলেরই বেগ বৃদ্ধি ও বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অর্থাৎ একান্তরূপে আরোগ্য কামনা করিয়া, যদি যোগী কাহারও মস্তকে হস্তার্পণ করেন, কিম্বা তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, অথবা বলবতী ইচ্ছাও করেন, তাহাতেই রোগীর রোগ বিদূরিত হয়। আবার নিজ দেহের উপরেও বিলক্ষণ আধিপত্য হয়। কোন রূপ ব্যাধি হইলে ইচ্ছা মাত্রেই তাহাকে উপশান্ত করিতে পারেন ইত্যাদি আরও অনেক ফল পাওয়া যায়। ইহার কারণ এখানে বিস্তৃতরূপে বুঝানের অবকাশ নাই, তবে সঙ্ক্ষেপে একটি দৃষ্টান্ত বুঝিলেই, ইহার কতকটা আভাস পাইতে পারিবে। কোন নদী বা খালের মধ্যে বাঁধ দিয়া, তাহার প্রবাহ বন্ধ করিলে, তাহার এক দিকের জল নিতান্ত বিক্ষুব্ধ ও স্ফীত হইয়া সঞ্চিত হইতে থাকে এবং সেই সময়ে ঐ বাঁধ ছাড়িয়া দিলে স্রোতের বেগ পূর্ব্বাপেক্ষায় লক্ষ গুণে অধিকতর হইয়া থাকে, ইহা বোধ হয় অবশ্যই অবগত আছ, এখানেও সেই রূপই জানিবে। আত্মার শক্তি সর্ব্বদাই লক্ষ লক্ষ শিরা দ্বারা লক্ষ লক্ষ ধারে বাহিরের দিকে বহিয়া যাইতেছে। কিন্তু তাহাকে যদি সংযমের বাঁধে নিরুদ্ধ করিয়া রাখা যায়, তবে সুতরাংই অভ্যন্তর প্রদেশে তাহার স্ফীততা বা উপচয় হয়। অতএব তখন যদি কোন সময়ে কোন কার্য্যের নিমিত্ত তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে সে পূর্ব্বাপেক্ষায় অত্যন্ত বেগশালিনী হইয়া কার্য্য সাধন করে। এমন কি তখন উপচিকীর্ষা প্রভৃতি সৎ প্রবৃত্তির বাঁধ না ছাড়িয়া, যদি ক্রোধাদি কুপ্রবৃত্তির বাঁধগুলি ছোটে, তাহাতেও ভয়াবহ কার্য্যই হইবে। অতএব সাবধান। যোগিন্!

সাবধান! কুপ্রবৃত্তির বাঁধ যেন তখন কদাচ ছোটে না, উহা অতিশয় যত্ন করিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। এই গেল ইহকালের ফল, তৎপর মৃত্যু হইলে এই সবিতর্ক যোগীর কোন্ স্থানে গতি হয়, তাহাও বলিতেছি।

শ্রুতি বলেন "সযদ্যেক মাত্র মভিধ্যায়ীত শতেনৈব সম্বেদিত স্তূর্ণ মেব জগত্যামভি সম্পদ্যতে। তমৃচো মনুষ্য লোক মুপনয়ন্তে, সতত্র তপসা ব্রহ্ম চর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সম্পন্নো মহিমান মনু ভবতি" (প্রশ্নোপনিষৎ)

ভাবার্থ,—সবিতর্ক সমাধিতে সিদ্ধি হইলে মৃত্যুর পরে কোন যাতনাদি কিছু না হইয়া অতি শীঘ্রই জন্ম হয়। কিন্তু সেই জন্মে তিনি বাহ্য বিষয়ের উপর কিছু মাত্র ব্যাসক্ত বা লিপাযু থাকেন না, কিন্তু সদ্ ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জিতেন্দ্রিয় সংযতমনা, ও আচারপরায়ণ হইয়া থাকেন। এবং তপশ্চর্য্যা দ্বারা আপনার মহিমার অনুভব করেন। * ইহা কি প্রকারে হয়, তদ্বিষয়ে এখন হস্তার্পণ করিব না; পরকাল বর্ণনার সময় ইহা বুঝিতে পারিবে।

মুক্তির সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম।

আবার আর একটি কথা,—যাহা এপর্য্যন্ত নামতঃ ও উচ্চারণ করা হয় নাই, অথচ যাহা মনীষি-ব্যক্তির একমাত্র লক্ষ্য—যাহার উপায় নির্ণয়ের নিমিত্ত সমস্ত শাস্ত্রের অসীম বিস্তৃতি হইয়াছে। সেই জিনিষটির নাম মুক্তি; মুক্তির বিষয় এখন প্রসঙ্গাধীন কিছু বলিতে হইল। মুক্তি কাহাকে বলে মুক্তির লক্ষণ কি, উহা কত প্রকার, ইত্যাদি বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক পরেই বলিব, এখন কেবল মোটামোটী অর্থটা শুন,—মুক্তি কথাটি, সচরাচর যে অর্থে ব্যবহৃত বা অভিহিত হয়, শাস্ত্রেও সেই

* এই শ্রুতিটিতে যদিও প্রণবের প্রথম মাত্রায় ধ্যানেরই এইরূপ ফল লিখিয়াছেন সত্য, কিন্তু প্রণবের প্রথম মাত্রা আর দেহের ভৌতিক স্তব যখন একই পদার্থ, তখন যুক্তিসাম্যে উভয় চিন্তারই সমফল হইবে। তাই এখানে ঐটি উদ্ধৃত করিলাম।

"মোচন" অর্থেই ব্যবহৃত হয়। বন্ধন বা আবদ্ধভাব হইতে বিমোচন হওয়ার নামই আমাদের আত্মার মুক্তি। আবদ্ধথাকা যেরূপ বাহ্য বস্তুরও অনেকই প্রকারেই সম্ভবে, আত্মারও অনেক প্রকারেই সম্ভবে। সুতরাং তাহার মুক্তিও অনেক প্রকারই হইবে। মনে কর, তুমি যে ঘরটির মধ্যে বসিয়া আছ, ইহার সকল গুলি দ্বার যেন অবরুদ্ধ আছে; তৎপর যেন এই বাড়ীর একটি প্রকাশিত দ্বার আছে, তাহাও অবরুদ্ধ, আবার তৎপর প্রাচীরের একটি দ্বার আছে, তাহাও অবরুদ্ধ আছে; তাহা হইলেই, তুমি প্রথমে ঐ প্রকোষ্ঠের মধ্যে আবদ্ধ আছ, তৎপর এই বাড়ীতে আবদ্ধ আছ, তৎপর ঐ প্রাচীরে আবদ্ধ আছ। এখন যদি তুমি কোন মতে এই প্রকোষ্ঠ হইতে বহির্গত হইতে পারিলে তবে এই প্রকোষ্ঠ হইতেই তোমার মুক্তি হইল; আর বাড়ী হইতে বহির্গত হইতে পারিলে ঐ বাড়ী সম্বন্ধে তোমার মুক্তি হইল; আর প্রাচীর হইতে বহির্গত হইতে পারিলে প্রাচীর সম্বন্ধেও তোমার মুক্তি হইল। আমাদের আত্মাও এইরূপ অনেক প্রকারে আবদ্ধ আছে তাহার একএকটি হইতে স্খলিত হইতে পারিলেই এক এক প্রকার মুক্তি হইল।

ধন, সম্পত্তি, গৃহ, পুত্র, পরিবারাদি বাহ্যবিষয়ের সহিত, আত্মার একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় বন্ধন আছে; উহা বহিশ্চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু অন্তরে অন্তরে উহা বিলক্ষণ অনুভূত হয়, উহা যে শৃঙ্খল-বন্ধন অপেক্ষায়ও অতিশয় সুদৃঢ়, তাহাও বেশ বুঝিতে পারা যায়। তোমার কতকগুলি টাকা কড়ি, বা অন্য কোন দ্রব্য, কেহ লইয়া যাইতে থাকুক, দেখিবে, তোমার হৃৎপিণ্ডটি যেন উৎপাটন পূর্ব্বক বাহির করিয়া লইয়া যাইতেছে, পুত্রটির গাত্রে কেহ হস্ত স্পর্শ করুক, বোধ হইবে যেন তোমারই গায়ে আঘাত করিয়া গেল, এবং পুত্রের ব্যাধি হইলে যেন তোমারই ব্যাধি হইয়াছে এইরূপ বোধ হইবে। স্ত্রী, ভ্রাতা প্রভৃতি অন্যান্য স্বজন সম্বন্ধেও এইরূপই হয়। ইহাদের সহিত আত্মার বন্ধন না থাকিলে কি এরূপ হইতে পারে? সকলের জন্যে তো সকলের কিছুই হয় না? বাস্তবিক একরূপ অদ্ভুত বন্ধনই আছে—যাহা পরে বিশেষরূপে শুনিতে পাইবে। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রকার বন্ধন আছে তাহাও ক্রমে ক্রমে

দেখাইব। কিন্তু এই যে বাহ্যবিষয়ের সহিত বন্ধনটি, ইহা সবিতর্ক সমাধির প্রথমাবস্থায়ই নিতান্ত শিথিল হইয়া, ছিন্ন-প্রায় হইবে, তৎপর ইহার দ্বিতীয়াবস্থায় একবারেই ছিন্ন হইয়া যাইবে। তখন এই বন্ধন হইতে একবারেই মুক্তি পাওয়া যায়,—কিন্তু এইক্ষণে তাহার হব-হব অবস্থাটি হয়। এখন তোমার "আমিত্ব" টা যেন বাহির হইতে গুটাইয়া আসিয়া, দেহের মধ্যে জড়সড় মত অনুভূত হইবে। এবং বাহ্য বস্তুর উপভোগের দ্বারা যাদৃশ আনন্দের উপলব্ধি হয়, তদপেক্ষায় বহুগুণ অধিক আনন্দের উপভোগ হইবে; অতএব তখন বহিঃস্থ বস্তুর উপরে যোগীর স্পৃহাও কমিয়া যায়, এবং সম্বন্ধও তাহাদের বিশ্লথ হইয়া যায়। এই যত প্রকার ফলের কথা বলিলাম, ইহা সমাধি অবস্থায়ও হয়, আবার জাগ্রত অবস্থায়ও থাকে। ইহার কারণাদি পূর্ব্বেই (২য় খণ্ডে) বলিয়াছি। এই গেল সবিতর্ক সমাধির প্রথমাবস্থা। এখন দ্বিতীয়াবস্থার বিষয় শুন।

সবিতর্ক সমাধির দ্বিতীয়াবস্থার বিবরণ।

ভৌতিক পদার্থের স্থূলরূপের কথা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি (পৃ প) কিন্তু তদ্ব্যতীত আর একটি অবস্থা আছে তাহার নাম "স্বরূপ"। স্বরূপ কি তাহা বুঝান অতি কষ্টকর বিষয়। দ্রব্যের যত প্রকার গুণ, ধর্ম্ম, বা শক্তি আছে, তৎ সমস্তই যদি একবারে অনভিব্যক্ত বা অজ্ঞেয় অবস্থায় থাকে তবে উহার যে অবস্থাটি দাঁড়ায়, তাহারই নাম দ্রব্যের স্বরূপ। মনে কর, তোমার এই পুস্তক খানি আছে, ইহা অবশ্যই পার্থিব পদার্থ ইহার যদি এই শাদা বর্ণটি, এবং চতুষ্কোণত্বাদি আকৃতি, এবং কাঠিন্য ও মৃদুত্বাদি সমস্ত গুলিন গুণ অপ্রকাশিত, বা অজ্ঞেয় অবস্থায় থাকে, তবে যে অবস্থা হয় তাহাই পার্থিব পদার্থের "স্বরূপ" অবস্থা। এইরূপ অবস্থা কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই অনুভূত হইতে পারে না। কারণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কেবল দ্রব্যের গুণ বা শক্তি গুলিরই পরিগ্রহ হইয়া থাকে, তদ্ব্যতীত আর কিছুই অনুভব করা যায় না। এইপুস্তক খানির দিকে তাকাইলে, তুমি ইহারই এই শাদা বর্ণ ও আকৃতিটি মাত্রই দেখিতে পাও; আবার

কর দ্বারা স্পর্শ করিলে, কেবল ইহার কাঠিন্যাদি গুণই উপলব্ধি করিতে পার, ইহাকে রসনায় সংলগ্ন করিলে, ইহার তিক্তাম্লাদি রসেরই অনুভব করিতে পার, এবং নাসিকার নিকট লইলে ইহার গন্ধ গুণটি মাত্রই বুঝিবে। এতদ্ব্যতীত আর কিছুই বুঝিতে পার কি? কখনই না। অতএব দ্রব্যের স্বরূপাবস্থা, সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই অগোচর; ইহাই ভৌতিক পদার্থের দ্বিতীয় অবস্থা বা দ্বিতীয় রূপ। শাস্ত্রেও উহাকেই স্বরূপাবস্থা বলিয়াছেন,—গুরুদেব বেদব্যাস বলেন,—"দ্বিতীয়ং রূপং? স্বসামান্যং মূর্ত্তি র্ভূমিঃ, স্নেহোজলং বহ্নিরুষ্ণতা, বায়ুঃপ্রণামী, সর্ব্বতো গতিরাকাশঃ, ইত্যেতং স্বরূপ-শব্দে নোচ্যতে" (পা, দ, ৩ পা ৪১ সূ, ভাঃ) অর্থ,—ভূত ভৌতিক পদার্থের, দ্বিতীয় রূপ কোন বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করিয়া বলার উপায় নাই; কারণ গুণ ক্রিয়ার দ্বারাই বস্তুর নির্দ্দেশ করা হয়। কিন্তু সমস্ত গুণ ক্রিয়া বাদ দিয়া যে অবস্থা থাকে, তাহাই ভৌতিক পদার্থের দ্বিতীয়াবস্থা। এই অবস্থার নামই ভৌতিক পদার্থের স্বরূপ (ভাবার্থ)।"

এই দ্বিতীয়াবস্থা বা স্বরূপাবস্থা আমাদের দেহীয় ভৌতিক পদার্থেরও আছে, সেই অবস্থার অনুভূতি হওয়াই সবিতর্ক সমাধির দ্বিতীয়াবস্থা। পরন্তু প্রথমাবস্থা হইতে এই দ্বিতীয়াবস্থায় যাইবার নিমিত্ত আর বিশেষ কোন শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। শাস্ত্র বলেন "যোগেন যোগোজ্ঞাতব্যো যোগো যোগাৎ প্রবর্ত্ততে। যোপ্রমত্তস্তু যোগেন সযোগে রমতে চিরং।" যোগের এক স্তরে উঠিতে পারিলেই, তাহার উপরি তলস্তর আপনেই বুঝিতে পারা যায়, এবং আপনেই নীচ স্তর হইতে উপরিস্থ স্তরে আরোহণ করা যায়।" দৈহিক ভূতের স্থূলাবস্থাতে সমাধির অভ্যাস করিতে করিতে, চিত্তের নিরোধ শক্তি যখন আরও প্রবলা হইয়া উঠে, এবং সত্ত্বশক্তির আরও বৃদ্ধি হইয়া চিত্তের নির্ম্মলতাও বৃদ্ধি পায়, সুতরাং তখন ভৌতিক পদার্থের স্বরূপাবস্থা কিছু কিছু অনুভূত হইতে থাকে। এবং স্থূলাবস্থাটা ক্রমে ক্রমে চিত্ত হইতে অন্তর্হিত হইতে আরম্ভ হয়। কারণ স্থূলাবস্থায় একাগ্রতা কালে চিত্তের যে অবস্থা হয়, তাহা আমাদের জাগ্রদবস্থা হইতে নিষ্ক্রিয় বা নিরুদ্ধাবস্থা হইলেও, উহা একবারে নিরুদ্ধাবস্থা নহে, কারণ ঐ সময়ে যখন ভৌতিক পদার্থের স্থূলাবস্থার, অর্থাৎ ক্রিয়া-

গুণাদির উপলব্ধি হয়, তখন চিত্তের ক্রিয়া হইতেই হইবে, ক্রিয়া না হইলে উহাদের অনুভব হইবে কেন? অতএব উহা আপেক্ষিক নিরোধাবস্থা মাত্র। সুতরাং, এতদবস্থা অপেক্ষায়, নিরোধ শক্তির একটু বৃদ্ধি হইলেই এই অনুভূতি ক্রমে ক্রমে অন্তর্হৃত হইতে থাকে। অবশেষে একবারেই অভাব প্রাপ্ত হয়; তখন কেবল ঐ স্বরূপাবস্থারই অনুভূতি হয়। এই সময়ই সবিতর্ক সমাধির দ্বিতীয়াবস্থা পূর্ণ মাত্রায় বিকসিত হইল। এই অবস্থায় আর আর সমস্তই প্রথমাবস্থার স্থায় জানিবে; কিন্তু মুক্তি সম্বন্ধে একটু বেশী পরিবর্ত্তন হয়। সবিতর্ক সমাধিতে কৃতকার্য্য হইলে, বহিঃস্থিত বিষয়ের সহিত আত্মার সম্বন্ধটা একেবারেই ছাড়িয়া যায়। ঐ সমাধি হইয়া জাগ্রৎ হইলেও কোন প্রকার বহির্বিষয়ের উপর কিছুমাত্র মায়া মমতা, বা লিপ্সাদি থাকে না। কারণ বহির্বিষয়ের উপভোগে যেরূপ আনন্দের অনুভূতি হয়, এই সমাধি অবস্থায়, তদপেক্ষায় অনেক অধিক পরিমাণে আনন্দানুভব হইয়া থাকে; সুতরাং, সন্দেশ খাইতে খাইতে যেমন গুড়ের উপর বিরক্তি হইয়া যায়, সেই রূপ বাহ্য বিষয়ে উপর বিরক্তির বৃদ্ধি হইয়া উঠে। এই গেল সবিতর্ক সমাধির বিবরণ, এখন সবিচারের বিবরণ শ্রবণ কর।

সবিচার সমাধির বিবরণ।

ভৌতিক পদার্থের, স্থূল, আর স্বরূপ এই দুইটি অবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত আর একটি অবস্থা আছে, তাহার নাম "ভূতের সূক্ষ্মাবস্থা" অথবা "তন্মাত্র অবস্থা"। শাস্ত্রই বলেন "অথকিমেতেষাং তৃতীয়ং রূপম্? তন্মাত্রং ভূতকারণম্ তস্যৈকোহবয়বঃ পরমাণুঃ * * * এতদ্ভূতানাং তৃতীয়ং রূপম্।" (৩ পা, ৪৩ সূ. ভা,) "ভূতের তৃতীয়াবস্থা 'তন্মাত্র', তাহারই রূপান্তর হইয়া এই স্থূলভূতাবস্থা হইয়াছে, তাহারই একটু স্থূলাবস্থার নাম পরমাণু"। ইহার বিশেষ বর্ণনা দ্বিতীয় পর্ব্বে করিব, ইহাই ভূতের সূক্ষ্মাবস্থা বা তৃতীয়াবস্থা।

এই তৃতীয়াবস্থা যেমন বহিঃস্থ ভৌতিক পদার্থের আছে, তেমন

দেহীয়-ভৌতিক পদার্থেরও আছে, তাহাতে সমাধি হইলেই সবিচার সমাধি হইল। সবিতর্ক সমাধিতে অভ্যাস পটুতা হইলে আপনিই সবিচার-সমাধির ভাব উপস্থিত হয়। তীব্রতর যত্ন সহকারে সবিতর্কের অভ্যাস করিতে করিতে, নিরোধের বল ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এবং সত্ত্বগুণের আধিক্য হইয়া ক্রমেই চিত্তের নির্ম্মলতাও বাড়ে, সুতরাং ক্রমেই সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম তত্ত্বের উপলব্ধির ক্ষমতা জন্মে, অতএব তখন স্থূলভূতের সূক্ষ্মাবস্থায় অনুভব হইতে থাকে, আর ভূতের স্বরূপাবস্থাটি মন হইতে অন্তর্হিত হইতে হইতে, অবশেষে এককালেই বিলুপ্ত হইয়া যায়, এবং সূক্ষ্মাবস্থারই সম্পূর্ণ রূপে পরিস্ফুর্ত্তি হইতে থাকে। তখনই সবিচার সমাধির পূর্ণাবস্থা হইল। এই সময়ে "নির্ব্বৃত্তিক দেহাত্মজ্ঞান" (৯১ পৃ ১৩ প) বিলুপ্ত প্রায় হয়, স্থূল-দেহটার উপর যে একটা "আমিত্ব" ভাব আছে, তাহা বিনষ্ট প্রায় হয়। এখন মুখ্য কল্পে, ঐ সূক্ষ্ম-ভৌতিকাবস্থারই উপলব্ধি হয়, এবং পূর্ব্ব নিয়মানুসারে তদন্তরালে বুদ্ধি অভিমানাদির ও গৌণভাবে অনুভূতি হয়। বলা বাহুল্য, যে এই অবস্থায় চৈতন্যেরও একটু আপেক্ষিক অধিক পরিস্ফুট উপলব্ধি হয়। এই অবস্থায় আত্মার আর এক প্রকার মুক্তি বা বন্ধন বিমোচনের সূত্রপাত হয়।

আমরা যে বাহ্য বস্তুর উপর মায়া মমতা করিয়া থাকি, তাহা দেহের মায়া মমতার অধীন, আমরা দেহকেই ভালবাসি, তাই বাহ্যবস্তুকেও ভালবাসি, কারণ বাহ্যবস্তুরদ্বারা দেহের পরিপুষ্টি হইয়াই মানসিক তৃপ্তি লাভ হয়। সুতরাং দেহের মমতাই যে,আমাদের সর্ব্বাপেক্ষায় অধিক,ইহা আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই। অতএব জানা গেল যে দেহের সহিতও আত্মার একটা সুদৃঢ় দুর্ভেদ্য সম্বন্ধ অথবা একটা বন্ধন বিশেষ আছে—যদ্দ্বারা দেহ আর আমি,যেন এক হইয়া আছি। এই বন্ধনটিই সচরাচর সমাধি অবস্থায় অত্যন্ত শ্লথ হইয়া আইসে। এই সময়ে পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিকতর আনন্দের বিকাশ হয়। বলা বাহুল্য যে, এই যে সকল আনন্দ বা সুখের কথা বলিতেছি ইহা "অলৌকিক সুখ" বা অলৌকিক আনন্দ; সুতরাং রজঃ আর তম অংশের ক্ষয় হইয়া সত্ত্বশক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই এই আনন্দের পরিবৃদ্ধি হয়। এই গেল সবিচার সমাধির বিবরণ এখন "সানন্দ সমাধির" কথা শুন।

সানন্দ সমাধির বিবরণ।

ইন্দ্রিয় এবং মনেতে সমাধি হওয়ার নাম "সানন্দ সমাধি" ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সবিচার সমাধির পরিপক্কতাবস্থায়ই এই সানন্দ সমাধির অঙ্কুর প্রস্ফুটিত হয়। দৈহিকভূতের তন্মাত্র বা সূক্ষ্মাবস্থার অনুভূতির সময়ও অন্তঃকরণের ক্রিয়া হয়, চিত্ত তখনও তদাকারে আকারিত হয়। ক্রিয়া না থাকিলে তদাকারে আকারিত হইতে পারে না, সুতরাং পূর্ণনিরোধাবস্থা হয় না। কিন্তু এই সমাধির অবস্থা স্থির রাখার নিমিত্ত তীব্রতর যত্ন করিতে করিতে, নিরোধশক্তি আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; সুতরাং ঐ ক্রিয়া টুকু (যদ্দ্বারা অন্তঃকরণ, তন্মাত্রের আকারে আকারিত হইতেছিল সেই ক্রিয়া টুকও) অন্তর্হিত হয়। অতএব "তন্মাত্রের" আর অনুভব থাকে না, তাহা হইলেই যোগীর অন্তঃকরণ একবারে নির্ব্বিষয় হইল, সুতরাং কেবল নিজের অস্তিত্বটি মাত্রই তখন প্রকাশ পাইতে লাগিল। কিন্তু অন্তঃকরণ তখন কেবল সূক্ষ্মাবস্থাপন্ন জ্ঞান শক্তিরূপে পরিণত হইলেও দেহেতে যখন পরিব্যাপ্তি রহিয়াছে তখন বুদ্ধি অভিমান, মন ইন্দ্রিয় (জ্ঞানেন্দ্রিয়) এই চারি অবস্থায়ই বিদ্যমান আছে। অতএব তন্মাত্রের আকার পরিত্যাগ করিয়া যখন অন্তঃকরণ নিজের অবস্থায় দাঁড়াইবে তখনও প্রথমে তাহার স্থূলাবস্থারই (ইন্দ্রিয়াবস্থারই) সূক্ষ্মানুভব হইবে, সুতরাং আনন্দ সমাধির প্রথমাবস্থা হইল।

এই সময়ে, নির্ব্বৃত্তিক দেহাত্মজ্ঞান একবারেই বিনষ্ট হইয়া গেল, সুতরাং দেহের সহিত যে মমতা বন্ধন ছিল তাহাও সম্পূর্ণ বিশ্লিষ্ট হইল, তবেই দৈহিক মুক্তি হইল। আর নির্ব্বৃত্তিক ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞান পূর্ণমাত্রায় (৯১ পৃ ২০প) বিকশিত হইল। এখন কেবল ইন্দ্রিয়ের সহিত মাখামাখী ভাবাপন্ন হইয়াই আত্মা প্রকাশ পাইতে লাগিলেন, যোগীর "অস্মিত্বটা" কেবল ইন্দ্রিয় শক্তি আর চৈতন্যের উপরেই দাঁড়াইল। ইহাই সানন্দ সমাধির প্রথমাবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

তৎপর, পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারেই ক্রমে মনেতে সমাধি হইবে, তখন ইন্দ্রিয় শক্তি মনের মধ্যে বিলীন হইবে, ইন্দ্রিয়ের স্বরূপ নিরোধ (৭৯ পৃ ১৬ প) হইবে, সুতরাং নির্ব্বৃত্তিক ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞানও বিনষ্ট হইবে, এবং ইন্দ্রিয়

শক্তির সহিত আত্মার "আমিত্ব বন্ধনটা বিমুক্ত হইবে। তখন মানসাত্ম-জ্ঞান (৯২ পৃ ৫ প) হইতে থাকিবে। এই সময়ে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে আধ্যাত্মিকী শক্তিগুলিও অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ইহাই সানন্দ সমাধির দ্বিতীয়াবস্থা।

অস্মিতামাত্র সমাধির বিবরণ।

তৎপরে, পূর্ব্ব নিয়মেই নিরোধ শক্তির পরিবৃদ্ধি হইয়া, অভিমানে সমাধি হয়, তখন মন অভিমানে বিলীন হইয়া যায়, মনের স্বরূপ নিরোধ হয়, (৮১ পৃ ১৭ প) সুতরাং মানসাত্মজ্ঞানেও বিনষ্ট হয় এবং মনের সহিত আত্মার আমিত্ব ভাবও বিনষ্ট হয়। তবেই মনের বন্ধন ছুটিয়া গেল; মন হইতে মুক্তি হইল। তখন নির্ব্বৃত্তিক অভিমানাত্ম জ্ঞান (৯২পৃ ১৮প) হইতে থাকে এবং তাহাতে যে যে অবস্থা বলা হইয়াছে (১০৩পৃ ৩প) তাহাই হয়। এ সময়ে আধ্যাত্মিক শক্তিগুলি আরও অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহাই অস্মিতামাত্র সমাধির প্রথমাবস্থা।

তৎপর এই সমাধিতে পটুতা লাভ করিলে পূর্ব্ব নিয়মেই, নিরোধ শক্তির বৃদ্ধি হইয়া অভিমানের স্বরূপ নিরোধ হয়, এবং বুদ্ধিতে সমাধি হইয়া যায়। তখন অভিমান বুদ্ধিতে বিলীন হয়, সুতরাং অভিমানের অনুভূতি থাকে না, এবং নির্ব্বৃত্তিক অভিমানাত্মজ্ঞানও থাকে না, সুতরাং অভিমানের সহিত যে "আমিত্ব বন্ধন" ছিল. তাহা হইতে মুক্তি হয়। এখন কেবল বুদ্ধি আর আত্মারই অনুভূতিটি থাকে, এখন নির্ব্বৃত্তিক বুদ্ধ্যাত্মজ্ঞান হইতে থাকে, যোগীর আমিত্বটি তখন কেবল আত্মা বুদ্ধির উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে। এই সময়ে পূর্ব্বনিয়মানুসারে অনেকগুলি আধ্যাত্মিক শক্তি বিকসিত হয়। ইহাই অস্মিতামাত্র সমাধির দ্বিতীয়াবস্থা।

নির্ব্বীজ-সমাধির বিবরণ।

অস্মিতামাত্র সমাধিতে নৈপুণ্য হইলে ক্রমেই পূর্ব্বোক্ত নিয়মে, নিরোধ শক্তির অতিশয় বৃদ্ধি হইয়া বুদ্ধিরও স্বরূপ নিরোধ হয়, সুতরাং বুদ্ধ্যাত্ম

জ্ঞানও (৯২ পৃ ২৪প) বিলুপ্ত হয় এবং একরূপ অপূর্ব্ব অবস্থার বিকাশ হয়। ভগবান্ পতঞ্জলি বলেন, "তজ্জঃ সংস্কারো অন্য সংস্কার প্রতিবন্ধী" (৫১ সূ) সমাধি অবস্থায় তীব্রতম নিরোধ শক্তির অবিচ্ছিন্ন সংস্কার রাশি সঞ্চিত হইলে ব্যুত্থান শক্তির সংস্কার গুলি এক কালে অভিভূত হইয়া যায়; সুতরাং তখন কোন প্রকার চিন্তা বা অন্য ক্রিয়াদি কিছুই থাকে না, কিন্তু একরূপ অপূর্ব্ব অনুভূতি হয়, এই অনুভূতির মধ্যে "প্রকৃতি" আর "পুরুষ" এতদুভয়ই থাকেন বটে; কিন্তু তাহার কোন আকার বর্ণনা করার সাধ্য নাই, তাহাতে "আমি"ভাবের লেশমাত্রও থাকে না, তখন জ্ঞেয়াবস্থাটি লুকাইয়া গিয়া যেন কেবল উপলব্ধির অবস্থাতেই বিদ্যমান থাকে, "আমি এই জানিতেছি, আমি এই অনুভব করিতেছি, ইত্যাদি ভাবের লেশমাত্র থাকে না, অথচ প্রকৃতির অপেক্ষায় যে পুরুষ বিভিন্ন বস্তু, তাহা প্রকাশ হয়। এই অবস্থায় বুদ্ধি সহিত যে আত্মার বন্ধন ছিল তাহাও উঠিয়া যায়, এবং অণিমা লঘীমা প্রভৃতি অষ্টৈশ্বর্য্যের বিকাশ হয় "ততোঽণিমাদি প্রাদুর্ভাবঃ" (পা, দঃ) এবং প্রকৃত্যাত্ম জ্ঞানই হইতে থাকে। ইহা নির্ব্বীজ সমাধির প্রথম অবস্থা।

পরে, ধারাবাহীক্রমে এই সমাধি থাকিতে থাকিতে, "তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধান্নির্ব্বীজঃ সমাধিঃ (পাদ ২ সূ) ঐ অবস্থায়ও নিরোধ হইয়া গেলে সমস্ত প্রকার সংস্কারাদির অভাব হইয়া পড়ে, তখন নির্ব্বীজ সমাধির দ্বিতীয়াবস্থা হয়।

এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, দেহের বৃত্তি নিরোধ অবধি রজঃ ও তমোগুণকে খর্ব্ব করিয়া সত্বশক্তির বৃদ্ধি হইতে হইতে যখন বুদ্ধিতে সমাধি হইল, তখন সত্বশক্তি বৃদ্ধির চরমাবস্থা হইল, রজঃ আর তমঃ ও এককালে অন্তর্হিত হইয়া গেল। অভ্যাসের পটুতায় উহা এমন ভাবে বিনষ্ট হইল যে, উহারা আর কখনও বিজৃম্ভিত হইতে না পারে। আবার সত্ব শক্তিরও যে অতিশয় বৃদ্ধি তাহাও উহাদের ক্ষয় করার নিমিত্তই হইয়াছিল, সুতরাং উহাদের যখন অস্তিত্ব পর্য্যন্তও বিলীন হইয়া গেল, তখন সত্ত্ব শক্তির তেজও আপনিই কমিতে আরম্ভ করিল, কমিতে কমিতে যখন প্রকৃতির অবস্থায় আসিল, তখন প্রকৃত্যাত্ম জ্ঞান এবং

সংস্কার শেষ নির্ব্বীজ সমাধি হইল। পরে প্রকৃত্যবস্থাও বিলীন হইয়া গেলে, তখন যোগীর "আমির" মধ্যে, কোন গুণ, কোন শক্তি, কোন ধর্ম্ম, কোন বৃত্তি বা বিশেষণ ইত্যাদি কিছুই থাকিল না। যাহার সহিত মাখামাখি সম্বন্ধ হইয়া চৈতন্যস্বরূপ আত্মা জড়রূপে মলিন বেশে নানা আকারে নানা প্রকারে প্রকাশিত হইতেছিলেন, তাহা গেল; কেবল মাত্র চৈতন্য পদার্থটিই একাকী থাকিলেন, তখন আর কোন বিষয়ের ধ্যানও নাই, জ্ঞানও নাই, চিন্তাও নাই, কেবল মাত্র সেই নিছক অনুভূতি জিনিষটিই (২৯৬ পৃ ১৭ প) থাকিলেন। তখন, সুখও নাই দুঃখও নাই, আনন্দও নাই, নিরানন্দও নাই, প্রকাশও নাই, ভক্তিও নাই, ক্রিয়াও নাই, সংস্কারও নাই, কেবল প্রকাশ মাত্রই আছেন। দেহটি জীবন্ত না মৃত তাহা বুঝিবার জো নাই। ইহাই নির্ব্বীজ সমাধির চরমাবস্থা।

এই অবস্থায় কেবলমাত্র চৈতন্যই থাকেন আর কোন প্রকার জড় বস্তুর সঙ্গে তাঁহার কোনরূপ সম্বন্ধই থাকে না, বাহ্য বিষয় হইতে প্রকৃতি পর্য্যন্ত, সমস্ত বন্ধন হইতেই আত্মা বা চৈতন্য একবারে বিমুক্ত, একবারে স্বতন্ত্র হইয়া কেবল ব্রহ্মাবস্থাতেই অবস্থিতি করিতেছেন, এজন্য ইহাকে কৈবল্য মুক্তি বা প্রকৃতাত্মজ্ঞান, বা ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মপ্রাপ্তিও বলে। ইহাই ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন "পুরুষার্থ শূন্যানাং গুণানাং প্রতি প্রসবঃ কৈবল্যমিতি" (৪ পা ৩৪ সূ)। এই সমাধির পর আবার কিরূপে জাগ্রৎ হয়, এবং তখন কিরূপ অবস্থা হয় তাহা দ্বিতীয় খণ্ডেই বলিয়াছি।

সমাধির বিষয় যাহা বলিলাম ইহার প্রত্যেক কথায় শ্রুতি, স্মৃতি, ও দর্শনের প্রমাণ ও যুক্তি মীমাংসাদি আছে, এবং আরও বহুতর কথা আছে তাহা ঈশ্বর সমাধি প্রকরণে বলিতে হইবে। এজন্য এখানে সঙ্ক্ষেপেই বলিলাম, ফলতঃ, যে টুকু বলিলাম তদ্দারাই বুঝিতে পারিলে যে আত্মসমাধি দ্বারা প্রকৃতি নিরোধ পর্য্যন্ত বিকাশ হইয়া আত্মজ্ঞানরূপ পরম ধর্ম্মও বিকসিত হয়, এবং নানা প্রকার অদ্ভুত শক্তি সমূহের প্রাদুর্ভাব হয়, তৎপর নির্ব্বাণ মুক্তিও হয়।

ইতর সমাধির বিবরণ।

শিষ্য। আত্ম সমাধির বিবরণ একরূপ বুঝিলাম এখন ইতর সংযম বা ইতর সমাধি কাহাকে বলে, এবং তদ্দ্বারাই বা কিরূপে কি হয়, তদ্বিষয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলুন।

আচার্য্য। চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদ, নদী, প্রস্তর, ঘটপটাদি যাহা কিছু ইচ্ছা হয়, তাহার কোন একটিতে লক্ষ্য করিয়া ধারণা, ধ্যান, সমাধি করিলে ইতর সংযম বলে ইহা পুর্ব্বেই বলিয়াছি। এই সমাধির দ্বারাও আত্মার প্রকৃতিনিরোধ পর্য্যন্ত হইয়া আত্মজ্ঞানও নির্ব্বাণ মুক্তি হইতে পারে। পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন "যথাভিমতধ্যানাদ্বা" "পরমাণুপরম মহত্বান্তোহস্য বশীকারঃ" "ক্ষীণে বৃত্তেরভি জাতস্যেবমণেগ্রহীতৃ গ্রহণ গ্রাহ্যে তৎস্থ তদঞ্জনতা সমাপত্তিঃ" (৩ পা, সমাধি পাদ ৩৯-৪০-৪১ সূ) ভাবার্থ,—যাহা ইচ্ছা হয় তাহারই ধ্যান করিতে করিতে চিত্তের সমাধি হইতে পারে। স্থূল বিষয়ে সংযম করিতে পারিলে, স্থূল সূক্ষ্ম সকল প্রকার তত্ত্বেই অবাধে সমাধি হয়। বাহ্য বিষয়ের ধ্যান করিতে করিতে চিত্তের বৃত্তি নিরোধ হইয়া গেলে স্থূলদেহ অবধি বুদ্ধি পর্য্যন্ত যেখানে যোগীর আমির অস্তিত্ব থাকিবে সেই খানেই সমাধি হইবে।" ইহার মর্ম্ম একটু বিস্তার মতে বুঝান যাইতেছে, ধরিয়া লও, তুমি যেন বাহিরে একটা ঘট চিন্তা করিতেছ, চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে ঐ ঘট লক্ষ্য করিয়াই ধারণা ধ্যান ও সমাধি এই তিনটি করিলে; সুতরাং চিত্তের ইতস্ততো গতির ক্ষমতা নষ্ট হইয়া নিরোধ শক্তির প্রাদুর্ভাব হইল, নচেৎ ঘটের সমাধি হইতেই পারে না। এখন বলা বাহুল্য যে, এই সমাধি কালেও দেহের স্থূলাবস্থায় সমাধি করার ন্যায়ই চিত্তের অবস্থা পরিস্ফুরিত হইবে। তৎপর তুমি আরও যত্নসহকারে ঐ ঘটের আকৃতি মনে রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলে, সুতরাং যে নিয়ম অনুসারে স্থূল দেহের চিন্তা করিতে করিতে ঐ স্থূল দেহের আকৃতিটি চিত্ত হইতে বিদূরিত হইয়া যাওয়ার কথা বলিয়াছি সেই নিয়ম অনুসারেই ঐ ঘটের আকৃতিটিও তোমার মন হইতে বিদূরিত হইবে। তাহা হইলেই মন বৃত্তিহীন হইয়া, অর্থাৎ ঐ

ঘটাকারে আকারিত অবস্থাটি পরিত্যাগ করিয়া নিজের স্বরূপে দাঁড়াইল; সুতরাং তখন মানসাত্ম জ্ঞান এবং সানন্দ সমাধি আর তাহার আনুষঙ্গিক অবস্থা সমস্তই হইল তৎপর আত্মসমাধির নিয়মানুসারে সমাধি হইয়া জীব কৃতকার্য্য হইতে পারে।

এখন জানা গেল যে, কেবলমাত্র বাহ্যবস্তুর সমাধি দ্বারায় আত্মার একারেক আত্মজ্ঞান পর্য্যন্ত সংসাধিত হয় না কিন্তু উহাতে সমাধি করিয়া চিত্তের একাগ্রতা ও অন্যান্য শক্তি লাভ করিলে আত্ম-সমাধি দ্বারাই যথানিয়মে মানসাত্ম জ্ঞানাদি হইয়া অবশেষে প্রকৃতাত্ম জ্ঞান হয়। এইরূপে ইতর সমাধি দ্বারা লোক কৃতকার্য্য হয়। ইহাই ইতর সমাধির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

জ্ঞানমার্গ কাহাকে বলে ?

ইহার সঙ্গে আর একটী কথা বলাও আবশ্যক, আজ কাল প্রায় আপামর সাধারণের মুখেই কথায় কথায় "জ্ঞানমার্গ ভক্তিমার্গ" এই প্রকার কথা সকল শুনা যায় কিন্তু সকলেই যে জ্ঞানমার্গ ভক্তিমার্গের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝে এরূপ আমার বোধ হয় না, তোমারও ওবিষয়ে হয়ত ভ্রান্তিমূলক ধারণাই আছে এইজন্য জ্ঞানমার্গ কাহাকে বলে সে কথাটি বুঝাইয়া দিই। মার্গ শব্দের অর্থ পথ আর জ্ঞান শব্দের অর্থ জানা সুতরাং সমাসের দ্বারা উভয়ের মিলনে উপলব্ধি হইলে যে কেবলমাত্র বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব জানিয়া এবং উপলব্ধি করিয়া যে প্রণালী অনুসারে আত্মজ্ঞান স্বরূপ পরম ধর্ম্ম লাভ করিয়া জীব মুক্ত হইতে পারে সেই প্রণালী বা সেই পন্থাই জ্ঞান মার্গ। অতএব এই যে আত্ম-সংযম ও ইতর-সংযমের প্রণালী প্রদর্শিত হইল ইহাই জ্ঞান মার্গ নামে অভিহিত হইতে পারে কারণ এই প্রণালী মধ্যে ঈশ্বর ভাবে উপাসনা, বা চিন্তা, বা ভক্তি অনুরাগ বা প্রেমের লেশ মাত্র নাই, কেবল মাত্র আধ্যাত্ম তত্ত্ব সকল অবগত হইয়া আত্মার সমাধি দ্বারাই সেই সকল তত্ত্বের উপলব্ধি

বা মানসিক প্রত্যক্ষ করিয়া জীব মুক্ত হইতে পারে। সেই জ্ঞান এবং উপলব্ধিই এই পথের এক মাত্র সম্বল। দেহের সমাধি দ্বারা দেহতত্ত্ব উপলব্ধি করিলে তৎপর ইন্দ্রিয় তত্ত্বাদিতে সমাধি দ্বারা উপলব্ধি করিতে করিতে অবশেষে আত্মার সমাধি হইয়া আত্মার প্রকৃততত্ত্ব অনুভব করিলেই সমস্ত বন্ধন ছুটিয়া গেল, জীব মুক্ত হইল, ইহারই নাম জ্ঞান মার্গ। ন্যায় বৈশেষিক এবং সাংখ্য দর্শনও প্রায় সমস্ত উপনিষদেই কেবল এই জ্ঞান মার্গের বর্ণনা এবং উপদেশ আছে। পাতঞ্জল আর বেদান্ত দর্শনেও এই পন্থাই বিস্তর রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, আবার উপাসনাও ভক্ত্যাদি বিষয়ও কিছু কিছু আছে। পূর্ব্বকার মহর্ষিগণ অনেকেই এই জ্ঞানমার্গের আশ্রয় লইয়া কৃতকার্য্য হইতেন। ইদানীংও যাঁহাদের সেইরূপ আর্য্যপ্রকৃতি আছে তাঁহাদের মধ্যে কদাচিৎ কাহাকে জ্ঞান মার্গের অনুসারী দেখিতে পাওয়া যায়।

জ্ঞানমার্গের বিপদাশঙ্কা।

কিন্তু তুমি কখনই এই জ্ঞানমার্গের অনুসরণ বা অনুসরণের চেষ্টাও করিও না; এখনকার লোকের যেরূপ প্রকৃতি তাহাতে জ্ঞানমার্গে সিদ্ধ হওয়ার কোনই আশা নাই, প্রত্যুত নানাবিধ বিপদাশঙ্কা আছে। অনধিকারী লোকে ইহার অনুষ্ঠান করিতে গেলে উন্মাদ, পক্ষাঘাত, অপস্মার (মৃগী) প্রভৃতি সমস্ত বায়ুরোগ, এবং শ্বাস কাস কামলাদি বহুতর ব্যাধি হইতে পারে, এমন কি মৃত্যুও হইতে পারে, চিত্তের অকর্ম্মণ্যতা, ও আলস্যাদি হইতে পারে। অতএব কখনই এই পন্থার অনুসরণ করিও না, কখনই করিও না কিন্তু অধিকারী হইলেও কেবল পুস্তক পাঠ করিয়াই ইহা অনুষ্ঠান করায় আশা ও কর্ত্তব্য নহে। তবে যদি উপযুক্ত কোন গুরু পাও যিনি, তোমার ক্ষমতা ও প্রকৃতি বুঝিয়া, হাতে হাতে অনুষ্ঠান শিক্ষা দিয়া, যখন ইহা করিতে অনুমতি করেন তখন করিলেও করিতে পার। ফলপক্ষে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর যিনি ইহা করিতে যাইবেন

তাহারাই 'আমাদের বিপক্ষের [illegible]' [illegible] আমার এই দিবে বাক্য যদি 'তোমার, অন্তরে' বোধ না হইতে পারে,' কিন্তু ঈশ প্রসাদে 'ইহার কারণ প্রদর্শিত হইবে, তখন ইহার অর্থও বুঝিতে পারিবে, এখন এইখানেই বিশ্রাম গ্রহণ করিলাম। ওঁ শ্রীসদাশিবঃ ওঁ।

ইতি শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি কৃতার্য্যধর্ম্মব্যাখ্যানাবর্ত্ত সাধনসমাধি বর্ণনে আত্মসংযম বর্ণনং নাম পঞ্চম খণ্ডং সম্পূর্ণম্ সমাপ্তশ্চেদং প্রথমপর্ব্বম্।

প্রথম পর্ব্ব সমাপ্ত হইল।